কবি সত্যেন্দ্রনাথের
গ্রন্থাবলী
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রথম খণ্ড

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত

বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড
৩৩ কলেজ রো : কলিকাতা

KABI SATYENDRANATHER GRANTHABALI
EDITED BY BISU MUKHOPADHYAY
VOLUME : ONE
Price Rs. 20·00
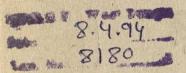
প্রথম প্রকাশকাল
ভাদ্র, ১৩৭৮
সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীকানাই পাল

মূল্য : কুড়ি টাকা

প্রকাশক
শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড
৩০, কলেজ রো
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ
শ্রীকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা ৬

"বঙ্গভূমে
যে-তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধদ্বার-রাত্রি অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের লাগি'
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি',
জয়মাল্য বিরচিয়া—রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি' ; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি !"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রযুগের কবি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন পূর্ণদীপ্তি বিকিরণ করেছে, তখন বাংলার সকল কবিই রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কবিতা রচনা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এর ব্যতিক্রম নন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর মধ্যে মাঝে-মাঝেই প্রকট হয়েছে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই আপন কল্পনাকে ভিন্ন পথে চালিত করে এবং এক অভিনব ভঙ্গিতে সে কল্পনার প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি নিজের প্রতিভার বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্র-যুগের কবি হওয়া সত্বেও আপন প্রতিভার স্বকীয়ত্ব তিনি রক্ষা করেছেন।

কবি এবং কবিতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব একটা ধারণা ছিল এবং সে ধারণা এমনই বদ্ধমূল ছিল যে, তা থেকে সত্যেন্দ্রনাথকে বিচ্যুত করা কারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তিনি বলতেন—বাংলাদেশে আড়াইজন সত্যিকার কবি জন্মেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র এক, রবীন্দ্রনাথ এক, আর মাইকেল আধ। ইউরোপের অল্প কয়েকজনকে তিনি কবি হিসেবে গণ্য করেছেন, শ্রদ্ধা করেছেন—যেমন, গ্যেটে, ভিক্টর হুগো, শেক্সপীয়ার ও শেলী। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত কবিকে তিনি কবি বলেই মানতেন না। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁর মত পরিবর্তন করার চেষ্টা করেও সত্যেন্দ্রনাথের সেই বদ্ধমূল ধারণাকে পরিবর্তিত করতে পারেন নি। আমেরিকার হুইটম্যান ও লংফেলোকে তিনি কবি বলে মানতেন না। তিনি বলতেন—"ওদের দেশের দুটি ত' মাত্র কবি, একজনের ছন্দ-মিল জুটেছিল ত' ভাব জোটেনি, অপরের ভাব জুটেছিল ত' ছন্দ-মিল জোটেনি।" ব্রাউনিঙের মত কবিকেও তিনি কবি বলে স্বীকার করতেন না। ব্রাউনিঙের কবিতাকে তিনি 'হেঁয়ালি' আখ্যা দিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ নিজে যখন কবিতা রচনা করেছেন, তখন এইরকম একটা দৃঢ়প্রত্যয় নিয়েই কবিতা লিখেছেন। কবিতা কি ধাঁচের হবে, সে সম্পর্কে তাঁর নিজের একটা আদর্শ ছিল, লক্ষ্য ছিল, মাপকাঠি ছিল। জনসাধারণের স্তুতি-নিন্দার কথা চিন্তামাত্র না করে তিনি কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। কবির অনুরাগ ছিল স্বদেশের প্রতি, মানুষের প্রতি এবং আপন মাতৃভাষার প্রতি। দেশ, জাতি এবং মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ নিয়ে তিনি তাঁর অধিকাংশ কবিতা লিখেছেন।

রবীন্দ্রপ্রভাবের আওতায় পড়েও সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনায় ও বর্ণনায় তাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যই তাঁর কাব্যে মৌলিকতার স্পর্শ ঘটিয়েছে। কবির এই মৌলিকতা কেবল তাঁর কাব্যের ভাববস্তুতে নয়, কবির ভাবানুভূতির সেই ব্যক্তিগত ভঙ্গি তাঁর কবিতার ভাষায় ছন্দে এবং শব্দযোজনায় ধরা পড়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। পিতামহের পাণ্ডিত্যের দীপ্তি তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁর কবিতায় জ্ঞানের আলো ঝকমক করে উঠেছে। অর্জিত জ্ঞানকে গানে পরিণত করার উদ্দেশ্যে কবির সমস্ত কাব্যপ্রচেষ্টা—একথা বলা চলে। কাব্যে জ্ঞানকে তিনি নীরস তথ্যপুঞ্জে পরিণত হতে দেন নি। আপন পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যকে অসামান্য সামর্থ্যের সঙ্গে তিনি তাঁর কাব্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে গিয়েছেন।

অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও বাংলা ভাষার দৈন্য ঘোচাবার জন্যে, বাংলা কাব্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যে তিনি যে সাধনা করে গিয়েছেন, তা অবিস্মরণীয় নিঃসন্দেহে। কিন্তু কবির কাব্য যতটা আদর পাওয়ার উপযুক্ত, ততটা সমাদর লাভ করে নি। যাঁরা তাঁর কবিতার অনুরাগী, তাঁদের মধ্যে একদলের ধারণা যে, সত্যেন্দ্রনাথের মত ছন্দকুশলী কবি দুর্লভ। আর একদল বলেন, অনুবাদে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অন্য ভাষা থেকে এমন সার্থক রূপান্তর খুব অল্প কবিই করতে পেরেছেন। এঁরা সত্যেন্দ্রনাথের ভক্ত এবং অনুরাগী নিশ্চয়ই। কিন্তু কেবল ছান্দসিক হিসেবে তাঁকে জানলেই তাঁর প্রতিভার সম্যক বিচার করা হয় না, অথবা একমাত্র অনুবাদই যে তাঁর প্রতিভার পরিমাপক—তাও নয়। উঁচুদরের কবিতাও তিনি লিখে গেছেন এবং তার পরিমাণও কম নয়। ভাষা ও ছন্দের রাজসিক আড়ম্বরের আড়ালে সেগুলি স্নিগ্ধ সন্ধ্যার শান্ত প্রদীপশিখার আলোক বিকিরণ করে। চোখ-ঝলসানো দীপ্তি তাদের নেই, কিন্তু মনের মধ্যে শান্তরসের ধারা বইয়ে দেবার শক্তি তাদের আছে। চিত্তের মধ্যে রম্যবোধ জাগিয়ে একটা স্বপ্নমদিরতা এনে দিতে পারে—এমনতর কবিতাও তিনি অনেক রচনা করেছেন।

তাঁর কবিতায় সৃষ্টির ঐশ্বর্য ভূরি পরিমাণ। উপরন্তু তাঁর কবিতা এমন বহু বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, যা শুধু পূর্বে ছিল না, তা নয়; তাঁর সমকালে

অন্য অনেক কবির মধ্যেই সে সকল বৈশিষ্ট্য ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় তাঁর সক্রিয় ও স্বকীয় মনের অজস্র নিদর্শন আছে। গতানুগতিক ধারায় তিনি চিন্তা করেন নি, কল্পনাও করেন নি। পুরাতন ব্যবহার-মলিন শব্দেরও অভাব তাঁর কবিতায়।

সত্যেন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন নানা বিষয় নিয়ে। তাঁর এক শ্রেণীর কবিতায় আমরা পেয়েছি কবির সমদৃষ্টির পরিচয়। সাম্যসাম, জাতির পাঁতি, মেথর, শূদ্র, বিশ্বকর্মা, সেবাসাম প্রভৃতি কবিতা এর নিদর্শন। কবি স্বাধীনতা ও তেজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। দেশ-বিদেশের মহত্ত্বকে সম্মান ও বন্দনা করেছেন। কবির অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা ছিল মনীষা ও পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতি, ন্যায়ের প্রতি, প্রতিভার প্রতি। তাঁর মধ্যে ছিল বীরপূজার প্রবণতা। মহতের জ্ঞানগরিমা, আত্মবলিদান ও পরার্থপরতাকে তিনি তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু করেছেন। দেশের সেবায় যাঁরা অগ্রগামী, তাঁদের জয়গান করেছেন। জাতীয় গৌরবে কবির মধ্যে জেগেছে উল্লাস। লাঞ্ছিতের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁর চিত্ত হয়েছে দ্রবীভূত। শিল্পীর অনুভূতি তীব্র, স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট। তাই দেখি, সত্যেন্দ্রনাথ ব্যথিতের অশ্রুজল, দুঃখ ও অমঙ্গল সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারেন নি। 'বেণু ও বীণা'র আরম্ভে কবি বলেছেন—

> বাতাসে যে ব্যথা যেতেছিল ভেসে ভেসে
> যে বেদনা ছিল বনের বুকেরি মাঝে,
> লুকান যা ছিল অগাধ অতল দেশে,
> তারে ভাষা দিতে বেণু সে ফুকারি বাজে।
>
> মূকের স্বপনে মুখর করিতে চায়,
> ভিখারী আতুরে দিতে চায় ভালবাসা,
> পুলক-প্লাবনে পরাণ ভাসাবে হায়,
> এমনি কামনা—এতখানি তার আশা।

কবির এই উক্তির মধ্যে কবিমানসের একটি বিশেষ ধাত ধরা পড়েছে। মানুষের পূজা তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমাদের চোখে যারা হীন, কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞার পাত্র, তাদের মধ্যেও কবি সন্ধান পেয়েছেন মনুষ্যত্বের

মহিমা। নবরূপের মধ্যে যে মহারূপের অধিষ্ঠান আছে, তার বন্দনা কবি করেছেন। তিনি জীবনের আহ্বান পৃথিবীর চারিদিকে ধ্বনিত হতে শুনেছিলেন। সেই আহ্বান কবির মনে এই বোধ জাগিয়ে দিয়েছিল যে, যেখানে ফুল ফোটে, পাখী ডাকে, পৃথিবী জ্যোৎস্নার আলোয় উদ্‌ভাসিত হয়—সেই জগৎটাকেই মেনে নেওয়ার মধ্যে কবিজীবনের সার্থকতা নেই; ব্যথিতের অশ্রুজল, দুঃখ-অমঙ্গল সম্বন্ধে উদাসীন থাকা কোনোমতেই সমীচীন নয়। লৌকিক সুখদুঃখের বাস্তবতায় নেমে না এসে তিনি পারেন নি। 'সবিতা', 'হোমশিখা', 'সন্ধিক্ষণ' তাঁর প্রথম দিককার কাব্যগ্রন্থ ও পুস্তিকা। সেগুলির মধ্যেই কবি সাম্যসম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছেন। এক নিখুঁত সমাজব্যবস্থার ছবি তাঁর কল্পনায় তখনই উদ্‌ভাসিত হয়েছে। বলিষ্ঠ নবজীবনারম্ভের কামনা তাঁর মধ্যে জেগেছে। মানবতার কল্যাণস্বপ্নে তিনি বিভোর হয়েছেন। ক্ষুদ্র ভেদবুদ্ধির বাধা নির্মূল করার কথা বলেছেন বলিষ্ঠতার সঙ্গে।

সত্যেন্দ্রনাথের এক শ্রেণীর কবিতা নিপীড়িত মানবের জীবনবেদ। সমাজব্যবস্থার নিষ্ঠুর শাসনে নিত্যলাঞ্ছিত উপেক্ষিত মানুষের জীবনকথা। সে-সব কবিতায় অত্যাচারিত মানুষের আত্মার ক্রন্দন প্রতিধ্বনিত। লক্ষ মানবের বেদনা সাম্যবাদের মহান্‌মন্ত্রে সেখানে রূপায়িত। মৌন মূক মূঢ়ের মুখে ভাষা দেবার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। নির্বাক মনের অখ্যাত জনের অন্তর্বেদনাকে প্রকট করার জন্য ভাষাকে যতখানি বলিষ্ঠ ও জ্বালাময়ী করা দরকার, তেমন ভাষা তাঁর অধিগত ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বুদ্ধির দীপ্তি, বিগত অতীতকে পুনর্জাগ্রত করার প্রয়াস। প্রাচীন যুগের ঐতিহ্যের মধ্যে তিনি আদর্শ-অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছিলেন। তাঁর কবিতার ভাববস্তুর ভিত্তিভূমি প্রধানত বুদ্ধি ও বিদ্যা, ভাবনা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি। বস্তু এবং চিন্তাকে, ইতিহাস এবং বিজ্ঞানকে, লোকব্যবহার এবং চরিত্রনীতিকে আশ্রয় করেই তাঁর কল্পনা পল্লবিত হয়েছে। কাব্যসৃষ্টিকালে কবিচিত্ত বেদ, পুরাণ, ইতিহাসের সঙ্গে সংযোগসূত্রটি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তাঁর কবিতায় অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটা সেতুরচনার প্রয়াস। ইতিহাস ও পুরাণপ্রসঙ্গকে অবলম্বন করে কবির দৃষ্টি যুগ-যুগান্তরের পথে ধাবিত। অর্বাচীন পুরাণ থেকে বেদের কাল পর্যন্ত কবি তাঁর দৃষ্টিকে

করেছেন প্রসারিত। প্রাচীন যুগের রহস্তময়তার মধ্যে পরিক্রমা করে তিনি পেয়েছেন আনন্দ।

অসংখ্য কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ উদ্দীপনাময় ছবি এঁকেছেন। জাতির আশা-আকাঙ্কার কথা ঘোষণা করার এবং অতীত ইতিহাসের গৌরবকে আধুনিক কালের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ শুধু শূন্য দিবসের অলস গায়ক ছিলেন না। এ কবির কল্পনায় অপ্রত্যক্ষ জগৎ বা দুরবগাহ ভাবাবেগ প্রাধান্য লাভ করে নি। পুরাণে ইতিহাসে মানুষের যে পরিচয় নিহিত আছে, তার প্রতিই তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁর কবিতা আবেগপ্রধান অতীন্দ্রিয়তার বিকল্প, ক্ষুব্ধ মনের বাস্তবমুখীন জীবনদর্শন। অবাস্তব সৌন্দর্যের মোহে তিনি বাস্তব থেকে কখনো দূরে যান নি। বাস্তবকে পুরোপুরি বিস্মৃত হয়ে তাঁর কল্পনা দিগন্তের অভিসারী হয় নি। লৌকিক সুখদুঃখের বাস্তবতায় নেমে এসে কবি খুঁজে পেয়েছেন অপার শান্তি। প্রত্যক্ষ জগৎ এবং সুস্পষ্ট চিন্তাই তাঁকে বেশী করে আকৃষ্ট করেছে।

যুগের ভাবনাচিন্তা, আশা-আকাঙ্কাকে দূরে স্থাপন করে শুধুমাত্র কল্পনায় বিভোর হতে তিনি পারেন নি। স্বদেশ এবং সমকালীন সমাজ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন। তাঁর কবিকল্পনা, সাংবাদিকতা ও সাময়িকতার স্বেচ্ছাবন্দীত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। সমাজ ও জাতির কল্যাণস্বপ্নে কবির কল্পনা নিয়োজিত হয়েছে। আপন সমসাময়িক কালের পৃথিবীতে, অথবা আপন দেশ ও কালে যে-সব ঘটনা ঘটেছে, যে-সব ঘটনায় জনচিত্ত সংক্ষুব্ধ হয়েছে, তাকে উজ্জ্বল করে আঁকার দিকে ছিল তাঁর বিশেষ প্রবণতা।

কবির মধ্যে ছিল প্রবল স্বজাতিপ্রীতি। তাঁর কবিত্বোন্মেষ স্বদেশী ভাবের আঘাতে। কিন্তু সেই স্বজাতিপ্রীতিকে একটা আইডিয়ার স্তরে না রেখে, দেশের ধর্ম-কর্ম, দর্শন-ইতিহাস, সাধনা-আরাধনার ইতিহাস তিনি পর্যালোচনা করেছেন। বর্তমানের যা কিছু অধর্ম ও অসত্য, যা কিছু ভীরুতা ও জড়তা, যা কিছু ক্ষুদ্রতা ও মূঢ়তা তাকে তিনি ধিক্‌কার দিয়েছেন, বিদ্রূপ করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ যুগসচেতন কবি ছিলেন। মানুষের সুখদুঃখ, হাসিকান্নার জগৎ তাঁকে আকৃষ্ট করেছে প্রবলভাবে। তাঁর সমসাময়িক কালে এমন কোন

ঘটনা ঘটে নি, যা তাঁর কবিতায় বাণীরূপ পায় নি। তা সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় এমন ভাবও আছে, যা কালের ব্যবধান মুছে ফেলে সকল কালের মানুষের মনে সাড়া জাগাতে সমর্থ। তাঁর বাণীতে এমন অনেক কিছু আছে, যা চিরন্তন। তাঁর কবিতায় অশেষের ইঙ্গিতও রয়েছে। একদিকে তিনি দেশহিতের বাণী প্রচার করেছেন, অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা উন্মোচন করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে চেনা জগতের মধ্যে নতুন ব্যঞ্জনা ফুটিয়েছেন, অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে অসামান্য মহিমা আবিষ্কার করেছেন। মনন এবং আবেগ উভয়কেই তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেবল শব্দের ললিত লীলায় তাঁর কবিতা ঝলমলিয়ে ওঠে নি। তাঁর মধ্যে অরূপবাদিতাও আছে।

বাস্তবতার দাবিকে অগ্রাধিকার দিয়েও সত্যেন্দ্রনাথ অরূপবাদী। রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা করেছেন। রূপজগৎ কবিকে অমোঘ আকর্ষণে আকৃষ্ট করে। কিন্তু রূপজগতের আকর্ষণ উপেক্ষা না করেও কবি ভাবস্বপ্নে আবিষ্ট হন। 'কুহু ও কেকা'র 'সহজিয়া' কবিতাটি কবির এই ভাবময়তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন—

ফুলের যা দিলে হবে নাকো ক্ষতি
অথচ আমার লাভ,
আমি চাই সেই সৌরভ,—শুধু—
অতনু অতল ভাব।
আমি চাই সেই দূর হতে পাওয়া
আমি চাই মধু-মশ্‌গুল হাওয়া,
অন্তরে চাই শুধু রূপসীর
অরূপ আবির্ভাব,
যাহা দিলে তার ক্ষতি নাই, তবু
আমার পরম লাভ।

অসীম অরূপের স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে যেমন করে রসের উৎস খুলে গিয়েছিল, প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের আড়ালে রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর ঈপ্সিততম ভগবানের সাক্ষাৎ পেয়ে উল্লসিত হয়েছিলেন, তেমনি কল্পনা সত্যেন্দ্রনাথও করেছেন। 'অভ্র-আবীর' কাব্যের 'কাজরী-পঞ্চাশৎ' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ ভগবান্‌কে খুঁজে পেয়েছেন ফুলের সৌরভে।

(তোমার) সৌরভ আজ চিন্‌ব গহন রসের অতলে !

*　　　*　　　*

(শুধু) গন্ধে তামার পাই যে নাগাল
　　(নীরব) ঝুলন-সাঁতারে,
(তোমার) রূপ-বিজুলী ডুব দিয়েছে
　　বাদল-পাথারে !

ভগবান্‌কে সত্যেন্দ্রনাথ আসতে দেখেছেন প্রস্ফুটিত ভুঁইচাঁপার রাশির মধ্যে—

(তুমি) আস্‌ছ পথে ভুঁই-চাঁপাতে
　　ভুবন সাজায়ে !
বাদল-ধারায় তাল মিলায়ে
　　(মৃদু) নূপুর বাজায়ে !

সত্যেন্দ্রনাথ অখণ্ড জীবনের কবি। শুধু চোখের দৃষ্টিতে দেখার মধ্যে দিয়ে নয়, কান পেতেও তিনি সৌন্দর্য উপভোগ করে গেছেন। কবির চিত্তের ক্ষুধা মিটেছে রূপজগতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে, আত্মার ক্ষুধা মিটেছে শব্দরসের অভিষেকে।

(সখী) যখন কেবল শ্রবণ চলে
　　নয়ন না চলে—
সেই শ্রাবণের আমল এখন
　　এ রঙ্‌-মহলে !
(আজ) শোন্‌ গো কেবল দাদুর কি কয়
　　(আর) ঝিল্লী কি বলে,
এক্‌লা পাখী কি গায়—বাদল-
　　ধারার বিরলে !

সত্যেন্দ্রনাথ এক শ্রেণীর কবিতায় মধ্যাহ্নের রৌদ্রদীপ্তি, বিদ্রোহের জ্বলন্ত হুংকার, মানুষের জড়তা-মোচনের প্রেরণা। আর এক শ্রেণীর কবিতায় সন্ধ্যার স্নিগ্ধছায়া। এই শ্রেণীর কবিতা চিত্তের মধ্যে সৌন্দর্যতৃষ্ণা জাগায়।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিচিত্ত আকাশ ও নীড় উভয়কেই স্পর্শ করেছে। তাঁর কবিমানস আকাশের ইন্দ্রধনু এবং পৃথিবীর প্রজাপতির পাখা—দুইয়েরই রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়েছে। রূপকথার স্বপ্নলোকে কবিচিত্তের প্রয়াণ তাঁর কবিতায়

আছে। চিরজ্যোৎস্নার রাজ্যটিও তাঁকে আকর্ষণ করে। পৃথিবীর অতিশয় তুচ্ছতম সামগ্রীকেও তিনি স্বপ্ন ও সুরভি মিশিয়ে নতুন করে সৃষ্টি করে নিয়েছেন। যে বিস্ময়রসে কবিতার জন্ম, সেই বিস্ময়রস তাঁর কবিতায় সুপ্রচুর। সৃষ্টির স্বপ্নরহস্যময় রূপ কবিকে মুগ্ধ করে। তখন রূপমুগ্ধ কবির মধ্যে কল্পনার লঘুপক্ষ বিস্তার আমরা পাই।—

কল্পনা আজ চলছে উড়ে
হাল্‌কা হাওয়ায় খেল্ খেলে'!
—ভোরাই : বেলা শেষের গান

সত্যেন্দ্রনাথ স্বপ্নলোকের কবি। কবি যখন প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন তখন চোখে দেখা সেই প্রকৃতিকে তিনি স্বপ্নলোকের সামগ্রীতে পরিণত করেছেন। 'কুহু ও কেকা'র 'যক্ষের নিবেদন' কবিতায় কবিমন কলকোলাহল-মুখরিত পৃথিবীর বন্ধন-মুক্ত হয়ে স্বপ্নবিহ্বল হতে চেয়েছে।—

শৈলের পইঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ,
মূর্ছার মন্তর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস!
ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর মৌন কোন্ সুর বাজায় মন,
বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন!

সত্যেন্দ্রনাথের একশ্রেণীর কবিতা স্বপ্নলোকের ভাণ্ডার, মনোরম চিত্রশালা, ইন্দ্রজালের রাজ্য। সে সব কবিতায় আছে শুধু রঙের ওপর রঙ্, মোহের ওপর মোহ, নানারঙের সন্ধ্যামেঘের খেলা। সেখানে পরীর গান, মন্ত্রের মায়া। এ কবির স্বপ্নমুগ্ধ দৃষ্টি মনে করিয়ে দেয় আয়ারল্যাণ্ডের কবি Yates-কে। ইয়েটস যেমন আয়ারল্যাণ্ডের প্রাচীন গাথা ও কাহিনীর অনুরাগী, সত্যেন্দ্রনাথও তেমনি বাংলাদেশের প্রাচীন রূপকথা, ব্রতকথা, ছড়া ও গাথার স্বপ্নাচ্ছন্ন জগতের ভক্ত। রূপকথা ব্রতকথার ইন্দ্রজাল তাঁর অনেক কবিতাতেই আছে।

তাঁর অনেক কবিতায় দেখি, কবি বিশ্বকে প্রখর আলোর সম্মুখে এনে দেখতে চান নি, তাকে অবগুণ্ঠিত রেখে, অন্তরের দীপশিখার স্নিগ্ধ আলোয় তার আরতি করেছেন। স্বপ্নজালের আবরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বসৌন্দর্য দেখে অসীম তৃপ্তিতে কবির মন ভরে গিয়েছে।—

দিনের আলোয় লাগ্‌ছে আজি তন্দ্রা চোখে,
নিবিড় নীলে ডুবিয়ে নিল স্বপ্নলোকে!—ভুঁই-চাঁপা : কুহু ও কেকা

অখণ্ড সৌন্দর্যলাভের আকাঙ্ক্ষা কবিমনে প্রবল হয়ে ওঠে, কবিচিত্ত জগতের নদীগিরি-অরণ্য অতিক্রম করে পৌছয় এক বাঞ্ছিত-লোকের সোনার চৌকাঠে। 'বেণু ও বীণা'র 'রম্যাণি বীক্ষ্য' কবিতায় কবি বলেছেন—

মন চিনেছে আকাশ-ভরা তারা,—
তাই—
মুক্ত রে আজ মর্ত্যভুবন-কারা!
তারার বনে মন হয়েছে হারা!

'ফুলের ফসল' কাব্যের 'আমন্ত্রণী' কবিতায় কবি নিজেকে স্বপ্ন-শাসন কবলিত করতে চেয়েছেন—

ফুলের ফসল লুটিয়ে যায়,
অপ্সরীরা আয় গো আয়;
মৌমাছিরে বাহন করে
হাওয়ার আগে ছুটিয়ে আয়!
পাতার আগায় শিশির-জলে
হেথায় কত মুক্তা ফলে,
লুতার সুতায় দুলিয়ে দোলা
ঝুলন খেলা খেল্‌বি আয়!

* * *

ভরে দে এই মিহিন্ হাওয়া
মোহন সুরের সুষমায়!
ঝুমকো ফুলের ছত্রতলে
জোনাক্-পোকার চুম্‌কি জ্বলে,
সেথায় গোপন রাজ্য পেতে,
স্বপ্ন-শাসন মেল্‌বি আয়!

'জ্যোৎস্না মদিরা' (কুহু ও কেকা) কবিতাতেও মধুর স্বপ্নাবেশে আবিষ্ট হওয়ার কথা আছে—

চন্দ্র ঢালিছে তন্দ্রা নয়নে,
মল্লিকা বনে ঢালিছে মায়া;
ছায়ায় আর্দ্র আলোখানি আজ
আলো-মাখা ফিঁকে হাল্কা ছায়া!

সুদূর-স্বপন-বিধুর প্রাণ,
উঠিছে মৃদুল মধুর গান,
মৃদুল বাতাসে মর্ম্মর ভাষে
উছসি' উঠিছে বনের কায়া!
স্ফুরিত ফুলের উতলা গন্ধে
নাচে অন্তর কত না ছন্দে,
আলোকে ছায়ায় প্রেমে সুষমায়
ভুবনে বুলায় মদির মায়া!

'অকারণ' (কুহু ও কেকা) কবিতায় রোমান্টিক কবিদের মত অব্যক্ত বেদনায় কবিচিত্ত অধীর হয়েছে। অনির্বচনীয় বিরহের আনন্দে কবি আবিষ্ট হয়েছেন। স্মৃতি-সঞ্চিত অমৃতলিপ্সায় কবি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।—

শূন্য যখন গাঙিনীর তীর,
পথে কেহ নাহি চলে,—
পড়ে নাকো দাঁড় খেয়া-তরণীর
তিমির-মগন জলে,—
নীলাম্বরীর অঞ্চল দিয়া
সন্ধ্যা সে দেয় দৃষ্টি রুধিয়া,
গন্ধতৃণের বিভোল গন্ধ
বাতাসের কোলে চলে;—
করুণে মুরলী বাজে পরপারে,
দীপ জ্বলে নিবে কিনারে কিনারে,
সুখ-নীড়ে পাখী ঘুম-ভরা আঁখি
স্বপনে কি যেন বলে;—
তখনি এ হিয়া উঠে উছসিয়া
নয়নে—অশ্রু ছলে।

ওয়ালটার ডি লা মেয়ার (Walter De La Mare), অথবা ইয়েট্‌সের (Yates) কবিতায় সুরের মূর্ছনায়, ভাষার মসৃণতায় মুহূর্তের মধ্যে যেভাবে একটা স্বপ্নলোকের পরিবেশ রচিত হয়েছে, সত্যেন্দ্রনাথের এক শ্রেণীর কবিতায় আমরা তেমন নিদর্শন পেয়েছি। তাঁর এই শ্রেণীর কবিতা মানুষকে পৃথিবীর তাপজ্বালা ভুলিয়ে অতীন্দ্রিয় আনন্দ আস্বাদন করায়, মনের নিভৃতে সৌন্দর্য-তৃষ্ণা জাগায়, একটা মেঘলোকের দিকে চিত্তকে আকৃষ্ট করে।

বাংলার পল্লীর কথা বলতে গিয়ে কবি স্বপ্নবিহ্বল হয়েছেন, কবির সৌন্দর্যতন্ময়তা ফুটেছে। বহির্জগৎকে অন্তরের সুন্দর স্বপ্নে মণ্ডিত করে একটি ভাবময় কল্পলোক সৃষ্টি সত্যেন্দ্রনাথও করেছেন। 'দূরের পাল্লা' কবিতায় পরিচিত চিত্রকে কবি স্বপ্নলোকের সামগ্রী করে তুলেছেন। এ কবিতায় মননাতিরেক নেই, আছে টুকরো টুকরো রূপচিত্র, বাংলার বিচিত্র ছবি; বর্ণগন্ধের স্বপ্নমদিরাময় মূর্ছনা। কবিতাটির পশ্চাতে একটা আবেগের খেলা লক্ষিত হয়। 'দূরের পাল্লা' কবিতায় চোখে দেখা ছবিকে কবি অনুভবের সামগ্রী করেছেন। কবিতাটিতে শব্দের ধ্বনিমাহাত্ম্যে স্বপ্নজাল বয়ন করা হয়েছে। বর্ণনার পিছনে একটি আবেগময় হৃদয়ের উপস্থিতি বেশ বোঝা যায়।

কবি দেখেছেন—বাংলার শ্যামশ্রী লুপ্ত হতে চলেছে। তাই শ্যামল স্বপ্নময় পল্লীর দিকে তিনি অধীর আগ্রহে তাকিয়েছেন। কবির চোখে বাংলার পল্লী-প্রকৃতি একটা মায়ার অঞ্জন পরিয়ে দিয়েছে। পল্লীকে তিনি 'আন্ গগনের আলো'য় উদ্ভাসিত দেখেছেন। পল্লীর বিচিত্র ছবি কবির চিত্তে আনন্দতরঙ্গের সৃষ্টি করেছে। সেই আনন্দে বাংলার মাঠ-ঘাট-বাটকে তিনি একটা প্রীতিস্বপ্নময় কবিতার দেশে পরিণত করেছেন। পল্লীর ছোট ছোট জিনিসকে ঘিরে কবির কৌতূহলের দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়েছে। কবিতাটিতে গ্রাম-জীবনের ছবি অনুরাগের সঙ্গে এঁকেছেন, অলস জীবন-ধারার ছবি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। 'দূরের পাল্লা' কবিতায় অপরূপ স্বপ্নচ্ছবির সমাবেশ—বুনো হাঁসের শ্যাওলায় ঢাকা ডিমের কথা, ঝকঝক কলসীর বকবক শব্দের কথা, তন্দ্রাচ্ছন্ন ঢোল-কলমীর ফুলের কথা, গ্রামগঞ্জের ক্ষীণরেখা। রূপকথা ও লৌকিক ছড়ার রসে কবিতাটি স্নিগ্ধ রমণীয়।

কবির মধ্যে ছিল সুগভীর মর্ত্যমমতা। সত্যেন্দ্রনাথের সুগভীর মর্ত্যপ্রীতি রবীন্দ্রনাথকে মনে করায়। স্বর্গের অমৃতধারার প্রতি বিরূপ হয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমনভাবে 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি'র প্রতি মমতা প্রকাশ করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথও ঠিক সেইভাবে মর্ত্যের মোহে আবিষ্ট হয়েছেন। দুঃখবেদনা-বিরহিত আনন্দের অলকাপুরীতে সত্যেন্দ্রনাথ বেশীদিন বাস করতে পারেন নি। বৈচিত্র্যবিলসিত এই পৃথিবীকেই কবির বেশী ভাল লেগেছে।

রোমান্সের মোহে সত্যেন্দ্রনাথ কল্পনার আনন্দলোকে গিয়েছেন বটে, কিন্তু ভাবময় অরূপ জগতে তিনি বেশীদিন অতিবাহিত করতে পারেন নি। পৃথিবীকে ভালবেসেই কবি নিজেকে ধন্য মেনেছেন।

এই মর্ত্যপ্রীতিই সত্যেন্দ্রনাথকে রূপের কবি করে তুলেছিল। কবি তাঁর দুচোখ ভরে নিঃশেষে এই মর্ত্যের রূপসিন্ধু পান করতে চেয়েছেন। রূপের এত বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব, এতটা প্রাধান্য, তাঁর সমসাময়িক অন্য কোনও কবির মধ্যে ছিল বিরল। এই রূপপ্রিয়তার বশে সত্যেন্দ্রনাথের লেখনী পরিণত হয়েছে তুলিকায়। পৃথিবী ও প্রকৃতির রূপে ও সুরে তিনি ছিলেন মুগ্ধ। এই কারণেই তিনি পরিপূর্ণ ভাববিভোর রসের কবি হয়ে উঠতে পারেন নি।

সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল শিশুর মত কৌতূহলী। সেই কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তিনি জগতের পানে চেয়েছেন। যা দেখেছেন, তাতেই হয়েছেন মুগ্ধ। অপূর্ব আনন্দে তিনি চরকার ঘর্‌ঘর্‌ শব্দে কান পেতেছেন। পিয়ানোর টুংটাং শব্দ শুনে মুগ্ধ হয়েছেন, শীতের ভোরে আনন্দে অধীর হয়ে তাতারসির গান গেয়েছেন। মাঝিদের দূরের পাল্লায় তাদের সঙ্গী হয়ে বাংলার পল্লীর বিচিত্র শ্রী ও সম্পদ্‌ দেখেছেন এবং আনন্দে তন্ময় হয়েছেন। পৃথিবীর অগণ্য সাধারণ জিনিসের মধ্যে তিনি দেখেছেন অনন্ত বিভূতি, পৃথিবীর বিচিত্র রূপসৌন্দর্য দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছেন। সে আনন্দ কোন তত্ত্বোপলব্ধির আনন্দ নয়—রূপপ্রিয়ের সহজ সরল আনন্দ।

সকল শিল্পীর চোখেই মাখানো থাকে বিস্ময়ের অঞ্জন। কেউ মানব-মনের রহস্যে, কেউ প্রকৃতির সৌন্দর্যে, কেউ বা অতীন্দ্রিয়ের ধ্যানে, কেউ বা অলৌকিকের কল্পনায় এই বিস্ময় প্রকাশ করেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ সহজ সৌন্দর্যের ভক্ত, সরল কল্পনার পূজারী। শিশুর রূপবিহ্বল মন নিয়ে, উৎসুক দৃষ্টি মেলে কবিচিত্ত মাঠ-ঘাট-পর্বত ও অরণ্যের মাঝে পরিক্রমা করেছে। তাঁর ভাষায় কলকাকলির যে প্রগলভ মাধুর্য, তা রূপমুগ্ধ চিত্তের আনন্দের অভিব্যক্তি। মনের আনন্দে কথা সাজিয়ে চোখে দেখা ছবিকে কবি করে তুলেছেন বাঙ্ময়।

১৯০৫ সালের পর বাংলাদেশকে জানবার চেনবার এবং শ্রদ্ধা করবার যে আকাঙ্ক্ষা কবিশিল্পীদের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল, সেই জাতীয়-সাংস্কৃতিক

চেতনা সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। দেশের মাটির পায়ে প্রণাম জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে বললেন—'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ীর, (তোমাতে বিশ্বমায়ের) আঁচল পাতা।' রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক অনেক কবিই সেদিন একদিকে যেমন বাংলার বিরাট রূপ প্রত্যক্ষ করলেন, অন্যদিকে তেমনি বাংলার প্রতিটি তৃণপর্ণে, পুষ্প-পল্লবে তাঁরা দেখলেন অনন্ত ঐশ্বর্য। সত্যেন্দ্রনাথ একদিকে বললেন—

> সাগরে তোর শঙ্খ বাজে—শুনতে যে পাই রাত্রি দিন,
> হিমালয়ের দুয়ার দিয়ে চর তোমার চলছে কিনা।
> দেখছি গো রাজ-রাজেশ্বরী তুমি তোমার শাসন খাটে,
> বিশ্বকে তোর অন্ন জলে যত্নে তোমার ডঙ্কা বাজে।
>
> —গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি : অভ্র-আবীর

অন্যদিকে বললেন—

> শিমুলে তোর আগুন জ্বালিয়ে, বন-জোড়া যেন বকুল তার,
> ঝাউ-শালিকে ঝম্পা খায়, নকীব হেঁকে চাতক যায়,
> নাগ-কেশরে চামর করে, কোকিল তোরে সঙ্গীতে,
> অভিষেকের বারি করে দিবা মেঘ-পুঞ্জিতে।
>
> —ঐ

সত্যেন্দ্রনাথ বিরাটের পাশে বাংলাদেশের অতি পরিচিত ছবিও এঁকে গিয়েছেন। বাংলাদেশের এই দুই রূপ দেখার মধ্য দিয়ে তাঁর দেশদর্শন সম্পূর্ণ হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বড় চেনা, বড় অন্তরঙ্গ একটা বাংলাদেশ আছে। তার লতায়-পাতায় পাখী, তার মেঘ ও আকাশ খুশির রঙে রাঙা। বাংলার মাটি আর বাংলার জলকে চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার বিচিত্র ছবিকে তিনি অবিস্মরণীয় করে গিয়েছেন। তিনি তাঁর কবিতায় বাংলার পাখীর গান আর তালপাতার বাঁশির যে সুর প্রতিধ্বনিত করে গিয়েছেন, তার রেশটুকু মিলিয়ে যাবার নয়। কবিতা শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সুরটুকু কানে বাজে, বাংলার ছবি চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে। বাংলার রূপ এবং স্বরূপের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁদের কাছে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার আবেদন অমোঘ।

জলের কোলে ঝোপের তলে
কাঁচপোকা রং আলোক জ্বলে,
লুব্ধ করে, মুগ্ধ করে
বৌ কথা কও কেবল ডাকে।

এ ছবি অতি-পরিচিত গ্রাম বাংলার ছবি। এমনিতর অসংখ্য চিত্র সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় রয়েছে। যেমন—

১. মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আলতা-পাটি শিম! —ইল্‌শে গুঁড়ি : অভ্র-আবীর

২. দিঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্‌সা দেখে,
শোল্-পোনাদের তরুণ পিঠে আলপনা সে যাচ্ছে এঁকে।

*　　*　　*

ডালপালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘড়িক্-ঘড়ি,
লক্ষ্মীদেবীর সামনে কারা হাজার হাতে খেল্‌ছে কড়ি!
—চিত্র শরৎ : অভ্র-আবীর

৩. হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো;
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থমকে গেল! —দূরের পাল্লা : বিদায় আরতি

৪. ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়,
ঝাউ-গাছ দুল্‌ছে,
ঢোল-কলমীর ফুল তন্দ্রায় ঢুল্‌ছে। —ঐ

কবি বাংলার ধূলিকণাকে পর্যন্ত সাহিত্যজাত করেছেন। বৃষ্টিধারার সঙ্গে তিনি আমাদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। বাঙালীর ঘরের চালার শিমের ফুলটিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। নিদাঘ মধ্যাহ্নের যে চিত্র তিনি এঁকে গিয়েছেন—'ময়রা মুদি, চক্ষু মুদি' পাটায় বসে ঢুলছে কসে'—তা আমাদের পরিচিত ছবি। বলা যেতে পারে, বাংলা দেশের এমন অন্তরঙ্গ চিত্ররূপায়ন অল্পসংখ্যক কবির কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমরা বঙ্গলক্ষ্মীর বন্দনা শুনেছি। তাঁর অপূর্ব ধ্যান-দৃষ্টিতে বাংলাদেশ আমাদের কাছে মধুময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় যে বাংলাদেশকে আমরা পেয়েছি, তা রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত

ধ্যানের গভীরে আমাদের আচ্ছন্ন করে না বটে, কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজবার জন্য বেরিয়ে পড়া বাবুই পাখীর মত বাংলাদেশের পথে-ঘাটে আমাদের টেনে বার করে নিয়ে যায়। তাঁর কবিতা পড়ে বাংলার চারিদিকে আমরা নিজেদের ছড়িয়ে দেবার দুর্নিবার একটা প্রেরণা অনুভব করি। মুহূর্তকালের মধ্যে আমরা কাজলাদিঘির পাড়ে গিয়ে দাঁড়াই, দেখি 'শোল্-পোনাদের তরুণ পিঠে কে যেন দেয় আলপনা!' শরতের রোদ হঠাৎ কমলাখোলার রেঁায়ার মত হয়ে আমাদের মনটাকে প্রসন্ন করে তোলে।

দেশ-বিদেশের বহু কবির কবিতা সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদ করে গিয়েছেন। অনুবাদে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কবি তাঁর প্রথম অনুবাদ-গ্রন্থ 'তীর্থ-সলিলে'র প্রারম্ভিক কবিতায় লিখেছিলেন—

> আমার কণ্ঠে গাহিছে আজিকে জগতের যত কবি।
> আমার তুলিতে আঁকিছে তাদের দুখসুখের ছবি।

'তীর্থ-সলিল'-এর ভূমিকায় তিনি আরও লিখেছেন—"ক্ষেত্রবিশেষে অনুবাদের অনুবাদ। সকল স্থলে মূলের ছন্দ রাখিতে পারি নাই; তবে, মূলের ভাব অক্ষুন্ন রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।" এরূপ বিনয়োক্তি করা সত্বেও, বিদেশী কবিতার ছন্দ অলঙ্কার ইত্যাদি বহিরঙ্গ রূপভেদ এবং সেই সঙ্গে মূল কবিতার ভাবকে তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন।

অনুবাদককে মূল ভাষার যথার্থ স্বাদ পেতে হয়। এক ভাষার রসাভি-জ্ঞতাকে অন্য ভাষায় আনতে হয়। মূল ভাষার শব্দার্থ, ইডিয়ম, সংগীতধর্ম সম্বন্ধে অনুবাদককে অভিজ্ঞ হতে হয়। অনুবাদকের দায়িত্ব শুধুই বুদ্ধিগ্রাহ্য সুস্পষ্ট অর্থ সরবরাহ করেই শেষ হয়ে যায় না। সেই অর্থটিকে রসের সামগ্রী করে তুলতে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ তা পেরেছিলেন। কবির 'তীর্থ-সলিল কাব্যখানি পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"মূলের রস কোনোমতেই অনুবাদে ঠিকমত সঞ্চার করা যায় না। কিন্তু তোমার লেখাগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রসসৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরবই তাই—তাহা একই কালে অনুবাদ এবং নূতন কাব্য।"

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে আড়ষ্টতা নেই, অনুবাদ হলেও সেগুলি নতুন সৃষ্টি।

মূলের রসকে তিনি সার্থকতার সঙ্গে ভাষান্তরিত করতে পেরেছেন। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদ সম্বন্ধে আরও বলেছেন—

"তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তরপ্রাপ্তি। আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহা শিল্পকার্য নহে, সৃষ্টিকার্য।"

অনুবাদে হাত দেওয়ার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চেয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্যের স্বাদ আনতে, দেশ-বিদেশের কবিতার ভাবপ্রবাহের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ঘটাতে। ভাবজগতের নতুন দিগন্ত রচনার জন্য অনুবাদ ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ জেগেছিল। দূর অতীতের ইঙ্গিত একালের কবিতায় তিনি প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-স্পৃহার মূলে আরও একটি কারণ ছিল। সেটা ছন্দের অভিনবত্ব সন্ধানে তাঁর সহজাত আগ্রহ। সংস্কৃত ছন্দ এবং বিদেশী কবিতার রূপগঠনকৌশল তাঁকে এমনই মুগ্ধ করেছিল যে, তারই ফলে তিনি বিচিত্র ছন্দের সংস্কৃত ও বিদেশী কবিতা অনুবাদ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ নির্মিতির স্তরে উন্নীত, অনুকৃতির দৈন্য থেকে বিমুক্ত। সৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য তাঁর অনূদিত কবিতাসমূহের বুকে। আপন অনুভূতি বা কল্পনার খাদ না মিশিয়ে মূলের রসবস্তুকে পরিবেশন করার আগ্রহ কবির মধ্যে ছিল, এইজন্যই এরূপ হয়েছে। মূলের রস গ্রহণ করার জন্য যে জ্ঞান দরকার, সত্যেন্দ্রনাথের তা ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ তর্জমা করে গিয়েছেন, নকল করেন নি। নকল করার মধ্যে কোন গৌরব নেই। অনুবাদে প্রতিভার দীপ্তি ধরা পড়ে, নকলে প্রতিভার চিহ্নমাত্র থাকে না। নকলে বাইরের পদার্থ বাইরেই থাকে, নকল নীরস ছোট গণ্ডির মধ্যেই মানুষকে বন্দী রাখে। কিন্তু অনুবাদ রসের সামগ্রী—তা মানুষের কল্পনাকে জাগ্রত করে, মানুষের মনে সুন্দরের স্বপ্ন সৃষ্টি করে। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ এই শ্রেণীভুক্ত।

সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে রূপোপভোগের এক প্রখর পিপাসা ছিল। কবিতায় রূপজগতের সৌন্দর্যকে অম্লান রাখার জন্যে, সৌন্দর্যকে উজ্জ্বলতর করবার জন্যে এ কবির প্রধান সহায় হয়েছিল তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর ভাষা। তাঁর শব্দযোজনা রূপজগতের রং ও রেখাকে সুস্পষ্ট করেছে। মনের অনুভূতি ও আনন্দকে

কারুকলায় মণ্ডিত করার জন্যে তিনি সকল প্রকার—সকল শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করে গিয়েছেন। তৎসম শব্দ থেকে আরম্ভ করে, বিদেশী ও অপ্রচলিত শব্দ, দেশজ শব্দ—সবই তিনি তাঁর কাব্যে আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করে গিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য পাঠকালে মনে হয় যে তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের অক্ষরগুলি পর্যন্ত বর্ণ ও ছন্দকে যেন পরিস্ফুট করেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি ভাষার অপরূপ কারুকার্য, কড়ি ও কোমলের চিত্তগ্রাহী ধ্বনিরঙ্গ, চিত্রাঙ্কনের আশ্চর্য নৈপুণ্য। বহুভাষায় অধিকার থাকার ফলে তাঁর শব্দভাণ্ডার বিচিত্রবর্ণের মণিমাণিক্যে উজ্জ্বল। দুনিয়ার মানিক-হরফ সঞ্চয়ন করে তিনি রচনা করে গিয়েছেন তাঁর কবিতাবলী। একটি তোড়ায় তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন চামেলি ও আফিমের ফুল। রাঙা আরবী প্রবাল, তুর্কেনী হীরা-রাশি, আরাকানী লাল আর ইরানী চুনীপান্না থেকে আরম্ভ করে 'চুনিয়া পাথর', 'মন্ত্রসিদ্ধ মণি' পর্যন্ত সবই সজ্জিত হয়েছে তাঁর রাজকোষে। তৎসম শব্দের সঙ্গে বৈদেশিক বাণীর মেলবন্ধন অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে তিনি করে গিয়েছেন।

ধ্বনির সহায়তায় তিনি বিচিত্র রঙের ছবি এঁকেছেন। কবির সুপরিচিত 'ঝর্ণা' কবিতায় একদিকে রয়েছে অপরূপ ধ্বনিঝংকার, সেই ধ্বনিঝংকার ঝর্ণার রূপকে স্পষ্টীকৃত করেছে, ঝর্ণার গতিতরঙ্গ ফুটিয়েছে। চরকার গান, দূরের পাল্লা, পাল্কীর গান, ইল্‌শে গুঁড়ি প্রভৃতি কবিতায় কেবল ধ্বনির মায়া নেই—ধ্বনির ঝংকারে সুষমাময় একটা রূপজগৎও ফুটে উঠেছে প্রত্যেকটি কবিতায়। চরকার গানে কেবল ধ্বনিঝংকার নেই, চরকার ঐশ্বর্য গৌরব ও কল্যাণশ্রীও ঐ কবিতায় পরিস্ফুট হয়েছে। বাংলার বিলুপ্ত ইতিহাস এতে রূপায়িত। এ কবিতার ধ্বনি আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জাগরণী মন্ত্র আমাদের শুনিয়েছে। পাল্কীর গানে যে সুরঝংকার ধ্বনিত হয়েছে, তাতে একদিকে রয়েছে পাল্কী বেহারাদের শ্রমহরণ সুরমূর্ছনার অনুকরণ, অন্য দিকে বাংলার গ্রামপথের বিচিত্র ছবি।

সত্যেন্দ্রনাথের শব্দধ্বনি অর্থদ্যোতক। শব্দের ধ্বনিপ্রবাহের সহায়তায় কবি স্বপ্নজাল বয়ন করে গিয়েছেন। তাঁর ব্যবহৃত ভাষা অতিশয় মসৃণ—সে ভাষার পিছনে স্পন্দিত হয়েছে একটি আবেগময় হৃদয়। শব্দের মাজিত মুকুরে

কবি বস্তুর বস্তুরূপ ফুটিয়েছেন। শব্দের আধারে পৃথিবীর সংখ্যাতীত চিত্রকে ধরে রেখেছেন।

জাতির চিত্তকে স্পর্শ করা ছিল সত্যেন্দ্রনাথের ভাষাসৃষ্টির একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। বংশপরম্পরাগত জাতীয় ঐতিহ্য এবং কল্পনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর মধ্যে যে এক প্রবল বাসনা ছিল, তা বেশ বোঝা যায়। খাঁটি বাংলা ভাষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বাংলা কাব্যে অসংখ্য নতুন নতুন ছন্দ উদ্ভাবন করে ও সংগ্রহ করে সত্যেন্দ্রনাথ তাকে প্রভূত সম্পদ্‌শালী ও বৈচিত্র্যময় করে গিয়েছেন। কবির বাণী রূপ পেয়েছে বিচিত্র ছন্দে। কাজরী, কাফি নানা রাগিণী তিনি শুনিয়েছেন—ভরতনাট্যম্ থেকে আরম্ভ করে তয়ফা পর্যন্ত নানা নৃত্যের ছন্দ তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। বাংলার ছড়ার ছন্দ, Sir Walter Scott-এর Young Lochinvar-এর ছন্দ (Dactyl), ভিক্টর হুগোর Jinnie কবিতার ছন্দ, গ্রীক Bumos ছন্দ, সংস্কৃত পঞ্চচামর, মালিনী, স্রগ্ধরা, রুচিরা, মন্দাক্রান্তা, ছালিক্য, গৌড়ীয় গায়ত্রী ছন্দ, শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ ; কিংবা গুজরাটি গরবা, ফার্সী রুবাই, আরবী হযজ্ ছন্দ—কিছুই বর্জিত হয় নি সত্যেন্দ্রনাথে। সব চেয়ে বড় কথা এই যে—বিভিন্ন দেশ ও জাতির বৈশিষ্ট্যমূলক ছন্দভঙ্গিকে এমনভাবে তিনি আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন যে, কোথাও তাদের আগন্তুক বলে মনে হয় না। সত্যেন্দ্রনাথের আমদানী করা ছন্দে নববধূর সলজ্জ সংকুচিত ভাবটুকু নেই, প্রৌঢ়া বধূর মত অসংকোচে সে সকল ছন্দ বাংলা ভাষার অঙ্গনে বিচরণ করেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ সব চেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন বাংলা স্বরমাত্রিক ছন্দ। তিনি বুঝেছিলেন যে বাংলা স্বরমাত্রিক ছন্দে বিচিত্র ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়। বাংলা শব্দের স্বরধ্বনিকে লঘুগুরু ভেদে এমনভাবে তিনি সাজিয়েছেন যে তাতে শুধু ইংরেজী নয়—সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার ছন্দের তালকে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের অনন্ত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎটি দেখিয়ে গিয়েছেন। লঘু-গুরু স্বরের নব নব সমাবেশের দ্বারা বাংলায় যে অসংখ্য নতুন

ছন্দ আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে—এ জিনিসটি সত্যেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। স্বরবৃত্তের অদ্ভুত শক্তি ও সম্পদের পরিচয় তিনি উদ্‌ঘাটিত করে গিয়েছেন। প্রাকৃত বাংলার নিগূঢ় শক্তির আবিষ্কারক হিসেবে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়েই থাকবে।

প্রচলিত পয়ার ত্রিপদী ছন্দও সত্যেন্দ্রনাথের হাতে নতুন রূপ পেয়েছিল। চোদ্দ অক্ষরের চিরপুরাতন পয়ারকে তিনি যতিবিভাগের বিপর্যয় ঘটিয়ে ও মিলের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করে এক নতুন রূপ দিয়েছেন। যেমন—

নিখিল অবদান। সমাধান যেখানে।
গীতি সে অবসান। যে মহান্ শ্মশানে।
যেখানে মহাঘুম। চিতাধুম সৃষ্টির।
সেখানে কুণ্ডলি'। কুতূহলী তুলি শির।

—শেষ : তুলির লিখন

এখানে পর্ববিভাগ ৮+৬ নয়, প্রতি চরণকে ৭+৭ অক্ষরের দুই পর্বে ভাগ করা হয়েছে।

দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদীর নতুন যতিবিভাগ করে সত্যেন্দ্রনাথ্ তাদের পৌরাণিক আবরণ মোচন করেছেন, তাদের নবীন রাজবেশ পরিয়েছেন।

যেমন—

চরণে লীন। এই যে মলিন!
এই যে আধার। নিরাধার।

অথবা—

এস তুমি। বাদলবায়ে। ঝুলন ঝোলাবে।
কমল চোখে। কোমল চেয়ে। কূজন ভুলাবে।।
শীতল হাওয়া। নিতল রসে।
বনের পাখী। ঘনিয়ে বসে।
আজ আমাদের। এই দোলাতেই। দুজন কুলাবে।।

সত্যেন্দ্রনাথে ধ্বনি-প্রধান ছন্দের নতুন রূপ—

জ্যোৎস্নায়। নাই বাঁধ।
এই চাঁদ। উন্মাদ।
এই মন। উন্মন।
তন্ময়। এই চাঁদ।।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তের প্রতি চরণের পর্ব ৪+৪ মাত্রার।

অঞ্চল সিঞ্চিত। গৈরিক স্বর্ণে, ।
গিরি মল্লিকা দোলে। কুন্তলে কর্ণে ।
অশ্রুর মৌক্তিক। হাস্যের স্ফূর্তি ।
লহরের লীলা ঠিক। লাস্যের মূর্তি ॥ ।

প্রতি চরণ ৮+৭ মাত্রা।

সত্যেন্দ্রনাথের সমিল মুক্তক—

আহত সৈনিক ভুলি যন্ত্রণা তাহার,
অস্ত্র-উপচার
আসন্ন জানিয়া যবে ত্রস্ত দৃষ্টি ভরে
সকাতরে
ইতি উতি চায়,
তখন তাহারো পানে চেয়ো করুণায়।

—চোখের চাহনি : মণি-মঞ্জুষা

সত্যেন্দ্রনাথের মাত্রাবৃত্ত অমিত্রাক্ষর—

ইংলণ্ড ! ইংলণ্ড !
সিন্ধুর প্রহরী !
রাষ্ট্রের স্রষ্টা !
মানুষের ধাত্রী !
সংগীত শুনিবার
অবসর আছে কি ?—
সংগীত-মিস্ত্রির অপরূপ কীর্তি ?
*　　*　　*
তন্ময় মুখ সব,—
উজ্জ্বল, রক্তিম,
হাপরের তাপে, হায়,
ঝলসায় চক্ষু !

—সংগীত মিস্ত্রির নিবেদন : তীর্থরেণু

সত্যেন্দ্রনাথ পয়ারে প্রবহমানতা এনেছিলেন—

জড়ায়েছ পুষ্পদাম সুবিপুল তরঙ্গ-বাহুতে
কার লাগি' মহাবাহু? কারে দিবে আলিঙ্গন-পাশ?
জ্যোৎস্না-বারুণীর রসে অসংবৃত এ মহা উল্লাস
কেন আজি দেহ-মনে? হবে বুঝি চন্দ্রমা রাহুতে
সন্ধি আজ শুভক্ষণে—পরিণয়—জীবনে মৃত্যুতে!

—পূর্ণিমা রাত্রে সমুদ্রের প্রতি : অভ্র-আবীর

'অভ্র-আবীর' কাব্যের 'অন্ধকারে সমুদ্রের প্রতি', 'সমুদ্র-পান' কবিতাতেও প্রবহমান পয়ার ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সমকালের কবি, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার ভিতর দিয়েই রবীন্দ্রোত্তর যুগের স্থচনা যে হয়েছিল—একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। রবীন্দ্রোত্তর কালের কবিতায় ভাবপ্রাবল্যের স্থানে আমরা বুদ্ধির প্রাধান্য পেয়েছি, চিত্তের দ্রুতি অপেক্ষা বুদ্ধির দীপ্তি লক্ষ্য করেছি। তারই আগমনী সত্যেন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রোত্তর কালের সাধারণ লক্ষণ বাস্তব-সচেতনতা, আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে সর্বাতিশায়ী মানবতার প্রতিষ্ঠা। এ কালের কবিরা অরূপ-বিমুখ, রূপাশ্রয়ী। বাস্তবচেতনা এবং রূপচেতনা রবীন্দ্র-পরবর্তী কালের কবিদের মধ্যে অতিশয় প্রখর। বর্তমানের কবিতায় অধ্যাত্ম-বোধের স্থান অধিকার করেছে একটা তীব্র সমাজবোধ, সেই সমাজবোধের পরিণতি একদিকে সকল প্রকার কৃত্রিম ভেদবিরোধী মনোভাবে এবং নিখিল মানবের প্রতি অসীম সহানুভূতিতে। রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মবোধের দ্বারা বাস্তবজীবনকেও একটা অবাস্তব স্থন্দর রূপ দিয়েছেন। কিন্তু এ-কালের কবিতায় মানবতাবোধ অতিশয় প্রবল, দারিদ্র্যের মৃত্যুগর্বে স্থন্দর জাতিসমূহের প্রতি স্থগভীর দরদ। আজ ছোট-বড়, তুচ্ছ-ক্ষুদ্র সকলকেই কাব্যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সাহিত্য অসীম ছেড়ে সীমায় নেমে এসেছে, জীবনাতীতকে ছেড়ে সাহিত্য জীবনকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধেছে। জীবনের স্থখদুঃখ, চিন্তাভাবনা, দ্বন্দ্ব-সমস্যা সাহিত্যের সামগ্রী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথে এ সকল লক্ষণ যে ছিল না তা নয়। তবে সত্যেন্দ্রনাথে ঐ রবীন্দ্রযুগেই এই সকল লক্ষণ অধিকতর প্রকট হয়েছিল। কাজেই রবীন্দ্রোত্তর যুগের কাব্যধারার পথিকৃৎ হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ একজন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী

সত্যেন্দ্রনাথের তিরোধানের পর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় নি—এ অত্যন্ত আক্ষেপের কথা। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সঞ্চয়ন প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর কোন কোন কবিতা পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে বা পায়। কিন্তু এ সবের মধ্য দিয়ে কবির সমগ্র পরিচয়লাভের বাধা ছিল। আজ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁকে সাধুবাদ দিই। বাংলার রসিক পাঠকসমাজ এবং কাব্যামোদী ব্যক্তিরা সত্যেন্দ্রনাথের সর্ববিধ রচনার সঙ্গে পরিচয়লাভ করে সুখী ও উপকৃত হবেন নিঃসন্দেহে।

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন-কথা

(১৮৮২-১৯২২)

সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি (৩০ শে মাঘ ১২৮৮)। দ্বিপ্রহর রাত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, ফলে বাংলা তারিখ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে : ২৯ শে মাঘ শুক্রবার অথবা ৩০ শে মাঘ শনিবার।

সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ টাকীর নিকটবর্তী পুঁড়া গ্রামের সন্নিহিত গন্ধর্বপুর থেকে এসে নদীয়া (এখন বর্ধমান) জেলার অন্তর্গত পূর্বস্থলী গ্রামের কাছে চূপীতে বসবাস শুরু করেন। চূপীর দত্তদের যে-বংশলতিকা পাওয়া যায়, তাতে দেখি,—
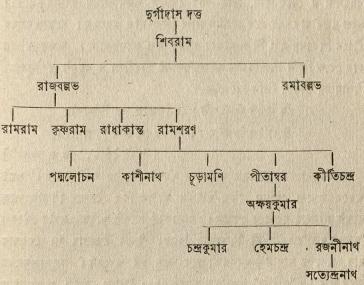
দত্তরা বঙ্গজ কায়স্থ। চূপীর যেখানে এঁদের বাস ছিল তা এখন নদীগর্ভে। অক্ষয়কুমার কলিকাতায় ৪৬ নং মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে একটি বাড়ি এবং বালিতে 'শোভনোদ্যান' নামে একটি বাগানবাড়ি নির্মাণ করেন। সত্যেন্দ্রনাথের চার বছর বয়সের সময়ে অক্ষয়কুমারের মৃত্যু হয় (২৮ শে মে ১৮৮৬)। অক্ষয়কুমার

তাঁর মৃত্যুকালে যথেষ্ট বিষয়সম্পত্তি রেখে যান ; উইলে দেখি তিনি কনিষ্ঠ পুত্র ও পৌত্রকেই অধিকাংশ বিষয়সম্পত্তির অধিকার দান করেন,—

'কলিকাতার নর্থ ডিবিজনের অন্তঃপাতি মসজিদবাড়ি ষ্ট্রীটস্থ আমার ৪৬ ছেচল্লিশ নম্বরের বাটি এবং বালি গ্রামের সদর রাস্তার পূর্বধারে কল্যাণেশ্বর শিবের সমীপস্থ যে একখণ্ড মোকররি মৌরষি ব্রহ্মত্র জমি ও পুষ্করিণী আছে, তাহা আমার কনিষ্ঠপুত্র রজনীনাথ দত্ত ও পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রাপ্ত হইবেক।' [নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, "অক্ষয়-চরিত", ১২৯৪, পৃ. ৫৬]

সত্যেন্দ্রনাথের মাতামহ রামদাস মিত্র চব্বিশ পরগণা জেলায় নিমতা গ্রামে বাস করতেন। সেখানেই সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। রামদাস মিত্র ও বিমলা দেবীর কন্যা মহামায়া দেবীর সঙ্গে রজনীনাথের বিবাহ হয়। অক্ষয়কুমার যে বিষয়সম্পত্তি রেখে যান, তার আয় থেকেই রজনীনাথের সংসার চলতো। অবশ্য রজনীনাথ সেই সঙ্গে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও করতেন। সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে পিতামহ এবং পিতা-মাতার প্রভাব ছিল অনেকখানি। অক্ষয়কুমারের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন জ্ঞানানুশীলনের ভাবদীক্ষা ও বহুমুখী কৌতূহল ; পিতামহের উদ্দেশে তিনি লিখেছেন—

হে আদর্শ জ্ঞানযোগী ! হে জিজ্ঞাসু তব জিজ্ঞাসায়
উদ্বোধিত চিত্ত মোর ;—গরুড় সে জ্ঞান পিপাসায়।

['১৪ই জ্যৈষ্ঠ', "কুহু ও কেকা"]

সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে কলিকাতায়। পল্লী অঞ্চলে কখনো গেছেন, কিন্তু দীর্ঘদিন কাটান নি। শৈশবে পিতার সঙ্গে কয়েক জায়গায় বেড়াতে গেছেন। বাল্যকাল থেকেই কবিতা লেখার ঝোঁক। "ছন্দসরস্বতী"তে তিনি লিখেছেন, 'বারো উৎরে তেরোয় পা দেওয়ার মাস খানেকের মধ্যেই ছন্দসরস্বতী স্কন্ধে এসে ভর করলেন।' সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সবিতা" প্রকাশিত হয়েছে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স আঠারো বছর। সত্যেন্দ্রনাথের 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' কবিতাটি ১৩০০ বঙ্গাব্দে (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) লেখা, এর আগে লেখা কবিতার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এই কবিতাটিকে কবির প্রথম দিকের রচনা ধরলে, তাঁর কাব্য রচনার সূচনাকাল বারো-তেরো বছরই হয়।

স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রম সত্যেন্দ্রনাথকে সে-ভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি। কলিকাতা সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে এফ্‌-এ ক্লাসে ভর্তি হন। এখানে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ তৃতীয় বিভাগে এফ্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'তখন (১৯০৩) আমি জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে ফোর্থ ইয়ার ক্লাসে পড়ি—কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্র-সাহিত্যদর্শী অজিতকুমার চক্রবর্তী, ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন আমার সহপাঠী। সত্যেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার এবং আমি—আমাদের তিনজনের থার্ড সাবজেক্ট ছিল সংস্কৃত। সংস্কৃত ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা কম। সে ক্লাসে তিনজনের খুব অন্তরঙ্গতা হয়েছিল।' ["রবীন্দ্র-স্মৃতি", ১৩৬৪, পৃ. ৭৮] বি-এ পরীক্ষা সত্যেন্দ্রনাথ দিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কৃতকার্য হলেন না। পড়াশুনো তিনি করতেন, কিন্তু পাঠ্যবস্তুর মধ্যে আবদ্ধ থাকতেন না। ফলে নানা বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি সংগ্রহে সাফল্য আসেনি।

সত্যেন্দ্রনাথের বহুপঠন ও জ্ঞানার্জনের প্রমাণ আছে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে। তাঁর বিরাট গ্রন্থাগারের কথা অনেকেই বলেছেন। পুরনো বই সংগ্রহের দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁর সংগ্রহের বিষয়বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। একাধিক ভাষা শিখেছিলেন,—অনুবাদ কবিতায় তাঁর বহু ভাষার উপর অধিকার প্রকাশ পেয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ কিছুদিন মাতুল কালীচরণ মিত্রের আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। কিন্তু ব্যবসায় তাঁর আগ্রহ থাকার কথা নয়, অর্থোপার্জনের প্রয়োজনও ততখানি ছিল না। ফলে অল্পদিনের মধ্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে সমগ্র সময় সাহিত্য সেবায় নিয়োগ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ যখন কলেজের ছাত্র তখনই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয় (১৩০৯)। মৃত্যুর পূর্বেই সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহের সম্বন্ধ তিনি স্থির করে গিয়েছিলেন। ১৩১০ সালের ৪ঠা বৈশাখ ঈশানচন্দ্র বসুর কন্যা কনকলতার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের

বিবাহ হয়। তাঁদের দাম্পত্যজীবন অত্যন্ত মধুর ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কনকলতা দেবী দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন, সম্প্রতি ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি পরলোকগমন করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন।

বাইরে থেকে দেখতে গেলে সত্যেন্দ্রনাথের জীবন ঘটনা-বিরল। একান্তভাবে সাহিত্য-নিবেদিত-প্রাণ কবি জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন গ্রন্থাগারের মধ্যে—ভাষাচর্চা, গ্রন্থপাঠ এবং সাহিত্যসৃষ্টি ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে দিন পনেরো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে একবার এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার সত্যেন্দ্রনাথ দার্জিলিঙ্ বেড়াতে যান। স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কিছুদিনের জন্য জৌনপুর, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, ফয়জাবাদ ভ্রমণ করেন। কিন্তু কয়েকটি কবিতা ছাড়া তাঁর ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ তিনি কোথাও লিপিবদ্ধ করেন নি। কলিকাতায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। প্রত্যহ অনেকখানি পথ হাঁটতেন। বিভিন্ন মেলার শুধু সন্ধান রাখা নয়, সবান্ধব উপস্থিতি ছিল প্রায় নিয়মিত। হেদুয়ায় সাঁতার কাটতেন, 'জলচর ক্লাবের জলসারঙ্গ' তাঁর একটি উপভোগ্য কবিতা। সন্ধ্যাবেলায় কখনও কার্জন পার্কে বন্ধুদের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করতেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর শান্তপ্রকৃতির মানুষ। কবিতার মধ্যে কখনো চাপল্য প্রকাশিত হলেও, কথাবার্তায় তা ধরা পড়তো না। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, 'তাঁর মতো মিতভাষী লোক আমাদের এই বাচাল জাতির মধ্যে খুব অল্পই দেখা যায়। আমি নিজে তাঁকে কখনো তর্কে যোগ দিতে দেখিনি, যদিচ তাঁর সুমুখে কখনো কখনো আমরা মহাউত্তেজিত ভাবে তর্ক করেছি! তাঁর মুখাকৃতি ও সংযত ব্যবহারের ভিতর থেকে তাঁর চরিত্রের সরলতা ও উদারতা স্বতঃপ্রকাশিত হয়ে পড়ত।' ['৺সত্যেন্দ্রনাথ', "সবুজপত্র", জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩২৯, পৃ. ৬৩০]

বাহিরে ধীরস্থির অচঞ্চল মানুষটি যখন কাউকে ভালোবাসতেন তখন তা কথায় প্রকাশ না পেলেও তার গভীরতা ও তীব্রতা কিছুমাত্র কম ছিল না। তাঁর মাতুল কালিচরণ মিত্র 'সাহিত্যিক চারুচন্দ্র' ["বিচিত্রা", পৌষ ১৩৪৫, পৃ. ৮২৩] প্রবন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের অব্যক্ত

অনুরাগের একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা পত্রগুলির মধ্যেও সত্যেন্দ্রনাথের সহৃদয়তা, কোমলতা ও হৃদয়ের উত্তাপ প্রকাশ পেয়েছে।

পরাধীনতার বেদনা ও রাজশক্তির অত্যাচার তাঁকে উদ্বেলিত করতো, যার প্রমাণ আছে অসংখ্য কবিতায়। আমাদের জাতীয় চরিত্রের স্বাভাবিক নিস্পৃহতা, ভীতি ও সবদিক বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যোগ না দিলেও, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের যাবতীয় স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত সমসাময়িক কোনো ঘটনাই তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। হয়তো এই সাময়িকতার উত্তেজনা কখনো কবিতার পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে, কিন্তু দেশকে ভালোবাসা এবং দেশবাসীকে জাগ্রত করা তাঁর জীবনের লক্ষ্য। সত্যেন্দ্রনাথের 'গিরিরাণী', 'কয়াধূ' প্রভৃতি কবিতার কথা মনে পড়বে, যেখানে পৌরাণিক রূপকের আশ্রয়ে রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দী। 'গান্ধিজী' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ আরও স্পষ্টভাবে বাঙালীর অন্যকে বিদ্রূপ-সমালোচনা করা ও তুচ্ছ বাদপ্রতিবাদে আনন্দলাভকে আঘাত করেছেন—

ওরে মূঢ় তুই আজকে কেবল ফিরিস্ নে ছল খুঁজে,
খুঁটিনাটি বোল কবে কি বলেছে তাহারি উতোর যুঝে,
গোকুল শ্রেয় কি শ্রেয় খানাকুল—সে কলহ আজ রেখে
ভারত জুড়ে যে জীবন-জোয়ার নে রে তুই তাই দেখে।

সাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলী সত্যেন্দ্রনাথকে কিভাবে উত্তেজিত করেছে, তার দুটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৩ এপ্রিল ১৯১৯) পরে লাহোরে হাণ্টার কমিটির সামনে ডায়ার যখন সাক্ষ্য দেয়, তখন শ্রীঅমল হোম "ট্রিবিউন" পত্রিকায় তার একটা বর্ণনা দেন। সেই বর্ণনাটুকু সঙ্গে দিয়ে শ্রীঅমল হোম সত্যেন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন, তাতে ২৫,০০০ নিরপরাধ ও নিরস্ত্র লোকের উপর গুলি চালিয়ে তার জন্য ডায়ারের বাহাদুরী ও কমিটির দেশী সদস্যদের সঙ্গে তার উদ্ধত ব্যবহারের কথা সব ছিল। বর্ণনাটি পেয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আমি শুধু ভাবছি তুমি চুপ

করে বসে ঐ রকম evidence শুনলে কি করে? আমার তো পড়ে রক্ত গরম হয়ে উঠছে। আমি যদি উপস্থিত থাকতুম তাহলে নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড করে বসতুম। আর পাঁচ হাজার পাঞ্জাবীর সামনে বসে ডায়ার ঐ রকম তাল ঠুকে বুক ফুলিয়ে চলে গেল?' [শ্রীঅমল হোম, 'সত্যেন্দ্রস্মৃতি', "ভারতবর্ষ", ভাদ্র ১৩২৯ পৃ. ৪৩৮] প্রসঙ্গত, শ্রীঅমল হোম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'He was a fiery nationalist, almost a revolutionary.'

সজনীকান্ত দাস "আত্মস্মৃতি"তে আর একটি ঘটনার কথা লিখেছেন; অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্কটিশচার্চেস কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ওয়াটের সঙ্গে ছাত্রদের বিরোধ (১৯২১) সে-সময়ে যে-উত্তেজনা সৃষ্টি করে তার প্রতিক্রিয়ায় সত্যেন্দ্রনাথ একটি কবিতা লেখেন,—'সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের বেঞ্চে বসিয়া কালো চশমা আঁটা চোখে আমাদের মুখে সে কাহিনী শুনিয়া কবি সত্যেন্দ্রনাথ এতই উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন যে, পরের মাসের প্রবাসীতে তাঁহার কটূক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ কবিতা 'কোনও ধর্মধ্বজীর প্রতি' (ফাল্গুন, ১৩২৭) বাহির লইয়া নির্দোষ ওয়াটকে সারা বাংলাদেশে নিন্দিত ধিকৃত করিয়া দিল।' ["আত্মস্মৃতি", ১৩৬১, পৃ. ৯৫]

সত্যেন্দ্রনাথ যখন কলেজে পড়েন তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার এবং তারপর শীঘ্রই তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন অন্তরঙ্গদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র রায় ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এবং এঁরা সকলেই সে-যুগে রবীন্দ্রভক্ত রূপে চিহ্নিত ছিলেন,—রবীন্দ্রনাথ এঁদের বিশেষ স্নেহ ও প্রীতির দৃষ্টিতে দেখতেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কান্তিক প্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন এখানে তরুণ লেখকদের একটি আসর গড়ে ওঠে। সত্যেন্দ্রনাথ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অনেকে এখানে নিয়মিত মিলিত হতেন। "মানসী" (ফাল্গুন ১৩১৫) পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন বাগচীর আহ্বানে "মানসী" পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথ শুধু লিখতেন না, পত্রিকার

কার্যালয়ে (২/৫ চৌরঙ্গী) যে-সাহিত্যবৈঠক বসতো তাতেও অংশ গ্রহণ করতেন। পরে মণিলাল এবং সৌরীন্দ্রমোহনের সম্পাদনায় যখন "ভারতী" পত্রিকা (১৯১৫-১৯২৩) প্রকাশিত হলো, তখন 'ভারতী-দল'-এর বৈঠক বসতো স্থকিয়া স্ট্রীটে। এখানে পূর্বোল্লিখিত কয়েকজন ছাড়া নিয়মিত আরও যাঁরা উপস্থিত হতেন তাঁরা হলেন, স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, গিরিজাকুমার বস্থ, শ্রীচারু রায়, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি। স্থধীরচন্দ্র সরকার লিখেছেন, 'ভারতীর আসরে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন একজন প্রধান আড্ডাধারী।···স্থকিয়া স্ট্রীটে ভারতী অফিসের পুরনো আড্ডার সঙ্গে সে সময়ের সব সাহিত্যিকই মোটামুটি পরিচিত ছিলেন। সকাল ও সন্ধ্যা দুবেলাই এই অফিসে আড্ডা বসতো। বিকেল থেকে রাত নটা দশটা পর্যন্ত আসর সরগরম থাকত, এবং রাত্রিবেলাতেই আসর জমত বেশি। রবিবার প্রায় সমস্ত দিনই আড্ডাধারীরা নানা রকম আলাপ আলোচনায় আসর জমিয়ে রাখতেন। অনেকদিন খাওয়া দাওয়া এইখানেই হতো।··· আমার বেশ মনে রয়েছে—আমাদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসতেন চেয়ারের উপর আসন-পিঁড়ি হয়ে। তিনি রমাঁ রলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ্ পড়ে সেখানে সমবেত লোকদের শোনাতেন। কখনও নিজের লেখাও পড়তেন।' ["আমার কাল আমার দেশ", ১৩৭৫, পৃ. ৫৩, ১০৫-০৬] এই 'ভারতীর বৈঠকে'ই একদিন (১৯১৬) শ্রীঅমল হোমের সঙ্গে অতুলপ্রসাদ সেন এলেন বেড়াতে—সত্যেন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্ম বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। অতুল-প্রসাদও সত্যেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। 'দুই কবির পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। দুজনেই স্বল্পভাষী, মধুরস্বভাব। অক্লান্তকণ্ঠ অতুলপ্রসাদ গানের পর গান গেয়ে শোনালেন।' [শ্রীঅমল হোম, 'স্মৃতিকথা', "উত্তরা", আশ্বিন, ১৩৪২]

এই সময়ে বাংলাদেশে রবীন্দ্রবিরোধিতা অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। এক-দিকে স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি, অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রসাহিত্য সমা-লোচনার নাম করে রবীন্দ্রনাথকে তীব্র আক্রমণ করা শুরু করেন। রবীন্দ্র-অনুরাগী তরুণ লেখকেরা আরও তীব্রভাবে এই সমালোচনার প্রত্যুত্তর দেন। সত্যেন্দ্রনাথ একদা "সাহিত্য" পত্রিকায় অনেক লিখেছেন, কিন্তু এই সময়

থেকেই তিনি "সাহিত্য" পত্রিকায় লেখা দেওয়া বন্ধ করে দেন। রবীন্দ্র-বিরোধীদের আক্রমণ করে সত্যেন্দ্রনাথ স্বনামে ও বেনামে অনেকগুলি ব্যঙ্গ কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন, এগুলি কিছুটা সাময়িকতা লক্ষণাক্রান্ত হলেও সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ এগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। [সত্যেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে যে-সব ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন সেগুলি হলো,—নবকুমার কবিরত্ন, ত্রিবিক্রমবর্মন্, বস্তুতান্ত্রিক চূড়ামণি, কলম্‌গীর, সলিলোল্লাস সাঁতরা প্রভৃতি] রবীন্দ্রভক্ত যাঁরা স্টার থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "আনন্দ-বিদায়" (১৯১২) নাটকের প্রথম রজনীর অভিনয় পণ্ড করে দেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবার দিনে তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর পরিকল্পনা সত্যেন্দ্রনাথই দিয়েছিলেন। তখনও রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাননি। রবীন্দ্রনাথকে এই প্রথম দেশবাসীর পক্ষ থেকে বিরাটভাবে সংবর্ধিত করা হয়। (শান্তিনিকেতনে অবশ্য অধ্যাপক ও ছাত্ররা ১৩১৮ সালের পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সত্যেন্দ্রনাথও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন)। প্রথমে যা ছিল অল্প কয়েকজন তরুণের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পরিকল্পনা, তাই শেষ পর্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সমর্থনে ও উৎসাহে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে এক সমারোহপূর্ণ কবিসংবর্ধনার রূপ নেয়, অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে তুলতে সময় কিছু বেশি লাগল,—২৮ শে জানুয়ারি ১৯১২ (১৪ই মাঘ ১৩১৮) কলিকাতার টাউন.হল্-এ এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। সত্যেন্দ্রনাথ রচিত 'কবিপ্রশস্তি' ('জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমারি করি গর্ব') হস্তিদন্তের পুঁথিতে ক্ষোদিত করে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেওয়া হয়।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৩২০) রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সংবাদ কলিকাতায় এসে পৌছুবার পর সত্যেন্দ্রনাথের উল্লাসের কথা অনেকে লিখেছেন [দ্র. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সত্যেন্দ্রপরিচয়', "প্রবাসী", শ্রাবণ ১৩২৯ ; হেমেন্দ্রকুমার রায়, "যাঁদের দেখেছি", দ্বিতীয় পর্ব, ১৩৫৯, পৃ. ৫০]। শান্তিনিকেতনে কবিকে এই উপলক্ষে যে-সংবর্ধনা জানানো হয়, সত্যেন্দ্রনাথ তাতেও বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে যে অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করা

হয়, সত্যেন্দ্রনাথ তার 'মুসাবিদা' করেছিলেন এবং অভিনন্দনের পর সত্যেন্দ্রনাথ 'আত্যুদয়িক' ('রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছ আজ ধ্রুবতারার প্রতিবেশী') কবিতাটি পাঠ করেন। [দ্র. ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বোলপুরে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা', "মানসী", পৌষ ১৩২০]

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের উৎসাহে 'বিচিত্রা' নামে যে বৈঠকটি গড়ে ওঠে (যেখানে সাহিত্যপাঠ ছাড়া গান-বাজনা-অভিনয়ও হতো) সত্যেন্দ্রনাথ তাতে নিয়মিত যোগ দিতেন। এই আসরে সদস্যপদের জন্য প্রবেশিকা চাঁদা ছিল এক টাকা এবং মাসিক চাঁদা এক টাকা। সাধারণতঃ প্রতিসপ্তাহে বা কখনো প্রতিপক্ষে একবার আসর বসতো। সত্যেন্দ্রনাথ এখানে কিছু কিছু লেখা পড়েছিলেন, যার সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া না গেলেও, ১৩২৪ সালের ১৫ই ফাল্গুন বুধবারের অধিবেশনে তিনি 'বাংলা ছন্দ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। সম্ভবত এই প্রবন্ধটিই 'ছন্দসরস্বতী' নামে "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। [দ্র. অলোক রায় সম্পাদিত "ছন্দসরস্বতী", ১৩৭৪, পৃ. ৫৪-৫৫] 'বিচিত্রা'র সেদিনের বৈঠকে প্রমথ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন, যিনি পরে "সবুজপত্র" পত্রিকায় 'পয়ার' নামে একটি প্রবন্ধে ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সূচনায় লিখেছেন, 'কবিবর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সু-করকমলেষু, সেদিন বিচিত্রায় যখন ছন্দের আলোচনা হয়, তখন সে আলোচনায় আমি যোগদান করিনি, তার প্রথম কারণ—সভার একটেরে বসেছিলুম বলে আপনার বক্তব্য সকল কথা আমার কর্ণগোচর হয়নি, এবং দ্বিতীয় কারণ, ও বিচারে আমি অনধিকারী।' ['পয়ার', "সবুজপত্র", ভাদ্র ১৩২৫, পৃ. ২৮৭]

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রানুরাগী তরুণ লেখকেরা 'রবিমণ্ডলী' নামে একটি সাহিত্যসংস্থা গড়ে তোলেন। 'রবিমণ্ডলী' নামটি সত্যেন্দ্রনাথেরই দেওয়া। চারুচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, মণিলাল, হেমেন্দ্রকুমার, সৌরীন্দ্রমোহন, অসিতকুমার হালদার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, সুধীর রায়চৌধুরী প্রভৃতি ছিলেন 'রবিমণ্ডলী'র প্রধান উদ্যোক্তা। প্রতি পক্ষান্তরে রবিবার বিকেল তিনটের সময়ে পালাক্রমে এক একজন সদস্যের বাড়িতে অধিবেশন বসতো—সদস্যেরা স্বরচিত নূতন লেখা পড়ে শোনাতেন। 'রবিমণ্ডলী'র প্রথম অধিবেশন হয়

সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে। সত্যেন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে তাঁর 'ধূপের ধোঁয়ায়' নাটিকাটি পড়েন। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর স্মৃতিকথায় সেদিনের বৈঠকের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—

"নির্দিষ্ট দিনে আমরা তাঁর মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের ভবনের দিকে যাত্রা করলুম।...ছোট্ট রাস্তা, এপাশে ওপাশে বাড়ি আর বাড়ির দঙ্গল—শহর মুছে রেখেছে স্নিগ্ধ শ্যামলতার চিহ্ন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ির ভিতরে পদার্পণ করলেই মনে হতো—হ্যাঁ, কবির বাড়িতে এলুম বটে! উঠোন জুড়ে টবের গাছে রঙবেরঙের ফুলের বাহার। কবির পাঠগৃহ দ্বিতলে। সেখানেও উঠবার পথে ফুলগাছের রঙিন পাহারা, পদে পদে গায়ে এসে লাগে তাদের পেলব স্পর্শ।

"বারান্দা পার হয়ে একখানা লম্বাদিকে বড়ো ঘর। চারিদিকে কোনো দেওয়ালই দেখবার জো নেই, কারণ দেওয়াল ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে আলমারির পর আলমারি, তাদের তাকগুলো চকচকে বাঁধানো কেতাবে ঠাসা। পুস্তকের স্তূপ আবৃত করে রেখেছে টেবিলের উপরিভাগ, ঘরের মাঝখানে যেখানে সেখানে মেঝের উপরেও রাশি রাশি বই।

"মেঝের বইগুলো একটু এদিক ওদিক ঠেলে ঠুলে সরিয়ে রেখে আমরা নিজেদের জন্যে কিছু কিছু জায়গা করে নিলুম কোনোরকমে। সর্বপ্রথমে সারা হলো ডান হাতের ব্যাপারটা। তারপর আমাদের মুখ থেকে নির্গত হতে লাগল সিগারেটের ধোঁয়া এবং কবির মুখ থেকে নির্গত হতে লাগল সদ্যরচিত 'ধূপের ধোঁয়া'র বাণী।

"কেবল পাঠ নয়, সঙ্গে সঙ্গে কবি মৃদুকণ্ঠে গানগুলি গেয়ে যেতে লাগলেন। বিস্মিত হলুম। ত্রিশ-একত্রিশটি গান, কিন্তু প্রত্যেক গানেই তিনি নিজে সুর দিয়েছেন—সুন্দর সুর, কোন কোন সুর আজও আমার মনে আছে। বৈঠকে তিনি অনুচ্চস্বরে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন বটে, কিন্তু সুদীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেও আমরা কেহই জানতে পারিনি যে, সুর সৃষ্টিতে তিনি অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী।" ["যাঁদের দেখেছি", দ্বিতীয় পর্ব, ১৩৫৯, পৃ. ৪৮-৪৯]

সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ছিল, ক্রমশ তা ক্ষীণতর হওয়ায় তিনি অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েন। চিকিৎসকেরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি অন্ধ হয়ে যাবেন। পড়াশুনো বন্ধ হয়ে গেল। সাধারণ-স্বাস্থ্যও ভালো ছিল না। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে গোড়ার দিকে বন্ধুদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ হুগলি জেলার জিরেট-বলাগড়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেলেন। সেখানে তিনি সদ্য লেখা 'জ্যৈষ্ঠী-মধু' কবিতাটি বন্ধুদের পড়ে শোনান।

কলিকাতায় ফিরে তিনি জ্বর ও পৃষ্ঠব্রণে আক্রান্ত হন। এই রোগেই ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে জুন প্রত্যুষ আড়াইটার সময় (১৩২৯ সালের ১০ই আষাঢ় রাত্রি আড়াইটে) তাঁর মৃত্যু হয়।

রামমোহন লাইব্রেরী হল্-এ সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ৯ই জুলাই (১৯২২) যে-শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে শোকার্ত রবীন্দ্রনাথ যে-কবিতাটি পাঠ করেন তা "পূরবী" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুধীরচন্দ্র সরকার লিখেছেন, 'আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনে এমন অভিভূত হয়েছিলাম যে সেদিন সত্যেন দত্তের সেই স্মরণসভায় কোনও রেসোলিউশন নেওয়া বা কমিটি গঠন হলো না। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী কবিগুরুর কবিতা শুনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি চলে গেল। এই রকম শোকপূর্ণ সভা আমি আর কখনও দেখিনি।' ["আমার কাল আমার দেশ", পৃ. ৬১]

শ্রীঅলোক রায়

সম্পাদকীয়

কবি সত্যেন্দ্রনাথের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের প্রাক্কালে যেমন আনন্দ অনুভব করছি, তেমনি বাংলার যিনি অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য উত্তরসূরিদের মধ্যে আজও যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্, যাঁর সম্পর্কে সেকালীন ও একালীন সর্বশ্রেণীর সমালোচক, সাহিত্যসেবী ও বিদগ্ধজন আজও গুণভাষণে মুখর, যাঁর গুণবৈষম্যের অবকাশ নেই এবং উচ্চনীচনির্বিশেষে জাতির সকল শ্রেণীর জনমানসের জন্য যিনি অনলসে অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন, মানবিকতা ও সহমর্মিতাই ছিল যাঁর সাহিত্যের সবিশেষ লক্ষণ,—তাঁর তিরোধানের পর আজ প্রায় অর্ধশত বৎসর অতিক্রান্ত হলেও, এযাবৎ এবম্প্রকার গ্রন্থাবলী প্রকাশের কোন প্রচেষ্টা যে পরিলক্ষিত হয়নি, তা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথের অকাল-বিয়োগের পর তাঁর স্বল্প-সংখ্যক ঘনিষ্ঠ সাহিত্যিক বন্ধুগণ তাঁর গ্রন্থগুলির প্রকাশ-বিষয়ে প্রথমাংশে কিয়ৎ-পরিমাণ সাহায্য করলেও, পরবর্তীকালে স্বল্পবয়সী সহধর্মিণী ব্যতীত এমন কোন সাহিত্যানুরাগী নিকট আত্মীয় ছিলেন না, যিনি অগ্রণী হয়ে এই প্রকাশন-কার্য অব্যাহত রাখা বা কোন নূতন পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্বন্ধে প্রযত্ন প্রকাশ করেন। কেবলমাত্র এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ বিষয়েই নয়, কালক্রমে সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলি স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে দীর্ঘদিন দুর্লভ ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না, এবং আজও সেগুলি সহজলভ্য নয়। তত্ত্বাবধানের অভাবই এর জন্য প্রধানতঃ যে দায়ী তাতে আর সন্দেহ নেই।

এই অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত কাব্যানুরাগীদের এক-কালে কিছুটা সান্ত্বনা দিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম বন্ধু স্বর্গত সুধীরচন্দ্র সরকার। তিনি তাঁর প্রকাশন-সংস্থার মাধ্যমে কবির কাব্যগ্রন্থসমূহ থেকে বড়দের জন্য 'কাব্য সঞ্চয়ন' (১৩৩০) নামে শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির একটি সংকলন ও তার কিছুকাল পরে ছোটদের জন্য 'সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা' (১৩৫২) নামে অপর একটি সংকলন লোকচক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত করে কবির যশঃকীর্তির দীপশিখা কিয়ৎপরিমাণে ভাস্বর রাখেন।

কিন্তু এই সংকলন গ্রন্থদ্বয়ই তো সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের মূল্যায়নের প্রকৃষ্ট পরিচয় নয়। তাঁর কাব্যসম্ভারের বিস্তৃত পরিধি ব্যতীত, নাটক ও গদ্য-সাহিত্যের রচনাকার হিসাবেও তিনি যে অনন্যসাধারণ ও অনাস্বাদিতপূর্ব কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন, তার তুলনাও বিরল। একজন কবির মধ্যে অনবদ্য কাব্য-বিভাবের প্রকাশাতিরিক্ত ঈদৃশ বিশ্লেষণধর্মী, গবেষণামূলক গদ্যরচনা ও পরিচ্ছন্ন ভাষান্তরের বাগবৈদগ্ধ্য প্রভৃতি সাহিত্যকর্মের সর্বাঙ্গীণ গুণ একত্রে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বোধহয় এদেশে এ বিষয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বন্দ্বাতীত নিদর্শন। প্রসঙ্গত সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনাস্বাদিতপূর্ব বাক্যটি ব্যবহারের তাৎপর্য হ'ল এই যে, কবি তাঁর স্বনামে ও 'নবকুমার কবিরত্ন,' 'ত্রিবিক্রমবর্মন্' প্রভৃতি ছদ্মনামে এমন বহু রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন ও তাঁর বন্ধুবান্ধবের নামাঙ্কিত পুস্তক-পুস্তিকায় এমন বহু রচনা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, যার সঠিক পরিচয় ও স্বাদু আস্বাদ সম্বন্ধে ইদানীন্তনকালের পাঠক-পাঠিকারা আদৌ অবহিত নন। আমরা এই গ্রন্থাবলীর অপরাপর খণ্ডে সেগুলি ক্রমশঃ প্রকাশের আয়োজন করেছি।

এই গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডে কবির গ্রন্থগুলির প্রকাশকালের ধারাবাহিকতা যথাসম্ভব রক্ষাকরার প্রয়াস করেও, বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য কিছু ব্যতিক্রম সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ উপর্যুপরি কাব্যগ্রন্থসকলকে স্থান না দিয়ে, কিছু গদ্য-সাহিত্যও এই সঙ্গে আমরা সংশ্লিষ্ট করেছি। মোটামুটিভাবে এই খণ্ডটিকে কাব্য, উপন্যাস, নাট্য, প্রবন্ধ ও বিবিধ—এই পাঁচটি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। কাব্য-বিভাগে 'সবিতা' (১৯০০) ও 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫) কাব্য-পুস্তিকাদ্বয় 'বেণু-বীণা' এবং 'হোমশিখা'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, 'বেণু ও বীণা'-কে (১৯০৬) অগ্রাধিকার দিয়ে, অতঃপর 'হোমশিখা' (১৯০৭) ও 'তীর্থ-সলিল' (১৯০৮) স্থান গ্রহণ করেছে। এই ধারাবাহিকতা রক্ষার ব্যাপারে পরবর্তী কাব্য-গ্রন্থ হিসাবে 'তীর্থরেণু' (১৯১০) ও 'ফুলের ফসল'-এর (১৯১১) নাম আসে বটে, কিন্তু গ্রন্থবলীয় ২য় খণ্ডের জন্য সেগুলিকে রেখে, এই খণ্ডে উপন্যাস হিসাবে 'জন্মদুঃখী' (১৯১২), নাট্য-গ্রন্থ হিসাবে 'রঙ্গমল্লী' (১৯১৩), এবং প্রবন্ধ-গ্রন্থ হিসাবে 'চীনের ধূপ'-কে (১৯১২) আমরা স্থান দিয়েছি।

কাব্য, উপন্যাস, নাট্য ও প্রবন্ধ নামধেয় খণ্ডাংশগুলির পর একটি স্বতন্ত্র

'বিবিধ' অংশে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক-পুস্তিকা থেকে কবির কাব্য ও গদ্য-সাহিত্যের কিছু কিছু নিদর্শন ধরে দেওয়া হয়েছে। এবং যে গ্রন্থগুলি এই খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে, সেগুলির পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক বিবরণ 'গ্রন্থপরিচয়'-এর মধ্যে যথাসম্ভব প্রদান করতে আমরা চেষ্টা করেছি।

প্রধানতঃ এই ধরণের চারটি বিভিন্ন খণ্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করার ব্যবস্থা আমরা সম্পূর্ণ করতে পারব বলেই বিশ্বাস। শেষ খণ্ডটিতে কবির বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বিবিধ রচনাবলী ব্যতীত, সত্যেন্দ্রনাথ-সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় অধিকতর তথ্যসমূহ, তাঁর উপর আলোচিত বিভিন্ন লেখকবৃন্দের রচনার পরিচয় ও সমগ্র খণ্ডগুলির অন্তর্ভুক্ত কাব্যাংশের সম্পূর্ণ বর্ণানুক্রমিক পঙ্ক্তি-সূচী সংযোজিত হবে।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে নানা প্রখ্যাত পত্রিকায় কাব্যে ও সাহিত্যে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা প্রভূত না হলেও কম হয়নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে তৎকালীন কবি ও সাহিত্যকদের অনেকেই প্রবাসী, ভারতী, কালি-কলম, কল্লোল, সবুজপত্র প্রভৃতি পত্রিকায় গদ্যে-পদ্যে তাঁর প্রচুর গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যে দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন, তার কিয়দংশ এই খণ্ডের প্রারম্ভেই আমরা উদ্ধৃত করেছি। গুণকথা-বর্ণন বা আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বসূরিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যাঁর নাম প্রথমেই মনে পড়ে, তিনি হলেন কবি, সমালোচক ও সাহিত্যের দুর্বাসা স্বর্গত মোহিতলাল মজুমদার। গদ্যে-পদ্যে তিনিই সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে সর্বাধিক আলোচনা করেন বিভিন্ন পত্রিকায়। 'ভারতী' পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩২৯) তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'সত্যেন্দ্র-বিয়োগে'। পরবর্তীকালে 'কালি-কলম' পত্রিকার ২য় বর্ষের (১৩৩৪) আষাঢ় সংখ্যায় তাঁর 'সতেন্দ্র-স্মরণে' নামক একটি কবিতা ও 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ একত্রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিনি সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দেন 'শনিবারের চিঠি' (ভাদ্র, ১৩৪৯) পত্রিকার সুদীর্ঘ ৩৬ পৃষ্ঠায় রচিত 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' নামাঙ্কিত নিবন্ধে।

এই ধরণের জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ-প্রবন্ধ ব্যতীত সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাথমিক

কাজ হিসাবে 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ৬৩ সংখ্যক পুস্তিকা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত'র (১৩৫৪) নাম উল্লিখিত হলেও, সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হিসাবে অন্তরঙ্গ সুহৃদ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ' (১৩৬১) গ্রন্থখানির নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ করা সমীচীন। কারণ তিনিই প্রথম বিস্তারিত ভাবে একখানি গ্রন্থের মাধ্যমে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যালোচনা করেন। বিশেষ ভাবে তাঁর গ্রন্থের শেষের দিকে 'শব্দসূচী ও প্রসঙ্গসংকেত' পরিচ্ছেদটি যেমন বৈশিষ্ট্যের দাবি করে, তেমনি পরিশিষ্টের মধ্যে 'সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ প্রিয়জন ও বিদ্বন্মণ্ডলী'র পরিচয়-ভূয়িষ্ঠ অংশটিও ভূয়োদর্শনের পরিচায়ক।

সত্যেন্দ্রনাথের উপর পরবর্তী কাজ হিসাবে আরও দু'খানি গ্রন্থের নামোল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক মনে করি। তাদের একখানি শ্রীমতী সন্‌জীদা খাতুন রচিত 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' (১৩৬৪), এবং অপরখানি আমার বিশেষ প্রীতিভাজন ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ' (১৩৬৮)। সত্যেন্দ্রনাথকে সর্বাঙ্গীণ দিক থেকে বোধগম্যের পক্ষে শ্রীমতী খাতুনের শ্রমও যে সার্থক সাহিত্য-প্রচেষ্টা হিসাবে গণ্য, তাতে আর সন্দেহ নেই। নানা ভাবে, নানা দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথকে তিনি দেখেছেন এবং কেবলমাত্র কাব্যাংশ নিয়েই নয়, তাঁর গদ্যরচনার বিষয়েও যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। এতদ্‌-ব্যতীত উক্ত গ্রন্থের শেষাংশে পরিশিষ্টের মধ্যে 'সত্যেন্দ্রনাথের রচনাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা' এবং 'সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা ও অভিমতের তালিকা' দুটি ভবিষ্যৎ গবেষক ও অনুসন্ধানীদের যথেষ্ট উপকার করবে।

'অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ' কবির কাব্য-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অংশের উপর মূল্যবান তথ্যসংবলিত পর্যালোচনা। সমগ্র অনুশীলিত বিষয়গুলির মধ্যেই গ্রন্থকার ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের চিন্তার গভীরতা অনুভূত হয়। ছন্দসরস্বতীর বরপুত্র, ভাষায় যাদুকর ও অনুবাদকদের শিরোমণি সত্যেন্দ্রনাথ কি পদ্যে কি গদ্যে ভাষান্তরের যে অনুপম কীর্তি স্থাপন করে গেছেন, তা বাঙালী মাত্রের পক্ষেই যেমন অবশ্য অধ্যেতব্য এবং অনুধাবন যোগ্য, তেমনি ভারতের আর কোন কাব্য-সাধকের পক্ষে অননুকরণীয় ও অসম্ভাব্য বলেই প্রতীতি জন্মে। প্রধানতঃ তাঁর 'তীর্থ-সলিল', 'তীর্থরেণু', ও 'মণি-মঞ্জুষা' নামক তিনখানি কাব্য-

গ্রন্থই নানা দেশের, নানা যুগের বিশিষ্ট কবিগোষ্ঠীর কাব্যসম্ভারের পরিচ্ছন্ন ও স্থললিত বঙ্গানুবাদ। কেবলমাত্র কাব্যই নয়, সত্যেন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্যের একটি প্রকৃষ্ট অংশ বিদেশীয় সাহিত্য থেকে সংগৃহীত। আলোচ্য খণ্ডে মুদ্রিত 'জন্মদুঃখী' উপন্যাস, 'রঙ্গমল্লী' নাটক এবং আরও কিছু গদ্য-রচনা বিদেশীয় সাহিত্যের প্রাঞ্জল ও সরস অনুবাদের নিদর্শন হিসাবেই স্থরসিক পাঠকসমাজ উপভোগ করতে পারবেন।

বঙ্গ-সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রে যে অভাব দীর্ঘদিন ধরে অনেকেই অনুভব করেছেন, সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী প্রকাশের দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত সেই অভাব দূরীকরণের গুরুভার ঘটনাচক্রে আমার উপর ন্যস্ত হলেও, আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থাপনায় এই মহান্ কবির গ্রন্থসমূহের আংশিক সম্পাদন-কার্য কতদূর সার্থক হয়েছে, তা সাহিত্যানুরাগী বিদগ্ধজন আশা করি অনুকম্পার সঙ্গে বিবেচনা করবেন। তবে এক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-মাহাত্ম্য বিনির্ণয়ের ভার থেকে আমাকে মুক্ত করেছেন আমার প্রবীণ অধ্যাপক বন্ধু শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জ্ঞানগর্ভ ও মনোজ্ঞ ভূমিকার সাহায্যে। তাঁর পিতা স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। সেদিক থেকে তিনি তাঁর পিতৃবন্ধুর সাহিত্যকার্যের যাথার্থ্য-বর্ণনে নিষ্ঠার সঙ্গে এই কর্তব্য যে পালন করেছেন তাতে আর সন্দেহ নেই। এই ভূমিকা ব্যতীত সত্যেন্দ্রনাথের জীবনবৃত্তান্তের উপর বিশেব গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার অশেষবিধ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করে জীবন-কথা রচনা করেছেন প্রীতিভাজন অধ্যাপক ডঃ আলোক রায়। সত্যেন্দ্রনাথের গুণালংকার সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও আন্তরিকতার নিদর্শন ইতঃপূর্বে 'ছন্দসরস্বতী' গ্রন্থের সম্পাদন-কার্যে যা প্রত্যক্ষ করেছি, এক্ষেত্রেও তা নিরীক্ষণ করে মুগ্ধ হয়েছি। এঁরা উভয়েই আমার সম্পাদন-ভার কিয়দংশে লাঘব ও বহুলাংশে গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই বিশেষ দুটি কার্যের জন্য এঁদের উভয়ের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

এবার সর্বাগ্রে যাঁর কথা স্মরণ করে এই গ্রন্থাবলীর সম্পাদন-কার্যের সূচনা করি, এখানে তাঁর সম্পর্কে সশ্রদ্ধভাবে আমার কিছু বলা অবশ্যই প্রয়োজন। তিনি আমার মাতৃস্বরূপা কনকলতা দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথের লোকান্তরিত সহধর্মিণী কনকলতা অপুত্রক ছিলেন এবং জীবনের দীর্ঘকাল মধুপুরে ধর্মাশ্রম কপিল

মঠের তত্ত্বাবধানে সাধিকার ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে একাকিনী বসবাস করতেন। সৌভাগ্যক্রমে একদা আমাকে তিনি সন্তান-তুল্য অপত্যস্নেহে গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষের দিকে কয়েক বৎসর সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির প্রকাশ সম্বন্ধে আমার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতেন। সেই সময় একবার অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই আশা ব্যক্ত করেন যে,আমি যেন কোন প্রকাশকের সাহায্যে সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলি একত্রে কয়েক খণ্ডে গ্রন্থাবলীর আকারে প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হই। তাঁর জীবদ্দশাতেই সে আদেশ আমি পালন করতে সমর্থ হই বটে, এবং একটি প্রকাশক-সংস্থার সঙ্গে তাঁর চুক্তিপত্রও স্বাক্ষরিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করেনি,—কালক্রমে উক্ত প্রতিষ্ঠান সে পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। তবে উক্ত প্রকাশক-সংস্থার কর্ণধারদের উদার মনোভাবের জন্যই দীর্ঘকাল পরে গ্রন্থাবলী প্রকাশের এই আয়োজন পুনরায় সম্পূর্ণ হয় এবং 'বাক-সাহিত্য' প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান সহৃদয়তার সঙ্গে এই ব্যয়বহুল পরিকল্পনার ভার গ্রহণ করেন। আজ তাঁদেরই আনুকূল্যে এই গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডের প্রকাশ সম্ভব হ'ল। পূজ্যস্থানীয়া কনকলতা কেবলমাত্র এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের ভারই আমার উপর দিয়ে যাননি, পরন্তু সস্নেহে সত্যেন্দ্রনাথের সমূহ গ্রন্থের স্বত্বও সর্বান্তঃকরণে আমায় দান করে গিয়েছেন। কিন্তু দুরদৃষ্টবশত শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে এই গ্রন্থাবলী আজ আর তাঁর কাছে উপস্থিত করে ঐহিক আনন্দলাভের কোন উপায় নেই! বিগত ১৯৬৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তাঁর তিরোভাব ঘটে।

এই গ্রন্থের প্রকাশ-ব্যাপারে ও সম্পাদন বিষয়ে নানা ভাবে যাঁদের কাছ থেকে সহায়তা লাভ করেছি, তাঁদের মধ্যে আছেন,—কনকলতা দত্তর বিষয়সম্পত্তির ন্যাসরক্ষক (trustee) মধুপুর নিবাসী আমার অগ্রজতুল্য শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু, বন্ধুবর শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীমতী সুধা বসু, ডঃ সুশীল রায়, শ্রীসুপ্রিয় সরকার, শ্রীমঙ্গলময় দত্ত ও শ্রীসুমিতচন্দ্র মজুমদার। এতদ্‌ব্যতীত আমার বিশেষ স্নেহভাজন শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত এই গ্রন্থাবলীর সমূহ প্রুফ্ যেমন দেখে দিয়েছেন, তেমনি অন্যান্য বিষয়েও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণ স্বীকার করি। এই প্রসঙ্গে মুদ্রণকার্যে সহযোগিতার জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রেসের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর সহযোগীদের কথাও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

হোমশিখা (কাব্য) ৯৭-২০২

তীর্থ-সলিল (কাব্য) ২০৩-৩৩২

কাব্য

বেণু ও বীণা

ভূমিকা

'বেণু ও বীণা'র অধিকাংশ কবিতা এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই কবিতাগুলি ১৩০০ সাল হইতে ১৩১৩ সালের মধ্যে রচিত।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলির নির্বাচন সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম্-এ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩১৩

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

* * *

উৎসর্গ

যিনি জগতের সাহিত্যকে অলংকৃত করিয়াছেন,
যিনি স্বদেশের সাহিত্যকে অমর করিয়াছেন,
যিনি বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক,
সেই আলোকসামান্য শক্তিসম্পন্ন
কবির উদ্দেশে
এই সামান্য কবিতাগুলি সসম্ভ্রমে অর্পিত হইল।
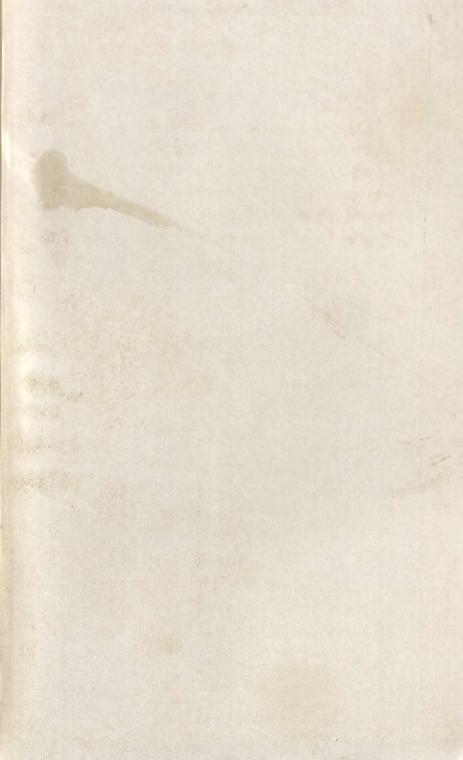
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আরম্ভে

বাতাসে যে ব্যথা যেতেছিল ভেসে, ভেসে,
যে বেদনা ছিল বনের বুকেরি মাঝে,
লুকানো যা ছিল অগাধ অতল দেশে,
তারে ভাষা দিতে বেণু সে ফুকারি বাজে!

মূকের স্বপনে মুখর করিতে চায়,
ভিখারী আতুরে দিতে চায় ভালবাসা,
পুলক-প্লাবনে পরান ভাসাবে, হায়,
এমনি কামনা—এতখানি তার আশা!

হৃদয়ে যে সুর গুমরি মরিতেছিল,
যে রাগিণী কভু ফুটেনি কণ্ঠে—গানে,
শিহরি, মূরছি,—সেকি আজ ধরা দিল,—
কাঁপিয়া, দুলিয়া, ঝংকারে—বীণাতানে?

বিপুল সুখের আকুল অশ্রুধারা,—
মর্মতলের মর্মরময়ী ভাষা,—
ধ্বনিয়া তুলিবে—স্পন্দনে হয়ে হারা,
এমনি কামনা—এতখানি তার আশা!

কতদিন হ'ল বেজেছে ব্যাকুল বেণু,
মানসের জলে বেজেছে বিভোল্ বীণা,
তারি মূর্ছনা—তারি সুর রেণু, রেণু,—
আকাশে বাতাসে ফিরিছে আলয়হীনা!

পরান আমার শুনেছে সে মধু-বাণী,
ধরিবারে তাই চাহে সে তাহারে গানে,
হে মানসী-দেবী! হে মোর রাগিণী-রানী!
সে কি ফুটিবে না 'বেণু ও বীণা'র তানে?

কিশলয়ের জন্মকথা

চোখ দিয়ে বসে আছি, কখন অঙ্কুর ফাটি'
বাহিরিবে প্রথম পল্লব ;
এক মনে আছি চেয়ে, ধরা যদি পড়ে তাহে—
নিখিলের আদি কথা সব।

সারাদিন বসে, বসে, তন্দ্রা চোখে এল শেষে,
চরাচর ডুবিল তিমিরে ;
প্রভাতে দেখিনু জেগে, নয়নে কিরণ লেগে—
কচি পাতা কাঁপিছে সমীরে।

অনিন্দিতা

ধূলিরে সুন্দর করি এস তুমি, হে সুন্দরী
ধূলা পায়ে এস অনিন্দিতা !
পক্ষ্ম-পাখে, আঁখি-পাখী, চাঁদের অমিয়া ছাঁকি'
ঢেলে দিক, হে কবি-বন্দিতা !

অধর কপোলময় ফুলের মিলেছে লয়,
সু-ললাট মতির আবাস,
সৌন্দর্যের ধারা-বৃষ্টি, বিধির অপূর্ব সৃষ্টি,
কালিন্দীর ঊর্মি কেশপাশ।

ফুলের রচিত দেহ, স্নেহ করুণার গেহ—
লয়ে এস—পরান উদার ;
অপূর্ব অমৃত-রসে, সিনান করাও এসে,
জ্যোৎস্না-ঘন পরশে তোমার !

আন গো মঙ্গল-ঘট, লয়ে এস অকপট
বেদনা-বুঝিতে-পটু মন,
ছু'খানি স্নেহের করে জগতে রে রাখ ধরে,
রাখ বেঁধে অন্তরে আপন।
এস, মন্দ-বায়ু-গতি! সৌন্দর্য-রূপিণী সতী!
শোন মোর সৌন্দর্যের গীতা;
মনের ছুয়ার খুলি, একবার পথ ভুলি,
এস দেবী—এস অনিন্দিতা!

আন-গগনের আলো

আমার কুঞ্জে লতার ছুয়ার নিবিড় ছিল না ভালো,
তাই ফাঁকি দিয়ে পশেছে আজিকে আন-গগনের আলো;
স্বজনী—শঙ্খ বাজা,—
আজ আসিয়াছে হৃদয়ে আমার, আমার হৃদয়-রাজা!
অরুণ চরণে শরত প্রভাত—
আজি এল যেন তারি সাথে সাথ,
তারি সাথে সাথ নিবাত সলিলে
ছুলিয়া উঠিল আলো;
স্তব্ধ হিয়ার ছু'কূল প্লাবিয়া কিরণে ভরিয়া গেল।

কুঞ্জভবনে লতার ছুয়ারে পল্লবদল নাচে,
অযুত গ্রন্থি তন্তুলতার খুলিলে পরান বাঁচে,
উন্মাদ ভালবাসা!
ছিঁড়ে দিলে তুমি সব বন্ধন, তুমি কেড়ে নিলে বাসা!
শরতের আলো—ত্রিলোক জুড়িয়া—
তারি সাথে হিয়া গেল যে উড়িয়া,
বাতাসে চড়িয়া আর কতদূর
ছুটিব তোমার পাছে,
কোথা যেতে চাও, কোথা লয়ে যাও, হায় গো কাহার কাছে?

আমার কুঞ্জ-দুয়ারের পাশে ছিন্ন লতিকাগুলি—
ব্যথিতের মত চেয়ে আছে, হের, মাখিয়া ধরার ধূলি
ওগো ! সমুদ্র-পাখী,—
তবু চলিয়াছি তোমারি সঙ্গে ব্যগ্র-ব্যাকুল-আঁখি।
ভাঙা হৃদয়ের,—নয়ন জলের—
মরু, হ্রদ ; কত মরীচি—ছলের ;
হাসির জ্যোৎস্না সুখের লহরে
ঘুম যায় নিরিবিলি ;
বিশ্ব-হিয়ার পরতে পরতে হিয়া মোর গেল মিলি।

বিশ্বে আলোক ফুটেনি তখন, তুমি এসেছিলে যবে,—
অলোক-আলোকে সাঁতারি কখনো তিমিরে কখনো ডুবে।
বিশ্ব-ভুবনচারী !—
সৃষ্টি-ছাড়া, কি মন্ত্রের বলে, হৃদয় লইলে কাড়ি !
নিমেষে ফুটাও নিখিলের ছবি,
নিমেষে বুঝাও বুঝিবার সবি,
নিমেষে ছুটাও দ্যুলোকে-ভূলোকে
মোহন বংশী রবে ;
আমিও ছুটেছি, সাঁতারি আলোকে—আঁধারে কখনো ডুবে।

নব বসন্তে

ফুলের বনে ফুল ফুটেছে,
কোকিল গাহে তায় ;
কিরণ কোলে লহর দোলে,
সলিল ব'হে যায় !
ফুলের বনে পরান মনে
পুলক উথলায়।
নূতন ঋতু, নূতন রীতি,
নূতন প্রীতি, নূতন গীতি,

নিখিল ধরা আপন-হারা
নূতন চোখে চায়,
ফুলের বনে, ফুল ফুটেছে,
সমীর মূরছায়।

সোনার মৃগ মৃগীর পানে
সোনার চোখে চায়,
কপোত সনে, মধুর স্বনে,
কপোতী গান গায়,
সোনার ফড়িং তৃণের বনে
ঝিঁঝির পিছে ধায়;
নূতন ঋতু, নূতন রীতি,
নূতন প্রীতি, নূতন গীতি,
নিখিল ধরা আপন-হারা
সোনার চোখে চায়!
ফুলের বনে পরান মনে
পুলক উথলায়।

বিভোর হয়ে চকোর আজি
চাঁদের পানে চায়,
হৃদয় তলে প্রেম উথলে
জগৎ ভুলে যায়,
চাঁদ সে ভাসে নীল আকাশে
আপন জোছনায়;
তরুণ প্রাণে, নূতন প্রীতি
নূতন রীতি, নূতন গীতি,
বিভোল্ ধরা আপন-হারা
সোনার চোখে চায়;
নিখিল সনে তরুণ মনে
পুলক উথলায়!

ফাগুনে

ফুল বলে, "আঁখি-জলে, ছিনু একা, ম্রিয়মাণ ;
তুমি এসে, মৃদু হেসে, নব প্রাণ দিলে দান ;
মলিন অধরে, মরি, তুমি দিলে সুধা ভরি',
তোমার চুমায় ফিরে, মনে পড়ে, ভোলা গান।
উদাস নয়নে আলো— তুমি জ্বালায়েছ ভালো,
এখন মরণ এলে—হাসিমুখে ঢালি প্রাণ।"
মধুকর, গুন্‌গুনি বলে, "হায় গুণ গণি'
এমন ফাগুন দিন—হয় বুঝি অবসান।"

বসন্তে

পুলক উষার কিরণ রাগে
পুলক পাখীর আকুল-গানে ;
ফুলের গন্ধে পুলক জাগে,
প্রেমের পুলক কিশোর প্রাণে !

নূতন ফুলের গন্ধ উঠে
দিগ্‌বিদিকে যায় রে লুটে,
চল্ রে ত্বরা, চল্ রে ছুটে,
চল্ রে ছুটে ফুলের পানে !

বাতাস বেয়ে বাতাস ছেয়ে,
ফুলের গন্ধ দিশেহারা—
আকাশ পানে চ'ল্‌ল ধেয়ে,
যেথায় হাসে উজল তারা ;

আধেক পথে তারার আলো,—
ফুলের গন্ধে মিশিয়ে গেল,
বইল ধরায় প্রেমের ধারা,
পুলক ধারা বইল প্রাণে।

রূপ-স্নান

জ্যৈষ্ঠ মাস—বৃষ্টি হয়ে গেছে,
আহ্লাদে আকুলা ভাগীরথী ;
স্নিগ্ধ বাতে ত্রিলোক তুষিছে,
কৃষ্ণা যেন সেবিছে অতিথি।

লালে লাল পশ্চিম আকাশ,—
তপ্ত সোনা—সিন্দুরে-হিঙ্গুলে,
অঙ্গে ধরি রক্ত চীনবাস,
জাহ্নবী, চলেছে এলো চুলে।

লাক্ষারাগে রঞ্জিত আকাশে
খণ্ড নীল দূর্বাদল-শ্যাম,
প্রলয়ের রক্তে যেন ভাসে
বটের পল্লব অভিরাম,—

ছায়া তার রক্তিম গঙ্গায়,—
দেখ চেয়ে—দিব্য কাম্য-রূপ,
রূপহীনা, কে আছিস্ আয়—
এ ঘাটে নাহিলে হয় রূপ !

মাঙ্গলিক

(খাম্বাজ)

পরমেশ ! আজি, বরিষ তোমার
আশিস যুগল শিরে ;
কর পবিত্র, পুষ্পেরি মত
এ নব দম্পতিরে।

আজি হতে তারা বাহিবে তরণী,
অকূল সিন্ধু-নীরে ;—
রহে যেন নভঃ কিরণে পূরিত,
বায়ু বহে যেন ধীরে।
হরষিত শত হৃদয় প্লাবিয়া
আজি যে পুলক ফিরে,—
সে মধুর প্রীতি, যেন দিবা-রাতি
যুগলে রহে গো ঘিরে।

প্রেম ও পরিণয়

সুখের নিলয় সেই পরিণয়,—
প্রণয় যাহে দৃষ্টি রাখে ;
নইলে কেবল লোহার শিকল,
জীবন-পথে বিঘ্ন ডাকে।
চন্দ্র তারায় সন্ধি করে
দু'টি হৃদয় বন্দী করে,
কত যুগযুগান্ত ধরে
আয়োজন তার চল্‌তে থাকে।
একটি নারী, একটি নরে,
অপূর্ণে অখণ্ড করে,
প্রাচীন ধরায় তরুণ করে,—
অরুণ-রাগে জগৎ আঁকে!
অমৃত প্রেম মর্ত্যলোকে,
অমৃত সে দুঃখ-শোকে ;
জীবন-পুঁথির জটিল লেখা—
স্পষ্ট হয় প্রেমিকের চোখে।

পরিণয়ে সেই যে প্রণয়,
পরিণত যেই দিনে হয়,
সে দিন ফলে অমৃত-ফল—
জগৎ-বিষ-বৃক্ষ-শাখে।

জ্যোৎস্নালোকে

তুমি গো আছ মগন ঘুমে
ফুলের বিছানা;
জানলা দিয়ে পড়িছে গিয়ে
আকুল জোছনা।
এই যে ছিল চরণ ছুঁয়ে,
একটি কোণে, একটু নুয়ে,
এখন সে যে হিয়ায় রাজে,
হরিণ-লোচনা!
সাহস পেয়ে, রয়েছে চেয়ে,
অধীর জোছনা!

সন্ধ্যা থেকে আমার চোখে
ঘুমের নাহি লেশ;
জ্যোৎস্নালোকে তোমায় দেখে
সুখের নাহি শেষ!
আমার ছায়া তোমার বুকে,
জ্যোৎস্না সাথে ঘুমায় সুখে,
জ্যোৎস্না সাথে নয়ন পাতে
রচিছে মায়া দেশ।
সন্ধ্যা থেকে আমার চোখে
ঘুমের নাহি লেশ।

জ্যোৎস্নাটুকু মিলায়, বায়ু
দোলায় কেশ-পাশ,
এখনি তবে প্রভাত হবে,
জাগিবে রশ্মি-ভাস্।
ছিল না বাধা, হরষ মনে,
চাহিয়া ছিনু তোমার পানে,
বিজন গেহ ছিল না কেহ
করিতে পরিহাস ;
জ্যোৎস্নাটুকু মিলায়, বায়ু
দোলায় কেশ-পাশ।

সফল আজি জীবন মম,
সফল জোছনা,
সফল তব রূপের রাশি
কমল-লোচনা!
ধৌত করি তারার মালে,
ধৌত করি যূথির জালে,
পড়েছে ঝরে তোমারি 'পরে
অমর জোছনা।
জ্যোৎস্না দেশে, রানীর বেশে,
হরিণ-লোচনা!

স্পর্শমণি

কহিতে কাহিনী আছে, গাহিবারও আছে গান।
যত দিন মনোবীণে ভালবাসা তুলে তান!
মলয় চলিয়া গেলে ফুল তো ফুটে না বনে,
ভালবাসা ফুরাইলে সাড়া তো উঠে না মনে
দেবতা চলিয়া গেলে, দেউলে না দীপ জলে,
ভুলেও না উঠে তান—প্রেম যেথা অবসান।

ভালবাসা যদি, হায়, বারেক ফিরিয়া চায়,—
অরুণ চরণ দিয়া—হিয়া পরশিয়া যায়,—
ফুটে শত শতদল, ছুটে মধু পরিমল,
জেগে উঠে কলগীতি—মন প্রাণ কানেকান!
গেয়ে না ফুরায় গান,—কথা হয় অফুরান্।

রূপ ও প্রেম

রূপ তো হাতের লেখা, প্রেম সে রচনা;
রূপহীনা নহে প্রেমহীনা।
লেখার এ দোষে শুধু, স্পর্শিবে না কাব্য-মধু?
প্রেম—ব্যর্থ হবে রূপ বিনা?

কবি হতে শ্রেষ্ঠ কি গো কেরানী মুহুরী?
প্রেম হতে রূপের মাধুরী?
কুরূপে—নয়ন বিনা কেহ তো করে না ঘৃণা
প্রেম যার হৃদয় যে তারি।

চাঁদের কিরণ সেও চুমে তার গায়,
মলয়া সে কুন্তল দোলায়,
যৌবন-দেবতা করে রাজ্য—সে দেহের 'পরে
মনে প্রাণে বহে প্রেম-বায়!

তবে ফিরায়ো না আঁখি কুরূপ বলিয়া,
যেয়ো না গো চরণে দলিয়া,
নিশির স্নেহের গেহে, দেখো, রূপহীন দেহে,
প্রেমে রূপ উঠে উথলিয়া!

মেঘের কাহিনী

সম্বর হ্রদে, জর্জর দেহে, ঘুমায়ে আছিনু ভাই,
লবণে জড়িত লহরের কোলে ঘুমেও স্বস্তি নাই ;
সহসা পূরবে, তরুণ অরুণ হাসিয়া দিলেন দেখা,
আমি জাগিলাম, বুকে দেখিলাম অরুণ-কিরণ লেখা !
কিরণাঙ্গুলি ধরি
আমি, উঠিলাম ত্বরা করি,
কম্পিত, ক্ষীণ, জর্জর তনু—ললাটে বহ্নি-শিখা।

তৃণ পল্লবে, নিম্ন বায়ুতে আপনার জ্বালা ঢালি'
উচ্চ গিরির উন্নত চূড়ে উঠিতে লাগিনু খালি ;
কঠোর শিলার পরশে আমার নয়নে ঝরিল জল,
ছলছল চোখে লাগিনু উঠিতে—ছুঁইনু গগনতল।
ডুবিলেন দিননাথ,
হাসি, পবন ধরিল হাত ;
তুষারের মত হয়ে গেল দেহ, ফুরাল সকল বল।

* * * *

বাতাসের সাথে ধরি হাতে হাতে গগনে ছুটিনু কত,
পলে পলে ধরি অভিনয় রূপ—খেলি বাতাসেরি মত ;
চন্দ্রমা আর গ্রহ তারকার সকল বারতা লয়ে'—
বরষের পথ মনের আবেগে নিমেষে চলিনু ধেয়ে ;
কত যে হেরিনু, আহা,
কভু, স্বপনে ভাবিনি যাহা !
ডাকে মোরে দূর চাতক, ময়ূর, কবি—গান গেয়ে গেয়ে !

বিশ্বের ডাক শুনেছি আবার—হৃদয় ভরেছে স্নেহে,
বিশ্বের প্রেমে পরান আমার ধরে না ক্ষুদ্র দেহে ;
বুকে ধরি খর বিজলীর জ্বালা বুঝেছি আপনি জ্বলে'
ধরণীর জ্বালা, তাই তো আবার চলিয়াছি মহীতলে !

মরুতে যে বায়ু ব'য়—
আর, করি না তাহারে ভয় ;
রঙীন মেখলা পরিয়া চলেছি আশা দিতে ফুলদলে।

আমারি মতন কত শত মেঘ জুটেছে আজিকে হেথা,
কাজলের মত বরণ, গাহিছে জীমূত-মন্ত্র-গাথা।
চলিতে দুলিছে শত গোস্তন, পূর্ণ শীতল রসে,
বেদনা তাপিতা আবেশে ঘুমায়, করবীবন্ধ খসে ;
টুটে কুতচূড় জটা,
তাহে, ফুটে দামিনীর ছটা,
কুন্তল ভার—আকুল ধরার চোখে মুখে পড়ে এসে।

ঝর্ঝর রবে ঝরে বারিধার, শিথিলিত কেশ, বেশ ;
গর্জন ধ্বনি সহসা উঠিল ব্যাপিয়া সর্বদেশ।
এ পারে বজ্র অট্ট হাসিল ও পারে প্রতিধ্বনি,—
সংজ্ঞা হারা'নু, কি যে হ'ল পরে আর কিছু নাহি জানি।
জাগিনু যখন শেষ,
দেখি, আছি আমি ব্যাপী' দেশ,
ভূতলে অতলে যেতেছে মিলায়ে আমারি সে তনুখানি !

আজি নাহি মোর জ্যোছনা সিনান, কিরণে শিঙার নাই।
নাহি রামধনু-মেখলা আমার, নাই কিছু নাই, ভাই ;
আজ আমি শুধু সলিল-বিন্দু, ভাই আজি মোর ধূলি,
চাঁদের মিতালি ভোলা যায়, করি' তার সাথে কোলাকুলি।
আমি, নহি নহি মেঘ আর,
এবে, জল আমি পিপাসার,
সার্থক আজি জন্ম আমার—যূথি রে ফুটায়ে তুলি।

শীতল কদলী ছায়
শয়ান রচিয়া হায়,
বিভোরে আছে কি বসি সে আমার পথ চাহি ?

আজো কি আমার ছবি—ফেলিয়া সকল কাজ—
আঁকিছে গোপনে, বালা, মলিন নলিন সাজ ?
আজো কি হৃদয় 'পরে—
আমার মূরতি ধরে ?
আজো কি তাহার মনে লীলা করে ঋতুরাজ !

আকুল আহ্বান

এস নাথ ! এস নাথ ! এস নাথ !
বসন্ত প্রভাত ! সুখ-বসন্ত প্রভাত
কোকিল সে কুহু কুহরিল,
শিহরি উঠিল বন-বাত ;
গুঞ্জরি' অলি বাহিরিল
বকুল গন্ধ সাথে সাথ !
এস নাথ ! এস নাথ ! এস নাথ !

বকুল ঝরিয়া মরিল গো,
চম্পকও হ'ল পরিম্লান ;
মূর্ছিত তাপে শিরীষগুচ্ছ,
তনু-মন আজি ম্রিয়মাণ।
'ফটিক জল'—'ফটিক জল'—
চাতক ফুকারে সবিষাদ ;
আমি লাজ-ভীতে নারি ফুকারিতে,
এস নাথ ! এস নাথ ! এস নাথ !

নিদ্রিত পুরে বায়ু 'হাহা' করে,
ঘন বরষণে কাটে রাত,
কত যূথি ঝরে—কে গণনা করে ?
হায় নাথ ! হায় নাথ ! হায় নাথ !

কদম কেতকে বনভূমি ছায়,
দাদুরী আঁধারে কাঁদে রে,
ফুল সম হিয়া ফুটিবারে চায়—
তারে কে আজিকে বাঁধে রে।
কেতকী মলিন, নীপ রূপহীন,
কমল খুলিল আঁখি পাত ;
জ্যোৎস্না হাসিল প্লাবিয়া ধরণী ;—
এস নাথ ! এস নাথ ! এস নাথ !

উত্তরে হাওয়া ফিরিল গো,
উল্‌কী ফুকারে সারা রাত ;
তুমি তো এলে না—তবু, ফিরিলে না,—
হায় নাথ ! হায় নাথ ! হায় নাথ !

কুন্দ কাঁদিয়া দুখে, হায়,
ঝরিয়া মিশায় কুয়াশায় ;
বিধবা কানন-বল্লরী, মরি,
মলিন আকাশ পানে চায়।
দীর্ঘ যামিনী কাটে না আর,
না মুদে হায় নয়ন-পাত ;
ডাকে তক্ষক—বন-রক্ষক ;
হায় নাথ ! হায় নাথ ! হায় নাথ !

অবসান

চ'লে যাও—ওগো, চ'লে যাও;—
বকুল ফুলেরে দ'লে যাও।
হেথায় ধূলির মাঝে
কে মুখ লুকাল লাজে,—
সে কথা শুনিতে কেন চাও?
আঁধারে ফুটিয়া সে যে
আঁধারে ঝরিয়া গেছে,
তার কথা—কেন গো সুধাও?

তাহার রূপের ভায়
তারা তো ফুটেনি হায়,
বড় আশা?—ছিল না তো তাও।
ঝরিয়া পথেরি ধারে
ছিল সে পড়িয়া, হা-রে
চরণে দলেছ—ভাল—যাও।
ধূলি-মাখা একাকার,
তার পানে বৃথা আর
আকুল নয়নে কেন চাও?
তারি সে শেষ নিশাস—
এখন' বহে বাতাস!
হেথা হতে—নিঠুর!—পালাও।

আলোকলতা

মূল নাই, ফুল ফল পত্র নাই মোর,
বাতাসে জনম মম, তরু-শিরে বাস;
তন্তু সম সূক্ষ্ম তনু, সুবর্ণের ডোর,
যে মোরে আশ্রয় দেয় তারি সর্বনাশ।

চিনেছ ? 'আলোকলতা' বলে মোরে লোকে ;
যে মোরে আদরে শিরে ধরে আপনার—
নিস্তার নাহিক তার, বেড়ি পাকে, পাকে,
শ্রীহীন, লাবণ্যহীন, করি তনু তার,—

রস মরে, পত্র ঝরে, শরীর শুকায়,
আত্মহারা আলিঙ্গনে—তরু এ তনুর,—
সমাচ্ছন্ন পরশের মোহ-মদিরায় ;
প্রতিবাতে কাঁপে দেহ অসার তরুর।

শুকাইলে বৃক্ষ, আমি, তবে সে শুকাই ;
আলোকের ধন, পুনঃ, আলোকে লুকাই !

উদ্‌ভ্রান্ত

আন বীণা, বাঁধ তার, ঢাল সুরা, গাহ গান ;
যে গিয়েছে—কথা তার, কর আজি অবসান।
যে ফুল গিয়েছে ঝ'রে, সে আর ফিরিবে না রে,
যে পাখী মরেছে হায়—গিয়েছে সে চিরতরে ;
মোছ তবে আঁখি-ধার—কাঁদিয়া কি হবে আর ?
ঢাল সুরা—করি পান, তোল গো নূতন তান,
শ্মশানে জনম যার—তারো কেন কাঁদে প্রাণ !
আমার এ আঁখি দিয়ে অশ্রু বহে না গো,
এ প্রাণ আপন ব্যথা কারেও কহে না গো,
আমার বেদনা বুঝে, এমন পাইনে খুঁজে,
এ জগতে যাতনার—পরিহাস—প্রতিদান !
পাষাণে পাষাণ হানি' তোল তবে কলতান !
বীণারে তুলিয়া লও, যত দিন আছে তার,—
তোমার ব্যথায় হায় কাঁদিবে সে শতবার,

কণ্ঠে মিলায়ে তান— গাহিবে করুণ গান,
তাহারে ধর গো বুকে—কর শোক অবসান ;
তোল ফিরে কলগান, পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ !

ব্যর্থ

অতিথি ফিরিয়া গেছে,
আয়োজনে এখন কি ফল ?
চাতক মরিয়া গেছে,
আজি আর মেঘে কেন জল ;
গোলাপ ঝরিয়া গেছে,
ফিরে যা রে পবন পাগল।

টুটিয়াছে সুরার পেয়ালা,
শুষ্ক মাটি লয়েছে শুষিয়া ;
ভেঙেছে তো ভেঙে যাক্ খেলা,
ঘরে পরে কি হবে দূষিয়া ?
নিশিদিন পঞ্জর-পিঞ্জরে
মরা পাখী কি হবে পুষিয়া ?

যামিনী পোহায়ে যদি গেল—
এখন এ বৃথা অঙ্গ-রাগ ;
নয়নের নেশা তো ফুরাল,
মিছে কেন কথার সোহাগ ?
লিখে লিখে সাদা হ'ল কাল,
ছিঁড়ে ফেল,—চিহ্ন ঘুচে যাক্।

ভ্রষ্ট

আনন্দে অমৃত-গন্ধ আছিল তখন,
তীব্র ছিল দুঃখ অভিমান,
অনুভূতি তীক্ষ্ণ ছিল, পুষ্প সম মন,
ভালবাসা ছিলনাক' ভান।

তখনি সে পরিচয় তোমায় আমায়,
কত দিন—কত দিন গেছে,
এত ঘনিষ্ঠতা,—শেষে, কে জানিত হায়,
অচেনার মত র'ব বেঁচে?

তুমি ডুবিয়াছ পঙ্কে আমি সশঙ্কিত,
মজি নিজে—কখন—কে জানে;
পাছে এ কাহিনী হয় অন্যের বিদিত,—
ফিরে নাহি চাহি তোমা' পানে।

হয় তো হতাম সুখী আমরা দু'টিতে,—
হেলা ভরে তুমি গেলে চলি';
প্রেম-শতদল হায় ফুটিতে ফুটিতে—
মনে পড়ে?—গিয়েছিলে দলি'।

মানুষ পাষাণ হয়, কর কি প্রত্যয়?
চেয়ে দেখ—সাক্ষী তার আমি;
ঠেকিয়া শিখেছি এবে, কেহ কার' নয়,—
সত্য কিনা জানে অন্তর্যামী।

কেনা, বেচা, বেনেগিরি কানাকড়ি নিয়ে,
হট্টগোল হাটের মাঝারে;

ঝরে গেল সোনাটুকু ঘাচিয়ে, ঘাচিয়ে,
প্রতিদিন দোকানে, বাজারে,—

অধরে যে হাসি ছিল—মিশেছে অধরে,
জঙ্গলের ফুলের মতন ;
নয়নে যে জ্যোতি ছিল, শুধু অনাদরে,
নয়নে সে হয়েছে মগন।

যে দিন পাঠায়েছিনু প্রেম-নিমন্ত্রণ—
অবসর হয়নি তোমার,
আজ তুমি উঞ্ছবৃত্তি করেছ গ্রহণ,
কি অদৃষ্ট তোমার আমার !

ভেব না যন্ত্রণা দিতে, গঞ্জনা, ধিক্কারে,
আজ আমি এসেছি হেথায়,
আপনার চেয়ে ভালবেসেছিনু যারে—
তার কথা কারে কহা যায় ?

বাহিরে, যেথায় তোরে করে পরিহাস—
ক্ষীণ-কণ্ঠে সেথা তুলি হাসি,
অন্তরে অন্তরে বাঁধা স্মৃতি-নাগপাশ,
সংগোপনে অশ্রুজলে ভাসি।

তবুও কাঁদে না প্রাণ পূর্বের মতন,—
অনুভূতি তীক্ষ্ণ নহে আর,
জেনেছি মৃত্যুর স্বাদ না যেতে জীবন ;
অশ্রুশূন্য শুষ্ক হাহাকার !

সান্ত্বনা

বিফল যদি হয় গো প্রণয়—বিফল হ'তে দাও ;
সুখের পরে দুঃখ পেলে—আর কি বেশী চাও ?
তোমার মনের আকুলতা
বুঝতে পারে তরুলতা,
মানুষ যদি না বুঝে তা'—সইতে হবে তাও।
প্রেম দিয়েছ প্রেমের ধনী,
দিয়েছ ঋণ—হওনি ঋণী,
রিক্ত তনু মুক্ত তুমি—সেই পুলকেই গাও।
প্রণয় হারিয়েছিস্ ব'লে,
পড়িস্‌নে ভাই দুঃখে হেলে,
প্রেমের সঙ্গে প্রাণ যেতে চায়—তারেও যেতে দাও।

একদিন-না-একদিন

একদিন-না-একদিন, কারো-না-কারো কপালে,
ঘটেছে যা—তাই নিয়ে ভাই বৃথাই মাথা বকা'লে

সীতার নামে কলঙ্ক আর লক্ষ্মণেরে অবিশ্বাস,
ধ্যানভঙ্গ শংকরের ও যুধিষ্ঠিরের নরকবাস ;
এমন সকল কাণ্ড যখন আগেই গেছে ঘ'টে,
তখন তুমি খ্যাতির খেদে গরম কেন চ'টে ?
চল্‌তে গেলেই লাগে ধুলো,
ধুয়ো তখন ও-সবগুলো,
তা' বলে কি পথ দিয়ে, ভাই, চলবে নাক' মোটে ?

একদিন-না-একদিন, কারো-না-কারো কপালে,
ঘটেছে যা—তাই নিয়ে ভাই বৃথাই মাথা বকা'লে।

অরসিকে রসের কথায় হয়ত যাবে ভোলাতে,
অপ্রেমিকে মনের ব্যথায় হয়ত যাবে গলাতে ;
অঘটন যা ঘটবে তা'তে—সেটা কিন্তু স্বাভাবিক !
কাজেই তা'তে বিলাপাদি, বেশী রকম, নহে ঠিক।
পরকে কেন মন্দ কই ?
মনের মত নিজেই নই।
আমাদের এই রোষ তুষ্টি—অধিকাংশই আকস্মিক।

একদিন-না-একদিন, কারো-না-কারো কপালে,
ঘটেছে যা—তাই নিয়ে ভাই বৃথাই মাথা বকা'লে।

নৈশ-তর্পণ

জলের লীলা মিলিয়ে গেল নিবিড় আঁধারে
আলোক মালা উঠল ফুটে নদীর ছ'ধারে ;
নৌকা 'পরে আলোক নড়ে,
নদীর জলে রশ্মি পড়ে ;
উঁকি দিয়ে ঢেউগুলি তার ছুটছে কোথা রে ;—
বুঝি বা কোন্ ঘুর্নি দিয়ে অতল পাথারে।
পরান আমার কেমন তা'তে হ'ল যে বিকল,
পড়ল ঘন নিশাস, চোখেও পড়ল এসে জল !

অম্‌নি ক'রে আমার মনে উঁকি দিয়ে হায়,
কতই হাসি-মুখের ছবি নিমেষে লুকায় ;
কেউ বা ভালবেসেছিল,
মধুর মৃদু হেসেছিল,
কার কাছে বা ততটুকুও হয়নিক' আদায়,
কেউ বা গেছে মানে মানে, কেউ ঠেকেছে দায়।

সবার তরেই আজকে আমি হয়েছি বিহ্বল ;
উঠছে ঘন নিশাস, চোখেও পড়ছে এসে জল।

কেউ ডুবেছে অতল জলে, ভেসেছে বা কেউ—
ছুটেছে কেউ কূলের পানে মথন ক'রে ঢেউ ;
কেউ হরষে জলে ভাসে,
কূলের পানে চেয়ে হাসে,
কেউ বা ভাসে চোখের জলে, ত্রাসে মরে কেউ
কূলে ব'সে উদাস মনে কেউ বা গণে ঢেউ,
আজকে আমি সবার তরেই হয়েছি বিহ্বল,
পড়ছে ঘন নিশাস, চোখের শুকায় নাক' জল।

যে কেউ মোরে ক'রে গেছ স্নেহের অধিকারী,—
নয়ন-জলে জানাব আজ আমি সে সবারি ;
জানিয়ে যাব আরো বেশী,
হয়নি যেথা মেশামেশি,—
ঘটেছিল যেথায় শুধু চোখের লেনা-দেনা।
জানিয়ে দেব চোখের জলে আমি সবার কেনা।
আমি যে আজ সবার তরেই রেখেছি কেবল,
একটা ঘন নিশাস, চোখের একটি ফোঁটা জল।

মৎস্যগন্ধা

দ্বীপে ঊষা এল কুয়াশায়,—
কোলের মানুষ চেনা দায়,—
চারি ধারে ঘিরি' তারে জলের আক্রোশ,
বাহিরে রোষের ছায়া—অন্তরে সন্তোষ।
হিম রাশি ফণা তুলে ধায়,
মৎস্যগন্ধা তরণী ভাসায়।

তরী চলে ডুবায়ে মৃণাল,
হাতে তার আর্দ্র কালো জাল ;
দৃঢ় মুঠি টানে জাল, পড়েনি রে মীন !
হয়ো না মলিনা বালা আজি শুভদিন ;—
জালে ধরা দেছে পরাশর !
তরী 'পরে সোনার বাসর !

কোথা দিয়ে কাটে দিনরাত,
ঋষি নাহি মুদে আঁখি-পাত ;
ধীরে ধীরে মিলাইল—কুয়াশার ঘর,
কাটায়ে মোহের ঘোর উঠে পরাশর।
মৎস্যগন্ধা—পদ্মগন্ধা আজ,
কোলে তার শিশু 'ব্যাস' করিছে বিরাজ !

আলেয়া

"পুড়ে মরি—পতি নাহি পাই,
কোথা পা'ব জুড়াবার ঠাঁই ?
জ্বালার অবধি মোর নাই।

দিনরাত শুধু হাহাকার,
শ্বাস-বায়ু অনল আমার,
মৃত্যু হ'ল—গেল না বিকার !

জ্বলে মরি, আকুল জ্বালায়,
ঘুরি তাই বিজনে জলায়,
মোর পিছে—কেন এস, হায় !

ফিরে যাও পথিক, পথিক,
মাড়ায়ো না কখন' এ দিক্,
এ পথের নাহি কোন ঠিক্।

ধ্রুবতারা নহি আমি ভাই,
আলেয়ার পোড়া মুখে ছাই,
পুড়ে মরি—গতি নাহি পাই!

শীতল হইবে তনু ব'লে—
মাঝে মাঝে ডুবি গিয়া জলে,
উঠিলে দ্বিগুণ পুনঃ জলে।

মুখ দিয়া উগারি অনল,
পবন ছড়ায় হলাহল,
ক্ষণকাল—সকলি বিকল।

আবার যা ছিল হয় তাই,
শান্তি নাই—যন্ত্রণা সদাই,
পরিণাম হ'ত যদি ছাই।

ভাবিতাম বেঁচে সুখ নাই,
এবে দেখি মরণেও তাই,
পুড়ে মরি—গতি নাহি পাই।"

সহমরণ

'জিজ্ঞাসিছ পোড়া কেন গা'?
শুনিবে তা'?—শোন তবে মা—
দুখের কথা বল্‌ব কারে বা!

*　　　*　　　*

জন্ম আমার হিঁদুর ঘরে,
বাপের ঘরে, খুব আদরে,
ছিলাম বছর দশ ;
কুলীন পিতা, কুলের গোলে,
ফেলে দিলেন বুড়ার গলে ;
হলাম পরের বশ।
আচারে তার আস্‌ত হাসি,
—বলব কি আর পরকাশি,—
মিট্‌ল সকল সাধ ;—
হিঁদুর মেয়ে অনেক ক'রে
শ্রদ্ধা রাখে স্বামীর 'পরে,
তাতেও বিধির বাদ।

বুড়াকালের অত্যাচারে,—
শয্যাশায়ী করলে তারে
জেগেই পোহাই রাতি ;
দিন কাটে তো কাটে না রাত,
মাসেক পরে গেল হঠাৎ—
নিব্‌ল জীবন-বাতি।

*   *   *

কতক দুখে, কতক ভয়ে,
শরীর এল অবশ হয়ে
ভাঙ্‌ল সুখের হাট ;
খ'য়ের রাশি ছড়িয়ে পথে,
চল্‌ল নিয়ে শবের সাথে,—
যেথায় শ্মশান-ঘাট।

গুঁড়িয়ে শাঁখা, সবাই মিলে
চিতায় মোরে বসিয়ে দিলে,
বাজ্‌ল শতেক শাঁখ ;

লোকের ভিড়ে ভরেছে ঘাট,
ধেঁায়ায় চিতার আধ্-ভিজা কাট,
উঠ্‌ল গর্জে ঢাক।

*　　　*　　　*

রোমে, রোমে, শিরায়, শিরায়,
জালা ধরে,—প্রাণ বাহিরায়,—
মরি বুঝি ধেঁায়ায় এবার!
আচম্বিতে—চীৎকার রোলে—
চিতা ভেঙে পড়লাম জলে,
মাঝি এক নিল নায়ে তার।

যত লোক করে 'মার মার',
আমার তো সংজ্ঞা নাই আর;
যবে ফিরে মেলিনু নয়ান,
দেখি, এক কুটীরের মাঝে
সেই মাঝি—আছে বসে কাছে,—
যে মোরে জীবন দেছে দান।

কয়দিন গেল শুধু কাঁদি';
শেষে তারে করিলাম 'সাদি',
ভুলিলাম ক্রমে যত ক্লেশ;
আগুনে গিয়েছে জলে রূপ,
তবু ভালবাসে পোড়া মুখ,
সুখে-দুখে দিন কাটে বেশ।

*　　　*　　　*

খেয়া দেয় মরদ জোয়ান,
আছে আরো দেড় বিঘা ধান;
আমি নিজে মিশি বেচি মা,—
শুনিলে তো—পোড়া কেন গা'!'

চিত্রার্পিতা

কে তুমি মহিমময়ী, অয়ি চিত্রার্পিতা,
ধরিয়াছ বীণা-ছাঁদে শিশুরে আপন ?
কচি মুখখানি তার, চুলে ভরা মাথা
দেখাইছ স্নেহভরে ; করিয়া গোপন।

নিজ মুখ, মাতার উচিত মহিমায় ;
আকর্ষিতে দৃষ্টি শুধু সন্তানের 'পরে,
নিজরূপ অপ্রকাশ রেখেছ হেলায় ;
জননী তুমিই বটে—বিধাতার বরে।

দেখা যায় শিরে রুক্ষ কবরী তোমার,
প্রবাসে কি পতি তব ? অয়ি মৃদুপাণি !
পাশে যে কুক্কুর তব—হায়, সে কাহার ?
কোথা তিনি ?—সেথা কি যায় না ছবিখানি ?

তাই কি, নয়ন-জল করিতে গোপন,—
বসেছ—ফিরায়ে হায় মু'খানি আপন ?

মমতাজ

হে সুন্দরী, অয়ি মমতাজ !
শোন গো তোমার জয়,
শোন সৌন্দর্যের জয়,
বিশ্বময় শুধু ওই আজ !

সৌন্দর্য-দেবতা তুমি রানী!
প্রেমের প্রতিমা তুমি,
তোমার সমাধি-ভূমি—
প্রেমিকের চির মৌন বাণী!

সম্রাটের মমতা-পুতলী!
মোমের রচিত দেহ,
ফুলের রচিত গেহ,—
ছেড়ে তুমি কোথা গেলে চলি'?

তোমার তনুর অনুরাগে,
দেখ গো, পাথর কিবা
পুঞ্জিত ফুলের শোভা
ধরিয়া, তোমারে ঘিরি' জাগে!

সম্রাটের রত্নময়ী তাজ!
ইষ্টদেবী শাজাহাঁর,
দেখিলে না একবার—
কি ধনে মণ্ডিত তুমি আজ?

যাদুঘর

যাদুঘরের কবাট পড়ে,
মায়াদেবীর টনক নড়ে,
যেথায় ছিল যে,—
মায়ার কলে,—নূতন বলে,—
উঠ্‌ল সে বেঁচে!

যাতুঘরে অন্ধকার !
ঘোরে কত জানোয়ার।
ডাকে কত পাখী,
মাছ কিলকিল সাপ হিলবিল,
শিলা মেলে আঁখি।

* * *

তা' সবে এড়ায়ে ছাড়ি হাঁফ,
তাড়াতাড়ি—একেবারে নেমে পড়ি, গোটা কুড়ি ধাপ ;
'মায়ার সহিত
আসি উপনীত—'
যেথায় সাজান' শুধু পাথরের চাপ।

* * *

যক্ষ-মূর্তি

তারি মাঝে, দেখিলাম অপরূপ—
পাষাণে খোদিত, এক মনোরম—মদনের যূপ !
মত্ত যক্ষ-রাজ,
মুরজার লাজ—
ভাঙিতে, যতনে এত, তবু সে বিরূপ !

শিশু-কাম দিতেছে বসনে টান,
কুবের সাধিছে ধরি'—'রতিফল' করিবারে পান ;
বাধা দিয়া তায়—
দ্বিগুণ বাড়ায়,
আগুন জালিলে আর নাহি পরিত্রাণ,

"কথা রাখ—আর ফিরায়ো না মুখ,
এবার—পড়েছ ধরা, সুখে যে দ্বিগুণ দেখি বুক !

মুখে শুধু রোষ,
মন পরিতোষ,
কি যে স্বভাবের দোষ—তবু দিবে দুখ!"

কত যুগ অমনি কেটেছে, হায়,
সাধিতে বিরতি নাই, তবু মুখ কভু না ফিরায়!
তবু, পেতে হাত—
কাটে দিনরাত,
মূলে সে হাবাত হলে, কি হ'ত উপায়?

কত যুগ অমনি গিয়েছে চ'লে!
ধরিয়া রয়েছে, তবু আনিতে পারনি তারে কোলে;
আর তুমি,—পাশে,—
স্ফুরিত উল্লাসে,—
স্থির যে রয়েছে আজো—সে পাষাণী ব'লে!

মমির হস্ত

(১)

কার দেহে, কোন্ কালে, লগ্ন ছিলে তুমি,—
নীলিমা-মণ্ডিত, ক্ষুদ্র, কঙ্কালাগ্র কর?
তারপর কত গেছে সহস্র বৎসর—
রক্ষা-লেপে লিপ্ত হয়ে লভিয়াছ ভূমি?

কবে সে—কবে সে হায়, গেছে তোরে চুমি',
মানবের সঞ্জীবন তপ্ত ওষ্ঠাধর
শেষ বার? হায়, কত যুগ-যুগান্তর
আগে, শিশুর আগ্রহ স্পর্শিয়াছ তুমি

জননীর বুক ; কত খেলিয়াছ খেলা,—
কত নিধি উৎসাহে ধরিয়া ফেলে দেছ,—
প্রথম যৌবনে কত করিয়াছ লীলা ;
নর রক্তোচ্ছ্বাসে সাজি, কতই খেলেছ—

লয়ে নিজ কেশ, বেশ, নয়ন, অধর
আজ অস্থিসার—তবু মুগ্ধ এ অন্তর !

(২)

রাজদণ্ড হয় তো গো ধরিয়াছ তুমি,
আজ তুমি কাচ পাত্রে কৌতুক-আগারে !

আজ গ্রাহ্য কেহ নাহি করে গো তোমারে,
দিন ছিল, হয় তো কৃতার্থ হ'ত চুমি,
জনমিয়া ছুঁয়েছিলে কোথাকার ভূমি,
আজ তুমি কোথা, হায়, কোন্ দূর দেশে !

আজ ভালবেসে তোমা' কেহ না পরশে,
প্রত্নতত্ত্বজ্ঞের এবে ক্রীড়নক তুমি,
ওই তুমি—চিন্তাজ্বর করেছ মোচন,—
গোপন করেছ হাসি, মুছেছ নয়ন ;

ওই তুমি—হয় তো গো করেছ রচন
ফুলহার,—কারো তরে কুসুম শয়ন !
দেহচ্যুত, অবজ্ঞাত, হায় রে উদাসী,
ভালবাসা চাহ যদি—আমি ভালবাসি !

ডাকটিকিট

ডাকটিকিটের রাশি—আমি ভালবাসি,
যদি তা' পুরানো হয়—ব্যবহার করা,
ছেঁড়া, কাটা, ছাপমারা স্বদেশী, বিদেশী ;—
তা' সবে পরশি' যেন হাতে পাই ধরা !

যুক্তরাজ্য, চিলি, পেরু, ফিজি দ্বীপ হতে,—
মিশর, সুদান, চীন, পারস্য, জাপান
তুর্কী, রুষ, ফ্রান্স, গ্রীস হতে কত পথে
এসেছে, চড়িয়া তারা কত মত যান !

কেহ আঁকিয়াছে বুকে—নব সূর্যোদয়,
শান্তি দেবী—কারো বুকে—তুষার পর্বত,
হংস, জেব্রা, বরুণ, শকুনি, সর্পচয়,
কারো বুকে রাজা, কারো মানব মহত ;—

যুগ্ম হস্তী, যুগ্ম সিংহ, ড্রাগন ভীষণ,
দীপ্ত সূর্য, সূর্যমুখী, ফিনিক্স, নিশান,
ময়ূর, হরিণ, কপি, বাষ্প জলযান,
দেবদূত, অর্ধচন্দ্র, মুকুট, বিষাণ !

কেহ আনিয়াছে বহি' পিরামিড-কণা !
কেহ বা এসেছে মাখি' পার্থিনন-ধূলি !
নায়েগ্রা-গর্জন বিনা কিছু জানিত না,—
এমন ইহার মধ্যে আছে কতগুলি !

কেহ বা এনেছে কারো কুশল সংবাদ—
মাখি' মুখামৃত, বহি' সাগ্রহ চুম্বন !
কেহ বা পেতেছে নব বাণিজ্যের ফাঁদ ;
কেহ অনাদৃত, কারো আদৃত জীবন !

সকলগুলিই আমি ভালবাসি, ভাই,
সমগ্র ধরার স্পর্শ পাই এক ঠাঁই !

উল্কা

তিমিরের মসীলেপ নিমেষে ঘুচায়ে
বিশ্বচিত্রপট হ'তে,—পরিস্ফুট করি,
প্রত্যেক পল্লবে, শাখে, তৃণে, জলাশয়ে,
দেউলে, প্রাসাদে, পথে,—ফুটাইয়া, মরি,

ভুজপাশে বদ্ধ সহচরে,—চকিতের মত,
জ্যোৎস্না-খণ্ড-রূপে হায়, চকিতে আবার
কোথায় ডুবিলে উল্কা ? তারা লক্ষ শত
মুদিল নয়ন, হেরি এ দশা তোমার।

কোথা ছিলে ? কোথা এবে চলিয়াছ, হায় !
সূর্যতেজে পুড়িতে কি পড়িতে ভূমিতে ?
অথবা, অনন্তকাল অভিশপ্ত প্রায়—
অনন্ত অতলে শুধু রহিবে নামিতে ?

ছিলে কি জীবের ধাত্রী পৃথিবীর মত ?
কিংবা চিরবন্ধ্যা, শুধু, ধ্বংস তোর ব্রত !

স্বর্ণ-গোধা

স্বর্ণ জিনি বর্ণ তোর, নয়ন-রঞ্জন,
স্বর্ণ-গোধা ! ভ্রম হয় স্বর্ণময় ব'লে,—
তনু তোর। ঘৃণ্য কিন্তু তোর পরশন ;
নাহি জানি কালকেতু ভুলিল কি ছলে।

সেকি তোরে ভেবেছিল খণ্ড সুবর্ণের ?
ত্বরান্বিত তাই বুঝি গেছিল কুড়াতে ?
শেষে নিজ ভ্রান্তি বুঝে—মর্মরে পর্ণের—
তীরে বিঁধে এনেছিল অনলে পোড়াতে।

স্থির তুমি থাক যবে, উজ্জ্বল বরণ !
প্রীতি লভে বিমুগ্ধ নয়ন ; কিন্তু হায়
অঙ্গভঙ্গী আরম্ভিলে—আপন নয়ন,
ঘৃণা ভরে মুদে যায়, ফিরে নাহি চায়।

জড়মতি রূপসীর অপরূপ হাসি,—
মন হতে যেমন মমতা দেয় নাশি।

প্রবাল-দ্বীপ

তিমিরে, তিমির অস্থি যেথা হয় শিলা,
ছিদ্রময় স্পঞ্জ-পুষ্প যেথায় বিকাশ,
সেই সাগরের তলে, সুখে করে বাস—
প্রবাল-দম্পতী এক ;—নিত্য নব লীলা !

দিনে দিনে প্রবালের বাড়ে পরিবার,
কত জীয়ে, কত মরে—রাখিয়া কঙ্কাল,
পঞ্জরের বাড়ে স্তূপ, যত যায় কাল ;
অজ্ঞাতে পূরণ করে ইচ্ছা বিধাতার।

স্তূপীকৃত যুগান্তের প্রবাল-পঞ্জর—
কোটি কোটি প্রাণ-পাতে হয়ে সংগঠিত,
কোটি হৃদয়ের রক্তে হয়ে সুরঞ্জিত,—
একদিন তুলে শির সিন্ধুর উপর !

পলি পড়ে, শঙ্খ চরে, জাগে নব দ্বীপ,
ধৈর্যশীল প্রবালের যশের প্রদীপ !

আগ্নেয় দ্বীপ

পার্শ্বে তারি—সাগরের গূঢ় তলভূমে,
আচম্বিতে সমুত্থিত মহামন্দ্র রব,
আচম্বিতে মাটি ফাটি, পর্বত ভৈরব
তুলে শির ; স্তব্ধ ঊর্মি ভয়ে তারে নমে।

আগ্নেয় উৎপাতে ত্রস্ত জলজন্তু-দল,
কালক্রমে পুনঃ যবে হইল নির্ভয়,
থামিল কম্পন, দূরে গেল তাপচয়,
দেশান্তের পান্থ পাখী করি' কোলাহল—

উড়ে গেল ; পড়ে গেল চঞ্চু হতে তার
বিস্ময়ে—শস্যের শিষ অভিনব দ্বীপে ;
শ্যামল হ'ল সে কালে জীবের আগার,
দাঁড়াইল মৌন মুখে বিধাতা সমীপে।

একে ধৈর্য অলৌকিক ! অন্যে তেজোবল !
তপস্যার প্রতিভার—পরিপূর্ণ ফল।

মূল ও ফুল

ফুল—শুধু দেখাইতে চায়
আপনারে রৌদ্রে জোছনায় ;
সমীরে করিতে চায় খেলা,
সারা বেলা রঙ্গ করে মেলা।
অলি বলে, "দাঁড়া ওলো জুঁই।
এই ছুঁই—এই তোরে ছুঁই।"

ফুল বলে, "দুলেছি হাওয়ায়—
আয় অলি এই বারে আয়।"
পাতা 'পরে মাথা যায় ঠুকে
অলি সে পলায় অধোমুখে !

মূল—শুধু লুকাইতে চায়
অন্ধকারে মাটির তলায় ;
খেলাধূলা গিয়েছে সে ভুলে,
কখন্ বা দেখে মাথা তুলে ?
কাজ—কাজ—জানে শুধু কাজ,
কাল যথা তেমনি সে আজ।
মাটি হতে শোষে শুধু রস,—
পাতা ফুল রাখে সে সরস,
কাজ সদা—নাহিক কামাই,
ফুলদল—বেঁচে আছে তাই।

ফুল সে রাজার মত থাকে,
মূল সে চাষার মত পাঁকে !
মাঝে, শাখা পাতার সমাজ,—
গন্ধ, রস, ভুঞ্জে তিন সাঁঝ !
ফুলহীন মূল কত আছে,
মূলহীন ফুল কই বাঁচে ?
ফুল ঝরে—ফুটে পুনরায়,
মূল গেলে সকলি ফুরায়।
ফুল তবু উঁচুতেই থাকে !
মূল সে চাষার মত পাঁকে !

ঝড় ও চারাগাছ

ঝড় বলে, "উড়ে গেল বড় বড় গাছ,—
এখনো আছিস্? আয়, উপাড়িব তোরে।"
"থাক, থাক" বলে চারা "না-না থাক আজ,"
না শুনিয়া কথা, তারে ঝড় ধরে জোরে।

পাড়ে ভূমি 'পরে আহা; একি! অকস্মাৎ
উঠে চারা, মল্ল সম আস্ফালি' পল্লব,
রক্তবীজ যুঝে যেন আপনি সাক্ষাৎ,—
নুয়ে পড়ে ভুঁয়ে, তবু, যুঝে অসম্ভব।

হর্ষে রবি ঢালে শিরে সোনার কিরণ,
শ্রান্তি বিদূরিতে মেঘ হর্ষে ঢালে জল,
বৃষ্টি জলে রৌদ্রে মিলে—হীরকে হিরণ,
ঝলমল তিন লোক,—হাসে পরীদল।

লজ্জায়, পলায় রড়ে, ঝড় দেশ ছেড়ে,
ত্রিলোকের আশীর্বাদে চারা উঠে বেড়ে।

জীবন-বন্যা

তিমির মগন গগন ঘিরিয়া
একি নব উচ্ছ্বাস!
স্পন্দিত করি' লক্ষ তারকা
জাগিছে রশ্মি-ভাস!

বঙ্গসাগরে করি' আজি স্নান
গাহিছে সমীর প্রভাতেরই গান,
জুড়ায় নয়ান, জুড়ায় পরান,
হাস্ রে জগৎ হাস্!
ছুটিছে তন্দ্রা, ছুটিছে স্বপন,
ওই শোন শোন কল আলাপন,
উঠিবে অচিরে উজল তপন,
নাহি রে নাহি তরাস।
উঁকি দিয়ে হাসে ত্রিদিব-কন্যা,
বাঁধ ভেঙে আসে কিরণ-বন্যা,
স্রোতে ফুল পারা ভাসে-ডুবে তারা,
নয়ন মেলে আকাশ।
যুগ যুগ ধরি' তামসীর মাঝে—
নিষ্ফল আঁখি মেলিয়াছিল যে,
নিশা শেষে দিশা লভিল, সে আজ
লভি' নব আশ্বাস।
নাহি ভয় আর নাহি শোক চিতে,
নিদ্রার শেষে নবশক্তিতে—
মানবের হাটে ছুটেছে বাঙালী
ধরি' নব অভিলাষ।
কে রোধিতে পারে পথ আজি তার?
কে বাঁধিতে পারে নির্ঝর-ধার?
ক্ষুদ্র বামন চরণ ছায়ায়
ত্রিলোক করিবে গ্রাস।

* * *

বাজাও শঙ্খ, বাজাও বিষাণ,
মুক্ত গগনে উড়াও নিশান,
(আজি) কিরণে, তপনে, পবনে, জীবনে,
অভিনব উল্লাস!

কোন্ দেশে

(বাউলের সুর)

কোন্ দেশেতে তরুলতা
　　সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই—
　　দল্‌তে হয় রে দূর্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,—
　　সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
　　আমাদেরি বাংলা রে !

কোথা ডাকে দোয়েল শ্যামা—
　　ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
　　মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
　　চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
　　আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ ভাষা মরমে পশি'—
　　আকুল করি' তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুন্‌তে পা'ব—
　　বাউল সুরে মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের—রামপ্রসাদের—
　　কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
　　আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাইরে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃপিতামহের—।
চরণ-ধূলি কোথা রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

সন্ধিক্ষণ

এতদিনে। এতদিনে বুঝেছে বাঙালী
দেহে তার আজো আছে প্রাণ !
এ জগতে যোগ্য যাঁরা তাঁহাদেরি মাঝে
আমরাও ক'রে নেব স্থান।
যে খুশি টিট্‌কারি দিক
অন্তরে বুঝেছি ঠিক—
এ কেবল নহেক হুজুগ ;
সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ !

পথে ঘাটে দেখ চেয়ে অন্দরে বাহিরে
দেশ হিতে বিলাস বর্জন,
বিরাট সহস্র শীর্ষ উঠেছে জাগিয়া
লক্ষ মুখে এক দৃঢ়পণ।
যেথা যে বাঙালী আছে,
প্রাণে প্রাণে মিলিয়াছে,
শুভ লগ্ন পেয়েছে বাঙালী,
মনে হয় আর মোরা রব না কাঙালী।

এ বড় আশার দিন—পণ্য স্বদেশের
সব তুলে লয়েছে মাথায় ;
এবার পরীক্ষা হবে প্রতিজ্ঞার বল,
ভগবান্ হউন সহায়।
ভুলেছিনু মনুষ্যত্ব
বিলাস ব্যসনে মত্ত,
ভুলেছিনু পৌরুষের স্বাদ,—
কে জাগালে সে পৌরুষ ?—সিংহের আহ্লাদ !

এ বড় সংকটকাল—পণের রক্ষণ,—
আমাদের ভ্রম পদে পদে,
সতর্ক জাগ্রত যেন রহি সর্বক্ষণ
নাহি ডুবি কলঙ্কের হ্রদে।
স্মরি স্বদেশের দুখ
মাতা-পত্নী-কন্যা-মুখ,
নিত্য প্রাতে উচ্চারিব পণ—
"বাঁচাব দেশের শিল্প—দেশের জীবন।"

দরিদ্র দেশের কোলে দরিদ্রের বেশ
আমাদের সাজিবে সুন্দর,
'খাটো দেহে খাটো ধুতি'—লজ্জা কিবা তায় ?
শ্রমের সৌন্দর্য মহত্তর !
শক্তিমান দেহমন,
ভীষ্মের মতন পণ,
তার চেয়ে কি আছে শোভন ?
জুড়ায় পরান মন কি ছার নয়ন ?

ভগবান্ ! হীনবলে তুমিই দিয়েছ
এ অপূর্ব নূতন জীবন !

লইয়া অভয় নাম প্রতিজ্ঞা করেছি ;
শক্তি দাও রাখিব সে পণ।
নব স্রোত, বঙ্গভূমে,
তোমার নিদেশে নেমে,
সর্বপ্রাণ করেছে সজীব ;
হে বরদ! শুভংকর! হে সুন্দর! শিব!

তুমি দাও বুঝাইয়া নিন্দুকে, কুটিলে,—
'বাঙালীও জন্মেছে মানব,
কার চেয়ে তুচ্ছ নয় বাঙালীর দাবী
বৃথা সে করে না কলরব ;
মঙ্গল বিধান যত,
স্বদেশের সেবা-ব্রত,
আজ সে মাথায় নেবে তুলে ;
মূঢ় সে—যে দাঁড়াইবে তার প্রতিকূলে!'

'উন্মুক্ত সবারি তরে নিখিল সংসারে
মনুষ্যত্ব-মহত্ত্বের পথ,
চির-ধন্য সে পথে কণ্টক দিতে পারে,—
এমন জন্মে না দাসখত ;
চুক্তির বেতন পাও,—
সর্তমত কাজ দাও
যে প্রভু অধিক করে আশ
ব'লো তারে—কর্মচারী নহে ক্রীতদাস।'

'অর্থের সম্বন্ধ হতে কত উচ্চতর
মনুষ্যত্ব—দেশহিত-ব্রত ;
স্বার্থ সাথে স্বদেশের বিরোধ যেথায়
স্বদেশেরি পায়ে হব নত।

এ কথা না ভুলে রই,
আমি শুধু তুমি নই—
দশের মাঝারে একজন ;
দেশের—দশের শুভে কল্যাণ আপন।'

এমনো পণ্ডিত-মূর্খ জন্মেছে এ দেশে,—
শুনিবারে সাহেবের মুখে
নিজের বুদ্ধির কথা ; স্বদেশে বিদেশে
'পণ পণ্ড' বলে স্ফীত বুকে ;
নিজ মুখে মাখি কালি,
লভে শূন্য করতালি,—
কালি দিয়া দেশের গৌরবে !
হা বঙ্গ ! দিয়েছ স্তন্য ইহাদেরো সবে।

শুনি পণপত্রে কত রাজভৃত্য, হায়,
সহি করে অস্পষ্ট অক্ষরে।
কি লজ্জা ! এতই ভয় চাকুরির তরে ?—
কি লভিবে দাস্যবৃত্তি ক'রে ?
বাণিজ্যে বসেন রমা,
কৃষি প্রায় তারি সমা,
দুই পন্থা উন্মুক্ত তোমার।
তবু দ্বিধা-কৃত-মন ? জঘন্য আচার !

স্বার্থান্ধ স্বদেশদ্রোহী জান নাকি হায়—
জান নাকি আত্মদ্রোহী তুমি ;
পুত্র পৌত্র অন্নাভাবে মরিবে ; এখনো
প্রসারিয়া লও কর্মভূমি।
কারে কর পরিহাস ?
নিজ স্ত্রীর লজ্জাবাস—
তাও নহে আয়ত্ত-অধীন !
সত্য তুমি অতি দীন—অতি দীন হীন।

আজি যারা অনাগত—ভবিষ্য যাদের
কি মান তাদের কাছে পাবে?
কোন্ স্বত্ব কোন্ বিত্ত—শ্ববৃত্তি ব্যতীত—
তাহাদের তরে রেখে যাবে?
কোন্ কর্ম্ম, কোন্ নীতি,
কোন্ মহত্ত্বের স্মৃতি,—
তাহাদের হবে মূলধন?
স্মরিয়া তাদের কথা—দৃঢ় কর পণ।

পাঠশালে ছাত্র করে বিদেশী-বর্জন,
চমৎকার! দৃশ্য চমৎকার!
বিলাস-বির্জনে হের তরুণী ছাত্রীরা
অগ্রগামী আজি সবাকার।
বলো রাজপুতানারে,—
বেণী বিসর্জিতে পারে
বঙ্গনারী তাঁদেরি মতন,
অন্তরে সে বীরাঙ্গনা, শৌর্য্যে ভরা মন।

শিক্ষক শিখান্ আজি বালকে যুবকে
হইবারে দেশের সেবক;
যত ধনী মহাজন পণ-বদ্ধ সবে,
ঊর্দ্ধ শিখা উৎসাহ পাবক!
মহাপ্রাণ সমুদার,
কত শ্লাঘ্য জমিদার
লয়েছেন দেশহিত-ব্রত;
মুক্তকোষ সবে, প্রাচ্য রাজাদেরি মত।

আর আজি ধন্য তুমি দরিদ্র বাঙালী,—
দিয়েছ সংশয় বিসর্জন

যেন মন্ত্রবলে তুমি মুক্তহস্ত এবে,
কোথা পেলে এত বড় মন !
পরস্পরে এ প্রত্যয়—
যত্নে আসিবার নয় ;
এ রত্ন দেছেন ভগবান !
অন্তরে সঞ্চিত করি রাখ দৈবদান।

বৎসরান্তে ভাদ্রশেষে শুধু একবার
কূল প্লাবি' আসে যে জোয়ার,
তাহার তুলনা নাই ; সমস্ত বৎসরে
সে জোয়ার আসে একবার !
সে জোয়ার এসেছে রে
আমাদের ঘরে ঘরে,
এসেছে রে নূতন জীবন !
বাঙালী পেয়েছে আজ সামর্থ্য নূতন।

কণা কণা স্বর্ণ ছিল মৃত্তিকার মাঝে,
ধূলি পারা ধূলি মাঝে হারা ;
আজি কোন্ অনির্দ্দিষ্ট ভূগর্ভের তাপে
গ'লে মিলে হ'ল স্বর্ণধারা।
হার গড়ি সে কাঞ্চনে,
এস সবে, সযতনে—
পরাইব দেশের গলায় ;
জননী ! জনমভূমি ! সাজাব তোমায়।

বাহিরের ঝড় এসে ভাঙে যদি ঘর—
কোথা থাকে পুত্র পরিবার ?
অন্তরে প্রবল হাওয়া উঠিয়াছে যদি
নত হও সম্মুখে তাহার।

স্বদেশ, তোমার পানে—
দেখ গো উদ্বিগ্ন প্রাণে
কাতর নয়নে চেয়ে আছে।
আশা করে মাতৃভূমি প্রত্যেকেরি কাছে।

পবিত্র কর্তব্য-ব্রত লয়েছি মস্তকে,
মরেও রাখিতে হবে পণ!
রাজ্যপণে পাশা খেলি', পণরক্ষা হেতু
বনে গেছে হিন্দু রাজগণ!
বিদেশের মুখ চেয়ে,
শতেক লাঞ্ছনা সয়ে
সংজ্ঞা যদি এসেছে আবার,
প্রতিজ্ঞা স্মরিয়া, শীঘ্র লও কার্যভার।

এদিন অলসে গেলে, কি ক্ষতি যে হবে—
দেখ বুঝে অন্তরে সে কথা;
আশা ভঙ্গ, মনঃক্ষোভ, শক্তি অপচয়,
শত দিকে পাবে শত ব্যথা;
শত্রু সে পাড়িবে গালি,
দু'গালে পড়িবে কালি,
আমল পাবে না কারো ঠাঁয়ে
আবার সহস্র বর্ষ পড়িবে পিছায়ে।

জাতিত্ব গৌরব যাবে অঙ্কুরে মরিয়া,
ঝরিবে রে আধ-ফোটা ফুল;
ভগবান! রক্ষা কর—শক্তি কর দান,
প্রভু! মোরা হয়েছি ব্যাকুল!
দুর্বলের বল তুমি!
দীনের শরণ-ভূমি!

আশ্রয় লইনু তব পায়,
লজ্জা-নিবারণ সখা! হও হে সহায়!

কে আছ হে ধনবান আনো স্বর্ণ-ধন,
কায়ক্লেশ আনো শ্রমী যেবা,
শিল্পী আনো নিপুণতা, উদ্যোগী উদ্যম,
সবে মিলি কর মাতৃ-সেবা।
পরিশ্রমে নাহি লাজ
আপনি চাষীর কাজ,
করিতেন রাজা মিথিলায়!
মন্ত্রদ্রষ্টা ত্বষ্টা ঋষি আদি সূত্রধার!

সুবেশ রাখাল-বেশ সকলি ভুলিয়া,
ধন্য হও স্বদেশের কাজে;
প্রতিজ্ঞা রাখিয়া স্থির স্থাণুর মতন
মান্য হও জগতের মাঝে।
আত্মতেজে করি ভর—
কর্মে হও অগ্রসর!
মূর্খে শুধু বলে এ 'হুজুগ';
বঙ্গ-ইতিহাসে হের এল স্বর্ণ-যুগ!

হেমচন্দ্র

বঙ্গের দুঃখের কথা, সদা করি গান,
দুখের জীবন তব হ'ল অবসান,
হে কবীন্দ্র! হেমচন্দ্র! চলে তুমি গেলে,
সে কি গাহিবারে গান দেব-সভাতলে?
বাসবের সভাতলে কি গাহিছ গান?
ভারত-ভিক্ষার কথা? কিংবা ভিন্ন তান,

গাহিছ,—কেমনে বাস করিল পাতালে
দুর্ব্বৃত্ত বৃত্রের ত্রাসে, বাসব সদলে,
পরাজিত অধোমুখ ; বর্ণিতে তাদের—
গাহিতে গাহিতে হায়—চাহিছ কি ফের
অতি নিম্নে—পরাজিত ভারতের পানে ?
—তোমার সে মাতৃভূমি—সুধা যার স্তনে,—
তার কথা স্মরি' কি ঝরিছে আঁখি-জল ?
জিজ্ঞাসে কি অশ্রুর কারণ দেবদল ?
কি বলিবে, হায় কবি, কি দিবে উত্তর ?
অন্তর্যামী জানিছেন তোমার অন্তর।

দুর্যোগ

কি যেন মলিন ধূমে, কি যেন অলস ঘুমে,
আকাশ রয়েছে ঢাকা সব একাকার ;
ছায়া-ম্লান তরু-শির, প্লাবিত তটিনী-তীর,
বিরাম বিশ্রাম আর নাহি বরষার !

উষার কনক হাসি, আর না জাগায় আসি,
হৃদয়ে উদ্দাম আশা, আনন্দ অপার ;
এখন নিশির শেষে, রুগ্ন বালিকার বেশে—
জীবন জাগায় এসে মরণ সাকার !

তাপহীন, দীপ্তিহীন, এমনি চলেছে দিন ;—
বঙ্গের এ দুর্যোগের নাহি বুঝি শেষ !
এ জল ফুরাবে না রে, এ আঁখি শুখাবে না রে ;
ঘুচিবে না বুঝি আর এ মলিন বেশ।

কত দিন আলো নাই, ভুলে যেন গেছি তাই,
কে বলিবে ছিল কিনা ?—মূকের স্বপন ;
কবে নাকি, স্বর্ণ-ছবি, পূরবে গৌরব রবি
উঠেছিল একবার, হয় গো স্মরণ।

কিরণ পরশে তার দেশে এল হর্ষভার,
সে দিন প্রথম, বুঝি, সেই দিনই শেষ ;
এসেছিল পথ ভুলে তাই ত্বরা গেল চলে,
প্রভাত সে না পোহাতে শূন্য হ'ল দেশ !

প্রিয়জন উপহার— শুকাইলে ফুলহার,
তবু কি ফেলিতে তারে পারে কোনো জন ?
গেছে বর্ণ, গন্ধ যত, কর্কশ কাঁটার মত,
তবু সে যে প্রিয়-স্মৃতি, যতনের ধন।

তাই—পূর্ণ অনুরাগে ; আজিও হৃদয়ে জাগে
সে কাহিনী, মেঘে যেন ক্ষণপ্রভা খেলে ;
জানি সে বিফল, হায়, নাহি প্রাণ শূন্য কায়,
আগুনের গুণ কিগো ভস্মে কভু মেলে ?

এল গেল নিশিদিন, মলিন, লাবণ্যহীন,
এ বরষা ফুরাল না, শুকাল না জল ;
আকাশ, পৃথিবী নাই, দাঁড়াবার নাহি ঠাঁই,
প্লাবনে হয়েছে এক অকূল অতল !

আমরা ডুবিয়া আছি, মরেছি কি বেঁচে আছি
জানি না, প্রকৃতি মাগো, ডেকে নে জুড়াই ;
দক্ষিণ দুয়ার খুলে ডুবাও গো সিন্ধুজলে,
হয়েছি পরের বোঝা—ঘরের বালাই।

সেথা নাহি ভেদাভেদ, নাহি মা মনের ক্লেদ,
ঢেকে দে বঙ্গের মুখ, বেঁচে কাজ নাই ;
অবাধ অনন্ত জল, নাহি তীর, নাহি তল,
মুক্ত পথে ছুটে যাব,—দে না মাগো তাই।

তা' যদি দিবি না, তবে, দেখাস্‌নি ও বিভবে,—
শরতের শুভ্র হাসি, বসন্ত-বিলাস ;
যাহারে সাজে, মা, হাসি, তাহারে দেখাস্ আসি—
বিচিত্র বরণে আঁকা তোর 'বার মাস'।

যারা জগতের কাছে নতশির হয়ে আছে,
জগতের কোনো কাজে নাহি যার যোগ ;
হৃদয়ে নাহিক বল, জীবনে তার কি ফল ?
আলোকে পুলকে তার শুধু কর্মভোগ।

দিস্ না, মা, নাহি চাই, আমাদের কাজ নাই—
হৃদয়-মাতানো তোর নব রবিকর ;
থাক এই অন্ধকার, মলিনতা বরষার,
ক্ষুদ্র মোরা, তুচ্ছ মোরা, জগতের পর।

বরষার নিবিড়তা দিক্ প্রাণে আকুলতা,
আপনা চিনিব তবু, আপনা চাহিয়া ;
সৌন্দর্য নিবিয়া যাক, ধরণী ডুবিয়া থাক,
আপন দারিদ্র্য শুধু উঠুক ফুটিয়া।

অন্তহীন অবসাদ, দিক্ প্রাণে নব সাধ,
যেতে জগতের কাজে উৎসাহ দ্বিগুণ ;
আয় বরষার ধারা, আয় গো আঁধারি' ধরা,
কালিমা ঢেলে দে, হৃদে জ্বেলে দে আগুন !

বঙ্গজননী

কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিস্ বিরস মুখে ;
শিরে তোর নাগের ছাতা, কমল-মালা ঘুমায় বুকে !
ঢলঢল নয়নযুগল জল-ভরে পড়ছে ঢুলে,
কাল মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ওই নিবিড় কাল চুলে,
শিথিল মুঠি,—ত্রিশূল কেন ধরায় ধূলা আছে চুমি ?
কে মা তুই কে মা শ্যামা—তুই কি মোদের বঙ্গভূমি ?

মা তোর ক্ষেতের ধান্যরাশি জাহাজ ভ'রে যায় বিদেশে,
অন্ন-সুধা বঙ্গে ফেরে গরল হয়ে সর্বনেশে !
বনের কাপাস বনে মিলায়, আমরা দেখি চেয়ে, চেয়ে,
অন্নবসন বিহনে হায়, মরে তোমার ছেলেমেয়ে !
বল্ মা শ্যামা, সুধাই তোরে, মোদের এ ঘুম ভাঙবে নাকি ?
ধন্য হতে পারবো না মা তোমার মুখের হাসি দেখি ?

ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি,
ভয়-ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার তেম্‌নি হাসি !
চরণতলে সপ্ত কোটি সন্তানে তোর মাগে রে—
বাঘে রে তোর জাগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগে রে ;
সোনার কাঠি, রূপার কাঠি,—ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি,
গৌরবিণী মূর্তি ধর—শ্যামাঙ্গিনী—বঙ্গভূমি !

'স্বর্গাদপি গরীয়সী'

বঙ্গভূমি ! কেন মাগো হইলে উর্বরা ?
তাই মা, নয়ন-বারি ফুরাল না তোর ;
স্বর্গ হর্তে গরীয়সী জন্মভূমি মোর,
এ স্বর্গে দেবতা কই ? দেখায়ে দে ত্বরা।

বল্ মোরে, কোন্ হেতু, সুপ্ত আজি তারা ?
অথবা, মগন কোনো তপস্থায় ঘোর ?
কবে ধ্যান ভাঙিবে গো,—নিশি হবে ভোর ?
কবে, মা, ঘুচিবে তোর নয়নের ধারা ?

অসুরে ঘিরেছে, হায়, কল্প-তরুবরে,
দেবতার কামধেনু দানবে দুহিছে !
আজি হতে অন্বেষি' ফিরিব ঘরে, ঘরে,
কোথা ইন্দ্র ?—ব'লে দেগো, কাঁদিসনে মিছে।

সে যে তোরে অস্থি দিয়ে গ'ড়ে দিবে অসি ;
অয়ি বঙ্গ ! অয়ি স্বর্গ ! অয়ি গরীয়সী !

আশার কথা

জননী গো—আজি ফিরে,—
জাগিতেছে তব সন্তান সব
গঙ্গার উভতীরে !
বাড়িতেছে তব কুটীরে,
ললিত বক্ষ-রুধিরে,
সন্তান কোটি কোটি গো,
দৃঢ় উন্নত শিরে !
আর নহে কেহ অসুখী,
জননীর ভার শিরে আপনার
তুলে নেছে নব-বাসুকি,
শত সহস্র শিরে !

উজ্জল হাসি আননে,
ক্ষোণী বাজিতেছে সিন্ধুর তীরে,
কর্করী বাজে কাননে ;
নব সংগীত গাহিছে,
নূতন তরণী বাহিছে,
পরান নূতন চাহিছে,
বিশ্ব-বিহারী নূতনে !
দখিনে গেছে অগস্ত্য,
পশ্চিমে গেছে ভার্গব, যেথা
সূর্য না জানে অস্ত !
গেছে রঘু প্রাগ্‌জ্যোতিষে,
বিশ্ব ছেয়েছে দলে, দলে, দলে,
ভিক্ষু, শ্রমণ, বোধীশে ;
দীপ্তি বহি' তিমিরে !

ধনপতি সে শ্রীমন্ত,—
সিংহল-জয়ী বিজয়সিংহ,
কীর্তি-কথা অনন্ত !
জ্ঞানে, বিজ্ঞানে সিদ্ধ,
বীর্যে—উদার, স্নিগ্ধ,
আচারে জগৎ মুগ্ধ,
সেবায় নহেকো ক্লান্ত ;
হেন সন্তান, আজ,
আইল কি পুনঃ আলয়ে তোমার,
ঘুচাইতে দুখ, লাজ ?
তোমারি মন্ত্র-ভাষা গো,
পূত, সুললিত, সংগীত জিনি'
অন্তর-পরকাশা গো ;
জাগিছে আজি সে ফিরে !

সপ্তসাগর তীরে,—
তোমার সপ্ত কোটি সন্তান
শত কোটি হবে ধীরে !
(মোরা) নৌকা ভরেছি পণ্যে,
(তুমি) আশিষ দূর্বা-ধান্যে,
জননী ! তোমারি পুণ্যে—
(মোরা) সকলি পাইব ফিরে।
নৌকা—ছুটেছে অধীরে !
সাত-ডিঙা ধন কোন্ প্রয়োজন ?
ঘিরিয়া ফেলিব মহীরে ;
অচিরে—কিংবা ধীরে।

দ্বিতীয় চন্দ্রমা

স্বপনে দেখিনু রাতে, হে ভারত-ভূমি,
সাগর-বেষ্টিতা অয়ি মর্ত্যের চন্দ্রমা
কুহকী নিদ্রার বশে সংজ্ঞাহীন আমি,—
শুনিনু মহিমা তব অয়ি বিশ্বরমা !

দেখিলাম, মহাকূর্ম সাগরের তলে,
বলিছেন মন্দ্রভাষে নাগদলে ডাকি',
"খুলে দে বন্ধন যত, শিরে ধর তুলে,
অপূর্ব এ ভূমি, আয় দেবলোকে রাখি !

পৃথিবীর গন্ধ নাই—নিষ্কাম ভারত !
ধর্মের ভবন চির ! দেবযোগ্য দেশ !
ধর্ম-বিভা পৃথিবীরে দিয়েছ নিয়ত,
এবে চন্দ্র সনে প্রভা বিতর অশেষ।"

সহসা দেখিনু, মুক্ত কপোতের মত
উঠিলে অম্বরে, তুমি দ্বিতীয় চন্দ্রমা !
চির জ্যোৎস্না হ'ল ধরা, চির আলোকিত ;
অতন্দ্র যুগল-চন্দ্র—অপূর্ব্ব সুষমা !

ধর্ম্মঘট

বাদলরাম হাল্‌ওয়াই—
গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান,
ধর্ম্মঘটের মস্ত চাঁই
দেখতেও ঠিক পালোয়ান।
মোটা রকম বুদ্ধিটা, তার
গলার স্বরও মধুর নয়,
কিন্তু যে কাজ কর্‌বে স্বীকার,—
কর্‌বে সে তা সুনিশ্চয়।
ছ' ছ' দিনের ধর্ম্মঘটে
বিকিয়েছে সর্বস্ব তার,
অন্ন মোটে আর না জোটে
তবুও কাজে যায়নি আর !
হোথায় যত সওদাগরে
কামড়ে মরে নিজের হাত,
হেথায় সে সগোষ্ঠী শুকায়
নাইক পয়সা, নাইক ভাত।
হপ্তা গেল ; পত্নী তাহার
দু'দিন আছে উপবাসে,
জুততে গাড়ী বলতে গয়ে,
শিক্ষা ভালই পেয়েছে সে।
শিশুটি তার কাণ্ড দেখে
কাঁদতে যেন গেছে ভুলে,

শান্তমুখী মেয়েটি আজ
ভয়ে ভয়ে নয়ন তুলে।
ছেলেমেয়ের কষ্টে সে যে
মোটেই ছিল নাকো সুখে,
স্পষ্ট সেটা লেখাই ছিল—
তার সে বিষম কাল মুখে;
তারই সঙ্গে লেখা ছিল
হৃদয়ের বল বিলক্ষণ,
বিকট ঘৃণা, বিষম জ্বালা,
সবার উপর—অটল পণ!
ধনীর ধনের উপরে যে
পরিশ্রমের আছে মান,—
যদিও এটা নাই সে জানে
নয় সে তবু ক্ষুদ্রপ্রাণ।
বাদলরাম! বাদলরাম!
গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান!
বাদলরাম! বাদলরাম!
দেখতে শুনতে পালোয়ান!
সূক্ষ্ম নহে বুদ্ধিটা তার,
কণ্ঠস্বরও মিষ্ট নয়;
কিন্তু যে কাজ কর্‍্বে স্বীকার,—
কর্‍্বে সে তা' সুনিশ্চয়।

পথে

আমার ধূলায়—এত ঘৃণা;—
আর তুই ধূলা মেখে, গাড়ী 'খান পথে দেখে,
ধরিলি আমারে এসে কিনা!

আশ্রয় লইলি মোর কোলে,
ওরে, তোর নাহি ভয়, ভয়ের এ ঠাঁই নয়,
ধূলা দেছ,—মারিব তা' ব'লে ?

শোন্ ওরে পথের বালক,
দূরে চলে গেছে গাড়ী, এই বেলা তাড়াতাড়ি
বাড়ী যা রে, থাকিতে আলোক।

চলে গেছে, যাক্—বাঁচা গেল ;
আশ্রয় দিলাম ওরে, সে মোর ধুতির 'পরে—
চিহ্ন এক রেখে গেল কাল !

সত্য কথা বলিতে কি ভাই,
ধূলা দেখে হ'ল রোষ ; কিন্তু তার—কিবা দোষ ?
পথই তার খেলিবার ঠাঁই।

দরিদ্রের শিশু সে যে হায়,
কোথায় আঙিনা তার নাচিবার—খেলিবার ?
পথে খেলে, ধূলা মাখি গায়।

বিশ্বগ্রাসী, ওগো, ধনিদল !
দরিদ্রের সকলি তো— করিয়াছ কবলিত,
পথ মাত্র আছিল সম্বল,—

ছেলেদের খেলিবার স্থান ;
তাও সহিল না আর, তাও কর অধিকার ?
গাড়ী, ঘোড়া, আনি নানা যান !

বিভীষিকা দেখায়ে এ সব—
ইচ্ছা কি দরিদ্র-দলে, পাঠাইতে রসাতলে ?
ধনহীন—নহে কি মানব ?

অবগুণ্ঠিতা ভিখারিণী

ওরে বধূ, গ্রাম্য-পথ-শোভা,
আজি কেন নগরীর মাঝে ?
কৃষকের গৃহলক্ষ্মী তুই,
বল্ আজি হেথা কোন্ কাজে ?
তুমি কি বিধবা নিরাশ্রয়া ?
স্বামীর স্মিরিতি, শিশুটিরে
বাঁচাইতে, ত্যজি' লজ্জা ভয়—
এসেছিস্ গ্রামের বাহিরে ?
অথবা এ কি রে অভাগিনী
কলঙ্কের নিশানা তোমার ?
ভেবেছিলে বালাই যাহারে,
সান্ত্বনা সে আজি নিরাশার।
কেন বাছা এনেছিস্ শিশুরে ভিক্ষায় ?
কাঁদে ছেলে,—নিয়ে যা',—নিয়ে যা' ;
জান না ? ভিক্ষায় তুমি এনেছ যাহারে,
পিতা তার নিখিলের রাজা !

অন্ধ শিশু

শীর্ণ দেহ, শুষ্ক তার মুখ,
দৃষ্টিহীন—শিশু এতটুক্ ;
জন্মেছে সে ভিখারীর ঘরে,
জীবন বহিছে অনাদরে।
পিতা মাতা কেহ নাই—কেহ নাই তার,
সে এখন অপরের সহায় ভিক্ষার।
অন্ধের দুখের নাহি শেষ,
গ্রীষ্মে শীতে একই তার বেশ,—

একই ভাবে সকাল-বিকাল,
পথে বসি' কাটায় সে কাল ;
কেহ বা দলিয়া যায়,—কেহ বলে 'আহা',
ব্যথিতের দুঃখ, হায়, কে বুঝিবে তাহা !
না জেনে সে বসিল ফিরিয়া,
পথ পানে পিছন করিয়া ;
না জেনে প্রাচীর-পাদমূলে,
হাতখানি পাতিল সে ভুলে !
নিষ্ঠুর নগরী ওরে, বিদ্রূপের ছলে,
মনে হয়, বিধি তোরে ভর্ৎসিলা কৌশলে !

বিকলাঙ্গী

নগরীর পথে, হায়,
কৌতুকের স্রোতে,
পাতিয়া বিশীর্ণ হাত—
প্রাতঃকাল হতে,
বসে আছে পথে !

মুখে নাহি বাণী, গা'য়
ছিন্ন বাসখানি,
বয়স চৌদ্দের বেশী
নহে অনুমানি,
কুব্জা অভাগিনী।

মুখ পানে তবু, কারো
চাহেনাকো কভু,
যৌবন যদিও আজি
দেহে তার প্রভু,—
চাহেনাকো তবু !

সরম-সংকোচে, তার
সর্ব দোষ ঘোচে ;
কুব্জারে ঘিরিয়া, ফুল—
ফোটে গোছে গোছে !
সরমে—সংকোচে।

'কুস্থানাদপি'

স্বাগত, স্বাগত, বারাঙ্গনা
তুমি কর ভাব-উপদেশ ;
সোনা সে সকল ঠাঁই সোনা,
যাই হ'ক পাত্র, কাল, দেশ।
পীড়া পেলে পথের কুকুর,
হও তুমি কাঁদিয়া বিব্রত ;—
ব্যথা তার করিবারে দূর,
প্রাণ ঢেলে সেবিছ নিয়ত !
উঠিছে সে শ্বসিয়া, শ্বসিয়া,
ঊর্ধ্বমুখ উদ্গত নয়ন ;
শ্বসিয়া—ধ্বসিয়া পড়ে হিয়া—
তোমারো যে তাহারি মতন।
হাসে লোক কান্না তোর দেখে,
ক্ষুণ্ণ-দৃষ্টি—উত্তর তাহার !
এত দিন কিসে ছিল ঢেকে—
এ হৃদয়—উৎস মমতার ?
দেখি তোর ভাব আজিকার—
আনন্দাশ্রু এল চক্ষু ভরে,
তুমি—খ্রীষ্ট-অবতার,—
দিনেকের—ক্ষণেকের তরে !

বন্যায়

বন্যায় গিয়েছে দেশ ভেসে।
বনস্পতি,—পাখীদলে, নিশীথে, জাগায়ে বলে ;—
"প্রাণ বাঁচা—পালা অন্য দেশে।

রক্ষা নাই আমার এবার,
এবার আসিলে হানা, আর আমি টিকিব না,
দেরি তোরা করিস্‌নে আর।"

দেখিতে দেখিতে এল হানা,
বনস্পতি,—গঙ্গাজলে, ছিন্নমূল,—ভেসে চলে,
তবু তারে পাখীরা ছাড়ে না।

"এখনো যা" বলে বনস্পতি ;
পাখী বলে, "পুণ্য ম'লে— ভেসেছি গঙ্গার জলে" ;
সুজনের এই তো পিরিতি।

দেবীর সিন্দূর

সারা রাত, আহতের মত,
শোকাহত আচার্য ভাস্কর,—
নিদ্রাগত—শয্যা বিলুণ্ঠিত,
তবু ব্যথা জাগে নিরন্তর।

অকস্মাৎ আসিল চেতন,
বক্ষ হতে নামেনি বেদনা ;
শ্বাস যেন পূর্বের মতন
সহজে করে না আনাগোনা।

"আজি দেশে দেবী-মহোৎসব,
ঘরে ঘরে বাদ্য বাজে নানা ;
সধবারা সাজিতেছে সব,
বিধবা লীলার তাহে মানা।

আছে লীলা বীজাঙ্ক চর্চায়,
মন যেন শান্তির নিবাস ;
সে ধৈর্য জানি না কেন, হায়,
মোর মনে জাগায় তরাস।

মূর্তিমতী শান্তি, মা আমার,
কোনো কথা নাহি তার মুখে ;
তবু, তার মুখ-চাওয়া ভার,
শেল সম বাজে মোর বুকে।

লীলাবতী—সন্ন্যাসিনী বেশে—
করিতেছে দীর্ঘ উপবাস ;
পিতা আমি, দেখিতেছি ব'সে,
চোখের উপরে বারমাস !

ডাকি লহ মোরে যমরাজ !
ডাকি লহ কন্যা পতিহীনা ;
পিতা হয়ে করিতেছি আজ,
সন্তানের মরণ কামনা !

আজি দেশে দেবী-মহোৎসব,
এ উৎসব সকল হিন্দুর ;
সধবারা, চলিয়াছে সব,
পরিবারে দেবীর সিন্দূর ;

ব্রাহ্মণী! এদিকে এস, শোন,
এখনি করিয়া দাও দূর—
মূর্খ—যত দেবল ব্রাহ্মণ,
পরো নাকো দেবীর সিন্দূর।"

শিশুর স্বপ্নাশ্রু

দোলায় শুয়ে ঘুমায় শিশু মায়ের কোলের মত,
মায়ের নয়ন নিয়েছে আজ জাগরণের ব্রত!
পল-বিপলে, সকাল-সাঁঝে, পাঁচটি মাসের স্নেহ,
হৃদয়টি তার ছাপিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে দেছে গেহ।
হায় কিশোরী! নূতন খেলা—মানুষ-পুতুল নিয়ে,
প্রদীপ করে, পলক-হারা, তাই কি আছিস চেয়ে?
ঘুমায় শিশু, পল্লী ঘুমায়, ঘুমে জগৎ ছায়,
কাজল-কাল চোখের কোণে ঈষৎ হাসি ভায়!
হঠাৎ, কেন চোখ দু'টি তার ছলছলিয়ে আসে,
ঘুমের ঘোরে, শিশুর চোখে, কোন্ দুখে জল ভাসে?
ঝিনুক-বাটির ঝনঝনা কি নিদ্রা-ঘোরে ও শোনে?
তাই কি কাঁপে ঠোঁট দু'টি তার—অশ্রু চোখের কোণে?
ভয় যে আজো শেখেনিকো মান-অপমান নাই,—
কি বেদনায়, ঘুমের ঘোরে, তার চোখে জল ভাই?
শিশুর স্বপন—তাও কি নহে সুখের ভগবান?
বিভীষিকার বিষম ছায়া তাতেও বিরাজমান?

অধ্রুব

খটের ধারে, বাতাসে দুলদুল,
দেখেছিলাম একটি ছোট ফুল;—
রবির আলোয় আহ্লাদে আকুল।

চটুল চোখে তারার মত চায় ;
হাত-লোভানো মন-ভুলানো তায়,
খটের ধারে ছুটেছিলাম, হায়।

কত চড়াই, কত না উত্‌রাই,
তবুও তার নাগাল নাহি পাই,
ছিন্ন আঙুল, আকুল চোখে চাই ;

এই সে দেখি, যায় না দেখা আর,—
ওই সে পুনঃ, এম্‌নি বারে বার,
এম্‌নি ক'রে কাছে গেলাম তার।

খাড়া পাহাড়,—ফাটলে তার ফুল,
শিলার ফাঁকে বাধিয়ে দে' আঙুল,—
বাড়াই বাহু—আবেগ সমাকুল।

হঠাৎ—বায়ু বইল ঝুরুঝুরু,
হৃদয়তলে বিষম গুরুগুরু,
নিখিল যেন দুল্‌ছে দুরুদুরু!

গাছ দেখিনে, শুধু গাছের মূল,—
সাপের মত ঝুলিয়ে দে লাঙ্গুল—
গিরির গায়ে ঘুমেই ঢুলুঢুল্।

শুইয়া পড়ি—ঝুঁকিয়া পড়ি ধীরে,
পাইনে নাগাল,—রক্ত নামে শিরে,
নিম্নে তিমির, শিলায় দেহ চিরে।

এবার বুঝি ঠেক্‌ল রে আঙুল!
হঠাৎ—একি!—পড়্‌ল খ'সে ফুল,—
খটের তলে, বাতাসে দুলদুল!

দুর্দিনে অতিথি

সে দিন হঠাৎ বর্ষা পেয়ে,
কামিনী ফুল ফুটল বনে ;
আমি তাহার একটি গুচ্ছ
তুলে নিলাম পুলক মনে।

ঘরে এসেই দোয়াত হতে,
লুকিয়ে, ফেলে দিলাম কালি,
দোয়াতের সে ফুলদানাতে
ফুলটি রেখে দেখছি খালি ;

জোর বাতাসে, হঠাৎ, ঘরে
ঢুকল সে এক প্রজাপতি ;
রইল রে সে সারাটি দিন,
একলা ঘরের হয়ে সাথী।

অতিথ হ'ল আমার ঘরে,
প্রজাপতি আপন হতেই ;
ঝড়-বাদলে, ছাড়তে তারে,
পারব না তো কোন মতেই।

কবাট দিলাম বন্ধ করে,
জানলা দিয়ে দিলাম তাই ;
সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জেলে
ভাবছি বসে কত কথাই।

হঠাৎ, উড়ে, আলোয় প'ড়ে,
প্রজাপতির জীবন গেল ;—
হায়, অতিথি ! নয়ন-জলে,
নয়ন আমার ভ'রে এল।

দুর্দিনের সেই অতিথি রে,
হায়, সুদিনের সুপ্রভাতে,—
আমার স্নেহ—পাথেয় দিয়ে,
পেলাম নারে আর পাঠাতে।
আবার আমি তেম্‌নি করে,
অনল-দগ্ধ দেহটি তার,
রেখে দিলাম ফুলের 'পরে ;
এঁকে নিলাম বুকে আমার।

স্খলিত পল্লব

আহ্লাদে বনানী সাজে মুকুলে পল্লবে,
বসন্তের সারঙ্গের রবে!
নিবিড় শীতল ছায়,
রাখালেরা ঘুম যায়,
পাখী গায় মৃদু কলরবে ;
গাছে গাছে কিশলয়,
নূতনের গাহে জয়,
মৃত্যু জরা পাশরিয়া সবে।

অকস্মাৎ ক্ষুণ্ণ করি পল্লবের হৃদ,
ক্ষুণ্ণ করি বসন্ত-সম্পদ,
স্তব্ধ করি কলরব,
পল্লবের জীর্ণ শব
লভিল রে নির্বাণের পদ!
কে জানিত শোভা মাঝে,
মরণের পাংশু সাজে,
একজন পার হয় মরণের নদ ?
কাহারো হ'ল না, ক্ষতি, গেল সে লুকায়ে,
নিভৃতে বৃন্তটি শুধু উঠিল শুকায়ে!

গোলাপ

পলে, পলে,—আলোকে, পুলকে,
ভরি' উঠে গোলাপ উষায় ;
স্ফুরিত পাপড়ি, দিকে, দিকে,
কচি ঠোঁটে কি বলিতে চায় ?
রৌদ্রের সাগ্রহ আলিঙ্গনে,
বায়ুর চুম্বনে, উষ্ণ শ্বাসে,—
গন্ধ-ধারা স্বজিয়া কাননে,
কৌতুকী সে—হাসে, শুধু হাসে !

অলি আসে—মধু লয়ে যায়,
থাকে না সে কাজ সাঙ্গ হ'লে,
গোলাপ সে মু'খানি ফিরায়,
শ্রান্তি-ভরে বৃন্তে পড়ে ঢ'লে।
রক্তমুখী সন্ধ্যার গোলাপ,
ভাবে বুঝি লাবণ্য বাড়িছে ;
বিষ ঢালে দিনান্তের তাপ,
আর জীবনের আশা মিছে।

নিশি আসে, শিশির নিষেকে—
শক্তি আর ফিরে নাকো তার,
শেষ গন্ধ ক্ষরে থেকে থেকে,
শেষ মধু,—নাহি নাহি আর।
তারপর নিশান্ত বাতাসে,
দলগুলি ঝরি পড়ে, হায়,
আলোকের তীব্র পরিহাসে,
ধূলি মাঝে গোলাপ লুটায় !

কুলাচার

বর এল স্থতি-ধুতি-পরা,
গৃহে উঠে হাসির ফোয়ারা ;
'শুনেছি বনেদী লোক,
তাদেরো কি ছোট চোথ—
চেলী কভু দেখেনি কি তারা ?'
গৃহে উঠে হাসির ফোয়ারা।

বাক্যপটু জেঠা মহাশয়,—
বরপক্ষে সম্বোধিয়া, কয়,
"স্থতি-ধুতি ব্যবহার
এও নাকি কুলাচার ?
এমন তো দেখিনি কোথায় !"
হাসি' কয় জেঠা মহাশয়।

বরের সে পিতামহ শুনি,
(বর্ষীয়ান্ নিষ্ঠাবান্ তিনি)
কহেন, "বাপু হে শোন,
কাহিনী অতি পুরানো,
পিতৃমুখে শুনেছি এমনি,
এসেছিল বৃদ্ধ এক মুনি ;

এসেছিল সন্ন্যাসী প্রবীণ
বহুকাল আগে একদিন ;
সেদিন মোদের গৃহে,
বিবাহের সমারোহে,
দীর্ঘ জটা, কম্বল মলিন,
এসেছিল সন্ন্যাসী প্রবীণ ;

দেহ গড়—উন্নত শিখর,
দন্ত শ্বেত, হাস্য মনোহর,
দগ্ধ প্রায় 'ধুনী' যেন
দীপ্তিমান্ দু'নয়ন,
দ্রুত পশে সভার ভিতর ;
স্তম্ভিত সকলে যোড়কর।

কহিলা কাঁপায়ে সভাতল,
'শুভকাজে—এ কি অমঙ্গল ?
বিধান দিতেছি আমি,
কথা শোন গৃহস্বামী ;—
পুরোহিত ! কি ছ্যাখো, অবাক্ !
দক্ষিণায় বসাব না ভাগ।

চীনবাস পোড়াও সকল,
কার্পাস পরাও নিরমল,
ধনী পাদপের দান,
কন্যা-বরে শোভমান ;
বৃথা শিরে ল'য়ো না এ পাপ,
ভ্রূণ-জীব হত্যার সন্তাপ।'

মৌন সবে যেন মন্ত্রবলে,
চীনবাস পোড়ায় অনলে ;
নিষ্পাপ কার্পাস বাস,
পুষ্পসম পুণ্য হাস,
কন্যা-বরে করিল প্রদান
অন্তর্ধান সন্ন্যাসী মহান্

সেই হতে বংশের গৌরব,
সেই হতে সম্পদ বিভব,
সে অবধি এ বিধান—
কুলাচারে অধিষ্ঠান,
সে অবধি সব সুলক্ষণ,
পাপ প্রথা করিয়া বর্জন।”

চমৎকৃত সভামাঝে সবে—
সন্ন্যাসীর পুণ্যের প্রভাবে,
কন্যাপক্ষ তাড়াতাড়ি,
কন্যার রেশমী শাড়ী
ছাড়াইয়া, কার্পাসে সাজায়!
নবোৎসাহে নৌবৎ বাজায়!

তিলক দান

স্নান সারি সকাল সকাল,
মিঠায়ে ভরিয়া ছোট থাল,
আপনি চন্দন ঘষি,
চারি বছরের ‘উষী’
ফোঁটা দিল, হাসি এক গাল।

দিদি এল পিঠে ভিজে চুল,
উষা-স্নানে শীতল আঙুল,
স্নেহের গৌরবে তার,
মুখে শ্রী ধরে না আর,
মা বলিয়া মনে হয় ভুল

কার্তিকের প্রভাত বাতাস
এখনো ছাড়িছে হিম-শ্বাস,
চন্দন-পরশ, শিরে,
জাগায় সে ফিরে, ফিরে,
জাগায় সে স্নেহের আভাস !

আছি মোরা দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
পূর্ণ পথ—ছোট বড় ভায়ে ;
—আকুল তৃষিত চোখে,
মলিন—বয়সে শোকে,
মুখপানে কে গেল তাকায়ে ?

জড়সড়—শীতে করি স্নান,
পরিধান—ধুতি পিরিহান,
শুভ্রকেশ—যত্নহীন,—
কোথা যাও হে প্রাচীন ?
তুমিও কি মোদেরি সমান ?

বর্ষীয়সী ভগিনীর গৃহে,
চলেছ কি স্নেহের আগ্রহে ?
অথবা, অভ্যাস বশে,
অতীত মৃতের দেশে,
খুঁজিয়া ফিরিছ সেই স্নেহে ?

এস, এস, মোদের পুলক—
পুনঃ তোমা করিবে বালক।
ক্ষুধিত ললাটে তব,
মোরা দিব—মোরা দিব ;
স্নেহদান—চন্দন-তিলক।

শিশুর আশ্রয়

ননীর গড়ন শিশুটি ;
মা তাহার এক বেনিয়ার দাসী,
দিনে রাতে কাজ—নাই ছুটি।

শিশু—কাছে কাছে থাকে,
জল ঘাঁটে, কাদা মাখে,
ছুটে আসে শুনে মা'র স্বর ;
কবে অবসর হবে,
কবে তারে কোলে নেবে,
পাবে ছেলে মায়ের আদর।

টলে টলে চলে যায়,
মা'র মুখপানে চায়,
টলে টলে কাছে আসে ফের ;
কাজে যেন ব্যস্ত কত,
হাত নাড়ে মা'র মত,
গিয়ে তার কাছেতে মুখের।

মা তার উঠিবে যেই,
ছেলের আঙুল সেই,—
চোখে লাগে, দেখে অন্ধকার ;
অমনি শিশুর পিঠে,
পড়ে চড় দু'চারিটে,
কাঁদে শিশু করি হাহাকার।

ভয়ে ধেয়ে মা'রই কাছে গেল সে পাগল !
মার খেয়ে—আগেভাগে পেলে শিশু কোল।

হাসি-চেনা

ওরে দিদি, দেখি, দেখি—একবার আয়,
ওই দুষ্ট হাসি যেন দেখেছি কোথায়!
যে বুড়া হয়েছি আমি ভাই,
সব কথা ভুলে ভুলে যাই।
ওই যে চতুর হাসি সরল প্রাণের,
ও যেন রে করতব মধুর গানের ;
হয়েছে,—ও হাসিটুকু, ভাই,
যার ছিল, সে-ও আর নাই।

থাকিলে কি হ'ত বলা নয়কো সহজ,
তোতে আর তাতে গোল বাধিতই রোজ ;
আর মনে তার ঠাঁই নাই,—
সেটুকু তোদেরি দিছি ভাই।
অতীতের তরে শোক ?—আমার তো নাই ;
যারা গেছে, আমি দেখি, তোরাও তারাই!
ভুল হয়ে যায় সব ভাই,
বুড়া আমি—তাই ভুলে যাই!

কচি হয়ে ফিরে আসে আমাদেরি মুখ,
আমাদের যৌবনের যত ভুলচুক,
চলা ফেরা, সব—চেনা, ভাই,
চেয়ে, চেয়ে, দেখি শুধু তাই।
যারা গেছে—কোথা হতে তাদের সে হাসি—
প্রত্যহ নূতন মুখে ফুটে রাশি রাশি!
কৌতুকে রয়েছি ভাল, ভাই,
ছাখ—আর বুড়া আমি নাই!

বর্ষীয়ান্

নগরীর সংকীর্ণ গলিতে—
পরিচ্ছন্ন পুরানে কুটীর ;
একদিন সে পথে চলিতে
কুটীরেতে দেখিনু স্থবির
আপন বলিতে, এ জগতে,
কেহ আর নাহি সে বুড়ার,
তাই, যারে পথে দেখে যেতে,
ডেকে বলে, যত কথা তার।

'টোটা'র বারতা শুনি যবে,
দেশে দেশে অসংখ্য সিপাহী,
কলহ করিয়া কলরবে,
দলে, দলে, হইল বিদ্রোহী ;—
অরাজক, হত্যা, অত্যাচার,
লুট্‌পাট, বীভৎস ব্যাপার ;
সেই কালে বহু 'রোজগার'
ঘটেছিল অদৃষ্টে বুড়ার।

দিন কত খুব ধূমধামে—
কাটে কাল, আমোদে হেলায়,
অট্টহাসি যেথায় ত্রিযামে,
সেথা হতে কমলা পলায়।
তারপর ব্যবসা জুয়ায়,
সম্পত্তি বিস্তর গেল তার ;
মরে গেল পুত্র দু'টি হায়,
পত্নী গেল—ঘুচিল সংসার।

মেঘের বারতা

নীল-মেঘপুঞ্জ হতে শৈত্যের বারতা
আসিছে, তাপার্ত, ক্লিষ্ট ধরণীর 'পরে ;
আচম্বিতে জলে, স্থলে, কাননে, অম্বরে,
বর্ষণে ধ্বনিয়া উঠে চর্চরিকা গাথা !

কাঁপে তরু, পুলকে আপ্লুত পুষ্পলতা ;
বৃষ্টি-ধারা উঠে নাচি বায়ুর প্রহারে,
বাতাহত—বর্ষাহত—শ্যাম সরোবরে
সু-যৌবনা শ্যামাঙ্গীর লাবণ্য-গৌরতা !

কালোতে বিকাশে আলো, মৃণালে কমল,
শ্যাম পত্রপুটে ফুটে সোনার মঞ্জরী,
তীর-বনচ্ছায়া-নীল, শ্যামল, কোমল,
বৃষ্টিপাতে—সরসীর বিকাশে মাধুরী।

নীল মেঘ হতে আসে শান্তির বারতা,
ধরায় লাবণ্য আনে অমরার কথা !

অপূর্ব্ব সৃষ্টি

স্বধর্মে স্থাপিলা যবে সৃষ্টিরে বিধাতা,
(প্রতাপে তপনে যথা,) অদৃষ্ট আসিয়া
নিভৃতে মদনে ডাকি কহিল বারতা ;
বাহিরিল চুপে চুপে দু'জনে হাসিয়া।

কুহেলি সৃজিয়া তারা মাথায় তপনে,
তপন হিমাংশু হ'ল ; হেথা পুনরায়
নৈশ মেঘে চন্দ্র-ধনু রচিল গোপনে ;
কেবা সূর্য—চন্দ্র কেবা—চেনা হ'ল দায় !

শুধু তাই নয়, রৌদ্র সৃজিয়া শশীর,
পূর্ণিমার শুক্ল মেঘে করিল স্থাপন ;
বিরহে মিশায়ে দিল স্মৃতি পিরিতির,
মিলনে কল্পিত ভেদ করিল রোপণ !

শাপ দিলা অন্তর্যামী অদৃষ্ট-মদনে,
'প্রভু হয়ে হবে দাস মানব-সদনে।'

'বাতাসী-মা'র দেশ

তুলোর মতন পাথার ভরে,
কোন্ ফুলের বীজ উড়েছে ?
কোন্ দেশেতে জনম লভি'
কোন্ বিজন গাঁয় ছুটেছে ?

ছেলেরা যেই ধরতে ধায়,
অমনি উঠে হাওয়ায় হায়,
কেউ বলে সে চাঁদের সুতো
জ্যোৎস্না-স্রোতেই লুটেছে !

কেউ বলে ও 'বাতাসী-মা'র ;—
কোন্ বিজন গাঁয় ছুটেছে।

সবাই মিলে উঠলো ব'লে শেষ,
আমরা যাব 'বাতাসী-মা'র দেশ !

যেদেশে লোক স্বপন ভরে,
বাতাসে বীজ বপন করে,
বাতাসে হয় সোনা-ফসল,
সোনার চেয়ে দেখতে বেশ !

আজকে মোরা সেই দেশেতে যাব,
আজকে যাব 'বাতাসী-মা'র দেশ !

তুলোর মতন লঘু পাখায়
বায়ু ভরে বীজ উড়ে যায়,
হাওয়ার মাঝে বপন, রোপণ,
হাওয়ার মাঝে ফসল শেষ !

আজকে মোরা সেই দেশেতে যাব,
আজ যাব রে 'বাতাসী-মা'র দেশ !

জীর্ণ পর্ণ

সূর্যের কিরণ করি আড়,
দিব্য এক টগরের ঝাড় ;
আকাশে বাড়িয়া উঠে বেলা,
ছেলেরা ছাড়েনা তবু খেলা,
বুড়াদের ভাঙেনাকো জাড় ।

পথে যেতে পড়ে গেল চোখে,
টগরের পল্লবের ফাঁকে,
কি এক সামগ্রী মনোলোভা,—
বিম্ব ফল জিনি তার শোভা,—
রক্ত যেন অপ্সরার স্বর্ণ অলক্তকে !

কাছে গিয়ে, দেখিনু যা শেষে,
কৌতুকে একাই উঠি হেসে ;
সে নহে অমৃত-ফল, হায়,
জীর্ণ পাতা, রৌদ্রে স্বচ্ছ প্রায়,
জীর্ণ তবু পূর্ণ যেন রসে !

তার কাছে সরস পল্লব,
কান্তিহীন, দীপ্তিহীন, সব ;

এ জীর্ণ পল্লব মাঝে, আজ,
সুস্থ, পুষ্ট, পত্রে দিয়া লাজ,—
বিকশিত সবিতার কিরণ-গৌরব !

অক্ষয়-বট

জন্ম তব সত্যযুগে হে, অক্ষয়-বট,
শাস্ত্রে কহে, সত্য কি ? কহ তা' মোরে তুমি
বড় সাধ মনে, যেতে তোমার নিকট,
ধন্য সে, চক্ষে যে হেরে তব পীঠ-ভূমি।

ভাসিলা কি নারায়ণ তোমারি পল্লবে ?
পিণ্ড দিলা সীতাদেবী তোমারি সাক্ষাতে ?
সিদ্ধার্থ দেখিলা তোমা'—আর ভিক্ষু সবে ?
বিক্রম বেতালে লভে—সে কি ও শাখাতে ?

বল মোরে বিবরিয়া ছদ্মবেশ রাখি'
পূর্ব কথা,—সর্বতাপ যে কথা ভুলায় ;
ভূত সাক্ষী তুমি শাখী ; কতই না পাখী
যুগে যুগে শাখে তব বেঁধেছে কুলায় !

সময়-সাগর-জলে মগ্ন অতীতের
তুমি মাত্র চিহ্ন শাখী, পূর্ব ভারতের।

শিশুহীন পুরী

সলিল-আলয়ে রাঙা শিখা লয়ে
আজিও রয়েছে কমল-কলি ;
এ হেন শিশিরে হায়, কার তরে,
জলে উঠে নিতি অনল জ্বলি !

তাম্বুল রসে রাঙায়ে রসনা
সোনামুখী বন-জবার হাসি—
ফুটিল আবার বনে বনে ওই,
আজ কে দেখিবে তাদের আসি ?

কলায়ের শুঁটে প্রজাপতি ফুটে,—
প্রজাপতি লুটে বেড়ায় খালি ;
নারিকেল শিরে বেজে ওঠে ধীরে
শত জোড়া ছোট হাতের তালি !

কাঠ-বিড়ালেরা মুখে মুখে করে
ঘুর্‌নি ঘোরার হরষ-ধ্বনি ;
কাছিমেরা দেয় রোদে গা-ভাসান্,
শালিকেরা ফেরে ফড়িং চুনি'।

লাল নীল ক্ষুদে জাড়ে আঁখি মুদে
হয়ে যায় হায় শুকায়ে সাদা,
ঘাটের ফাটলে লুটায় চামর,
রাশি রাশি ফুটে সোনার গাঁদা।

বনের কুসুমে আদর করিতে
নাহি কেহ, নাহি শিশুর হাসি ;
বনে, ফুলে, ফলে, ছায়া-তরু-তলে,
শুধু বিফলতা বেড়ায় ভাসি।

বিজন এ পুরী শিশুর অভাবে
কে যেন জীবন লয়েছে কাড়ি,
হরষ বিথার নাহি যেন আর,
পুলক-দেবতা গিয়াছে ছাড়ি !

পথহারা

আকাশ পানে চেয়েছিলাম, ছিলাম করজোড়ে,
একটা কিছু মনের মাঝে তুলেছিলাম গ'ড়ে ;
আকাশ পানে চেয়েছিলাম,
স্বাতীর জলে নেয়েছিলাম !
হর্ষে ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল ধূলা এসে,
ছায়াপথটি হারিয়ে গেল,—অশ্রুজলে ভেসে।

দেখি,—প্রথম পারিনি তো চাইতে কোনোমতে,—
ছায়াপথটি হারিয়ে গেছে সাদা মেঘের স্রোতে ;
আকুল হয়ে দিক্ ভুলেছি,
বুকের মাঝে গোল তুলেছি,
কে—ছায়াপথ চিনিয়ে দেবে, ছিনিয়ে ছায়া হতে ?
পরান-পাখী—ফিরবে কিরে মেঘের রচা পথে ?

কে জ্যোতি-পথ দেখাবে হায়, দিব্য-রথে ল'য়ে ?
ভেসে যাবে মেঘের ফেনা কোন্ সে বাতাস ব'য়ে ?
নীরব নিশি, ভাবছি একা,—
আজও কারো নাইকো দেখা,
পরান-পাখী ফিরবে নাকি তারার রচা পথে ?
তোলাপাড়া এই শুধু, হায়, সে দিন সন্ধ্যা হতে।

নাভাজীর স্বপ্ন

'ডোম' বলি, ফিরাইয়া মুখ, চলে গেল পূজারী ব্রাহ্মণ,
নাভাজী নমিতেছিল গোবিন্দে তখন ;
দু'টি ফোঁটা অশ্রুজলে, মন্দির সোপান,
সিক্ত হ'ল ; সে দিন সে আর, পথে যেতে গাহিল না গান।

কাটা বেত, চেরা—কাঁচা বাঁশ, কুটীর দুয়ারে স্তূপাকার,—
অন্যদিন পরিতৃপ্ত হ'ত গন্ধে যার,
আজ তারে কোনো মতে পারিল না আর
বাঁধিবারে ; দেখিল না চেয়ে আপন হাতের দ্রব্য-ভার।

কুটীরের রুদ্ধ করি দ্বার, ভূমিতলে রচিল শয়ান,
রাঁধিল না, খাইল না, করিল না স্নান ;
ধীরে—তন্দ্রা এল চোখে, মগ্ন হ'ল মন ;
দেখিল সে অপূর্ব স্বপন,—ইষ্টদেব শিয়রে আপন !

"হে নাভাজী ! ক্ষুণ্ণ কেন মন ?" জিজ্ঞাসিলা গোবিন্দ তখন,
"কর বৎস হরিদাস কবীরে স্মরণ,
সে সব ভক্তের কথা করহ প্রচার,
ব্রাহ্মণের দর্প হবে দূর,—ঘৃণা কা'রে করিবে না আর।"

'রম্যাণি বীক্ষ্য'

ফাগুন নিশি, গগন-ভরা তারা,
তারার বনে নয়ন দিশাহারা ;
কে জানে আজ কোন্ স্বপনে
উঠেছে চাঁদ আন্ গগনে,
তারার গায়ে চাঁদের হাওয়া লেগেছে !
পেয়েছে সব চাঁদের যেন ধারা !
আন্ গগনের চাঁদ,
যেন হেথায় পাতে ফাঁদ ;
আর নিশীথের আলো—
আজ হেথায় কিসে এল ?
আরেক সাঁঝের গান,
ফিরে জাগায় যেন তান ;

তারার বনে পরান হ'ল সারা !
এ যেন নয় গান,
এ যেন নয় আলো,
তবু দোলায় কেন প্রাণ,
তবু কেমন লাগে ভাল,—
মন যে মগন তাতে,
ফাগুন-মধু-রাতে,
মন চিনেছে আকাশ-ভরা তারা,—
পেয়েছে আজ চাঁদের যারা ধারা !
বিচিত্র ওই আকাশ
দেয় নূতন কত আভাস,
উষার আলো বাতাস—
যেন, শেফালিকার সুবাস—
যেন, তারার বনে লেগেছে,
চোখে আমার জেগেছে ;—
মুক্ত রে আজ মর্ত্য-ভুবন-কারা !
তারার বনে মন হয়েছে হারা !

সন্ধ্যা-তারা

(কীর্ত্তনের সুর)

অয়ি মৃদুলোজ্জ্বল তারাটি,
মম জীবন-সন্ধ্যা-গগনে ;
অয়ি দিব্য-কিরণ-ধারাটি,
কত শান্তি বিতর ভুবনে।
যবে নিদাঘ-সমীর-নিশাসে—
মম হৃদয় শুকায় নিরাশে,

তুমি অমনি আসিয়া,
যাতনা জুড়াও—
শান্ত শীতল কিরণে ;—
মম জীবনে—সন্ধ্যা-গগনে !
যবে ধূলায় ধূলায় মিলিয়া,
ঘন আঁধার আসে গো ঘিরিয়া,
আসি আকুল পরানে
তোমারে দেখিতে
নীলিম নিথর গগনে,
মম জীবনে—সন্ধ্যা-গগনে !
তুমি নিরাশার মেঘে ডুবো না,
তুমি প্রলয়ের ঝড়ে নিবো না,
শুধু অমনি আসিয়া,
হাসিয়া, হাসিয়া,
অমিয় ঢালিয়ো পরানে ;—
মম জীবন-সন্ধ্যা-গগনে !

অমৃতকণ্ঠ

শুনেছি, শুনেছি কণ্ঠ তব,
পুনঃ আজি বহুদিন পরে,
প্রাণে মনে জেগেছে উৎসব,
রোমাঞ্চ সকল কলেবরে !
উৎকর্ণ, উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি, আবার শুনিতে ওই স্বরে !
নিশান্তের শুকতারা সম
পরিপূর্ণ লাবণ্যের রসে,
সংগীত তোমার, নিরুপম !
হর্ষ-ধারা অন্তরে বরষে ;
দিবসে কোথায় ডুবে যায়, অতি ক্ষীণ, অতি মৃদু যে সে ।

পূর্ণ, পুষ্ট মন্দার মুকুল,—
নন্দনের লতাচ্যুত হয়ে,
তোমার ও সংগীতে আকুল,—
অঙ্গে মোর পড়িল লুটায়ে,
প্রথম পাপড়ি যে সময়ে, এলায়ে পড়িবে মধুবায়ে।

ও সংগীত আঙুরের ফল,
মুদ্রিকায় রসের ব্যথায়,
অধরের পীড়নে কোমল
ফেটে পড়ে, একটি কথায়;
বিন্দু—দুই, স্নিগ্ধ, সুমধুর রস দিয়া—মিলায় কোথায়।

বর্ষণান্তে মুক্তাফল সম,—
পল্লবাগ্রে যাহা শোভা পায়,—
সন্ধ্যাস্বর্ণ,—যাহে অনুপম
সপ্ত বর্ণে—লীলায় সাজায়,—
সে যেন গো তোমার সংগীতে, লয় দিয়া সলিলে মিলায়!

স্বাতী হতে ঝরি যে শিশির
মহামণি হয় সিন্ধুতলে,
তুলনা সে—আজি এ নিশির
অন্ধকারে যে সুর উথলে;
আনন্দ-চঞ্চল করি মোরে, আকুল করিয়া তারাদলে।

জননীর চুম্বনের মত
ও সু-স্বর, পবিত্র, কোমল,—
মন্ত্রপূত আশীর্বাণী-যুত,
হর্ষ-স্নিগ্ধ যেন শান্তিজল;
সদ্য-ঝরা শেফালি পরশে, হ'ল যেন শরীর শীতল!

নক্ষত্র জানিত যদি গান,
ভাবিতাম গাহিতেছে তার
বাণীর বীণার মধু-তান!

অমরার—অমৃতের ধারা !
তারার পরশ বুঝি পাও,—তাই গাও হয়ে আত্মহারা !

আঁখি কভু দেখেনি তোমায়,
হে অনন্ত-আকাশ-বিহারী !
ফেরো তুমি তারায়, তারায়,—
নক্ষত্রের কূলে কূলে, মরি,
পক্ষ্ম যেন আঁখির পলকে,—আঁখির পলকে যাও সরি'

বড় সাধ, শিশুকাল হতে,
হে সুকণ্ঠ ! চিনিতে তোমায় ;
পাইনি সন্ধান কোনো মতে,
পাইনি তোমার পরিচয় ;
কত জনে সুধায়েছি নাম,—বলিতে পারে না কেহ, হায় !

সুধায়েছি কবিজন পাশে,
সুধায়েছি কৃষক-বধূরে ;
কেহ শুনি অন্তরালে হাসে,
কেহ হায় চ'লে যায় দূরে ;
কোন্ দেশে জনম তোমার ? কিবা নাম—কে বলিবে মোরে ?

নাম তব থাকে, নাহি থাকে,
ডাকিব 'অমৃতকণ্ঠ' ব'লে ;
ভালবেসে যে-যা ব'লে ডাকে,
তাহাতেই পরান উথলে ;
হে অমৃতকণ্ঠ ! পাখী মোর, তোর গানে চক্ষু ভরে জলে।

গান—তব শোনে বহু জনে,
না থাকে বা থাকে পরিচয় ;
শুনেছি হে, ওই গান শুনে,
গর্ভশায়ী শিশু স্তব্ধ রয় ;
যতদিন নাহি এস ফিরে, ততদিন ভূমিষ্ঠ না হয়।

গাও, তবে, গাও হে আবার,
হর্ষ-শিশু লভিবে জনম !
সুধাপায়ী ! চন্দ্রিকা উদ্গার
কর পুনঃ স্নিগ্ধ মনোরম ;
কোকিল পাপিয়া চাতকেরা স্তব্ধ হ'ল, গাও নিরুপম ।

যাহা কিছু মনোজ্ঞ-মধুর,
যাহা কিছু পবিত্র-সুন্দর,
যত আছে ঈপ্সিত-সুদূর,
—চির-মুগ্ধ আমার অন্তর—
বলে, পাখী শীর্ষে সবাকার—হরষ-আপ্লুত ওই স্বর ।

বহুদিন, বহুদিন পরে,
পাখী—তোর পেয়েছি রে সাড়.
বহুদিন, বহুদিন পরে,
প্রাণ মোর পেয়েছে রে ছাড়া !
সাড়া দেছে অন্তরের বীণা, গানের স্পন্দনে পেয়ে নাড়া !

আজ, পাখী, সাধ হয় ফিরে,
ফিরিবারে তারায়, তারায় ;
ব্যগ্র চোখে, সমুন্নত শিরে,
ছেড়ে যেতে পুরানো ধরায় ;—
বাঁশীর একটি রন্ধ্র খুলি', নিঃশেষিতে সংগীতে ত্বরায় ।

তারপর, নৈশ অন্ধকারে,
তোর মত যাব মিলাইয়া ;
কাজ নাই আনন্দ ঝংকারে,
চলে যাব শুষিরে গাহিয়া ;
যাহা গাই,—তোর মত যেন, যেতে পারি পুলক ঢালিয়া

তারপর, কে চিনে না চিনে,
রাখিব না সন্ধান তাহার ;

কণ্ঠ যদি পূর্ণ হয় গানে
তোর মত, গাহিব আবার ;
বেশীক্ষণ রহিব না আমি, গান শেষে রহিব না আর।
হে অমৃতকণ্ঠ ! হে সুদূর !
মূর্তিমান্ সুর ! সুধাধার !
কণ্ঠ মোর করহে মধুর,
কর মোরে সঙ্গী আপনার,
গান গেয়ে, উল্লাসে উড়িয়া, দিব মোরা অসীমে সাঁতার !

বেদনার বন্ধনের পারে,
চল, পাখী, লইয়া আমায় ;—
কষ্ট,—যেথা, ফিরে না শিকারে,
সব ব্যথা সংগীতে ফুরায় ;
বাঁশীর একটি রন্ধ্র খুলি'—সব গান শেষ হয়ে যায়।

কর মোরে, অতনু-সুন্দর !
পরিপূর্ণ সংগীতের রসে ;
এই মহা তমিস্র-সাগর
আসে যেন সংগীতের বশে ;
তারার জনম দিয়া গানে, দীপ্ত কর এ বিজন দেশে।

অন্ধকারে, পথভ্রান্ত জন
পায় যেন সংগীতে আশ্বাস ;—
ঘুচে যেন প্রাণের ক্রন্দন,
ফেলিতে না হয় দীর্ঘশ্বাস,
অন্ধকারে পায় দেখিবারে—জ্যোতির্ময় আপন নিবাস !

মুক্তি-শিশু—জন্মেনি এখনো
আছে কোন্ গানের প্রত্যাশে !
পাখী ! পাখী ! তোমার মতন
গান মোরে শিখাও হে এসে !
মুক্তি-শিশু আসুক জগতে,—পূর্ণ হ'ক ত্রিলোক হরষে !

নামহীন

বর্ষাশেষ, সুপ্রভাত প্রসন্ন আকাশ,—
মহাদ্যুতি ইন্দ্রনীল মণির মতন ;
জলে, স্থলে, ফুলে, ফলে, লাবণ্য-বিকাশ,
পথ, ঘাট, সব—যেন সবুজে মগন।
পুরানো প্রাচীরখানি সবুজে সবুজ !
আর তারে কে বলে কঙ্কাল-সার আজ ?
দেখ্ রে নিন্দুক তোরা দেখ্ রে অবুঝ,
লাবণ্যের বন্যা—মর্ত্যে—নন্দনের সাজ !
অতি ছোট ছোট গাছ—ছেয়েছে প্রাচীর,
নেচে উঠে স-পল্লব আকুল উল্লাসে,
রৌদ্র-ঝিলে করে স্নান, নত করি শির,
পাখী সম ;—বিচঞ্চল মৃদুল বাতাসে।
বল্ ওরে ছোট গাছ তোদের সুধাই,
নাম কি রে—নাম কি রে—নাম কি তোদের ?
"নাম নাই, আমাদের নাম নাই, ভাই,
হর্ষে আছি,—হর্ষ দি'ছি—এই,—এই ঢের !"

মমতা ও ক্ষমতা

পক্ষী-শাবকেরে বটে সেই স্নেহ করে,—
দৃঢ় মুষ্টি-বলে যার কাল ফণী মরে ;
নহিলে বৃথা সে স্নেহ,—শুধু মনস্তাপ ;
মমতা—ক্ষমতা বিনা, উন্মাদ প্রলাপ।

আকাশ-প্রদীপ

অন্ধকারে জ্বলে ক্ষীণ আকাশ-প্রদীপ,
কতক্ষণ—আছে আয়ু—কতক্ষণ আর ?
হিম-সিন্ধু মাঝে রচি' ক্ষুদ্র মায়া-দ্বীপ,
সে কেবল রশ্মিটুকু করিল বিস্তার !

শাহারজাদী

কল্পনা-নগরে, শত কবিতা স্থন্দরী
আনন্দে করিত বাস ; সহসা একদা,
কহিলেন লোকেশ্বর, তূর্যধ্বনি করি,
"সেই আমি নিত্য নব অনিন্দ্য প্রমদা।"

আনন্দে লাগিল দিতে যত পুরবাসী
কন্যা নিজ ; কে জানিত দিনেকের তরে
সে সম্পর্ক ? পোহাইলে বিবাহের নিশি,
কে জানিত, যাবে তারা স্বপনের পুরে !

ভয়ে নাহি আর কেহ করে কন্যাদান
লোকেশ্বরে ; পরিণাম জেনেছে সকলে ;
ফিরিয়া এসেছি তাই ভবনে আপন,
মানসী কন্যারে মোর কহি' অশ্রুজলে ;—

যা রে বাছা ! লোকেশের কণ্ঠে দেহ মালা ;
শাহারজাদীর ভাগ্য লভো তুমি বালা !

"আত্মানং বিদ্ধি"

"—To thine own self be true
And it must fallow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man."
—Shakespeare

ভূমিকা

‘হোমশিখা’র প্রথম কবিতাটি ভিন্ন সমস্ত কবিতাই এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই কবিতাগুলি ১৩০৫ সাল হইতে ১৩১৩ সালের মধ্যে রচিত।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ মহোদয়গণ আমার পূর্ব-প্রকাশিত কবিতাপুস্তক ‘বেণু ও বীণা’ পাঠে সন্তোষ প্রকাশ করায় আমি পুনর্বার কবিতা পুস্তক প্রকাশে সাহসী হইলাম।

কলিকাতা
২১শে আশ্বিন, ১৩১৪

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

*　　*　　*

উৎসর্গ

বঙ্গীয় গদ্যের গৌরবস্থল,
আমার পূজ্যপাদ পিতামহ,
স্বর্গীয় মহাত্মা
অক্ষয়কুমার দত্তের
স্মরণীয় নামে
আমার সাহিত্য-চেষ্টার ফলস্বরূপ,
এই সামান্য কবিতাগ্রন্থ,
ভক্তির সহিত
উৎসর্গীকৃত হইল।

*　　*　　*

প্রাচীন বেদীর ’পরে　　নূতন সমিধ সাজাইয়া,—
তীর্থ-জলে রচিয়া পরিখা,—
বসে আছি প্রতীক্ষায়,　　আকাশের পানে তাকাইয়া
কেমনে জ্বালিব হোমশিখা?
গগনে বাড়িল বেলা,—　　মানবের মেলা পথে ঘাটে,
আচম্বিতে আমারি সকাশে—
বিদ্যুৎ পড়িল খসি!　　সোনায় মুড়িয়া শুষ্ক কাঠে
হোমশিখা উঠিল আকাশে।

সবিতা

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং। ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো ন প্রচোদয়াৎ।"
"ধেয়াই বরেণ্য সবিতায়। রমণীয় দীপ্তি-দেবতায়।
আমাদের বুদ্ধি-বিধাতায়।"—বিশ্বামিত্র

For I doubt not thro' the ages one increasing
purpose runs,
And the thoughts of men are widened
with the process of the Suns." —*Tennyson.*

"Knowledge is power."—*Bacon.*

তিমির রূপিণী নিশা,—হে বিশ্ব-সবিতা!
তুমি দেব, নির্মল-কিরণ!
আলোকের আলিঙ্গনে রমিত তিমির,
ফুল্ল উষা—অপূর্ব মিলন।
পুষ্পময়ী বসুন্ধরা,
দ্যুলোক আলোকে ভরা,
জনয়িতা—সবিতা—সবার!
বরণীয়—রমণীয়—নিত্য-জ্ঞানাধার!

হে সবিতা! অবনীর নবীন বয়সে,
আহ্বানিত এমনি ভাষায়
আর্য-ঋষি, প্রকৃতির পুত্র প্রিয়তম,—
নিত্য নব জ্ঞান-পিপাসায়।
গেছে চ'লে কতদিন,
তবু তৃষা নহে ক্ষীণ;
কি অতীতে বর্তমানে কিবা,
জ্ঞানতৃষা মানবের জলে নিশি-দিবা।

উষায় উষায় তাই আহ্বানি তোমায়,—
আলোক—উৎসাহ—আশা—জ্ঞান !
স্তব্ধ হ'ক তন্দ্রাময় অবসাদ মাখা—
ঝিল্লীরব—কুহকের তান।
না হলে নিদ্রার কোলে
আবার পড়িব ঢ'লে,
সঙ্গী যত—চলে যাবে ফেলে,
রহিব পিছনে একা—কাঁদিতে বিফলে।

অসিত বরণ তব বৈতালিকগণ
আগমন করিছে ঘোষণা ;
নীরস কর্কশ স্বর, তবু লাগে ভাল—
তবু তাই শুনিতে বাসনা !
বাজিলে সমর-ভেরী
মাতি উঠে রণ-করী,
সে উৎসাহ মানে না বেদনা,
তখন আকাঙ্ক্ষা তার অঙ্কুশ-তাড়না।

এসেছে, এসেছে ধরা আঁধারের পারে !
নীলাকাশে হাসিছে কিরণ ;
এস রবি, এবে তুমি কোন্ দিব্যলোকে ?
দিব্যালোক কর বিকীরণ !
আঁধার,—বনের মাঝে
লুকাইছে ভয়ে-লাজে
সেথাও আলোক ছুটে আসে,
জড়ায়ে লুকায়ে জড়ে বাঁচে অবশেষে !

সমুজ্জ্বল সুষমায়—লোহিত আভায়
কি আনন্দ উঠিছে ফুটিয়া ;

বিদ্যুতের বেগে ধায় হৃদয়-শোণিত,
পুলক উঠিছে উথলিয়া !
নিতান্ত আপন যেন !
নহিলে এমন কেন ?
আছে যেন কত পরিচয়,
আছে যেন অনন্তের স্মৃতি প্রীতিময়।

তবে কি, তবে কি তুমি পিতা পৃথিবীর—
বসুন্ধরা দুহিতা তোমার ?
হে সবিতা, বিশ্ববাসী তাহারি সন্তান,—
তাই বুঝি আনন্দ অপার !
ধমনীতে তাই বুঝি
তোমারে হেরিয়া আজি
ছুটিছে শোণিত খরতর,
হৃদয়ের আকর্ষণ এ যে প্রভাকর !

ছিল দিন,—এ হৃদয়ে বহে যে শোণিত,
বহিত সে—ও তব হৃদয়ে ;
তখন ধরণী ছিল অঙ্কে তব সুখে,
মহাশূন্যে পড়েনি লুটায়ে।
সন্তানে আপন গুণ
না দেখিয়া, কি আগুন
জ্বলিল যে হৃদয়ে তোমার !
মনঃক্ষোভে ত্যজিলে তনয়া আপনার !

অভিমানে, চ'লে যায় অভিমানী মেয়ে,
বিসর্জিতে আঁধারে জীবন ;

অমনি হৃদয় তব উঠিল কাঁদিয়া,—
ছিঁড়ে গেল ক্রোড়ের বাঁধন।
অমনি সহস্র করে,
রোধিতে, ফিরাতে তারে
শতদিকে ছুটিল কিরণ।
এমনি হে সন্তানের স্নেহের বন্ধন!

তাহার হৃদয়ে তেজ তোমারি মতন,
রূপে সম, নহে বটে কভু;
অসীম তোমার স্নেহে, আগ্রহে, যতনে—
মরিল না; ফিরিল না তবু।
ছুটে, ছুটে, ভেসে, ভেসে,
শান্ত, ধীরে হ'ল শেষে,
ফুটিল শ্যামল-হাসি মুখে;
তবু সে তো ফিরিয়া এল না তব বুকে।

এখন সে শত শত সন্তানের মাতা;
তবু বুঝি তোমার নয়নে—
আজিও সে, সেই ক্ষুদ্র অভিমানী মেয়ে;
তাই যেন তৃপ্তিহীন মনে,—
হর্ষাবেগে অঙ্গে তার
বুলাইছ শতবার
স্বর্ণ-কর, হে বাষ্প-লোচন!
লভিল স্থবির অন্ধ ফিরে হারাধন!

জ্বলিতেছ চিরদিন তুমি হে যেমন,
জ্বলে সদা ধরণী তেমনি;

মানব—সে সিন্ধুনীরে বুদ্‌বুদের মালা,
তারাও জ্বলিছে নিরবধি!
বাহিরে বিষকা ঢাকা,
শান্তির মাধুরী মাখা,
অন্তরে জ্বলিছে মহানল,
অভিলাষ, আশা, তৃষা, আকাঙ্ক্ষা কেবল!

অবিরাম, অবিশ্রাম জ্বলিছ যেমন,
মোদের এ বুক দিয়া হায়—
বিশ্বের রহস্যময় দুঃখ-সুখে পড়ি'—
জ্বলিছে যে জ্ঞান-পিপাসায়।
অমৃত ফেলিয়া তাই
শুধু জ্ঞান-সুধা চাই;
ধ্রুবতারা আঁধার সাগরে—
মানবের নিত্য সখা—জ্ঞান এ সংসারে।

চল ওরে, তব সনে হই অগ্রসর,
আরো ঊর্ধ্বে অনন্ত গগনে,
তোমার উৎসাহ-কণা হৃদয়ে ধরিয়া
সহিব ও অসহ কিরণে।—
যতদিন নাহি ফিরে
আঁধার হৃদয়-নীরে
ঊর্মিমালা, করি ছুটাছুটি
মাখিয়া কনক-আলো—কিরণ-কিরীটী।

আঁধারে আঁধার শুধু, চলে না নয়ন,
আদি-গাথা নিহিত যেথায়;

সে আঁধারে ফোটে আলো মুমূর্ষুর হাসি,
তাহে শুধু মূর্তি ভীতিময়।
তারপর উষা আসে
উজল লোহিত-বাসে—
সৌন্দর্য—কবিতা—আভরণ!
অবশেষে, তীব্র, শুভ্র, সত্যের কিরণ

চেতনা জাগিল জড়ে,—তরু, পশু, নর,
আর্যজাতি বিকাশ চরম!
উজলিল সিন্ধু-গিরি, কক্ষ-গিরি শির,
আর্যদেরি প্রতিভা পরম।
সে আলোকে আত্মহারা—
ভাসিল পুলকে ধরা,
বিশ্ববাসী লভিল পরান,—
ভারত তুলিল যবে জ্ঞানের নিশান!

ভারত দেখায় পথ বিশ্ব পিছে ধায়—
সৌন্দর্যের পূজা শিখে নর;
গাহিতে প্রভাতী তান—প্রকৃতি বন্দনা,
প্রকৃতির চিনিল ঈশ্বর!
চঞ্চল অনিল, জল,
সবিতা কিরণোজ্জ্বল,
নেহারি বিস্ময়ে নতশির;
অমনি জ্ঞানের তৃষা—পরান অধীর।

অমনি হৃদয়ে ফোটে কল্পনা-কুসুম,—
সে কবিতা—অক্ষয় সে গান;

জ্ঞানের—প্রাণের কথা অক্ষরে, অক্ষরে,
মর্মে তার আকাঙ্ক্ষার তান।
অসীম মনের বল,
চমকিল ধরাতল,—
ভারতের প্রতিভা বিপুল ;
তাই ভারতের নাম ভুবনে অতুল।

হেথায় মানব-মনে প্রথম বিকাশ
সৌন্দর্য—কবিতা—মধুগান ;
হেথায় শিখিল নর জ্ঞানের আদর,
সভ্যতার প্রথম সোপান।
জগতের ইতিহাসে,
স্বর্ণাক্ষরে পুরোদেশে—
লিখে রাখ ভারতের নাম,
জগতের জ্ঞান-গুরু পুণ্যময় ধাম !

ভারত,—ভারত-মাতা, জননী আমার,
আজি কেন তোমার সন্তান—
অলস, অবশ হেন—প্রাণহীন সম ?
হারায়েছে সে পূর্ব সম্মান।
কোথা সে উৎসাহ, বল,—
লঙ্ঘিল যে বিন্ধ্যাচল,
কোথা আজি—কোথা আজি, হায়,
সে প্রতিভা, জ্ঞান-প্রভা, বিশ্ব মুগ্ধ যা'য়।

কোথা তারা ? শির পাতি লয়েছে যাহারা,
উপহাস শত অপমান,

তবুও বলেনি শুধু মধুময় ধরা,—
পরলোক নন্দন সমান।
তাদেরি সন্তান সব,
যাদের জ্ঞান-বিভব
ভারতের—বিশ্বের গৌরব ;
তবু কেন, তবু কেন বোঝে না এ সব ?

শিখাল যে মানবের কত ক্ষুদ্র জ্ঞান—
কত ক্ষুদ্র ধারণা তাহার,
আঁকিবে কল্পনা-বলে কেমনে সে ছবি—
সুমহান্ বিশ্বের ব্যাপার ?
কেন হ'ল চরাচর,
কেন বা জন্মিল নর,—
কে সৃজিল—কেন বা সৃজিল ?
বিফল কল্পনা, হায়, তৃষা না মিটিল।

কোথা আজি, সুবিশাল হৃদয় যাহার
কেঁদেছিল মানবের দুখে,
ব্যাধি, জরা, মরণের কঠোর শাসন
শেল সম বিঁধিল যে বুকে,
স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে,
রাজ্য সিংহাসন ছেড়ে,
জগতে গাহিল শান্তি গান,—
'অহিংসা পরম ধর্ম'—ত্রিতাপ নির্বাণ।

তাদেরি সন্তান সব, তবে কেন হায়,
সেই তেজ, সে উৎসাহ নাই ?
তারা যেন জ্ঞান-যজ্ঞে দীপ্ত হুতাশন,—
অবশেষ—মোরা শুধু ছাই।

অথবা এ ভস্ম মাঝে
যে অনল-কণা আছে
—বিশ্ব তাহে হাসিবে না হায়,—
ফুৎকারে ফুরায় বুঝি নিশ্বাসে মিশায়।

সাহসে বাঁধিয়া বুক,—হয়ে অগ্রসর,
ছুটেছিল জ্ঞান-পথে যারা,
সহসা আবেশে, যেন স্বপনে বিভোর,—
নীরব, নিস্পন্দ, আত্মহারা ;
স্বপনে করিয়া ভুল,
হারাল জ্ঞানের মূল,
না বুঝে ত্যজিল জ্ঞান-তৃষা ;
ঠেলিল অমৃত-ভাণ্ড, হারাইল দিশা।

ঊর্ধ্বে যারা ছুটেছিল আলোকের পথে—
সবলে তেয়াগি' ধরণীরে,
এবে তারা পাংশু মেঘ অশুভ, মলিন,
এল দেশ ঢাকিতে তিমিরে।
সে মেঘে হ'ল না জল—
ধরাতল সুশীতল,
তাহে শুধু অশনি ভীষণ—
চপলা—চঞ্চল-আলো—ধাঁধিল নয়ন।

যে আলোকে আঁলোকিত গিরীশের শির,
চীনে চিনে জগতের লোক,
শিহরে মিশর যাহে রোমাঞ্চিত রোম,—
পারস্তানে পরম পুলক,

ভারতের ভাগ্য-দেবে,
জিজ্ঞাসি' কোথায় এবে
সে আলো কে করিল নির্বাণ ?
কোন্ ভুলে হতমান ভারত-সন্তান !

অনুনয়ে ফিরে মন, সিংহাসন টলে,
শক্তি ফিরে শক্তি আরাধনে,
তটিনীর ফিরে স্রোত মানব-কৌশলে,
ফিরে স্মৃতি ভিষকের গুণে ;
সে শুধু ফিরে না হায়—
যে দিন চলিয়া যায়,
কি কঠোর কালের শাসন !
যেমন চলিয়া যায় আসে না তেমন।

প্রতীচ্যে জাগিল আলো,—প্রাচ্য অন্ধকার,
দীন-শিশু গাহে সুমধুর ?
"দেবতার ভোগ্য সুধা—ভক্তি, শান্তি, ক্ষমা,
করো পান বিশ্ব তৃষাতুর !
সবাই সবার ভাই,
ছোট-বড় হেথা নাই,
এক পিতা সবাই সন্তান ;
ধুয়ে মুছে ফেল গর্ব, ঈর্ষা, অভিমান।"

যে আলোক ফুটিল এ কনক-মুকুরে,
কতদিন কেহ দেখিল না,—
চাহিতে—লাগিল ধাঁধা—মুদিল নয়ন ;
শান্তি তার একান্ত কামনা।
কেহ বা ভাসিল স্রোতে,
কেহ গেল ভিন্ন পথে,

সে পথেও না মিটিল আশা ;
মরুভূমি, মরীচিকা, আলেয়ার বাসা।

তীব্র জ্বালা, দেহ মন পুড়ে হ'ল ছাই,
প্রাণ যায়, দারুণ পিপাসা,
তবুও পাবে না জল,—কি বিষম ঠাঁই,
তবু হায় মিটিবে না আশা।
কঠিন শাসন এত,
কে সহিবে অবিরত ?
মানুষ—মানুষ চিরদিন ;
জ্ঞান-তৃষা, জ্ঞান বিনা কে করে বিলীন ?

আবার ফিরিল নর এসেছে যে পথে,
আবার শুনিল শান্তি-গান।
বুঝিল সে, শান্তি নহে, শান্তি তরে শুধু ;
আছে আরো উদ্দেশ্য মহান্ !
সমাজ, ধর্মের বিধি,
মমতা শিখায় যদি,
তবে তার আছে স্বার্থকতা ;
নহে, 'শান্তি' অর্থহীন—স্বপনের কথা।

হেথায়, মানব মনে, অনন্ত পিপাসা ;
জানি না মিটে না কেন হায়,
তাই চাহি চিরদিন জ্ঞানের আলোক,
দ্বেষ-বহ্নি শুধু অন্তরায়।
এক বিন্দু ক্ষমা যদি
নিবায় বিদ্বেষ-ব্যাধি—
বিশ্বে যদি শান্তি আসে ফিরে,
সরল জ্ঞানের পথ হবে ধীরে, ধীরে।

তাই শান্তি সুনির্মল স্বর্গের কিরণ,
তাই ক্ষমা মনের ভূষণ ;
নীতি-কথা, একতার এত সমাদর,
তাই বুঝি 'ধর্ম মহাধন' !
দুর্জয় মানব মন,
পাছে, বেধে উঠে রণ,
বিধি বাঁধা তাই শত শত ;
বিশ্বের রহস্য, নহে, রহিবে অজ্ঞাত।

যারা শুধু ঘুমাইত—সুখদ শয়নে
এবে দেখি জ্ঞানের কিরণ,
ফুৎকারে নিবাতে চায়,—ক্রোধে আত্মহারা,
ভাঙ্গে তার কল্পনা—স্বপন।
তারপর ধীরে ধীরে,
ঘুম-জাল গেল চিরে,
বুঝিল সে ভ্রম আপনার ;
হইল সত্যের জয়—জয় মমতার।

সে আলোকে শ্বেতাম্বর হাসিল বিজ্ঞান,
বিশ্ব আঁখি মেলিল আবার ;
নির্মল জ্ঞানের আলো—সত্যের কিরণ
তীব্র তবু আনন্দ-আধার।
শুভ্র তুষারের 'পর
পড়েছে রবির কর—
প্রতিবিম্বে উদ্ভাসিত ধরা ;
তাই আজি বিজ্ঞান বিশ্বের আঁখি-তারা।

বিজ্ঞান ! বিজ্ঞান ! আজি তোমার মহিমা—
কলগীতি তুলেছে জগতে,

সে পরশে লভি' যেন নবীন জীবন,
মানব ছুটেছে এক পথে।
সে আলোক, আজি সবে
আলোকিছে সমভাবে—
কি তৃণ কি উচ্চ তরুশির ;
বিজ্ঞান তোমার হাসি মধ্যাহ্ন-মিহির !

'কোন্ পথে যাবে ভাই' জিজ্ঞাসে বিজ্ঞান,
'কোন্ পথে !' বিশ্ব বলে ধীরে,
'কই সুখ কোথা হায় উৎস করুণায় ?
বিষাদ সতত আছে ঘিরে ;
তবে বৃথা দিবারাতে
মিথ্যা-দেবতার সাথে
কি হবে বরষি পুষ্প চয় ?
চল জ্ঞানপথে।' ধরা শোনে সবিস্ময়।

'এ নহে সন্তোষ, হায় ঔদাস্য কেবল,
নহে শান্তি—শুধু তার ভান।
কেমনে লভিবে সুখ, বল, না হইতে
বিশ্বের সমস্যা সমাধান ?
চল তবে সত্যপথে,
আরোহি জ্ঞানের রথে,
দেখে আসি, কোন্ পথে চলে
চন্দ্র তারা, নিশিদিন গগন-মণ্ডলে ;—

'কোন্ পথে, কোথা হতে বহে প্রস্রবণ,
কোথা হতে মেঘে আসে জল,
কোন্ গানে কোন্ তানে—ধ্বনিত ধরণী,
কেন সিন্ধু সতত চঞ্চল ;

কি দিয়া গঠিত ধরা,
কি দিয়া মানব গড়া,
দেখ জ্বালি জ্ঞানের কিরণ ;—
কার্য যদি ব'লে দেয় অজ্ঞাত কারণ।'

একি হ'ল! একি ছবি দেখালে বিজ্ঞান,—
এ জগতে নাহি কি করুণা?
একের নিধন বিনা বাঁচে না অপর!
এ বিশ্ব কি দৈত্যের রচনা!
হে সবিতা! হে সবিতা!
মানবের জ্ঞানদাতা!
দাও আলো—দাও সত্যকণা,
কিছু যে বুঝি না দেব, আমি যে উন্মনা।

হে সবিতা, দাও বল আরো উচ্চে যাই,
প্রহেলিকা এখনো না বুঝি,
প্রাণপণে জ্ঞানপথে তাই যেতে চাই ;—
চির সুখ,—বৃথা তারে খুঁজি।
চাহি সুখ কে কোথায়
জীবনে পেয়েছে তায় ;
পাব কিনা জানি না সে হায় ;
তবু সে পরশমণি, প্রাণ তারে চায়।

কোন্ পথে বিশ্ব ফিরে, তাই খুঁজি সদা,
আমরাও সেই পথে যাব—
অনন্ত সাগর বুকে—আনন্ত লহরী,
তারি সনে, একতানে গা'ব।

যদি কোন রত্ন পাই,
আদরে ধরিব তাই;
দিব ডালি ভবিষ্যের করে ;
না পাই, এই সে পথে পাবে তা' অপরে।

হে সবিতা, না মিটিতে জ্ঞানের পিপাসা,
তুমি দেব অস্তাচলে যাবে ;
আসিবে জীবন-সন্ধ্যা—আসিবে আঁধার
পূর্ণ আলো কে মোরে দেখাবে।
উষার উৎসাহ লয়ে,
সন্ধ্যায় বিষণ্ণ হয়ে,
এমনি রে অপূর্ণ আশায়,—
কালস্রোতে কত লোক ভেসে গেছে হায়।

গেছে, মুছে গেছে স্মৃতি ; কোন পুণ্যবান
রেখে গেছে গৌরব-নিশান,
বাজায়ে বীণার তারে নব নব গান,
বাজায়ে সে জ্ঞানের বিষাণ ;
দারুণ তৃষ্ণায় জ্বলি,
বিক্ষত চরণে চলি,
আনিয়াছে পিপাসার জল,
রেখে গেছে দিব্যফল—বিশ্বের মঙ্গল।

হে সবিতা, দিন দিন এ বিশ্বভুবনে,
শিক্ষাদাতা—পিতার মতন
বিতরিছ স্নেহ সনে—সুতীব্র কিরণ—
জ্ঞান-ধন—অমূল্য রতন।

আর স্নেহময়ী ছায়া,
হৃদয়ে মায়ের মায়া,
পিছে তব ফিরে অনুক্ষণ,
ঘুচাতে ধরার ব্যথা—মুছাতে নয়ন।

যাই তেবে, সন্ধ্যা আসে,—হয়েছে সময়,
অন্ধকার পক্ষ করে নত ;
ঝিল্লীরব—ঢালে বুঝি সুষমা-সংগীত,
ওই ওই ওই গো নিয়ত।
পিছনে আসিছে যারা
দাও আলো, হ'ক তারা
আত্মহারা—প্রফুল্ল হৃদয় ;
যাই তবে—আমাদের হয়েছে সময়।

আবার পোহালে নিশি, মাখিয়া কিরণ—
সঙ্গে তব চলিব আবার,—
নব বলে, নবোৎসাহে, নবীন জীবনে
পূরাইতে তৃষ্ণা কামনার।
আবার নির্মল—আলো,
আমার হৃদয়ে জ্বালো,
হে, সবিতা জ্ঞানের কিরণ,—
আরো আলো—আরো আলো কর বিতরণ !

সোম

"O for a draught of vintage, that hath been
Cool'd a long age in the deep-delved earth,
Tasting of Flora and the country-green."—Keats.

"Pains ask to be paid in pleasure."—Bacon.

নিশীথের মায়া-উপবনে,
মৃগ তুমি হে মৃগাঙ্ক সোম !
কোন্ যুগে—কোন্ শুভক্ষণে
জনমিলে উজলিয়া ব্যোম ?
নিশির পরশি কায়
চলিয়াছ চিরদিন,
মাথা রেখে তারি গায়
ভ্রমিতেছ বিরাম বিহীন ;
তিথি, মাস, বর্ষ কত হায়,
লয় হয়ে গেল পায় পায় !

বর্ষ, যুগ হাজার হাজার,
লক্ষ লক্ষ তিথি, পক্ষ, মাস,
কোথা দিয়ে হয়ে গেল পার,
তুমি সেই ভ্রমিছ আকাশ !
কোথা দিয়ে হ'ল পার
অপরূপ কত জীব,
তাদের মঙ্গল, আর
তা' সবার যতেক অশিব ;
তুমি সব দেখিলে একাকী,
আকাশের শুক্ল-পক্ষ-পাখী !

কত নিধি জলধি-মন্থনে
উঠেছিল, মনে তাহা নাই,
হস্তী, হয়,—নাহি সে স্মরণে—
ভস্ম ছাই—কত কি বালাই।
কেবল রয়েছে জাগি,
তোমার জনম-কথা,
হৃদয়ে গিয়েছে লাগি,
সে দিনের আনন্দ-বারতা ;
চতুর্দিকে মঙ্গল আভাষ,
দেবতার মৃদুমন্দ হাস।

ধীরে ত্যজি পৃথ্বীর জঠর,
সিন্ধুর এড়ায়ে সর্পজট,
শিশু-শশী—প্রশান্ত, সুন্দর,
আবির্ভূত শিরে স্বর্ণঘট ;
সে সুধা সেচন করি,
ব্যোম-লতিকার মূলে,
মলিন বল্লরী, মরি,
সাজালে মুকুলে ফলে ফুলে ;
ব্যোমলতা—সোমলতা এবে,
হে মায়াবী ! তোমারি প্রভাবে।

থরে থরে নক্ষত্র-মুকুল
ব্যোমলতা-সোমলতা 'পরে,
বায়ুভরে করে দুল্ দুল্,
ছায়াপুটে মঞ্জরী মুঞ্জরে,
সহসা, লতার গায়ে,
সমীরণ একদিন

দেখিল, নখের ঘায়ে
রসধারা ঝরিতেছে ক্ষীণ,
সে রস আকণ্ঠ করি পান,
সমীরণ হারায় জ্ঞেয়ান।

নব চোখে দেখিছে সংসার,
জ্ঞানহারা মুগ্ধ সমীরণ !
এ সংসার ভালবাসিবার
নহে নহে অহরহ রণ।
জ্ঞেয়ান হারায়ে বায়ু
লভিল নূতন জ্ঞান,
মানব হারায়ে আয়ু
লভে যেন দেবতার মান ;
অনাঘ্রাত কুসুমের ঘ্রাণ,
বন্দী করি নিল মন প্রাণ।

সে অবধি এ তিন ভুবনে
স্বর্ণধারে ঝরে সোমরস,
সুরাসুর আনন্দিত মনে
পান করি গান করে যশ।
ঝরিয়া, ক্ষরিয়া, সোম !
উড়ুম্বর পাত্রে মোর,
পূর্ণ কর সন্ধ্যা-হোম,
চূর্ণ কর যুদ্ধে দস্যু চোর ;
এস, সোম ইন্দ্রের সেবায়,—
আর্য-ঋষি ডাকিছে তোমায়।

যজ্ঞ যাগে, দস্যু বধে কিবা,
বেলান্ত কাটায়ে ঋষিগণ,

পিপাসায় মগ্ন যবে দিবা,
করিত তোমারে আবাহন ;
মোরাও তেমনি আজ,
দিন-শেষে পিপাসায়,
ফেলে রেখে শত কাজ,
ডাকিতেছি কৃপার আশায় ;
শিরে বোঝা—লক্ষ কোটি কাজ
দুর্ভাবনা হানে শত বাজ।

রোগ এল শূল লয়ে হাতে,
পিছনে রহিল পড়ি কাজ,
শোক এল শেল হানি মাথে
সব কাজে পড়িল রে বাজ ;
জরা এসে লজ্জা দিবে
ব্যর্থ হয়ে যাবে সব,
মৃত্যু কবে সাড়া দিবে
ডুবায়ে কাজের কলরব ;
শত কাজে সহস্র ভাবনা,
দুর্ভাবনা—মরণ-যন্ত্রণা।

কাজ সারা কবে হবে আর,
বেলা যায় বাড়ে হাহাকার ;
অন্ধ করি নয়ন সন্ধ্যার
নিশাচর আসে অন্ধকার।
এস সোম, এস ত্বরা,
সহিতে পারি না আর,
দস্যু-শঠ-ভণ্ড-ভরা
জগতের পাপ অত্যাচার ;

পিশাচে বেঁধেছে হেথা দল,
সর্বশুভ করিতে বিফল।

ধর্ম কহে খড়্গ তুলি রোষে,
'রাজস্ব দে, প্রাপ্য সে আমার'
'পূজা দাও আগে রাজকোষে'
দর্পভরে কহে তরবার।
　　সমাজ কহিছে হাঁকি'
　　'আগে রাখ মোর মান',
　　প্রকৃতি বলিছে ডাকি,
　　'ফিরে দে, ফিরে দে মোর দান।'
তুল না জ্ঞানের কথা আর,—
অজ্ঞ হয়ে ভান বিজ্ঞতার।

সোম! সোম আন সোমরস,
দেহঢালি রঞ্জিত ধারায়;
দেহ মন হয়েছে বিবশ,
রুদ্ধ প্রাণ সব্যূহ কায়ায়;—
　　বরিষ, বরিষ মুখে
　　সোমরস সুধাধার,
　　যা আছে জ্বালা এ বুকে—
　　যত ক্ষত মৌন নিরাশার।
মুছে যাক্—হ'ক্ অবসান,
সোমরস করি আজি পান।

আহা-হা কি সুন্দর অম্বর,
কি সুষমা দ্যুলোকে-ভূলোকে,
তরুর কাঁপিছে কলেবর
ছায়া-বুকে জাগিয়া পুলকে,

ঘুমাইছে নববধূ—
ছায়া, নব জোছনায়,
বিভোর মদন, মধু,
স্ফুরিত অধরে ফিরে চায়!
এস সোম! প্রেম কর দান—
সে অশান্তি সান্ত্বনা মহান্!

স্নিগ্ধ বায়ু, ক্ষুদ্র শিশু যেন,
হিমকর—হানিছে চঞ্চল,
কপালে কপোলে—ফুল হেন—
চোখে মুখে, আহ্লাদে পাগল।
মা চাহিছে পথ, ওরে,
বধূ একা জানালায়,
শিশু হাসে স্বপ্নঘোরে,
পুত্র, পিতা, পতি, ঘরে আয়;
মগ্ন নিশি শান্তি সুষমায়,
স্নেহনীড়ে ফিরে তোরা আয়।

বহুরূপী! দিব্য-মায়াধর!
কি কুহক জান হে কুহকী,
কতরূপ ধর মনোহর,
নিত্য নব যখনি নিরখি;
নির্ম্মল অক্ষত কভু
ধৌত সুর-গঙ্গাজলে,
রুদ্রের ললাটে কভু
গৌরীর রঞ্জিত পদতলে,
কভু বক শুভ্র সুশোভন—
ঘন নীল পল্লবে মগন।

কভু মিলে উজ্জ্বলে কোমলে,
বায়ুস্তরে ভেসে যাও একা,
পারিজাত হরণের কালে
বজ্র যেন গরুড়ের পাখা !
    মিশর-রাণীর কভু
    পানপাত্র চমৎকার,—
    যত পান করি তবু
    পূর্ণ পাত্র পূরে পুনর্বার !
কভু চক্র সর্বাঙ্গ সুন্দর,
মূর্তিমান দেবতার বর।

শিশু শুয়ে জননীর কোলে
গান শোনে গান গেয়ে গেয়ে,
'চাঁদ আয়' ব'লে হাত তোলে
কত হাসে কাঁদে তোমা চেয়ে,
    তুমি তো এস না হায়
    কাঁদা তার হয় সার ;
    বালক যৌবন পায়,
    ঠেকে শেখে,—ডাকে না সে আর ;
এখন সে চেয়ে তুষ্ট নয়,
পেলে, বুঝি, তখন কি হয়।

প্রেম আসে চন্দ্রমালা গলে,
মুখে চোখে চারু চন্দ্রহাস,
আবরিত চন্দ্রিকা অঞ্চলে,
চন্দ্রের মণ্ডলে যার বাস ;
    হৃদয়ে বেজেছে সাড়া
    নয়নে জেগেছে রূপ,

সাগর পেয়েছে নাড়া
আর কি হিল্লোল রহে চুপ ?
চাঁদে যার উঠিত না মন,
চাঁদমুখে তুষ্ট সে এখন ;

আশা-পাখী উড়ায় বালক,
দৃঢ় পাখে ফিরে সে ভুবন,
অন্ধ করে স্থতীব্র আলোক
নিম্নে ক্রমে আরম্ভে ভ্রমণ ;
এক এক বার শুধু
দিনান্তের রাঙা মেঘে,
উছলে হৃদয়-মধু,
সুপ্ত প্রাণ উঠে জেগে জেগে ;
তারপর রহে নত শিরে
গণ্ডীব্যূহ যত আসে ঘিরে।

হায় সোম চাহ কি শুনিতে
হৃদয়ের ক্ষুদ্র বিবরণ ?
মন মরে—জানিতে চিনিতে,
বড় হয়ে ছোট হয় মন ;
আশায় দিয়েছ ছাই,
তোমায় না চাহি আর,
এবে যে চন্দ্রমা চাই
বাঁধা রবে সদা সে আমার ;
সে চাঁদের ক্ষতি ক্ষয় নাই,
প্রেমশশী পূর্ণ সে সদাই।

সে চাঁদ উদয় হলে মনে,
নাহি ভয়, নাহি গৃহ বন,

শক্তি লভে ভীরুচিত জনে
প্রেম করে অসাধ্যসাধন ;
নব প্রীতি, নব প্রাণ,
সম্বন্ধ নূতন সব,
নব দান প্রতিদান,
দেহ মনে নবীন উৎসব !
সর্বস্ব—জীবন করি পণ,
বারেক দেখিতে প্রিয়জন ।

উদারতা উদিত হৃদয়ে,
আজি মহা মার্জনার দিন,
অনুভূতি তীক্ষ্ণতর হয়ে
বিশ্বজনে গণে ত্রুটিহীন,
সম্রাট আজি রে আমি
মরমের রাজা আজ,
সাহসের অনুগামী
হয়ে ক্ষমা দেছে দিব্যসাজ !
কি কহিনু—করিনু কি কাজ,
ক্ষম সোম ! মত্ত আমি আজ ।

সোম ! তুমি প্রেমে নিরমান,
কর প্রাণ প্রেমে পরিপূর,
মুহূর্তের তরে কর দান
ইন্দ্রসম সম্পদ প্রচুর ;
বিনিময়ে লয়ে যাও
যা আমার আছে সব,—
সুদীর্ঘ জীবন লও
অদৃষ্টের ব্যসন উৎসব ;

ক্ষণ তরে হীরা দাও নিতে,
কাজ নাই অঙ্গার খনিতে।

আজি মোর হয় অনুমান
জীবনের মাহেন্দ্র সময়,
পূর্ণ বুঝি সত্যের সন্ধান
হর্ষরব তাই বিশ্বময়;
সবিতা সহায় যার,
সোম যার সহচর,
জ্ঞানাধার—প্রেমাধার—
একাধারে নারী আর নর,
পিতৃভাবে মন্ত্রের সাধন,
মাতৃভাবে সন্তাপ হরণ।

এক নেত্র সুতীব্র উদাস,
আর নেত্র আর্দ্র স্নেহনীরে,
একাঙ্গে বিরাজে কৃত্তিবাস,
বধূ-বেশ আর অঙ্গ ঘিরে;
একে দণ্ড, কমণ্ডলু,
শ্রুতি আর পুঁথিভার
আরে লাজ স্বর্ণবালু
শমীপত্র আর ঘৃত ধার;
মেঘাশ্রিত নিদাঘের সাঝ;
ক্ষম সোম—মত্ত আমি আজ।

কালের কাহিনী আছে যত
আর যত কথা কালিকার
সে সকল আজিকার মত
দাও সোম করে নদী পার।

বিস্মৃতির বৈতরণী—
তার বড় কাল জল,
—মৃত্যুর তামসী খনি
যার কাছে স্বচ্ছ সুনির্মল,—
সে নিবিড় বিস্মৃতির জলে,
কালের কাহিনী দাও ফেলে।

আজি শুধু সত্য বর্তমান,
আজি শুধু প্রেমের বেসাতি,
প্রাণ লয়ে কিবা দিবে দান ?
বল, আজ গণিব না ক্ষতি ;
প্রথম বেলায় ওগো
তুলো না বচসা আর,
দিব সে—যা তুমি মাগ,
মুখ আর করো নাকো ভার ;
কথা রাখ, দোহাই তোমার,
হাটে হাটে ঘুরায়োনা আর।

জ্যোৎস্না হাসে, শীতোষ্ণা যামিনী,
অন্তর্বায়ু কাঁপিছে জাহ্নবী,
ধ্যানরতা মুগ্ধা সন্ন্যাসিনী
যোগেন্দ্রের যোগ্য নারীচ্ছবি !
বালতরু বসন্তের
পল্লবে অঙ্কিত শাখা,—
সংমিলিত ভুজঙ্গের
পুচ্ছ যেন শেহালায় মাথা ;
কুশভূমে জিহ্বা খান্ খান্,
চুরি ক'রে স্বর্গ-সুধা পান !

সংখ্যাতীত জোনাকীর মত
জলে স্ফুরে আলোকের ঝাঁক,
বিশ্বকর্মা আজি যেন স্বতঃ
তারার চড়ায়ে দেছে পাক ;
ফুটে উঠে ডুবে যায়,
ফুটে ওঠে আরবার,
ভেসে ওঠে, হেসে চায়
একেবারে হাজার হাজার !
মালা গলে ঢেউ নাচে দুলে,
চুপি সাড়ে পড়ে এসে কূলে।

বকুল দলিয়া কেবা যায় ?
বাতাসে আসিছে গন্ধ তার ;
এ পথে নিশীথে কে গো, হায়,
কোন্ গোপী করে অভিসার ?
কোন্ বনে বাজে বাঁশী
কোন্ গানে মজে প্রাণ
কার মুখে ফুটে হাসি
কার মুখ ভয়ে পরিম্লান,
কই রাই—কই সে কানাই ?
বল সোম, বল মোরে তাই।

তাদের বাঁশীর শুনি সুর
গায়ে লাগে তাদেরি বাতাস,
বনমালে সৌরভ প্রচুর,
মনে জাগে তাদেরি তিয়াষ,
সকলি রয়েছে হায়,
তাদেরি সে দেখা নাই,

দিন গেছে, নিশি যায়,
কোথা রাই—কোথায় কানাই ?
এই ছিলে কোথা গেলে ভাই,
আর কেন দেখা নাহি পাই ?

বসুন্ধরা যখন কিশোরী
এসেছিল নবীন কিশোর,
স্বরগের প্রেম বুকে ধরি,
ধরণীর লাবণ্যে বিভোর ;
তুমি জান সোমরায়
তুমি তো জান সে সব,
অনুষ্ঠিত এ ধরায়
হ'ল যবে স্বর্গের উৎসব,—
এল যবে কিশোরী কিশোর,
রূপে—মোহে—প্রেমে হয়ে ভোর।

জগতের প্রথম প্রেমিক,
মুগ্ধ মূক রূপে সে তন্ময়,
প্রিয়া মুখে চাহে অনিমিখ্,—
লজ্জা, ভয়, কখনো বিস্ময় ;
কত পথে কত মতে
দিনমান কেটে যায়,
বিশ্ব ডুবে তমঃ স্রোতে
প্রিয়ায় দেখিতে নাহি পায় ;
আচম্বিতে তুমি সোমরায়,
প্রেমিকের হইলে সহায় !

শৈলমূলে নদীকূলে কিবা
ঘুম যায় প্রেমের প্রতিমা,

অঙ্গে অঙ্গে চন্দ্রিকার বিভা
কিশোরীর বাড়ায় মহিমা ;
অলপ বয়সী বালা
অসীম রূপের খনি,
ভূলুণ্ঠিত যূথীমালা
প্রতি অঙ্গ ফুলের গাঁথনি ;
প্রেমিকের হে চির সহায়,
তুমি যেন জাগায়োনা তায়।

আঁখি চাহে সুপ্ত আঁখি 'পরে
সুপ্তশ্বাসে জাগ্রত মিশায়,
মন কাঁদে সুপ্ত মন তরে
প্রতি অঙ্গে প্রতি অঙ্গ চায় ;
অলক উড়িয়া পড়ে
চোখের উপরে ওই,
আলো পড়ে—ছায়া নড়ে,
দেখিবার কি আছে এ বই ?
অকস্মাৎ বিদ্ধ যেন বাণে
ধায় যুবা কাতর পরানে।

সারা দিনমান করি ক্ষয়
নিশি আনে মাহেন্দ্র সুযোগ,
সোম, সোম, কি আনন্দময়,
নয়নের মনের সম্ভোগ ;
রূপ মাঝে মোহ বীজ,—
স্বর্ণকোষে প্রেমাঙ্কুর,
মধু ! সোম ! মনসিজ !
দেহ সবে আনন্দ প্রচুর।

গণ্ডূষে শুষিব সুধা সব,
সোম, সোম—আজি মধূৎসব।

দিনে, দিনে, মিলন মধুর,
পুষ্ট কলা তুমি দিনে দিনে,—
পূর্ণিমায় ক্ষীর-ভারাতুর—
উপমিত—গর্ভিণীর স্তনে,
তারপর অবসাদ,
দূরে দূরে প্রতিদিন,
সফলার পতি সাধ
কে না জানে—নিত্য হয় ক্ষীণ ;
হায় সোম, দীর্ঘ বিভাবরী
জাগে যুবা পূর্ব কথা স্মরি'।

সেই দেখা—সেই চেয়ে থাকা,
কাছে কাছে থাকিবার সাধ,
তরুতলে ঘুমঘোরে ডাকা,
ছেলেখেলা মধুর বিবাদ,
করে করি কর-রোধ,
আবেগ সহস্র গুণ।
বালিকার কিবা বোধ ?
তবু নারী স্বভাবে নিপুণ !
তোলাপাড়া এই সারা রাত,
বারেক না মুদে আঁখিপাত।

শাখে শাখে পাকে বীজকোষ
লঘু তুলা বাতাসে উড়ায়,
স্মৃতি লয়ে যাহার সন্তোষ
ভোলা কথা যত্নে সে কুড়ায়,

সেই নিশি পূর্ণিমার,
সেই সোম কান্তিমান্ ;
লূতাজাল ভাবনার
ছেয়ে ফেলে প্রশান্ত নয়ান।
ঝিঁঝি ডাকে—লাগে ঘুমঘোর,
হায় নিশি স্বপন-বিভোর।

স্বপনে স্বপনে কাটে রাত ;
জীবনের আধেক স্বপন,
দিনরাত, ঘাত-প্রতিঘাত,
আলোছায়া—বেকত গোপন ;
আদিকাল হতে, আজ,
এল গেল কতদিন ;
কত ছবি, কত সাজ,
কত প্রেম আদি-অন্তহীন !
হে মায়াবী ! দিব্য-কলেবর !
প্রেম-সোম ! অক্ষয়-অমর !

দাও মোরে আজিকার মত
মনোমত সুন্দর স্বপন ;
যা কিছু রয়েছে অবিদিত,
যত কিছু আকাঙ্ক্ষার ধন ;
আমার সন্তাপ হর,
তীর্থ-বারি ঢালি শিরে,
আমারে সম্রাট কর
স্বপনের অবাধ মন্দিরে,
জ্ঞানে যাহা হয়ে আছে বোঝা,
প্রেমের পরশে হ'ক সোজা।

আশ্বিনের ঝটিকা সমান
ভ্রষ্ট করে—নষ্ট করে সব
উন্মাদ শোকের অভিযান,
পরিণত ব্যসনে উৎসব ;
অর্থহীন অত্যাচার,
অক্ষুধায় রক্তপাত,
কে বুঝাবে মর্ম তার ?
কোন্ দ্বারে করিব আঘাত ?
জ্ঞান হেথা মানে পরাভব,
বুদ্ধি নারে বোঝাতে এ সব।

নাশে শোক উৎসাহ উদ্যম,
শক্তি যায়, সামর্থ্য ফুরায় ;
কাহারো না হলে মনোরম,
মন্ত্র-সাধা হয়ে উঠে দায় ;
কেহ যদি না শুনিল
বীণা সে তো ভেঙেছেই,
কেহ যদি না মানিল
সে মানুষ থাকিয়াও নেই ;
বন্যা যদি মূল ফেলে ঢাকি,'
আর বাসা বাঁধিবে কি পাখী ?

শোক যদি আসি দেয় হানা,
মৃত্যু যদি হরে প্রিয়জন,
কাঁদিতে করো না সোম মানা,
বলিও না 'এমনি জীবন',
মত্তজনে তত্ত্বকথা
বৃথা হবে অপব্যয়,

ঔষধ বিহনে ব্যথা
ঘুচেনাকো শুধু ব্যবস্থায় ;
হারানিধি—ঔষধ অমোঘ,
এনে দাও—দূরে যাক্ রোগ।

এনে দিবে হারা-মরা-ধন
হেন জন পাব গো কোথায়,
আন সোম আন গো স্বপন
স্বপ্ন জানে—তাহারা যেথায়।
কত কথা বলিবার
বাকী যে রয়েছে হায়,
আয় স্বপ্ন একবার
লয়ে চল তাহারা যেথায় ;
ওহে সোম! স্বপন-দেবতা!
জান তুমি তাহাদের কথা।

এখনি—এখনি প্রাচীমূলে
দেখা দিবে তপন করাল,
কাঁটা সম কর্কশ আঙুলে
ছিন্ন করি স্বপনের জাল ;
শত্রু মিত্র নিরন্তর
আনে বুদ্ধি, উপদেশ,
কাঁদিবার অবসর
দিবে না দিবে না বুঝি লেশ!
স্বপনে মিলন কর দান,
এস সোম—হয়ো না পাষাণ।

ক্ষণস্থায়ী শুক্ল প্রতিপদে
উদয়াস্ত না হয় নির্ণয়,

ক্রমে তনু বাড়ে পদে পদে,
পূর্ণিমায় সদা সমুদয় ;
তেমনি, ক্ষণিক হায়
স্বপনে মিলন হ'ক,
মরণের পূর্ণিমায়
অনন্ত মিলনে যাবে শোক।
মহাস্বপ্ন হবে এ জীবন,
মহানিদ্রা—হবে জাগরণ।

পৃথ্বী ডাকে, "এস প্রিয় সোম !
এস কুন্দ-বরণ সুধীর !
দেখ মোর কণ্টকিত রোম,
শতস্তনে উচ্ছ্বসিত ক্ষীর ;
যবে গ্রহণের কালে
দিনকর কোলে লয়,
রবিরে আবরি ফেলে
এত রূপ ধরে সোমরায় ;
চাঁদ ছেলে মন্দ বলে লোকে,
মন জানে, দেখি যে কি চোখে।"

যবে তুমি সূর্যের সকাশে
গুপ্তভাবে সুপ্তভাবে রও,
অগ্রে চল তবু ভাগ্যবশে
দীপ্তিলাভে বঞ্চিত তো নও ;
পলে পলে অগ্রসর,
তিলে তিলে দীপ্তি লাভ,
নিত্য নব কলেবর
নিত্য কত অভিনব ভাব ;

অহরহ উন্নতি তোমার,
ক্ষয় শেষে উদয় আবার।

অচেনা নূতন কত মুখ
দেখিবে জগতে কালি সাঁঝে,
তাদের প্রাণের দুঃখ-সুখ,
যে কথা বলে না কারে লাজে—
তোমারে বলিবে সব,
তুমিও শুনিবে তাই,
তাদের সে কলরব
কর্ণে তব পশিবে সদাই ;
তাদের আনন্দ কর দান,
প্রেম দিয়া পূর্ণ কর জ্ঞান !

প্রেম দিয়া পূর্ণ কর জ্ঞান,
কর সোম প্রাণের বিকাশ ;
জ্ঞান যদি হয় মুহ্যমান,
প্রেম দিয়া দিও হে আশ্বাস ;
পলে পলে আগুয়ান,
তিলে তিলে শক্তিলাভ,
নিত্য নব নব জ্ঞান,
নিত্য কত নবতর ভাব ;
নিত্য নব আনন্দ তুফান,
প্রেমে জ্ঞানে পূর্ণ হ'ক প্রাণ।

সর্বংসহা

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

"—To be weak is miserable, Doing or suffering."
—Milton

শ্যামাঙ্গলা, সাগর-বসনা,
পদ্মগন্ধা, বন্দিতা ধরণী,
কান্তিময়ী প্রসন্ন বদনা,
সর্বংসহা, জীবের জননী,
ধাত্রী, ধেনু, মানবের প্রসূ সনাতনী!
তুমি তুমি তুমি অহরহ,
দেবতার পূর্ণ অনুগ্রহ!

সন্তানের শিরে রাখি শির
মা শিখায় প্রণাম বালকে,
শিশু পুনঃ তুলি নিজ শির
মা'র শিরে প্রণমে পুলকে;
বসতি প্রসূতি সনে আনন্দ-গোলোকে!
তেমনি আমিও নমি তোরে,
শিশু সম আহ্লাদের ভরে।

অনিন্দিতা, বেদের বন্দিতা,
পৃথ্বী তুমি ছন্দে প্রকীর্তিতা,
ঋষিদের আরাধ্যা দেবতা,
অর্ঘ্য ধর—হৃদয়ের কথা;
হে বিশ্ব-দেবতা! আজি শুন মোর গাথা;
শক্তি, প্রেম, জ্ঞানের নিধান
হ'ক যত মানবের প্রাণ।

শক্তির সুদৃঢ় সিংহাসনে
জ্ঞান প্রেম—রাজা আর রাণী,
বীর্যবান কেশরী বাহনে
জগন্মাতা ত্রিলোক পালিনী;
সূক্ষ্মশক্তি অধিষ্ঠিত স্থূলে চিরদিনই।
তুমি সেই দৃঢ় সিংহাসন,
সাধকের সাধের আসন

মুখ্য লক্ষ্য জ্ঞান যে জনার,
প্রেম যার প্রাণের সাধনা,
শক্তি তার প্রধান নির্ভর,
ভয়াবহ শৌর্যে তার ঘৃণা;
স্থির নহে প্রেম, জ্ঞান, কভু শক্তি বিনা।
রাখিবার শক্তি যার নাই,
পাওয়া তার বিষম বালাই।

পৃথ্বী তুমি শক্তি স্বরূপিণী,
পূর্ণ কর ত্রিবিদ্যা সাধন,
শৌর্য প্রেম জ্ঞেয়ানের খনি!
সিদ্ধিকাম সাধকের ধন!
নাহি ক্ষতি, হও যদি শ্মশান-আসন।
পোড়া হাড় অগ্নি বরিষণ,
সে তো হবে অঙ্গের ভূষণ!

সংসার শ্মশান হয় যদি
গৃধ্র, ফেরু, শিবার রোদন
বিশ্বে যদি উঠে নিরবধি,—
তবু রবে অটুট সাধন,

তবু হবে শ্মশানে শক্তির উদ্বোধন !
বিভীষিকা দাঁড়ায় আসিয়া,
তাড়াইব হেলায় হাসিয়া !

দেহ শক্তি—শক্তি অবিনাশী,
দৃঢ় হ'ক এ বাহু যুগল,
'ন্যায়' যদি সত্য ভালবাসি
তবে যেন না হই বিফল—
করিবারে দুষ্কৃতের দুরাশা বিফল।
নহে বৃথা জীবে প্রেম, ন্যায়ে রুচি ছার,
দুর্বলের আত্মগ্লানি সার।

যে শকতি অয়ি সর্বংসহা !
জন্মাবধি ন্যস্ত প্রতি নরে,
দেবশক্তি—রাজশক্তি তাহা,
প্রতি নর সম্রাট অন্তরে।
অত্যাচারে তাই প্রাণ চাহে দলিবারে।
সে শক্তি অমর কর তুমি,
ধান্যে ধনে পরিপূর্ণা ভূমি !

সিংহী তুমি অয়ি সর্বংসহা !
প্রতি নর সিংহের শাবক ;
খাদ্য, পেয়,—স্তন্য তব যাহা
স্বাস্থ্য-বল-শৌর্য-নিয়ামক,
সঞ্চারি শকতি সৃজে অন্তরে পাবক !
সে পাবক নিষ্কম্প নির্মল,
আত্মতেজ নির্ভর অটল।

হে কঠিনা ! ডুবেছে যে কভু
সেই জানে মহিমা তোমার,

ভাসি ডুবি—যত যুঝি তবু,
পায়ে ভূমি ঠেকেনাকো আর,
দৃঢ়স্পর্শ—সুখস্পর্শ ঠাঁই দাঁড়াবার!
কঠিনা!—কে বলে তোরে হেয়?
নির্ভর—কঠিন হওয়া শ্রেয়।

হে অচলা! ভূকম্প যে জন
কখনো করেছে অনুভব,
সেই বুঝে অচলের গুন;
চরাচর দোলে যবে সব—
সিন্ধু সম ভূমি যবে আরম্ভে তাণ্ডব,
গৃহ, তরু মাতালের প্রায়
টলে যেন পড়ে গায় গায়!

দীর্ণ দেশ বিষম জৃম্ভনে,
আর্তনাদে পূরিত অম্বর;
যদুবংশ দ্বারাবতী সনে,
ধনজনে পম্পাই নগর,
হ'ল যবে কবলিত,—তোমারি জঠর
পুনঃ স্থান দিল তা সবায়,
মৎস্য-নারী তুমি কি গো হায়?

তাহার অনেক যুগ আগে,
গঙ্গা সম কঠিন পরানে,
(কোন্ শান্তনুর অনুরাগে,
কে বলিবে—কেবা তাহা জানে)
গ্রাসিয়াছ আপনি গো—আপন সন্তানে।
অতিকায় মহাবলবান,—
তবু তোর তুষ্ট নহে প্রাণ।

ছিল শুধু পশুবলে বলী,
অপুষ্ট দুর্বল ছিল মন,
তাই বুঝি অঞ্চলে ঢাকিলি
বক্ষে লয়ে করিতে যতন।
গর্ভে পুনঃ দিলি স্থান কাঙ্গারু মতন।
বলসার স্তন্য করি পান
কবে তারা পাবে পুনঃ প্রাণ?

স্তরে স্তরে অন্তরে তোমার
এখন যে তাদের স্মিরিতি।
হয়ে আছে, অঙ্গারের ভার;
এখন যে জাগিতেছে নিতি
মসীময় তাহাদের অপূর্ব মূরতি;—
কত জীব এবে অস্থিসার;
কত তরু, পল্লব-সম্ভার।

এই সব জীব অতিকায়
পৃথ্বী তোর প্রথম সন্তান
আর কি পাবে না তারা হায়
আর কি পাবে না তারা প্রাণ?
নব তেজে মনোবলে হয়ে বলীয়ান?
এই যে অঙ্গার-তরু সব,
জানিবে না আর মধূৎসব

ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের মত
ধান্য-ধনে চির পরিপূর
হও তুমি অক্ষয় অক্ষত
দেহ জীবে স্তন্য সুপ্রচুর;
দেহ কান্তি, দেহ শক্তি, ক্লান্তি কর দূর

মানবের কামধেনু তুমি,
বলময়ী ফলময়ী ভূমি !

যুগ্ম সন্ধ্যা হানিছে তোমারি
লঘু মেঘ-অঞ্চলে কুঙ্কুম,
সগন্ধ মৃন্ময় রেণু ধরি
রচে রবি কিরণ-কুসুম !
হে ধরণী—বরণীয়া—মর্ত্যে কল্পদ্রুম।
ধূলি-পটে ফুটাও আলোক,
বরণের অনন্ত পুলক।

ধূলি বিনা রশ্মি সে নিষ্ফল,
বিনা দেহে আত্মা সে অক্ষম,
স্থূল বিনা সূক্ষ্ম হীনবল,
শৌর্য বিনা উত্তম অধম,
শক্তি বিনা প্রেমে জ্ঞানে অশান্তি পরম,
ত্রিশক্তি সে ত্রিমূর্তি দেবতা,
জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে একতা

মানুষ—মানুষ হ'ক ফিরে
প্রেমে, জ্ঞানে, শক্তিতে সমান ;
কি প্রশান্ত, অতলান্ত তীরে,
অর্ক-টীকা নীরে ভাসমান,
কি অন্তার্ক-সিন্ধুকূলে নিত্য তমস্বান্,
দ্বীপে, দ্বীপে, দেশে দেশে নর
আত্মবলে করুক নির্ভর।

মানবের বিরাট সংঘাত
এক দেহ হ'ক এক প্রাণ,

এক অঙ্গে বাজিলে আঘাত
সর্ব অঙ্গে পড়ে যেন টান,—
আঁখি ছুটে, বাহু উঠে হয়ে একতান ;
একের সাধিতে পরিত্রাণ
সবে যেন হয় এক প্রাণ।

অগ্নিবর্ষ—এশিয়া বিপুল,
উক্ষরূপী য়ুরোপ উদ্দাম,
উষ্ট্ররূপী আফ্রিকা অতুল,
আমেরিকা বন-বৃষ নাম,
কূর্ম সম পৃষ্ঠে ধরি কত পুরী গ্রাম,
পুরে, গ্রামে লোক দলে দল ;
ক্ষমতায় বহে অবিচল।

গ্রামে, গ্রামে, নগরে নগরে,
সংখ্যাতীত কুটীর প্রাসাদ ;
গৃহে, গৃহে, লোক নাহি ধরে,
জনে, জনে,—প্রমোদ, প্রমাদ ;
বিশ্বময় উঠে এক অপূর্ব নিনাদ !
নানা স্বর মিলে এক সাথে
কানে এসে পশে প্রতিবাতে।

বুদ্ধ, কৃষ্ণ, খৃস্ট, মহম্মদ—
'সারেগম' একই বীণার ;
সৌম্য কবি, বীরেন্দ্র দুর্মদ,
ভকতির—ভাজন—ঘৃণার ;
কি অপূর্ব বিশ্বরূপ মানব তোমার !
ভিন্ন স্বর এক বীণা 'পরে,
মিলেমিশে আনন্দে বিহরে !

ধর্মনীতি, বীরের বিধান,
কত না আচার মনোহর
নরমেধ, আত্ম-বলিদান,
আলিঙ্গন করে পরস্পর !
ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গনে যেন বৃকোদর ;
লৌহ-ভীম গুঁড়া হয়ে যায়,
শোণিত উগারে রাজা, হায় !

কত বীর—কত ধর্মবীর,
কত ঋষি,—কত শাস্ত্রকার,
কত শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ধীর,
কত কবি কিংকর আশার—
ভাঙিয়া গড়িছে কত অপূর্ব সংসার !
বিফলতা, বিরোধের মাঝে
এ অখণ্ড সুর কোথা বাজে ?

মানুষ সমান হবে নাকি
ধনে, মানে, শৌর্যে, প্রেমে, জ্ঞানে ?
সে ছবি কি দেখিবে এ আঁখি ?
একি মহাস্বপ্ন আজি প্রাণে !
বুঝায়ে দে—বুঝায়ে দে—অবোধ সন্তানে,
সর্বংসহা জননী আমার,
মৌন তুমি থেক না মা আর।

ওই শোন যত মহাদেশে,
যত মহাসাগরের তীরে,
কানাকানি করিছে উল্লাসে।
'মুক্তি পাবে মানব অচিরে !'
দগ্ধ করি বৈতরণী—বিস্মৃতির তীরে

লোকাচার—কুশপুত্তলিকা,
জ্বলিবে জ্ঞানের দীপ্ত শিখা!

কি বলিলি জননী আমার
কম্পিত পুলকে মম প্রাণ,
"যে-যা বলে—যে-যা কহে আর
কথায় দিয়ো না কারো কান,—
মানুষ আবার হবে সম্মানে সমান!
নতশির হবে রে উন্নত!
দূরে যাবে যত মনঃক্ষত!"

শক্তি দাও ছিঁড়িব শৃঙ্খল,
সর্ব্বংসহা!—সহেছি অনেক!
দূর কর সর্ব অমঙ্গল,—
দূর কর প্রভেদের ভেক;
মুক্তিজলে সর্বজনে কর অভিষেক!
মুক্ত হ'ব শক্তি কর দান,
দুঃখ হতে কর পরিত্রাণ।

শক্তিময়ী! শক্তি কর দান,
মুক্তির দেহ মা অধিকার,
অনুকম্পা কিংবা অবজ্ঞান
চাহি না মা চাহি না কাহার;
ঘরে পরে যোগ্যতা জানায়ে পুনর্বার
তবে যেন করি গিয়ে দাবী—
মানবের মহামুক্তি,—ভাবী!

হে ধরণী! অশ্রান্ত-গমনা!
চির-স্থিরা—লোকে তোমা জানে,

শব্দ নাই—আড়ম্বর কণা,
কার্য নিজ সাধিছ গোপনে,
ত্বরা নাই, শ্রান্তি নাই, এ শূন্য ভ্রমণে !
ত্বরাহীন কর তন্দ্রাহীন
শক্তির সঞ্চয়ে চিরদিন।

শক্তিময়ী ! স্তন্য কর দান,
হ'ক প্রাণে বলের সঞ্চার ;
মনে যত সংকল্প মহান্
কার্যে হোক পরিণতি তার,
প্রয়োগ ক্ষমতা মোরে দাও মা আমার !
অপ্রয়োগে মন্ত্র সে নিষ্ফল,
শৌর্য বিনা সকলি বিফল।

সর্বংসহা জননী আমার,
সহগুণে মণ্ডিতা ধরণী,
ধৈর্যে বল কর মা সঞ্চার,
দুঃসহ কি সহে চিরদিনই ?
নিভৃতে শিখা মা বিদ্যা অসুর-নাশিনী ;
নহে নষ্ট হয় প্রেম-যাগ,
দৈত্যে খায়—জ্ঞান-যজ্ঞ-ভাগ !

কর মোরে তোমার পূজারী,
হে ধরণী ! শক্তি স্বরূপিণী
কর মোরে সৈনিক তোমারি,
নারীরূপা ! নিখিলের রাণী !
শুধু, পূর্ণ মহিমায় চাহিয়ো আপনি,
আজ্ঞা তব বুঝিব অমনি,
প্রাণপাতে পালিব তখনি।

প্রাণ—সে তো তুচ্ছ অতিশয়,
স্থির মৃত্যু—জন্মেছে যে ভবে,
মৃত্যু সে তো ফিরে পায় পায়,
মরণেরে কেন ভয় তবে?
দুর্ভিক্ষে মরণ—মারী, ভূকম্প, আহবে,
সর্পাঘাতে, অগ্নির উৎপাতে,
দস্যু হাতে কিংবা বজ্রাঘাতে।

মৃত্যু যার চির সহচর
যোগ্য তার নহে মৃত্যুভয়।
বেদিয়া না ছাড়ে স্নাহাহার,—
কালফণী সঙ্গে তার রয়।
মিছে তবে—মিছে তবে মরণের ভয়;
অবহেলে ডমরু বাজায়ে,
কালফণী ফিরিব নাচায়ে!

নির্ভর—নিজের ক্ষমতায়
কবে হবে, ধরণী, সবার?
কতদিনে—কতদিনে, হায়,
হবে নর দেবতা আবার?
চৈতন্য, সিদ্ধার্থ, কৃষ্ণ, রাম অবতার!
কতদিনে হবে পুনরায়
জ্ঞানে, প্রেমে, শৌর্যে সমন্বয়!

সর্বংসহা! সংঘাত-কঠিনা!
নমোনমঃ জননী সবার,
কারে মোরা জানি তোমা বিনা?
দেহ, প্রাণ, সকলি তোমার।
তুমি সে সূতিকা-গৃহ, ক্রীড়াভূমি আর,

ফুলশয্যা, বাসর শয়ান,
তুমি পুনঃ অন্তিমে শ্মশান !

শ্রান্ততনু বালকের মত,
শয্যার আশ্রয় লই যবে
অর্ধরাতে—বর্তি নির্বাপিত,
ঘুমে যবে অচেতন সবে,
তুমি মোর ঘুম দাও নয়ন-পল্লবে ;
কোলে লয়ে আহ্লাদে আকুল,
চোখে মুখে পড়ে কাল চুল !

অন্ধকারে তন্দ্রা আসে ঘিরে,
কত দেখি বিচিত্র স্বপন,
মনে হয় তোর দেহে ফিরে
দেহ মোর লীন হয় পুনঃ,
তোর ক্ষেতে, গাঙে, মেঘে, এই তনু মন ;
শস্যে মিশি কখনো শিশুতে,
স্বপ্নময়ী বিচিত্র নিশীথে।

গন্ধ হয়ে রহি গো কুসুমে,
রস হয়ে বাস করি ফলে,
লঘু বাষ্প হয়ে মেঘে, ধূমে,
জ্যোতিরূপে বিদ্যুতে, অনলে,
শব্দরূপে পিক কণ্ঠে,—নির্ঝরের-জলে।
তনু মন প্রাণ মিশে যায়,
একে একে পৃথ্বী তোর কায় !

তবু রহে জ্ঞেয়ান অমর,
তবু সেই আনন্দ সম্বার,

তবু সেই শক্তিতে নির্ভর—
যে নির্ভরে আনন্দ অপার,
অসীমে মিশেও সাড়া পাই আপনার ;
তোর মাঝে দেখি আপনায়,
সিন্ধু মাঝে বুদ্বুদ খেলায় !

সর্বংসহা ! অগ্নি সর্বংসহা !
নমস্তে ধরণী ! নমস্কার,
একমুখে যায় না গো কহা
তাই মাতা বলি শতবার,—
মনস্কাম পূর্ণ কর আমা সবাকার ;
পূর্ণ নর দেখা, মা আমার,
মরধামে দেব অবতার।

ঘরে ঘরে দেবের স্বভাব,—
জ্ঞানে প্রেমে শৌর্যে সমন্বয় ;
ঘরে ঘরে সত্যের প্রভাব
একেশ্বর প্রভু যেন হয় ;
শক্ত বাহু, মুক্তকণ্ঠ, উন্মুক্ত হৃদয়,
হয় যেন জননী সবার ;
জনে জনে দেব অবতার।

ত্রিশক্তিতে পূর্ণ কর প্রাণ,
কর মাতা জনম সফল,
দেবত্ব মানবে কর দান,
স্তন্যে কর শরীর সবল,
জ্ঞানে পুষ্ট, প্রেমে তুষ্ট, সজীব সচল ;
শৌর্যে—কর প্রতিষ্ঠা সবার,
ত্রিপদ্ম-আসনে পুনর্বার !

সমীর

"Be thou, spirit fierce,
My spirit! Be thou me, impetuous one!"
—*Shelley*

হে সমীর, প্রাণবায়ু, আয়ু-প্রদ তুমি,
বিশ্বে তুমি প্রাণের উপমা!
প্রশান্ত সুন্দর কভু প্রচণ্ড উন্মাদ!
কবি বিনা কেবা চিনে তোমা?
নিরূপিতে গতি তব,
কত চেষ্টা অভিনব,
সব তুমি করেছ নিষ্ফল!
হে লোচন-অগোচর! হে চির-চঞ্চল!

চন্দ্রলেখা তোমারে করিছে আলিঙ্গন,
আলিঙ্গিছে অরুণ কিরণ!
তাহাদের প্রিয় তুমি, জীবন বল্লভ,
ওগো প্রিয়তম সমীরণ!
বিতরি নিশ্বাস বায়ু,
পুনঃ বিহঙ্গের আয়ু
ঝড়-রূপে কর তুমি নাশ!
কুসুম-বিকাশ ওহে বিটপীর ত্রাস!

উড়াও আকাশে ছিন্ন মেঘের পতাকা,
ঢেকে ফেলে রবির প্রতাপ!
ভীম হুহুংকার নাদে কাঁপে জল স্থল,
দর্পে কর চূর্ণ ইন্দ্রচাপ!
আবার সুধীর হয়ে,
খেল ঘরে ধূলি লয়ে,

ও চরিত্র কে বুঝিবে হায়!
কখন চুমিছ ধূলি—কখন তারায়!

এই তুমি করিতেছ মরণ-বিস্তার
গৃহে গৃহে মারী-বীজ দিয়া,
এই পুনঃ ফুটাইছ কুসুমের হাসি
জলে স্থলে গন্ধ বিথারিয়া!
মেরুপ্রান্তে যম রূপে,
নাসারন্ধ্রে পশি' চুপে,
কণ্ঠ চাপি রুধিছ নিশ্বাস!
চন্দন-পরশ পুনঃ মলয় বাতাস!

নবজাত শিশুর অন্তর-নীড়ে পশি'
কর তুমি সম্বন্ধ স্থাপন!
চির সহচর তুমি, তোমার বিরহে
অন্ধকার হেরি ত্রিভুবন!
তুমি আত্মা, বিশ্বপ্রাণ,
কর মোরে কর দান
মহাপ্রাণ তোমার মতন;
সদানন্দ, ছন্দকবি, প্রসন্ন পবন!

খেলাঘরে ধূলাখেলা, অনেক হয়েছে,
এইবার করো গৃহহীন;
ঘূর্ণবায়ু সম প্রাণ গ্রহে গ্রহান্তরে
ছুটে যেতে চাহে অনুদিন!
বেদুইন মরুচর,—
তাহার নাহিক ঘর,
বাস তার উন্মুক্ত সমীরে!
চল সখা, পরশিব শশাঙ্ক মিহিরে!

রুদ্ধ বারি পলে পলে হতেছে পঙ্কিল।
রুদ্ধ বায়ু বিষ হয়ে উঠে!
অসহ্য এ অবরুদ্ধ নিষ্কর্ম জীবন।
চল চল বাহিরিব ছুটে!
চল দেশ-দেশান্তরে।
মেরু প্রান্তে মরু 'পরে।
গৃহে প্রাণ রহিতে না চায়।
তরু সম মরিব কি জন্ম-মৃত্তিকায়?

বিহঙ্গ তোমারি প্রজা, তুমি জান তারা
কোন্ লোকে করে গো প্রয়াণ,
তোমারি কৃপায় তারা পথ না হারায়,
ফিরে আসে সুধা করি পান।
হে বায়ু! বিমান-রাজ!
আমারে দেখাও আজ,
মহাশূন্যে যত আছে পথ!
হব সহচর, পূর্ণ কর মনোরথ!

পাখীরা তোমার প্রজা আমিও তাহাই,
প্রাণ মোর পাখীর সমান;
পাখীরা শোনায় গান, আমিও শোনাব
বিশ্বপ্লাবী সঞ্জীবন গান!
কীচকের রন্ধ্রে পশি',
তুমি বাজাইলে বাঁশী
গাহি প্রেম, মান, অভিমান;
যুদ্ধ গা'ব, পাঞ্চজন্যে তোল তুমি তান!

হে অরূপ, হে অবর্ণ, হে বর্ণনাতীত!
বিশ্ব ঘোষে তোমার মহিমা!

ভাগে ভোগ করে ধরা আলো অন্ধকার ;
তোমার রাজ্যের নাহি সীমা !
জ্ঞান, প্রেম, শক্তি যথা,
তুলিতে না পারে মাথা,
তুলে শির উৎসাহ সেথায় !
যাহার স্বপক্ষে তুমি—তাহারি সে জয়।

বহ্নির আত্মীয় হয়ে দাবদাহ কালে,
ভস্মশেষ কর মহাবন !
তুমি সে বিরূপ হলে চক্ষের নিমেষে
নিবে যায় চণ্ড-হুতাশন !
তুমি তুষ্ট হলে পরে
কুসুম স্ফুরিয়া—করে
বিশ্বজনে আনন্দ প্রদান ;
রুষ্ট হলে কোরকেই হয় অবসান।

ভাসিছে তোমার স্রোতে পুঞ্জদ্বীপ সম,
কত মেঘ—বৃষ্টি-বিন্দু-কারা ;
মহাসিন্ধু হতে তুমি সিন্ধু মহত্তর,
অনন্তের অন্তহীন ধারা !
অনন্ত জীবন তুমি,
প্রাণের আবাস-ভূমি,
চিরন্তন আত্মার ভাণ্ডার !
আয়ুষ্কর ! আয়ুহর ! আয়ুর আধার !

বহিতেছে দুর্বাসার শাপবাক্য তুমি,
বহিতেছ সীতার রোদন
বহিতেছ রাবণের লালসার শ্বাস,
ভীমের সে প্রতিজ্ঞা ভীষণ !

ভীষ্মের অটল বাণী,
শকুনির কানাকানি,
গান্ধারীর ক্ষুব্ধ হাহাকার !
তোমারে বিদীর্ণ করি ছুটেছে চীৎকার

বহ তুমি উচ্চ নীচ ক্ষুদ্র মহতের
অন্তরের সাগ্রহ প্রার্থনা,
কিন্তু কোন্ দেশে হায় ! কিন্তু সে কোথায়,
বল মোরে, শুনিতে বাসনা ;
এই যে ক্রন্দন-ধ্বনি,
নিত্য আসিতেছ শুনি
প্রতীকার কি করিছ হায় ?
হৃদয় কি জেগে আছে মিথ্যা প্রতীক্ষায় !

দর্পহারী ! ক্ষুদ্র তৃণ খেলে তোমা সনে,
আয়ু তার নাহি লও কাড়ি,
কিন্তু যেই বৃক্ষ তোলে মস্তক গগনে।
ফেল তারে সমূলে উপাড়ি !
যে পর্বত চুমে নভঃ,
কঙ্কর-প্রহারে তব
দিন দিন হয় তার ক্ষয়।
প্রকাণ্ডে দলিয়া গাও সামান্যের জয়।

পরশ—পরশ-মণি তোমারি সে দান,
হে চন্দন-কানন-নিবাসী !
হাসিতে রোদনে সদা তুমি দাও তান,
বিশ্ব জুড়ি বাজে তব বাঁশী !
বজ্রের দামামা কাড়া,
পাপিয়ার নৈশ সাড়া,

তোমারি বীণার ভিন্ন স্বর।
কর মোরে বজ্র দৃঢ়, সংগীত মধুর!

প্রচণ্ড মার্তণ্ড তাপে তুমি নাহি দহ
এসে শুধু ধূলির সমীপে,—
তাহারি জ্বালায় জ্বলি জ্বালায় বারতা
আপনি প্রচার' সপ্তদ্বীপে!
আমিও একান্তে রহি'
দুঃখ অনায়াসে সহি,
কিন্তু হায় দুঃখীর ক্রন্দন
অসহ্য সে, তাই গানে করি সে ঘোষণ।

অসহ্য সে অক্ষমের পরে অত্যাচার;
রাজ্যেশ্বর, পথের ভিখারী
সমান ন্যায়ের চোখে; মানুষ সবাই;
অধিকার সমান সবারি।
ওই কথা নিশিদিন
গাহিতেছে মনোবীণ,
ওই কথা প্রচারি ভূতলে
আমি শুধু কঙ্কর প্রহারি গিরিদলে।

দংশকের আক্রমণে অস্থির কুঞ্জর,
ক্ষয় গিরি কঙ্কর আঘাতে,
ভেঙে পড়ে হর্ম্যচূড়া শব্দের সংক্ষোভে,
ক্ষর শিলা বিন্দু বারি পাতে!
ক্ষুদ্র করে মহাকাজ,
ক্ষুদ্র দিতে পারে লাজ
জ্ঞান বৃদ্ধ হয়ে প্রবীণেরে!
পরাজিল শিশু রাম প্রৌঢ় ভার্গবেরে!

ছাড় তবে তপ্তশ্বাস, প্রলয় বাতাস,
আমি সাথে ছুটাই আগুন,
দাবানলে দগ্ধ হ'ক মিথ্যা-লোকাচার,
তুমি আমি আজি সমগুণ !
ভস্ম হবে বহু প্রাণী
হায়, তবু স্থির জানি—
সে ভস্মে উর্বরা হবে ধরা ;
ঘুচিবে জঙ্গল, হবে শস্য-শ্যামা ত্বরা !

নববীজে আরম্ভিব বপন রোপণ,
নববীজ—সত্য অভিনব !
মানবের মহাসংঘ জাগি সেই দিন
ভ্রাতৃভাবে মিলিবে রে সব
জাতি বর্ণ নির্বিশেষে
সবাই মিলিবে এসে ;
বিরোধী পৃথক্ ইতিহাস
হবে মাত্র পুরাতত্ত্ব—হবে পরিহাস।

সেই মহা-মিলনের দিনে সমীরণ !
হয়ো তুমি প্রসন্ন বাতাস ;
সে দিন আমার গান তোমা সনে মিলি
আকাশে তুলিবে কলহাস।
মোরে চিনিবে না তারা,
আমি কিন্তু আত্মহারা
মিশে যাব তাদের উল্লাসে !
স্তব্ধ রবে আজি যারা ব্যস্ত উপহাসে।

হায় বায়ু, দর্পী তরু শুষ্ক পত্র ফেলি
তোমারেও করে উপহাস !

কোথা রহে দর্প তার, সে রহে কোথায়
ছাড় যবে প্রচণ্ড নিশ্বাস!
ইচ্ছা করে তোমা সম
জন্ম পেতে, নিরুপম!
ঝড়ে ঝড়ে কাটাতে জীবন।
হ'ক সে শোভন কিবা হ'ক অশোভন!

কতদিন ফিরিব হে সংসারের মাঝে
গণি গণি চরণ ফেলিয়া?
কতকাল যাবে আর ভাবিয়া চিন্তিয়া—
ছেলেখেলা প্রত্যহ খেলিয়া?
বাঁচাই সকল দিক,
তবু সে হয় না ঠিক,
কিছুতেই নহি নিরাপদ,
বাঁশরী বাজাই সর্পশিরে রাখি পদ

সর্ব স্বার্থ পণে কেনা মানুষের প্রেম
কারো ভাগ্যে হয় সে কপট
যন্ত্রণা-মরণ পণে গর্ভের বহন,
পুত্রমুখ দর্শন দুর্ঘট!
সব নিরাপদে রেখে
পেতে যাহা চাহে লোকে
হায় তার মূল্য কিছু নাই!
যেথায় অমূল্য মণি ভুজঙ্গ সেথাই!

সর্বত্যাগে ব্রাহ্মণত্ব, বিদিত সংসারে,
রাজত্ব সে জীবন সংকটে!
বাণিজ্যে সর্বস্ব পণ,—মূলমন্ত্র হায়,
নিরাপদে কোন্ শুভ ঘটে?

অনেক কণ্টক মাঝে
একটি কমল রাজে,
অনেক অশুভ মাঝে শুভ!
অনেক হারাতে হয়—পেতে হলে ধ্রুব।

হে সমীর, হে অধীর, হে শান্ত মলয়,
কর মোরে তোমার সমান ;
মানব-মুকুল যেন আমার ভাষায়
ফুটে ওঠে লভি' নব প্রাণ।
আমার এ গানে পুনঃ
সকল বন্ধন যেন
ছিঁড়ে উড়ে বিশ্ব ছেড়ে যায়,
বিরাট মানব জাতি মিলে পুনরায়।

'জীবন' কাহারে বলে, শিখাও সমীর,
শিখাও হে 'বাঁচা' কারে বলে ;
নিত্যমুক্ত মানুষ না জড় হয়ে পড়ে,
সূক্ষ্ম অতি লাভ ক্ষতি গণনার ফলে।
গাও হে উৎসাহ গান,
পূর্ণ করি তোল প্রাণ
অভিনব শুভ মন্ত্রণায়;—
মানুষ মানুষ যাহে হয় পুনরায়।

হে সমীর! প্রবেশিয়া সম্রাটের বুকে,
জন্মিয়াছ উচ্চ-আশা হয়ে ;
দরিদ্রের বুকে পশি দীর্ঘশ্বাস-রূপে
বাহির হয়েছ বহ্নি লয়ে,
আমার মরম মাঝে
যে লেখা দেখিলে আজ

বিশ্বে তার কর হে প্রচার,—
সকল বন্ধন হারা আনন্দ অপার !

আজি হতে যে করিবে নিশ্বাস-গ্রহণ
সেই সে করিবে অনুভব
হে বায়ু, তোমার সনে আমার বুকের
যত কথা, যত সুর—সব !
সে কভু ভুলিবে না হে
আমার প্রাণের-দাহে,
আমাদের উৎসাহ বচন,
চাহিবে মানব পানে উজ্জল লোচন।

আবেগের স্রোতে নব ভাবের প্রবাহে
ভেসে যাবে ত্বরিতে পরান,
নূতন আনন্দ-লোকে, ওহে সমীরণ !
শুনিবে সে আনন্দের গান।
চকিতে দেখিবে চেয়ে,
সমস্ত জগৎ ছেয়ে
আনন্দে, ধরিয়া হাতে হাত,
গাহিছে মিলন-গীতি মানব-সংঘাত।

সে দিন কোথায় আমি রহিব জানি না,
তুমি রবে এমনি সমীর !
হয় তো পড়িবে মনে আমার এ গান
ভুলে যাবে হয় তো অধীর !
যুগে যুগে গান করি
কত পাখী গেছে মরি ;
আজ পুনঃ শুনি কলতান,
মনে কি পড়ে না হায় তাহাদের গান ?

আমি জানি কোন কথা ভুল না হে তুমি,
হারানো কথার তুমি খনি।
যৌবনের তাপে তাই তপ্ত হয়ে ওঠ—
পিককণ্ঠ শুন গো যখনি!
যখনি বসন্ত প্রাতে
কোকিল সংগীতে মাতে,
ফুল কলি আঁখি তুলি চায়।
আমি দেখিয়াছি সব ঢেক না আমায়!

হে সমীর! তোল তবে উৎসাহের তান,
বিশ্ব যেন রহে সচেতন!
আমিও তোমার সনে গাব সমস্বরে,
যতদিন না আসে মরণ।
আমি গেলে—দেখ দেখ
এ গান জাগায়ে রেখ
মিলনের সংগীত মহান্
নবোৎসাহ সঞ্চারিয়া—দিয়ো নব প্রাণ!

যে আছে প্রেমিক, ওগো, যেবা জ্ঞানবান,
শক্তিমান যে আছে ধরায়,
তাহারে শোনাও, বায়ু, এ মহা-সংগীত,
মহোৎসাহে মাতাও ত্বরায়!
শোনাও সকল লোকে,
অন্ধ, দীন, পঙ্গু, মূকে,
যন্ত্রণার অবসান গান।
মহোৎসাহ-মহোৎসবে পূর্ণ কর প্রাণ!

সিন্ধু

"—Boundless, endless, and sublime
The image of Eternity—the throne
of the Invisible."—Byron

হে রহস্য-নিকেতন! সিন্ধু সুমহান্!
হে ভাস্কর-করোজ্জ্বল জল!
পরিয়া হিরণ্য দ্রাপি বিরাট শরীরে,
কর গান আনন্দ বিহ্বলে!
অতলান্ত, নিত্যতমঃ,
গূঢ় তুমি মৃত্যু সম,
ইহলোকে পরলোক তুমি!
হে সমুদ্র! অদ্ভুতের নিত্য-লীলাভূমি!

ছায়া সম—স্বপ্নোপম প্রজাগণ তব
চিরকাল নিঃশব্দ নির্বাক!
জল-গুল্ম ধরে, মরি, সচল-স্বভাব
রাজ্যে তব,—অবাক, অবাক!
অসিচঞ্চু কেহ হায়,
কেহ চলে অষ্টপায়,
একাধারে ধরে নানা রস!
স্বচ্ছ-সুপিচ্ছিল তনু তরুণ-পরশ!

চরণে নিশ্বাস লয়ে প্রাণ ধরে কেহ,
স্ত্রীপুরুষ কেহ এক দেহে,
নিজ দেহ কাটি কেহ খণ্ডে খণ্ডে বাঁচে,
বহু একে পার্থক্য না রহে!
কোন জীব আঁতে দাঁতে,
মুখে না, চিবায় আঁতে!—

ঘুচালে হে লিঙ্গ ও বচন !
ঘুচালে সহজ জ্ঞান—গেল ব্যাকরণ !

মক্ষিলতা—লতা হয়ে গ্রাসে মক্ষিকায় !
রক্ত শ্বেত প্রবাল পঞ্জর—
ধরে কিবা গুল্ম শোভা নয়ন রঞ্জন
ছিদ্র-ঘন মনোজ্ঞ-সুন্দর !
অপূর্ব শম্বুক চয়,
কপর্দ কঙ্কালময়,
শোভে তটে যেন অট্টহাস !
নিঃশব্দে শিখিছে শঙ্খ সংগীত উদাস !

সচল দ্বীপের মত যোজন যুড়িয়া,
চলে তিমি শৈবালে চর্চিত !
রাজশঙ্খ—অঙ্গে অঙ্গে রামধনু আভা ;
মুক্তা-প্রসূ—ত্রিলোক বাঞ্ছিত !
বরুণ—আসে না আর,
পান-পাত্র আজ তার
আছে পড়ি আলয়ে তোমার !
রতির বীজন-বৃন্ত সৃষ্টি চারুতার !

কতদিন সন্ধ্যারাতে দক্ষিণ পবনে,
পেয়েছি হে তব আলিঙ্গন !
টেনেছে মরণ-টানে পরান আমার
তব গান,—ভৈরবে মোহন !
উদয়াস্ত রবিচ্ছটা,
প্রলয় মেঘের ঘটা,
সব সাজে সাগর তোমায় !
দিবসের তীব্র আলো, তমিস্র নিশায় !

প্রশান্ত যখন তুমি, অন্তরে তখন
জাগে ভয় দেখিয়া তোমায়!
ক্ষুব্ধ যবে ঝটিকায়, সুন্দর তখন,
তখন তোমায় প্রাণ চায়!
কি এক মোহের টানে
ধায় প্রাণ তোমা পানে
লালসা, কামনা, অনুরাগে!
জাগে না মরণ-কথা, ভয় নাহি লাগে!

কত সুরে, কত ছলে, ডাক গো আমায়,
রাত্রিদিন প্রভাত-সন্ধ্যায়!
মন্দ আন্দোলিত তব ওই বক্ষস্থল
নিশিদিন পরান লোভায়!
ওই—ওই কলহাসি,
বাজায় ব্যাকুল বাঁশী,
টানে প্রাণ অকূলের পানে!
শয্যা ত্যজি উঠিয়াছি মুগ্ধ ওই গানে!

ডাক গো আবার ডাক মহামন্ত্র রবে,
শোনাও মরণ-ভোলা গান!
নিথর নক্ষত্রমালা ডুবিবার আগে
আমারে মিলন কর দান।
আঁধার মাথায় লয়ে
কাহারা চলেছে বেয়ে?
ঢেউ মাঝে তরণী মিলায়!
তুমি জান' কোন্ পথে তারা আসে যায়।

জাগিছে শৃঙ্খলাহীন মগ্ন গিরি-শির,
তমঃশিলা ক্ষয় তিলে তিলে;

ডুবে জাগে শতবার ফেনিল লহরে
বালুচর অকূল সলিলে।
তরী লয়ে যারা যায়
পথ তারে কে চিনায় ?
যদি তারা ডুবে এ পাথারে ?
তারা কি মরণ ভুলে ভেসেছে সাগরে ?

হে সিন্ধু ! আমিও আজি মরণ বিস্মৃত !
কেবা আমি ধরণীর মাঝে ?
পৃথ্বীদেহে অতি ক্ষুদ্র রক্তশোষী কীট,
এ জীবন লাগিবে কি কাজে !
তাই আসিয়াছি আজ
ঘুচাতে সকল লাজ
ঝাঁপ দিতে তরঙ্গ মাঝারে ;
মহাপ্রাণে মিশাইতে ক্ষুদ্র এ—আমারে।

সচল পর্বত সম ঢেউ আসে ছুটে,
এখনি কি পড়িবে আছাড়ি ?
কিবা সে প্রকাণ্ডতর ঢেউয়ে যাবে মিশে
দিবে শেষ জলস্থল নাড়ি ?
মরিব ঢেউয়েরি সনে,
লক্ষ ঢেউ যেই ক্ষণে
এক হয়ে—হয়ে সুমহত—
ভাঙিয়া পড়িবে শেষে গলায়ে পর্বত।

ঘুচে যাবে ব্যবধান, বাধা ও বন্ধন,
সপ্তসিন্ধু মিলিবে আবার !
কোলাকুলি হবে পুনঃ লহরে লহরে,
আজ নাহি পরিচয় যার।

সাজিয়া কিরণ বাসে
অপ্সর শিশুর হাসে
পূর্ণ হয়ে যাবে চরাচর!
এক হবে কৃষ্ণ, পীত, তুষার সাগর।

প্রাণের সে রাজ্য হবে, ভাবের সংসার,
শক্তি প্রেম জ্ঞানের মিলনে;
বহিবে উৎসাহ বায়ু জাগায়ে ভুবন,
হর্ষ রবে জীবনে-মরণে।
সোম হবে স্নিগ্ধতর,
সবিতা উজ্জ্বল আর'
চিরশ্যামা সর্বংসহা ধরা,
সমীরণ অনুকূল, সিন্ধু মুক্তি-ধারা!

বসে আছি সেদিনের পথ চেয়ে হায়,
দিন যায়, জীবন ফুরায়;
দেশান্তের পান্থ পাখী দেশ ছেড়ে যায়,
তুমি জানো কেন সে পলায়।
মোরেও লইয়া যাও,
মোরেও দেখায়ে দাও,
আনন্দের চির নিকেতন;
শান্তির প্রদীপ যেথা মঙ্গল-কেতন।

হে সাগর আজি তব স্নিগ্ধ উপকূলে,
দেখিনু যে অপূর্ব স্বপন,
সে কি সত্য হবে কভু হবে কি সফল?
কহ মোর জীবন-মরণ!
এই যে চিত্রের মেলা,
এই যে ঢেউয়ের খেলা,

ইহা কী হবে না চিরন্তন ?
চিরদিন ব্যথা রবে—রহিবে ক্রন্দন ?

ফুকারি সমুদ্র-পাখী উঠে যে কাঁদিয়া
পরক্ষণে হাসে হা-হা স্বরে !
এ কি হায় দৈববাণী—বল রত্নাকর,
প্রত্যয় না হয় শকুন্তেরে।
মন গাহে ভিন্ন গান,
সে কহিছে অবসান—
একদিন হবে বন্ধনের !
এ জগৎ কেবলি তো নহে অশুভের।

অশুভের রাজ্য এবে, ভুল নাহি তায়
অধিকার চিরস্থায়ী কার ?
শুভশক্তি আজিও যুঝিছে প্রাণপণে
একদিন জয় হবে তার !
তখন ঘুচিবে ভেদ,
ঘুচিবে সকল খেদ,
সেই দিন এ বিশ্ব-ভুবনে—
মরণে ফলিবে শুভ, মঙ্গল জীবনে !

জীবন-মরণ—হবে দিবা বিভাবরী,
নাহি রবে বিরক্তি সংশয় !
পূজ্য হবে মনুষ্যত্ব সকলের আগে,
মান্য হবে মানব-হৃদয় !
জীবনে ফলিবে শুভ,
মরণে মিলিবে ধ্রুব,
হবে নর বিরাট-মানব !
জলের মিলনে যথা সিন্ধুর উদ্ভব।

যে জলে করেছে কেলি কার্ত-বীর্যার্জ্জুন,
লয়ে শত সহস্র অঙ্গনা!
যে জলে রক্তাক্ত করি দিয়েছে তৈমুর,
যে জলে জানকী নিমগনা,
যে জলে যুগান্ত ধ'রে
পূজার্চনা করে নরে
সকলি এসেছে তব ঠাঁই,
মিলে এক হয়ে গেছে, ভেদ আর নাই।

হে সিন্ধু! গর্জন গান গাহ পুনর্বার,
গুহাতলে তুলি প্রতিধ্বনি ;
ধ্বংস করি বাধাবিঘ্ন, বিদারি' পর্বত
গাহ পুনঃ লক্ষ কণ্ঠে,—শুনি!
কহ মহা-কূর্ম-বরে,
"সহিছ কেমন করে
বহিছ দুষ্কৃত পৃষ্ঠোপরে ?
ঘুচাও ধরার ভার, নাশ' অধর্ম্মেরে!"

ওই—ওই ভেসে যায় দণ্ড সুবিশাল,
বারংবার ডুবিয়া-ভাসিয়া,
ও কি ভগ্নশেষ কোন অর্ণবযানের ;
কার ভাগ্য ফেলিলে গ্রাসিয়া ?
লয়ে রত্ন লয়ে প্রাণ,
ফিরায়ে করিছ দান
ভগ্নতরী—শব উগারিয়া ?
ফেলিতেছ ভুক্তশেষ কূলে আছাড়িয়া ?

হে সমুদ্র! হে বিচিত্র! হে সংসার-রূপী!
ঘুচাও হে আমার সংশয় ;—

ওই যে তরঙ্গ তব উঠে আস্ফালিয়া,
হে অনন্ত! ওকি ফণাচয়?
কেবল—কেবল বিষ—
উগারিছ অহর্নিশ?
মন্দ-ভাল দুই নাশ' ক্রূর!
হে সমুদ্র! হে সংসার! হে সর্প নিষ্ঠুর!

চিরকাল রহিবে কি বিচিত্র কেবল
শত কণ্ঠে শত ভাষা কহি'?
শত পথে শত মতে হট্টগোল তুলি,
ভ্রমিবে অদ্ভুত বোঝা বহি'?
তরঙ্গে তরঙ্গ হানি
জ্ঞাতি-সূত্র নাহি মানি
কেবলি কলহে হবে চূর?
হে সমুদ্র! হে সংসার! হায় সর্প ক্রূর!

তোমায় মথিব পুনঃ সুরাসুরে মিলি'
হে সমুদ্র! হে বিশ্ব সংসার!
অমৃত ছানিয়া লব বিষ-সিন্ধু হতে,
মিল শুধু হ'ক একবার!
হাঙ্গর কুম্ভীর মাঝে
আমি জানি রত্ন আছে,
তমোময়! হে রহস্যময়!
পুরাতনে ভাঙি, গাও, নূতনের জয়।

পুরাতনে চূর্ণ করি ডুবাও সলিলে,
বহুদিন খর সূর্যতাপে—
দহিছে সে;—স্থান তারে দাও নিজ বুকে,
দহিছে অন্যায়-মহাপাপে!

নূতন ন্যায়ের দেশ
গড় তুমি, ঊর্মি-কেশ!
সেথা পুনঃ দেখিলে অন্যায়,—
ভেঙে দিও—ডুবাইও—প্রচণ্ড বন্যায়।

আজি বিশ্বে বিতরিছে দক্ষিণ পবন
পুষ্পগন্ধি ধরায় নিশ্বাস ;
দূর দেশ হতে যারা আসিছে বাহিয়া,—
শ্রান্ত প্রাণে লভিল আশ্বাস!
মজ্জমান ভগ্ন-পোতে
অসহ্য লবণ স্রোতে
লভি' যেন সলিল সুস্বাদ
নাবিকের মন লভে কূলের সংবাদ!

আজি এই বালুচরে বসিয়া একাকী,
আজি এই দক্ষিণ পবনে,
অতি দূর—গ্রহান্তর হতে মৃদুগান—
পশে আসি আমার শ্রবণে!
ওগো ভিন্ন গ্রহবাসী!
কি গান গাহিছ বসি'—
তোমাদের সমুদ্রের তীরে ;
ডাকিছ কি আমাদের? বলো, শুনি ফিরে!

হে সাগর! রশ্মি-রেখা নাচিছে হাসিয়া!
হাসিতেছ তুমি কলস্বরে!
কি যেন গোপন আজি রাখ মোর কাছে!
যেন তাহা বলিবে না মোরে!
ঊর্মি করে কানাকানি,
গ্রহে গ্রহে জানাজানি,

কেন শুধু আমায় গোপন !
বলো, বলো, জাগরণে করো না স্বপন।

হাসিয়া লুকাতে কেন চাহ বারবার,
ফুটে উঠে ফেন-শুভ্র-হাস !
মঙ্গল-বারতা তুমি পেয়েছ নিশ্চয়,
মিলনের মহান্ আশ্বাস !
কখন বর্ষণ ছলে
ত্রিলোকের সন্ধিস্থলে—
ক্ষণপ্রভা বলেছে তোমায়,
বৃষ্টি বিন্দু—কলস্বরে সায় দেছে তায় !

দেশে দেশান্তরে মিল যুগে যুগান্তরে !
অনন্তের অনন্ত মিলন !
লোকে লোকান্তরে মিল গ্রহে গ্রহান্তরে।
গাহ সিন্ধু সংগীত নূতন !
অচেত চেতনে মিল !
জীবনে-মরণে মিল।
জন্মে জন্মান্তরে সম্মিলন !
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু ! করহ ঘোষণ !

স্বর্ণগর্ভ

"মাতর্মেদিনি তাত মারুত সখে তেজ স্ববন্ধো জল
ভ্রাতর্ব্যোম নিবদ্ধ এষ ভবতামন্ত্যঃ প্রণামাঞ্জলিঃ।
যুষ্মত্‌ সঙ্গ বশোপজাত সুকৃতোদ্রেক স্ফরন্নির্মল
জ্ঞানাপাস্ত সমস্ত মোহমহিমা লীয়ে পরেব্রহ্মণি ॥"

হে অসীম ! স্বর্ণগর্ভ ব্যোম !
হে বিরাট ! ব্রহ্মাণ্ড-উদর !

কুক্ষিতলে লক্ষ সূর্য সোম,
তবু তুমি তমঃ কলেবর !
কোথা আদি কোথা শেষ—
কই তব কাল দেশ ?
বিশ্বাধার ! অচ্যুত ! অক্ষয় !
গুণহীন গুণের নিলয় !

কোথায় অসংখ্য তারা জ্বলে ?
অনাদি অনন্ত অন্ধকারে !
কোথায় হাজার ভেলা চলে ?
অকূল অতল পারাবারে !
নিশীথে প্রান্তর দেশে
ধুনি জ্বেলে আছি বসে ;
রশ্মিছত্র বেড়ে উঠে যত—
আঁধার-চত্বর বাড়ে তত !

হা অনন্ত আঁধারের গ্রাস !
হা আলো—খেলানা আঁধারের ;
অসত্যের মাঝে করি বাস,
হায় হায় কি হবে সত্যের !
গ্রহ, রাশি, সূর্য, সোম,
জ্যোতির্ময় তারাস্তোম,
কতটুকু এনেছে জীবন ?
কতটুকু আলোক স্পন্দন ?

অপরূপ ! স্বরূপ তোমার
তিন লোকে কে পারে বর্ণিতে ?
নাহি পাই স্পর্শ সুষমার,
নাহি পাই মাধুরী ভুঞ্জিতে ;

বর্ণের বিকাশ নাই,
গন্ধের বিলাস নাই,
নাই নাই সংগীত ঝঙ্কার ;
মুগ্ধ তবু অন্তর আমার !

তবু যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি—
মনে-প্রাণে স্বস্তি আর নাই,
অন্ধকারে হয়ে কাছাকাছি
সারারাত বসে আছি তাই ;
তুমি আছ আমি আছি ;
জানিতে পাইলে বাঁচি—
মোদের সম্বন্ধ চিরন্তন,
পুরাতনে নিয়ত নূতন !

এ কি মোহ ? এ কি ইন্দ্রজাল ?
মায়াধর—প্রাচীন সংস্কার ?
তারি ভাবে দেখি কি খেয়াল—
মূর্তি ধ'রে আসে বাক্য তার ?
স্বপনে রে সত্য ভাবি,
পরিচয় করি দাবী ?
মিথ্যা করি মনে রে পীড়ন ?
একি ব্যঙ্গ ? হায় মুগ্ধ মন !

নয়ন মেনেছে পরাজয়।
ঊর্ধ্ববাহু ব্যর্থতা প্রচারে ;
তবু মোর সদা মনে হয়
একেবারে ডুবিনি পাথারে।
কৌতুহলে করি সাথী
কাটাই তিমির রাতি ;

যে তিমিরে স্বদূর তপনে,
খদ্যোত বলিয়া হয় মনে।

এ তিমিরে নাহি গ্রহ, রবি,
কেহ নাই কিছু নাই হায়!
করমে আনন্দ বড় লভি'
জেগেছি গো শুধু সে আশায়!
দোহদ-ব্যথার মত
দুর্লভের মোহ যত
আকুল করিল প্রাণ-মন,
তাই ডালি দিনু এ জীবন।

নিজেরে বিপন্ন করি নিজে!
সেই এক আনন্দ নূতন!
পুনঃ বাঁচি হর্ষ তাহে কি যে—
কে করিবে তাহার বর্ণন?
সাগরে ভাসায়ে ভেলা
সারাবেলা হেলাফেলা,
কে জানে সে ভিড়িবে কোথায়?
নূতন বন্দরে কিবা অতল তলায়?

হে হিরণ্যগর্ভ! হে আকাশ!
তোমার ও অরূপ সলিলে
আছে বহু আবর্তের ত্রাস,
অপরূপ—তুমি হে নিখিলে!
আবর্তের নাভিস্থলে
ঘূর্ণিজলে উঠে জলে—
এক এক সূর্য সমুজ্জ্বল!
ডুবে ভেসে ফিরে গ্রহদল।

স্বর্ণনাভ সে আবর্ত হতে
যেই গ্রহ যতদূরে চলে,
শব্দহীন মন্দীভূত স্রোতে
নির্বিকার নিস্তরঙ্গ জলে,—
সে কি তত শান্তি পায়,
তত তৃপ্তি লভে ? হায়,
কিবা সেই ধন্য ত্রিভুবনে
ফিরে যেই আবর্তের টানে !

হে বিরাট ! ওহে বিশ্বরূপ !
তোমার ও দেবদেহ মাঝে,
শুভ্র, শ্যাম, কুৎসিত, স্বরূপ,
ভাল, মন্দ, সমানে বিরাজে।
নিবিড় পল্লবদলে
বর্ণে, রূপে, পরিমলে,
ফুল হাসে তারার মতন ;
কে ধন্য অধন্য কোন্ জন ?

যে সবিতা সার্থক হেথায়,
অন্যলোকে সেই সে নিষ্ফল !
যে সুধাংশু হেথা দীপ্তি পায়,
লোকান্তরে পিণ্ড সে কেবল !
সর্বংসহা এই ধরা,
মাতা যারে বলি মোরা,
ভিন্ন গ্রহে—গ্রহ মাত্র হায় !
অগোচর এই সিন্ধু বায় !

হেথা যার মূল্য কিছু নাই,
অমূল্য সে অন্য কোন দেশে ;

আজি যারে বলিতেছি 'ছাই,'
প্রাণাধিক ছিল কালিকে সে!
যে তত্ত্ব নূতন বলি'
মাথায় নিতেছি তুলি,
আজি যারে করি আবিষ্কার,
কাল কেহ পুছিবে না আর!

হে মহান্! সকলি নিষ্ফল
ব্যবহার না জানিলে তার,
হে উদার! সকলি সফল
জানিলে প্রকৃত ব্যবহার!
বিকারে গরলে মধু,
নহিলে—গরলই শুধু,
হে মৃত্যু! হে অমৃতের রাজা!
তোমা ছাড়ি'—কারে করি পূজা!

বর্ণহীন তুমি হে আকাশ!
নীলকান্ত—মানুষের চোখে,
তোমার কি জাগে অভিলাষ
রূপে ধরা দিতে নরলোকে?
মানুষের প্রেম, হায়,
তোমার কি প্রাণ চায়?
সূর্যশশী ভাণ্ডারে যাহার,—
প্রাণ পেতে প্রাণ কাঁদে তার?

নীলোৎপলে পরাগের মত
গর্ভে তব সূর্য কোটি কোটি!
পরমাণু সম গ্রহ যত
রসে ফিরে উলটি-পালটি!

স্বর্ণগর্ভ! বিশ্বাধার!
তত্ত্ব জানে কে তোমার?
স্বর্ণসূত্রে শুধু অনুভব,—
জ্যোতির্ময় আনন্দ উৎসব!

হে হিরণ্যগর্ভ! হে উদার!
পক্ষপুটে রাখিয়াছ ঢাকি'
স্বর্ণডিম্ব—সোনার সংসার;
হে আদিম! হে অপূর্ব পাখী!
স্নেহ তব সুগভীর,
নাহি তল নাহি তীর,
নাহি তাহে তরঙ্গ চঞ্চল;
শুধু শান্ত রক্ত চলাচল।

তরঙ্গিত সাগর বিশাল,—
শেষ যার ধরণীর শেষে,
ক্ষুব্ধ তার গর্জন করাল
ডুবে যায় মৌন তব দেশে;
ভাবের স্বপন-কায়া,
মনের জগতে, মায়া
বিরচন করি যেন ফিরে—
নিঃশব্দে ও তিমির-শরীরে!

আছ তুমি সকলের মাঝে,
তবু যেন নাই কোন ঠাঁই;
দেহে তব ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে,
তবু তুমি নির্লিপ্ত সদাই!
নাট্যলীলা, নিত্য নব,
দ্রষ্টাভাবে অনুভব

অন্তরের জগতে হরষে !
স্নিগ্ধ এক মৃণালের রসে !

জ্যোতির্ময় স্বর্ণ মৃণাল,—
অন্তরে, আনন্দ-ধারা তার
বহিয়া চলেছে চিরকাল,
চিরন্তন প্রাণের আধার !
হৃষ্ট-আশা-সূত্র-ভরে
বিশ্ব রহে শূন্য 'পরে,
যদি সেই সূত্র পড়ে কাটি'—
তখনি সে মাটি হয় মাটি।

সূর্য হয়ে ফুটেছে হরষে
কণামাত্র তোমার সৌরব !
ফুল হয়ে বসন্তে বিকাশে
হে নির্গুণ ! তোমার গৌরব !
তুমি ব্যাপ্ত লোকে লোকে,
তুমি দীপ্ত চোখে চোখে,
মুখে মুখে গুঞ্জরিত তুমি ;
অমৃত ! মরণে আছ চুমি' !

সোপবীত দ্বিজ শনৈশ্চর,
দিনকর গ্রহ-ছত্রপতি,
পাণ্ডুর কিরণ শশধর,
চারিচন্দ্রে গুরু বৃহস্পতি,
ছায়াপথ—তারাসেতু,
রাশিচক্র, ধূমকেতু,
কত শত সৌর সম্প্রদায়,—
তোমার শরীরে শোভা পায় !

মহাশূন্য ! পূর্ণ সর্বধনে !
মহামৌন ! সংগীত আলয় !
অন্ধকার ! সহস্র তপনে—
লক্ষ সুধাকরে আলোময় !
গ্রহ হতে গ্রহান্তরে,
সূর্য হতে শশধরে,
কিরণে কিরণে আলিঙ্গন !
রাজ্যে তব বিচ্ছেদে মিলন !

স্বর্ণগর্ভ ! সাম্রাজ্যে তোমার
অন্তরীক্ষে অনন্ত মিলন !
দূরে প্রেম—আনন্দের ধার,—
চোখে চোখে, কিরণে কিরণ !
নাহি পরশের ক্লেদ,
নাহি গ্লানি, নাহি স্বেদ,
দৃষ্টি সুখে হৃষ্ট প্রাণ-মন !
তুষ্ট চিতে অনন্তে ভ্রমণ !

উলটি-পালটি শতবার
কোথায় চলেছে গ্রহচয় ?
ইঙ্গিতে বল হে একবার—
কি উদ্যোগ চলে নভোময় ?
ঊর্ধ্ব কিবা অধোগতি,
না বুঝিনু ক্ষীণমতি,
কিবা শুধু স্রোতে গা ভাসান !
কোথা এর হবে অবসান ?

কোথায় জ্যোতিষ্ক দল চলে—
যাত্রীদল চলেছে কোথায় ?

কে আমি ? কে দিবে মোরে ব'লে
এ কথা স্থধাব কারে হায় ?
জানি শুধু ভাসিয়াছি,
কূল নাই কাছাকাছি,
বিস্ময়ে সংশয়ে কাটে দিন,
শক্তি গেল, দৃষ্টি হ'ল ক্ষীণ।

তাই বলে করিনি নিজেরে
নিশাচর আশঙ্কার দাস ;
কি স্থধাবে জন্ম-নাবিকেরে ?
তার শুধু ভেসেই উল্লাস !
লাভ ক্ষতি নাহি গণে,
নাহি গণে ধন জনে,
জানে শুধু আনন্দ—জীবন !
আশঙ্কা,—সে জীবনে মরণ !

স্বর্ণগর্ভ ! স্বর্ণগর্ভ ব্যোম !
তুঃখে স্থখ তোমার আমার !
আমরা ফুটাই তারাস্তোম—
ছিল যেথা নিত্য অন্ধকার !
আনন্দ আনন্দ শুধু
কেবল কেবল মধু
বিতরণ,—মথিয়া সাগর !
মধুময়—হ'ক চরাচর !

মধু জলে, মধু বন-ফলে,
ওষধির পত্রে মূলে মধু,
মধু শস্থে, মধু মহীতলে,
জীবনে আনন্দ-মধু শুধু !

মধু—কর্মে আসক্তের,
মধু—বিষে রোগার্তের,
মধুপ্রদ মৃত্যু দধীচির !
মধুজীব দয়িত শচীর !

মধু তুমি, মধু স্নিগ্ধ ব্যোম !
মধুময়ী চিরশ্যামা ধরা !
মধু, মধু, মধু সূর্য সোম।
মধুরাত, সিন্ধু মধুক্ষরা।
মধুমান বনস্পতি,
কাম্য ধেনু মধুমতী,
মধু মধু—বিশ্ব মধুময় !
মধুমান্ আনন্দ অক্ষয় !

সাগ্নিকের গান

"এতেনা-গ্নে ব্রহ্মণা বাবৃধস্ব
শক্তীবা যত্ তে চকৃমা বিদাবা।
উত প্রণেষি অভিবস্তো অস্মান্ত্
সংনঃ সৃজ সুমত্যা বাজবত্যা॥"

আকাশে বসতি যাঁর তপনের মাঝে,
অন্তরীক্ষে বিদ্যুতের দেহে,
সেই অগ্নি মূর্তিমান গেহে,
সেই অগ্নি মর্ত্যভূমে আনন্দে বিরাজে !

কীটের আবাস ভূমি, বিশীর্ণ, নীরস,
নিস্তেজ, শ্রীহীন শমী-শাখে—
মূর্তিমান সেই বহ্নি থাকে,
সংঘাতে জাগিয়া উঠে দৃপ্ত নিরলস !

প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁরে যজ্ঞ বেদিকায়,
মোরা সবে তাঁরি পূজা করি,
অন্তরে তাঁহারি তেজ ধরি।
বিচ্ছুরিত নববল তাঁহারি শিখায়!

জলো জলো তেজঃপুঞ্জ! উজ্জ্বল পাবক!
সূর্য চন্দ্র আছে যতদিন,
ততদিন তুমি মৃত্যুহীন,
ততদিন তন্দ্রাহীন জলো ধকধক!

দহ দহ নিঃশেষিয়া মিথ্যার জঞ্জাল,
অমূলক, অলীক, অসার,
দগ্ধ করো—করো ছারখার।
গ্রাস' তুমি মেলি' মস্ত রসনা করাল!

সত্যের কিরণ রূপে বিরাজ ভুবনে,
মানুষে মানুষ পুনঃ করি,
সকল কলঙ্ক তার হরি'
অগ্নি-পরীক্ষায় আজি চিনাও কাঞ্চনে।

জ্ঞান-বহ্নি রূপে জলো সদা ঊর্ধ্বমুখে,—
নিবাত নিষ্কম্প সমুজ্জ্বল,
আবেগ উদ্বেগ অচঞ্চল,
মৌন প্রতীক্ষার মত নিয়ত উন্মুখ!

প্রেমের আলোক রূপে করহে বিরাজ।
সুনীচ তৃণের পানে হেলি'
আপনার স্বর্ণ-পাণি মেলি'
গলিত কাঞ্চনে তা'রে সিক্ত করো আজ।

জ্বলো মনঃকুণ্ড মাঝে নির্মল পাবক !
সমুদ্রে বাড়বানল জ্বলো,—
দাবানল বনে বনে চলো,
ঝলসি জ্বলিয়া উঠ পৌরুষ-পুলক !

আর তুমি সুপ্তভাবে ইন্ধনে বিলীন—
কতকাল রহিবে অনল ?
জাগো জাগো জাগো মহাবল !
থেক না হে অসীম শক্তিতে শক্তিহীন।

দিব দান ইতিহাস-খাণ্ডব-কানন,
হে অগ্নি ! বাড়াতে অগ্নি তব,
ঢালিব জীবন-হবি নব,
নূতন শক্তিতে জাগো জাগো হুতাশন !

মোদের বচনে মনে—অন্তর মন্দিরে,
রহ তুমি জাগি' অনুক্ষণ,
তরু দেহে রসের মতন ;
বিষম জ্যৈষ্ঠের দিনে দুরন্ত শিশিরে।

দরিদ্রের নিধি সম রাখিব তোমায়
আজীবন অতি সাবধানে,
যোগ্যজনে সঁপিয়া নিদানে
নিশ্চিন্তে ধূলার দেহ মিশাব ধূলায়।

বিশ্ব-মানবের ভ্রূণ অপুষ্ট কোমল
যতদিন পূর্ণাঙ্গ না হয়,
যতদিন আছে কোন ভয়
ততদিন তপ্ত তা'রে রাখিও অনল।

যে দিন পেয়েছে নর তোমার সন্ধান,
মনুষ্যত্ব পেয়েছে সে দিন ;
হে অনল, হে চির নবীন !
তুমি রাখ বাঁচাইয়া তোমার সে দান।

উচ্চে উঠিবেই শিখা দুলুক যতই,
নির্মুক্ত নির্মল সুমহৎ
আত্মার কাঞ্চনময় রথ
তুলেছে পতাকা নীল নীলাকাশে ওই।

সে রথে মহিমময়ী প্রাণময়ী নারী—
বিরাজিতা জগতের রাণী ;
মূঢ় জড় সদা যুগ্মপাণি
চলেছে স্খলিত গতি পিছে পিছে তারি।

প্রাণময়ী সুন্দরীর রথচিহ্ন ধরি'
পঙ্গু, মূক, জড় মুক্ত হবে,
মুক্ত হবে প্রেমের গৌরবে,
যা আছে অপূর্ণ আজি উঠিবে তা' ভরি'।

হৃদয়-মন্দির-বাসী শক্তির প্রেরণা—
অনুভব করি নিজ মাঝে,
সাজিবে সে অভিনব সাজে,
দূরে যাবে ভেদজ্ঞান—অলীক ধারণা।

অনলে জ্বলিয়া যাবে সকল প্রভেদ,
পঙ্কলেপ, চন্দন প্রলেপ,
অগ্নি হতে নগ্ন শুনঃশেফ—
উঠিবে নির্মল শিশু উচ্চারিয়া বেদ !

পাপে পুণ্যে তারতম্য মূর্খতা বিদ্যায়
মানুষে মানুষে যাহা আছে,
টিকে না—ও পরীক্ষার কাছে,
দগ্ধ হয় ছদ্মসাজ জ্ঞানের শিখায়।

চঞ্চল, সংযমী শিব মদনের শরে;
ধর্মপুত্র মিথ্যা কহে হায়,
কেবা উচ্চ তুচ্ছ কে হেথায়?
অহল্যা, বসন্তসেনা,—শ্রেয় বলি কারে?

ধর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে নির্ণয়ে রোগের,
বিফল বিধান বিধি যত;
মূলে হায় কি যে আছে ক্ষত,
অতর্কিতে ছেয়ে ফেলে দেহ সমাজের!

পশুতে ভরিয়া উঠে বীরের সমাজ,
ভণ্ডে ভরি' উঠে ধর্ম-মঠ;
কীটে ভরে শস্যপূর্ণ ঘট,
সত্ত্বরস নাশি' রহে পরি তুষ-সাজ!

তারপর আসে যবে বপনের দিন;
লঘু বায়ে তুষ উড়ে যায়,
ঘৃণ্য কীট মাটিতে লুকায়,
চাহিয়া রহিতে হয় বল-বুদ্ধি হীন।

দেহীর জটিল এই দেহের মতন
যত সংঘ-সমাজ-শরীর,
সবই হায় ব্যাধির মন্দির,
ক্ষণিক স্বাস্থ্যের শেষে রোগ চিরন্তন।

এ রোগের শান্তি নাই ঔষধে মন্তরে ;
দেখা পেলে সত্য-দেবতার,
ব্যাধি তবে থাকেনাকো আর,
বাহিরে বিকাশে জ্যোতি আনন্দ অন্তরে।

রহ চির-প্রজ্জ্বলিত চির-সমুজ্জ্বল
সত্যনিষ্ঠা! বহ্নি শিখা সম ;
যেথা যেথা সুনিবিড় তম
সেথাই মোদের তুমি সহায় সম্বল।

ভবিষ্যের বলবুদ্ধি ভরসা যাহারা,
সত্যের নিষ্কল শিখা পানে
দ্রুতপদে উল্লাসিত প্রাণে
যারা আজি চলেছে ভাবনা-ভয়-হারা ;—

কিছু কি তাদের তরে করি নাই ভবে ?
দেহপাত করি প্রাণপাত
ভরিয়াছি সময়ের খাত,
দেহ সেতু করে দিছি,—তারা পার হবে।

কি উৎসাহ কত সাধ আমা' সবাকার!
সব জানিবার কৌতূহল,
কি অমৃত কিবা হলাহল,
সব শিখিবার সাধ—সব শিখাবার!

সব গ্লানি, সব ব্যাধি, বেদনা ঘুচায়ে,
পৃথ্বী রে করিব নিরাময়,
কুৎসিতে করিব শোভাময়,
বশে আনি কালফণী ফিরিব নাচায়ে।

সন্দেহের সংশয়ের অন্ধকার দেশে
লয়ে যাব জ্ঞানের মশাল,
আঁধার খনির রত্নজাল
তুলিয়া আনিব মোরা নিমেষে নিমেষে।

এই ধূলিময় ধরা রহি' এরি মাঝে,
রাখে নব সংবাদ তারার !
ক্ষুদ্র নর তুচ্ছ নহে আর,
জেনেছে সে—এ বিশ্বের আত্মীয় সে নিজে !

শত দিকে শত স্রোত, ঘুর্ণি শত শত,
তারি মাঝে ক্ষুদ্র আপনায়,
যে শক্তিতে স্থির রাখা যায়,
অমৃতের অংশ সেই বিশ্বে ওতপ্রোত।

বহুদূরে স্বর্গপুরে না রহেন তিনি,
তাঁর বাস মানব অন্তরে,
আনন্দ তাঁহারি চর্যা করে,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই তাঁহারি সঙ্গিনী।

তাঁহারি নয়ন-জ্যোতি সত্যের আলোক,
সন্দেহে ও সংশয়ে সহায়,
সর্বশুভ তাঁরি অনুজ্ঞায়
তাঁরি কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ মর্ত্যলোক।

গাও হে কর্মের জয় ! উৎসাহী যুবক !
কর্ম কর সত্যের কারণে,
কর শ্রম জ্ঞানের চরণে,
জলুক অতন্দ্র শিখা কর্মের পাবক !

আপন পরের তরে কর কায় ক্লেশ!
সকল জীবের সুখ তরে,
শুভচিন্তা শুভকর্ম ক'রে,
করম-বীরের স্বর্গ লভো অবশেষ।

বিশ্বের মঙ্গল হেতু কর পরিশ্রম,
মানুষের তরে কর তপ,
কর্ম—কর্ম—কর্ম কর জপ,
আছে তো মৃত্যুর পারে বিশ্রাম চরম।

আগুন জ্বালায়ে রাখ! রাখ হে সজাগ!
ন্যায্য দাবী যার যত আছে
অবনত হও তার কাছে;
তা বলে নিজের দাবী করিয়ো না ত্যাগ।

বহ্নিশিখা সম সদা হও উচ্চশির!
সুপবিত্র, নিষ্কল, নির্মল,—
রেখ তেজ উৎসাহ প্রবল,
ক্ষুদ্র হও—তুচ্ছ নও, হয়ো না অধীর

সবাই হইতে নারে যোগী জিতেন্দ্রিয়,
হতে পারে সরল সবাই,
স্খলনে পতনে ক্ষতি নাই,
সরল যে সেই সাধু বিশ্বের সে প্রিয়।

নির্ভয়ে ভেটিয়ো তারে যে আসে সম্মুখে,
ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, ভয় আর,—
মর্ম বুঝে লও সবাকার;
নহে, মিথ্যা বেঁচে থাকা ভ্রম পুষি' বুকে।

সাবধান! সাবধান!—ওহে সত্যকাম!
কাচ মণি নিজে লও চিনে,
মণিভ্রমে রাঙা কাচ কিনে
মনে মনে কমায়ো না রতনের দাম।

শিশু সম নগ্ন, কান্ত, পবিত্র, সুন্দর;
অগ্নিসম নিষ্কলঙ্ক, শুচি,—
হাস্যে যার তম যায় ঘুচি'
সেই সত্য চিরন্তন, অক্ষয়, ভাস্বর।

তাহারে ধরিয়া রাখ হৃদয়ে আপন,
আজীবন সেবা কর তারি;
ভ্রষ্ট যত ত্রিপুণ্ড্রক-ধারী,
চোখে তার ধূলা দিয়ে, করে জ্বালাতন।

আগুন সজাগ রাখ, হে উন্নতি-কামী!
রহ ধরি সাধনার পথ,
সিদ্ধ হবে তবে মনোরথ,
নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয় ভুল'—তীর্থ-পথ-গামী!

যুগের সাধনে কিংবা জনেকের তপে
করগত হয় যেই নিধি,
সে নিধি রহে না নিরবধি,—
যতন যে জানে শুধু তারে প্রাণ সঁপে।

তপস্যা নিয়ত চাহি—চাহি কালে, কালে,
সিদ্ধি হয় তবে করগত;
বিক্রমের বেতালের মত
চলিবে নির্দেশ মানি' ভূতলে-পাতালে!

জ্ঞান চাহি হে অনল চাহি মোরা আশা,
আশাহীনে শূন্য এ সংসার,
কর্মে জ্ঞানে হর্ষ নাহি তার,
জন্মমৃত্যু—যন্ত্রবলে যাওয়া আর আসা।

সমীরের সখা চাহি—চাহি হে ইন্ধন,—
চাহি জ্ঞান, চাহি মোরা আশা,
করুণা, মমতা, ভালবাসা,
উৎসাহ, শকতি চাহি আবেগ-স্পন্দন!

আজন্ম নেহারি শুধু মানবে ঘিরিয়া,
বিস্তারি বিপুল নিজ দেহ
আছে বিশ্ব, জানেনাকো কেহ
কোথা হতে, কি কারণে, এল কি করিয়া।

আজীবন দেখিতেছি সূর্য, সিন্ধু, ক্ষিতি,
মৃত্যুহীন এ বিশ্বভুবনে;
তাহাদেরি অক্ষয় জীবনে
মানুষের আছে ভাগ, মনে হয় নিতি।

বিশ্ব-মানবের সাথে প্রতি মানবের—
এক দাবী, এক অধিকার,
এক বিধি, একই বিচার;
অনাদি অনন্ত এক ধারা জীবনের!

যুগে যুগে চলিয়াছে দেহের পালন,
চলিয়াছে মনের বিকাশ,—
অন্তরের আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
বিশ্ব-ক্রোড়ে দুলিছে পুলক অকারণ!

হে পাবক! পবিত্র কর হে চিত্ত মোর
দগ্ধ করি মিথ্যার জঞ্জাল,
নষ্ট করি শঙ্কা-তমোজাল,
জ্বলো তুমি বিনাশিয়া সংশয়ের ঘোর।

বিশ্ব-মানবের প্রাণে মিশাও এ প্রাণ,
ঘুরে যাক্ জীবনের ধারা,
পারাবারে হ'ক আত্মহারা;
বিশ্ব-মানবের গানে মিলাও এ গান।

আপনারে বিরাটের আত্মীয় জানিয়া,
বাড়ুক শকতি দিনে, দিনে,
তার সাধ্য তার শক্তি জেনে
নিজ সাধ্য, নিজ বল লইব চিনিয়া।

বিশ্ব-মানবের মত পৌর-অধিকার,
তার মত পৌরুষ, গৌরব,
জনে জনে লভে যেন সব;
জনে জনে মহত্ত্বের পূর্ণ অবতার।

হে পাবক! হে নির্মল! হে চির-উজ্জ্বল!
ভুলিতে দিয়ো না আমাদের
মহনীয় মহিমা তপের,
চিরস্থির রহে যেন সাধনার ফল।

যুগে, যুগে, হে যজ্ঞাগ্নি! শিখায়ো সকলে;
অতন্দ্রিত ভাবে যেই জাতি,
সমুজ্জ্বল রাখি জ্ঞানভাতি
তপস্যা করিতে পারে,—তার পুণ্যফলে—

স্বর্গলোক নেমে আসে এই ভূমণ্ডলে ;
লভে নর দেবতার মান,
দেবশক্তি, দেবতার জ্ঞান ;
পুলকে বিদ্যুৎ মেলে তার পদতলে !

যে আজ মেলিছে আঁখি ভবিষ্যের কোলে,
যজ্ঞের অনল পানে চেয়ে,
মৃদুস্বরে উঠিতেছে গেয়ে,
অর্থহীন আনন্দ-কাকলি কুতূহলে,—

তাহারি ললাটে এই যজ্ঞ-ললাটিকা ;
যুগান্তের তপস্যার ফল,
দিক্ তারে নিত্য নব বল,
সে রাখিবে সমুজ্জ্বল সাগ্নিকের শিখা।

যারা আসিতেছে ওই আমাদের পরে,
প্রাণে যেন বহ্নি-তেজ রাখে ;
যুগে যুগে দীপ্ত যেন থাকে,
মনুষ্যত্ব-মহত্ত্বের রশ্মি ঘরে ঘরে।

জ্বলো অগ্নি ঘরে ঘরে, অন্তরে অন্তরে,
করো প্রাণপুঞ্জ তেজস্বান্ ;
যাক্ তম, যাক্ ভেদজ্ঞান,
ঘৃণা, ভয়, পাপ, তাপ, দর্প যাক্ দূরে।

হে অগ্নি ! হে দেবপ্রিয় ! দীপ্ত হুতাশন।
সফল কর এ মম গান,
গৃহে গৃহে কর অধিষ্ঠান,
হউক সাগ্নিকে পূর্ণ নিখিল ভুবন।

উজ্জ্বল-প্রকাশ হয় হে দৈব-আলোক !
তেজঃপুঞ্জে পূর্ণ কর প্রাণ,
অন্তরে দূরি কর হান,
স্বর্গের কিরণে পূর্ণ হ'ক মর্ত্যলোক

সাম্য-সাম

"For a' that, and a' that,
'Tis coming yet, for a' that,
That man, to man the world o'er,
Shall brothers be for a' that."

—*Robert Burns*

ছায়াপথ হতে এসেছে আলোক, তপন উঠেছে হাসি ;
বারতা এসেছে পুলক প্লাবনে ভুবন গিয়েছে ভাসি !

মাতিছে নিখিল, দুলিছে মুকুল, জাগিয়া উঠিছে পিক,
বারতা এসেছে প্রভাত পবনে,—প্রসন্ন দশদিক।

কে আছ আজিকে অবনত মুখে, পীড়িত অত্যাচারে ?
কে আছ শূদ্র, কেবা দ্বিজ, অন্যায় কারাগারে ?

যুগ যুগ ধরি কি করেছ, মরি, লভিতে কেবলি ঘৃণা ?
পুরুষে পুরুষে হীনতা বহিতে, বহিতে কারণ বিনা !

এ বিপুল ভবে কে এসেছে কবে উপবীত ধরি গলে ?
পঞ্চম অধম অশুর বক্ষে মাতৃদেহের তন্ হলে' !

কণ্ঠে বাঁধিয়া ধনসম্পুট, রত্নমুকুট শিরে,
কেহ নাহি আসে গর্ভ-নিবাসে, মানবের মন্দিরে ;

তবে কেন হায় জগত জুড়িয়া, এ বিপুল ধন-পনা,
বেড়া দিয়ে দিয়ে মুক্ত বাতাসে বাঁধিবার কল্পনা !

ঊর্ধ্বে রয়েছে উদ্যত সদা জগন্নাথের ছড়ি,
সমান হতেছে শূদ্র ও দ্বিজ সবে তার তলে পড়ি'।

খনির তিমিরে, কারা কি কহিছে, ওগো শোন পাতি কান,
অনেক নিম্নে পড়ি আছে যারা শোন তাহাদের গান।

দূর সাগরের হল্‌হলা সম উঠিছে তাদের বাণী,
বহু সন্তাপ, বহু বিফলতা, অনেক দুঃখ মানি';

অশ্রু হারায়ে রক্ত নয়ন জ্বলিছে আগুন হেন,
পঙ্কিল ভাষা, স্বল্প বচন,—নাহি সে মানুষ যেন!

শ্রমের মাতাল পাষাণের চাপে উঠিছে পাগল হয়ে,
রসাতল পানে ছুটে যেতে চায় বোঝার বালাই ল'য়ে;

জীবন বিকায়ে ধনের দুয়ারে খাটিয়া খাটিয়া মরে,
কলঙ্কহীন শ্রমের অন্নে জঠর নাহিক ভরে!

হেথায় কুবের ফুলিছে, ফাঁপিছে,—ফুলিছে টাকার থলি,
চিবুকের তলে বাড়িছে তাহার দ্বিতীয় পাকস্থলী!

নর বাহনের সুবিপুল ভারে মানুষ মরিল, হায়,
মরিল মরম, মরিল ধরম, ধরণী গুমরি' ধায়।

তবু ঘর্ঘরে, চলে মন্থরে, জুড়িয়া সকল পথ,
ধনী-নির্ধনে সমান করিয়া জগন্নাথের রথ!

মানুষ কাঁদিছে, মানুষ মরিছে, বেঁচে আছে তরবার!—
এর চেয়ে সেই বন্য-জীবন ভাল ছিল শতবার;

সেথায় ছিল না শৃঙ্খল-জাল, বন্দী ছিল না কেউ,
ছায়া-সুগহন কাননের মাঝে শুধু সবুজের ঢেউ।

জটিল গুল্ম কণ্টকে ফুলে উঠিত আকুল হয়ে,
দেবতার শ্বাস আসিত বাতাস ফলের গন্ধ ব'য়ে।

পশু ও মানুষে ছিল মেলামেশা ভাষাহীন জানাজানি,
ছোট্ ছোট ভাই-ভগিনীর মত ছিল বহু হানাহানি ;

জীবন আছিল, আনন্দ ছিল, মৃত্যুও ছিল সেথা,
ছিল না কেবল রহিয়া রহিয়া মন মরিবার ব্যথা।

ছিল না সেথায় দুর্জয় লোভে দহন দিবস নিশা,—
লুটিয়া, পীড়িয়া, দলিয়া, ছিঁড়িয়া প্রভু হইবার তৃষা।

ছিল না এমন খাজনার খাতা খাজাঞ্চী-খানা জুড়ি ;
সেলামী ছিল না, গোলামী ছিল না, হাইতোলা-সাথে-তুড়ি।

হায় বনবাস ! সজীব, সরস, শতগুণে তুমি শ্রেয়,
এই পোড়া মাটি রস-বাসহীন মানুষে করেছে হেয় ;

এই কাঠ খোঁটা—বসন্তে যাহা আর ফোটাবে না ফুল,
এরি সহবাসে নীরস মানুষ,—জীবনে মানিছে ভুল।

ঊর্দ্ধে উঠেছে দুর্গ প্রাচীর, মানব শোণিতে আঁকা,
আকাশ সুনীল কুটীরবাসীর চক্ষে পড়েছে ঢাকা ;

সাগরের বায়ু বাধা পেয়ে পেয়ে সাগরে গিয়েছে ফিরে।
মানবের মন এমনি করিয়া মরিয়া যেতেছে ধীরে।

তরবারি শুধু ফিরিছে নাচিয়া বিপুল হেলার ভরে।
বাঁধন কাটিতে জন্ম যাহার সেই সে বন্দী করে !

বলবান যেই,—ধর্ম যাহার ক্ষত ও ক্ষতির ত্রাণ,
সেই সে ঘটায় জগতের ক্ষতি, সেই করে ক্ষত দান !

অমল যশের লালসায় হায় জয়ের মশাল জ্বালি ;
নিরীহ জনের রক্তে কেবল লভে কীর্তির কালি।

বন্ধ্যা সোনায় এরা বড় জানে,—জননী মাটির চেয়ে—
সফলতা যার অণুতে-রেণুতে চিরদিন আছে ছেয়ে ;

তবু এরা জ্ঞানী, তবু এরা মানী, এরা ভূস্বামী তবু,
ভূমির ভক্ত সেবক যাহারা—এরা তাহাদেরি প্রভু !

যারা প্রাণপাতে কঠিন মাটিতে ফলায় ফসল ফল,
তারা আছে শুধু খাটিয়া বহিয়া ফেলিবারে শ্রমজল ;

তারা আছে শুধু কথায় কথায় হইতে যোত্রহীন,
'দেড়া' 'দুনো' দিয়ে বর্ষে বর্ষে কেবল বহিতে ঋণ ;

সমুখে করাল রয়েছে 'আকাল' মৃত্যু রয়েছে পিছে,
ঘিরি' চারিধার আছে হাহাকার, পালাবার আশা মিছে।

এত বড় এই ধরণীর বুকে তাহাদেরি নাই ঠাঁই,
তবুও ভূমির ভৃত্য, ভক্ত, ভর্তা সে তাহারাই !

তাদের নয়নে ফলময়ী ভূমি স্নেহময়ী মা'র চেয়ে,
রমণীর চেয়ে রমণীয়া—যবে কাল মেঘ আসে ছেয়ে ;

কন্যার চেয়ে কান্তিশালিনী, হাস্যশোভনা ভূমি ;
কি বুঝিবে মূঢ় রাজস্বভুক্, এর কি বুঝিবে তুমি ?

তবুও সমাজ তোমা হেন জনে ভূস্বামী বলি মানে ;
প্রকৃত স্বামী সে দীন কৃষকের কথা কে তুলিবে কানে

বলের গর্ব পর্বত হয়ে বাড়ায় ধরার ভার,
চলে লুণ্ঠন কুণ্ঠাবিহীন ঘরে ঘরে হাহাকার ;

প্রবল দস্যু বিকট হাস্যে বিশ্বভুবন মথি',
সুনামের হার গলায় দোলায়ে চলেছে অবাধ-গতি !

নিরীহ জনের নয়ন বাঁধিয়া ঘুরাইয়া তরবারি,
বালকে বৃদ্ধে বধিয়া চলেছে, বাঁধিয়া চলেছে নারী !

পিশাচের প্রায় ক্রূর হিংসায় শবেরে দিতেছে ফাঁসি !
সপ্ত সাগর মানে পরাভব ধুতে কলঙ্ক রাশি !

ইতিহাস তবু তাহাদেরি দাসী,—নিত্য ছলনাময়ী,
ধন বৈভব তাহাদেরি সব, তারা বীর, তারা জয়ী !

ক্ষুদ্র প্রদীপে নিবা'তে পবন ! যতন তোমার যত,
সেই শিখা যবে দহে গো ভবন কোথা রহে তব ব্রত ?

হায় সংসার, ক্ষুদ্র মশার দংশন নাহি সহ,
মৃত্যুর চর ক্রূর বিষধর তারে পূজ অহরহ !

তবু উদ্যত রয়েছে নিয়ত বৈভবে দিয়ে লাজ,
বলী দুর্বলে করিতে সমান বিশ্বদেবের বাজ !

মুক্ত রাখ গো মনের দুয়ার, মানুষ এসেছে কাছে,
ঘুচাও বিরোধ, বাধা, ব্যবধান, বিঘ্ন যা কিছু আছে ;

বলের দর্প, কুলের গর্ব, ধনের গরিমা ল'য়ে,
মুক্ত বাতাসে বাক্য-বেড়ায় ফেল না, ফেল না, ছেয়ে ;—

জননীর জাতি, দেবতার সাথী নারীকে বলো না হেয়,
অর্ধজগতে করো না গো হীন জগতের মুখ চেয়ো।

স্নেহবলে নারী বক্ষ শোণিতে ক্ষীর করি পারে দিতে ;
কে বলে ছোট সে পুরুষের কাছে—কোন্ মূঢ় অবনীতে ?

তারা-সুগহন গগনের পথে চলেছে মরাল-তরী,
তারি মাঝে নারী পুষ্প-প্রতিমা সুষমা পড়িছে ঝরি' ;

চরণের বহু নিম্নে জগৎ স্তব্ধ হইয়া আছে,
নন্দন-বন-বিহারী পবন ফিরিছে পায়েরি কাছে ;

কুন্তল দোলে, মন্থরে চলে স্বপন-তরণীখানি,
সুপ্ত জগতে চিরজাগ্রতা প্রেমময়ী কল্যাণী !

কত কবি মিলে বিশ্বনিখিলে বন্দনা রচে তার।
সংগীত ভুলি দুটি আঁখি তুলি' চাহে শুধু শতবার ;

মুগ্ধ নয়ন স্বপ্নমগন, মৌন বচন সব,
সেতার, কানুন্, বীণা, তান্‌পুরা মানে যেন পরাভব!

গানের দেবতা, প্রাণের দেবতা, ধ্যানের দেবতা নারী;
বনের পুষ্প, মনের ভক্তি সে কেবল তারি—তারি।

ক্ষেত্র বীজের প্রাচীন কাহিনী তুলে আর নাহি কাজ,
গেছে সংশয়, রমণীর জয়,—জগত গাহিছে আজ;

কত না বালক ধন্য হয়েছে মায়ের মূরতি লভি',
কত না বালিকা বহিয়া বেড়ায় জনকের মুখছবি;—

তবে কেন মিছে কথার কলহ, দূর কর কলরব,
আরো কাছাকাছি আসুক মানুষ—আসুক মহোৎসব!

কে রয়েছ বলী, আর্ত অবলে হাতে ধরি লও তুলি',
জ্ঞানী, অধিকার বাড়াও নরের নূতন দুয়ার খুলি;

মানুষেরে যদি মনে জান পর, শিক্ষা বিফল তবে,
রাখিবার বল মারিবার চেয়ে বহু গুণে শ্রেয় ভবে।

দেবতার ঘরে গণ্ডী রেখ না—খোল মন্দির দ্বার,
দেবতা কাহারো নহে তৈজস, দেবভূমি সবাকার;

নরকের ভয় দেখায়ে মানুষে খর্ব করো না তবে,
মানুষেরি প্রেমে হউক ধন্য, লভুক্ পুণ্য সবে।

কে জানে, কেমন পরলোক, যাহে আকাশ রয়েছে ঢাকি'।
মূক মরি' সেথা পায় কি গো বাণী, অন্ধ কি পায় আঁখি?

উন্মাদ সেথা লভে কি শান্তি? পুষ্টি লভে কি ভ্রূণ?
বন্ধু সেথায় বন্ধুর মুখ দেখিতে কি পায় পুনঃ?

পুণ্যের ক্ষয়ে এই লোকালয়ে জন্ম কি হয় আর?
কিবা সে পুণ্য? কিবা সে পাতক? মূল কোথা ছিল কার?

সৃষ্টির সাথে কে সৃজিল মায়া ? কে দিল বৃত্তি যত ?
কে করিল হায় মনু-সন্তানে স্বার্থ-সাধনে রত ?

তিমিরের পরে তিমিরের স্তর, দৃষ্টি নাহিক চলে,
মৃত্যু সে কথা গুপ্ত রেখেছে, জীবিতে কভু না বলে ;

যে বলে জেনেছি ভণ্ড সে জন, নহে উন্মাদ ঘোর,
সে জ্ঞান আনিতে পারে ইহলোকে জন্মেনি হেন চোর।

ছায়াপথ জুড়ি আলোক বিথারি' কত না তপন শশী,
শান্তির মাঝে অচিন্ত্য বেগে চলিয়াছে উচ্ছ্বসি' ;

কত না লক্ষ পুষ্পক রথ, যাত্রী কত না তায়,
কোন্ সে তীর্থে যাত্রা সবার, কে বলিতে পারে, হায় ;

কারা করেছিল যাত্রা প্রথম ? পৌঁছিবে কারা শেষ ?
রথে রথে বাড়ে অস্থির স্তূপ, শাদা হয় কাল কেশ !

রথের মাঝারে জন্ম মরণ, চিনে জীব শুধু রথ,
সমুখে পিছনে শুধু বিস্তার—সীমাহীন ছায়াপথ !

কলরব করি যাত্রী চলেছে, গান গেয়ে, কেঁদে, হেসে,
মৌন আকাশে শব্দ পশে না, বায়ু স্রোতে যায় ভেসে ;

প্রার্থনা ভেসে কূলে ফিরে এসে ব্যথিয়া তুলে গো মন,
মানুষ আবার মানুষে আঁকড়ি' প্রাণে পায় সান্ত্বন !

সেই মানুষেরে করো না গো হেলা তা'রে করো না গো ঘৃণা,
এ জগতে হায় কি আছে নরের—নরের মমতা বিনা ?

অভিষেক যারে করেছে তপন, আর সে অশুচি নাই,
জ্যোৎস্না-মদিরা যে করেছে পান সেই সে আমার ভাই ;

সমীরে যাহার নিশ্বাস আছে, সে আছে আমারি বুকে,
সলিলে যাহার আছে আঁখিজল সে আমার দুঃখে-সুখে ;

কুসুম-সরস ধরণী যাদের বহিছে পরশখানি,
জীবনে-মরণে কাছে আছে তারা, মনে মনে তাহা জানি।

জাগ জাগ ওগো বিশ্ব-মানব! বারতা এসেছে আজ!
তোমার বিশাল বপু হতে ছিঁড়ে ফেল ভৃত্যের সাজ;

জানু পাতি কেন রয়েছ নীরবে অবনত করি মাথা?
কারা কাঁধে পিঠে উঠিয়া তোমার—তোমারে দিতেছে ব্যথা?

ঘণ্টা ঝাঁঝর কর্ণে বাজায়ে বধির করিছে কারা?
অঙ্কুশ হানি অঙ্গে কে তব বহায় রক্তধারা?

জানু পাতি কেন অবনত শিরে রয়েছ নীরবে, হায়,
দাঁড়াও উঠিয়া, ঘৃণ্য কীটেরা পড়ুক লুটিয়া পায়।

দাঁড়াও হে ফিরে উন্নত শিরে হাসি উজ্জ্বল হাসি,
হাতে হাত ধরি' গুণী, জ্ঞানী, বীর, শিল্পী, রাখাল, চাষী;

জগতে এসেছে নূতন মন্ত্র বন্ধন-ভয়-হারী
সাম্যের মহাসংগীত সব গাহ মিলি নরনারী!

আমরা মানি না মানুষের গড়া কল্পিত যত বাধা,
আমরা মানি না বিলাস-লালিত ঘোড়ার আরোহী গাধা।

মানি না গির্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তাঁর ঘর;

রাজা আমাদের বিশ্ব-মানব, তাঁহারি সেবার তরে,
জীবন মোদের গড়িয়া তুলেছি শত অতন্দ্র করে।

আশা আমাদের সূতিকা-ভবনে বিরাজিছে শিশু-রূপে,
তারি মুখ চেয়ে জগতের বাহু খাটিয়া চলেছে চুপে!

ধনের চাপে যে পাপের জনম এ কথা আমরা জানি,
দণ্ডের চেয়ে দয়ার ক্ষমতা অধিক বলেই মানি;

দোষীরে আমরা নাশিতে না চাহি, মানুষ করিতে চাই,
গত জনমের পাতকী বলিয়া আতুরে দূষি না ভাই।

যার কোলে শিশু হাসে আহ্লাদে শিশু-হিয়া জানি তার,
যার স্নেহে ভূমি হয় গো সফলা ভূমি তারি আপনার!

মানি না অন্য বিধি ও বিধান মানি না অন্য ধারা,
মানি না তাদের সংসার যারা করেছে দুঃখ-কারা।

প্রেমের আদর জানি গো আমরা জ্ঞানের মূল্য জানি,
শক্তি যখন শিবের সেবিকা তখনি তাহারে মানি।

আমরা মানি না শিখা, ত্রিপুণ্ড্র, উপবীত, তরবারি,
জাবদা খাতার, ধারিনাকো ধার, মোরা শুধু মমতারি।

মাংসপেশীর শাসন মানি না, মানি না শুষ্ক-নীতি;
নূতন বারতা এসেছে জগতে মহামিলনের গীতি।

নয়ন মোদের উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সহসা তাই
তৃণে, পল্লবে, নীল নভতলে আর মলিনতা নাই!

চঞ্চল হয়ে উঠেছে বিশ্ব বিপুল পুলক ভরে।
বাহু প্রসারিয়া ছুটেছে মানব, মানব-হিয়ার তরে!

ছিঁড়িয়া পড়িছে শৃঙ্খল যত ভাঙিয়া পড়িছে বাধা,
বিঘ্ন যত সে মনে জেগেছিল নাহি নাহি তার আধা!

জীর্ণ বিকল লোহার শিকল ছিঁড়িছে—পড়িছে টুটি,
আজীবন যারা আছিল বন্দী তারাও লভিছে ছুটি!

অন্ধের দেশে দৃষ্টি আসিছে, মূকের ফুটিছে বাণী।
কবে থেমে যায় কলহের সাথে অস্ত্রের হানাহানি।

অন্যায় সাথে বিস্মৃতি নদে ডুবুক অত্যাচার,
সাম্যের মহাসংগীতে সুর যাক্ মিলি' সবাকার।

এস তুমি এস কর্মী পুরুষ, এস কল্যাণী নারী,
প্রভু আমাদের বিশ্ব-মানব মোরা জয় গাহি তাঁরি।

কার বন্ধন হয়নি মোচন—কারায় কাঁদিছ বসি—
গাহ নির্ভয়ে সাম্যের গান—শিথল পড়ুক খসি';

উচ্চে সবলে উচ্চারো ওগো সাম্যের মহাসাম,
করো করাঘাত কারাভবনের দুয়ারে অবিশ্রাম;

দুর্বল বাহু বল পাবে ফিরে,—ওগো হও একসাথ,
কণ্ঠে মিলাও কণ্ঠ আবার, হাতে ধরি লও হাত;

অপরাধে, নারী, পুরুষেরি মত দণ্ড যদি গো পায়,—
তবে পুরুষের স্বাধীনতা হতে কেন বঞ্চিবে তায়?

নারী ও শূদ্র নহেক ক্ষুদ্র, হেলার জিনিস নহে,
দেহ তাহাদের আগুনের আগে তোমাদেরি মত দহে;

তাহাদেরো রাঙা রক্ত রয়েছে, তাহাদেরো আছে প্রাণ,
আশা, ভালবাসা, ভয়, সংশয়, আছে; আছে অভিমান;

তৃষ্ণা-ক্ষুধায়, শোক, বেদনায়, তোমাদেরি মত ভোগে,
তোমাদেরি মত মর্ত্য-মানুষ, মরে তোমাদেরি রোগে;

ওগো ধনবান, ওগো বলবান, জেনো তোমাদেরো আছে,
তাহাদেরি মত গ্রন্থি অপটু—স্কন্ধ মাথার মাঝে!

মানুষ মানুষ; শক্তি মূরতি; বহ্নি ধরে সে বুকে;
সে নহে শূদ্র, সে নহে ক্ষুদ্র, দেব-বিভা তার মুখে,

সে যে জন্মেছে ধরণীর বুকে, কে তারে ছিঁড়িয়া লবে!
সে যে দিনে দিনে হয়েছে মানুষ, তারে ঠাঁই দিতে হবে!

তার বাঁচিবার, তার বাড়িবার অধিকার আছে—আছে;
কারো চেয়ে দাবী কম নহে তার এ বিপুল ধরা মাঝে।

ধরণীর বুকে আছে সঞ্চিত অমেয় পীযূষ-সুধা,
বলী দুর্বলে ভুঞ্জিবে তাহা, কেহ সহিবে না ক্ষুধা।

সবিতা যাহারে করেছে আশিস, ধরণী ধরেছে বুকে,
সে কভু জগতে মরিতে আসেনি,—মরিতে আসেনি দুখে।

নগ্ন মূরতি, হর্ষ-মুকুল, শিশু আসে ধরা 'পরে,
ঘৃণার পঙ্ক তারে মাখায়ো না ওগো পঙ্কিল করে ;

রক্তপায়ীর মুখোস পরায়ে তারে নাচায়ো না, ওরে,
দিয়ে ত্রিপুণ্ড ভণ্ড তাহারে সাজায়ো না হেলা ভরে ;

সুকুমার হিয়া চরণে দলিয়া মানুষে যন্ত্র করি,
শ্যামা ধরণীর পুলকের হাসি নিয়ো না নিয়ো না হরি' ;

আহা শিশু হিয়া উচ্ছসি' উঠিয়া দূরে ফেলে দেয় সাজ,
ধনী ও দীনের দুলাল মিলিয়া খেলিতে না মানে লাজ !

আজো শোনা যায় হৃদয়-নিলয়ে প্রকৃতির মহাবাণী,
তাই মাঝে মাঝে যেন থেমে আসে জগতের হানাহানি ;

ওগো তবে আর—যাহা আপনার—তারে কেন রাখ দূরে ?
ওই শোন, শোন,—রাগিণী নূতন ধ্বনিছে বিশ্বপুরে !

জীমূত মন্দ্রে সপ্তসিন্ধু গাহিছে সাম্য-সাম,
মন্দ পবন নূতন মন্ত্র জপিছে অবিশ্রাম !

প্রভাত তপনে, গগনে, কিরণে পড়ে গেছে জানাজানি,
মেদিনী ব্যাপিয়া তৃণে পল্লবে সুগোপন কানাকানি !

পুরাণ বেদীতে উঠিছে দীপিয়া অভিনব হোমশিখা,
এস কে পরিবে দীপ্ত ললাটে সাম্য-হোমের টীকা !

কত না কবির উন্মাদ-গীতি আজিকে শুনিতে পাই,
বাহু প্রসারিয়া রয়েছে তাহারা আজি যেই দিকে চাই !

হে শুভ সময়! গাহি তব জয়, আনো বাঞ্ছিত ধন,
অক্ষয় দানে ধনী ক'রে তুমি দাও মানুষের মন ;

কর নির্মল, কর নিরাময়, কর তারে নির্ভয়,
প্রেমের সরস পরশ আনিয়া দুর্জয়ে কর জয় !

ভাই সে আবার আসুক ফিরিয়া ভায়ের আলিঙ্গনে,
ভস্ম হউক বিবাদ বিষাদ যজ্ঞের হুতাশনে ;

সমান হউক মানুষের মন, সমান অভিপ্রায়,
মানুষের মত, মানুষের পথ, এক হ'ক পুনরায় ;

সমান হউক আশা, অভিলাষ, সাধনা সমান হ'ক,
সাম্যের গানে হউক শান্ত ব্যথিত মর্ত্যলোক।

তীর্থ-সলিল

ভূমিকা

'তীর্থ-সলিলে'র প্রায় ত্রিশটি কবিতা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট নূতন।

'তীর্থ-সলিল' জগতের সমস্ত সাহিত্য-মহাপীঠ হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তকে প্রকাশিত সমস্ত কবিতাই নানা দেশের, বিভিন্ন যুগের, বিচিত্র কবিতার পদ্যানুবাদ ; ক্ষেত্র বিশেষে অনুবাদের অনুবাদ। সকল স্থলে মূলের ছন্দ রাখিতে পারি নাই ; তবে, মূলের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।

বিশ্বমানবের নানা বেশ, নানা মূর্তি ও নানা ভাবের সহিত পরিচয় সাধনই এই গ্রন্থ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য। আমার জ্ঞান ও শক্তিতে যতটুকু সম্ভব তাহা করিলাম, আশা করি ভবিষ্যতে যোগ্যতর জনের সাধনাবলে সমগ্র বিশ্বের ভাব-সম্পদ বাঙালী সাধারণের আরো একান্তরূপে আপনার হইয়া উঠিবে।

পরিশেষে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে সমস্ত কবি ও লেখকের নিকট আমি ঋণী তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা বিনয়ের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা
৭ই আশ্বিন, ১৩১৫

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

* * *

উৎসর্গ

বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক,
সমস্ত সৎ-সাহিত্যের বিচক্ষণ রসজ্ঞ,
বহু ভাষাবিদ্
মনস্বী
শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহোদয়ের করকমলে,
আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ
এই ক্ষুদ্র চয়ন-গ্রন্থখানি অর্পিত হইল।

সত্যেন্দ্রনাথ
(শিশুকালে)

দুই বন্ধুসহ সত্যেন্দ্রনাথ
(মধ্যে সতীশচন্দ্র রায় ও তাঁর দক্ষিণে অজিতকুমার চক্রবর্তী)

সাঁতারু-বেশে সত্যেন্দ্রনাথ
(সঙ্গে তৎকালীন শিক্ষার্থী প্রখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্লকুমার ঘোষ)
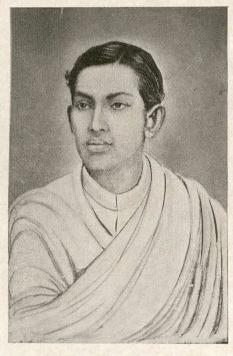
সত্যেন্দ্রনাথ
(যৌবনে)

*

*   *

বিশ্ববাণীর বারতা এনেছি বঙ্গের সভাতলে,
ভরেছি আমার সোনার কলস নানা তীর্থের জলে ;
ওগো তোরা আয় আয় !
নিখিল কবির সংগীত ওঠে বঙ্গের বন-ছায় !

স্তব্ধ বিমূঢ় শত শতাব্দ যাহাদের মুখ চায়,—
যাদের ভাষায় অতীত জগত পুনর্জীবন পায়,—
তারা আজি কুতূহলে
বঙ্গবাণীর মন্দিরে আসি মিলিয়াছে দলে দলে ।

আমার কণ্ঠে গাহিছে আজিকে জগতের যত কবি !
আমার তুলিতে আঁকিছে তাদের দুঃখ সুখের ছবি ।
শত বিচিত্র স্বর,
আজি একত্রে বিহরে হরষে অখণ্ড সুমধুর !

আমার কণ্ঠে গাহিছেন ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস !
দান্তে, হোমার, শেক্সপীয়ার, কণ্ঠে করিছে বাস !
গেটে, হুগো, বায়রন,
হেঙজ্, হাফেজ, স্তাফো, অবৈয়ার, খুস্‌হাল, টেনিশন

ওমর খৈয়াম্ আসিয়া মিলেছে, এসেছে ভল্টেয়ার ;
হায়েন এসেছে, শেলি, সাদি, কীটস, বার্নস, বেরাঞ্জার,
আরো যে এসেছে কত !
মোদের পদ্মবনে জগতের জুটেছে মধুব্রত !

নানা দেশে যারা ছিল গো ছিন্ন, ছিল নানা মত ভাষা,—
নানা কালে যারা ছিল বিভিন্ন, না ছিল মিলন আশা,
তারা আজি এক ঠাঁই !
আকুল হৃদয়ে করে কোলাকুলি পুলকের সীমা নাই।

প্রেম-যমুনায় মিলেছে আজিকে স্নেহ-গঙ্গার ধারা,
জ্বালা-কুণ্ডের এসেছে প্রবাহ টুটিয়া পাষাণ কারা ;
চুপে চুপে তারি সাথে,
ঝরিয়া মিশেছে স্নিগ্ধ শিশির গোপনে তিমির রাতে।

কুম্ভ আমার ভরিয়া এনেছি শত তীর্থের জলে,
বঙ্গবাণীর পুণ্যাভিষেক পুনঃ আজি হবে বলে ;
ওগো তোরা আয় আয় !
শতেক ধারায় তীর্থ-সলিল উথলি বহিয়া যায় !

মাঙ্গলিক

অথর্ব-বেদ

এ গৃহে শান্তি করুক্ বিরাজ মন্ত্র-বচন-বলে,
পরম ঐক্যে থাকুক সকলে ঘৃণা যাক দূরে চলে ;
পুত্রে পিতায়, মাতা দুহিতায় বিরোধ হউক দূর ;
পত্নী পতির মধুর মিলন হোক আরো সুমধুর ;
ভায়ে ভায়ে যদি দ্বন্দ্ব থাকে তা হোক আজি অবসান,
ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান ;
জনে জনে যেন কর্মে বচনে তোষে সকলের প্রাণ,
নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান।

দু-দিনের শিশু

ব্লেক

"আমি আজো নামহীন,
বয়স দুইটি দিন।"
—কি ব'লে ডাকিব মোরা তোরে ?
"আমি খুশী-টুসটুসি,
আমার নামটি খুশী।"
—'খুশী'! তুই খুশী থাক ওরে!
আনন্দ-সুধার পাত্র,
বয়স দু-দিন মাত্র,
'খুশী' বলে আমি ডাকি তোরে ;
তুমি হাস চেয়ে চেয়ে,
আমি কহি গান গেয়ে,—
তোরে ঘিরি' খুশী যেন ঝরে।

মাউরি জাতির 'ঘুম-পাড়ানি'

(অষ্ট্রেলিয়া).

খোকা আমার, খোকা আমার, 'তুল্ তুলসী'র পাতা!
বেনামূলের গুচ্ছ আমায় রাখ্ রে বুকে মাথা!
মৃগনাভির কৌটা আমার খোকা ঘুম যায়,
গুগ্‌গুলু ধূপ-ধুনার আবেশ খোকার চোখে আয়!

জাপানী 'ঘুম-পাড়ানি'

ঘুমো আমার সোনার খোকা, ঘুমো মায়ের বুকে
আকাশ জুড়ে উঠলো তারা ঘুমো রে তুই সুখে।
হাত পা নেড়ে কান্না কেন ? কান্না কেন এত ?
চাঁদ উঠেছে, ঘুমো রে তুই সোনার চাঁদের মত!
একটি দিয়ে চুমো,—ঘুমো রে তুই ঘুমো।

ঘুমো আমার সোনার পাখী মায়ের বুকের 'পরে ;
ঘুমের ঘোরে ডরিয়ে কেন উঠলি অমন করে ?
ও কিছু নয়,—শব্দ ওঠে হাওয়ায় বাঁশের ঝাড়ে,
(আর) চকাচকী ডাকাডাকি ক'চ্চে পুকুর পাড়ে !
ঘুমো রে তুই ঘুমো—একটি দিয়ে চুমো।

ঘুমো আমার সোনার যাদু কিসের তোমার ভয় ?
কে কি করে ?—কাছে কাছে মা যে তোমার রয় ;
খোকা আমার ছুঁতে নারে ঘাসের বনের সাপ ;
বাজ পড়ে না,—যতই খুশী হ'ক না মেঘের দাপ !
ঘুমো মানিক ঘুমো,—একটি দিয়ে চুমো।

ঘুমো মনের সাধে, শুধু, স্বপন দেখিস না রে,—
ভয় পাছে পাস জেগে,—হুতোম ডাকছে যে আঁধারে।
গুটিস্থুটি মাথাটি রাখ্ আমার বুকের 'পরে,
হাস রে শুধু,—দেখি আমি,—হাস রে ঘুমের ঘোরে !
ঘুমো মানিক ঘুমো,—ঘুমো রে তুই ঘুমো।

ঘুমো আমার সোনার খোকা, ঘুমো আমার কোলে ;
ভূমিকম্পে পাহাড় যখন ঘর বাড়ি নে' দোলে ;
পাপের কর্ম যে করেছে দেব্‌তা তারেই মারে,
নির্দোষী মোর সোনার খোকা,—কেউ না ছুঁতে পারে,
ঘুমো মানিক ঘুমো,—সোনার পাখী ঘুমো।

শিশু

সুইনবার্ন

খোকা! দেখ ফুল!
খোকা দেখে এর চেয়ে ভাল ঢের,—
সুখের স্বপন হতেও মোহন,
দেখে ছবি জুলজুল!

খোকা, শোনো গান!
খোকা জানে এর চেয়ে ভাল ঢের,
যতই শোনাক্ ও গানের চেয়ে
মধুর পাখীর তান।

খোকা, দেখ চাঁদ!
চাঁদেরে আকাশে দেখে খোকা হাসে,
আলোয় সে দেয় ভালবাসা কত,—
নিশির মিটায় সাধ।

খোকা, দেখ ঢেউ!
আহা কচিমুখ হ'ল উৎসুক
দুধের ছেলের গম্ভীর ছবি
দেখিবি কি তোরা কেউ?

খোকা, দেখ তারা!
খোকা তোলে হাত; হায় উন্মাদ,
যা কিছু শোভন তাহাতেই দাবী?
এ কি গো তোমার ধারা?

খোকা, ঘড়ি বাজে;
খোকা ঢুলে ঢুলে পড়ে বাহুমূলে,
জড় হয়ে এল পাপড়ি ফুলের
পত্রপুটের মাঝে!

কিরণ-কুসুম! খোকা!
শুধু সুস্বপন দেখ তুমি ধন!
যে অবধি রাত না হয় প্রভাত
না ফুটে অরুণ-লেখা।

মিনি ও বিনি

টেনিসন

মিনিতে আর বিনিতে
ঘুমিয়ে প'ল ঝিনুকে,
আয় গো তোরা দেখে যা,
মিনুকে আর বিনুকে
ভিতর-রাঙা ঝিনুকটি।
বাহিরে তার রুপালী;
সাগর জলের শব্দেতে
ঘুরে বেড়ায় নিদালি!
দুটি তারা ফুটফুটে
উঁকি দিয়ে দেখছে যে,
কোন্ স্বপনে মগ্ন তারা
কেউ কি পারে বলতে সে?
চমক-ভাঙা সবুজ পাখী
শিসটি দিতে লেগেছে,—
জাগো আমার লক্ষ্মী মেয়ে,
সূয্যিমামা জেগেছে।

মানব-সন্তান

ভিক্টর হুগো

যত্নে রেখ এই ক্ষুদ্র মানব-সন্তানে,
ক্ষুদ্র,—তবু অন্তরে সে ধরে বিশ্বস্তরে ;
শিশুরা জন্মের আগে রশ্মিরাশিরূপে
চঞ্চল পুলকভরে ফিরে নীলাম্বরে।

আসে তারা আমাদের অন্যায়ের দেশে,
বিধাতা পাঠান শুধু দিন দুই তরে ;
শিশুর অস্পষ্টভাবে তাঁরি বাণী ফুটে,
ক্ষমার বারতা তাঁর শিশু-হাসে ক্ষরে।

তাদের সে স্ফূর্তি তাতে আমাদের চোখে,
স্বর্গ কাঁদে শিশু যদি কাঁদে গো ক্ষুধায় ;
আনন্দে তাদের যে গো চির-অধিকার,
তারা ব্যথা পেলে বিশ্ব কাঁদে যাতনায়।

নির্মল সে ফুলদলে রস যদি মরে—
বিশ্বজনে পরশে তবে সে অপরাধ ;
মানুষের ঘরে, মরি, দেবতা বিহরে !
হায় রে, নিগূঢ় নভস্তলে বজ্রনাদ—

জাগে,—যবে ভগবান ফিরেন খুঁজিয়া
সেই সব শিশু,—হায়, যারা ধরাতলে
এসেছিল একদিন দেবতার সাজে,—
এবে যারা ছিন্নবাসে,—সিক্ত অশ্রুজলে।

অন্ধ-বালক

সিবার

বল গো কাহারে বলে আলো,
আমি তার কিছু যে জানি নি ;
চোখে দেখে কি আনন্দ বল,
আমি যে গো অন্ধ চিরদিনই।

কত কি দেখেছ, বল সব,
রবি নাকি আলো দেয় নিতি!
তাপ আমি করি অনুভব,
কেমনে সে করে দিবা রাতি?

দিন রাতি জানে না এ আঁখি,
ঘুম রাতি, খেলা মোর দিন ;
না ঘুমায়ে জেগে যদি থাকি,—
মোর দিন রবে চিরদিন।

শুনি আমি দুঃখ করে সবে,—
দুঃখ করে ভাবি মম ক্লেশ ;
আপনি বুঝি না যে অভাবে,
তা আমি সহিতে পারি বেশ।

পাব না যা—সে ভাবনা ছাই,
সে কেবল—মন-সুখে শনি ;
গান গাই রাজ-সুখে ভাই,
তবু আমি অন্ধ চিরদিনই।

বসুন্ধরা

হোমর

জীবের জননী তুমি, অয়ি বসুন্ধরা !
অগাধ অনন্ত স্নেহে ও হৃদয় ভরা।
হে আদি-সম্ভূতা, আজি বন্দিব তোমায়,
মহীয়সী তব নাম নবীন গাথায়।
সাগরে বিহরে যারা বিচিত্র বরণ,—
আকাশে আমোদে ভাসে ; করে বিচরণ
পুণ্যময় ভূমি 'পরে শান্তি পারাবার ;—
সকলি তোমার দেবী সকলি তোমার।
সবারে সমান ভাবে পাল গো আপনি
অনন্ত রতন ধনে, হে আদি-জননী !
ফুল্লমুখ শিশু হাসে—সে তোমারি কোলে ;
শাখে শাখে পাকা ফল পুঞ্জে পুঞ্জে দোলে ;
মানব-জীবন,—সেও তব ইচ্ছাধীন,
আপনি ফুটায়ে কর আপনাতে লীন !

চিত্রকূট

বাল্মীকি

ওই দেখ তরু 'পরে ফুলরাশি থরে থরে
শোভিছে প্রদীপমালা সম ;
শিশির গিয়েছে ব'লে যেন তারা কুতূহলে
পরেছে মালিকা মনোহর !
হেথায় ভেলার বন বিল্ব-তরু অগণন
ফলভারে অবনত কায়।

কে করিবে উপভোগ এ কাননে নাহি লোক,
ফলে ফল বিফলে হেথায়।
ওই দেখ গাছে গাছে কেমন ঝুলিয়া আছে
মধুক্রম মধুমক্ষিকার ;
ডাহুক ডাকিছে জলে, শিখী কেকারব ছলে
উত্তর দিতেছে যেন তার !
আপনি ঝরিয়া ফুল ঢেকেছে বিটপী-মূল—
রচিয়াছে ফুলের আসন ;
ফিরে করী দলে দলে, বিহগের কলকলে
চিত্রকূট মুগ্ধ করে মন।

সমুদ্রে ঝড়

ভার্জিল

চারিদিকে বহিল বাতাস,—
তুলিয়া সাগর-বক্ষে সংক্ষোভ ভীষণ ;
অন্তস্তল করিয়া বিকাশ
উন্মাদ তরঙ্গ তীরে ধায় অগণন।
কলরবে কাঁদিল মানব,
সশব্দে ছিঁড়িয়া যায় নৌকার বাঁধন ;
উঠি মেঘ সহসা ভৈরব
নিল হরি' নীলাকাশ, রবির কিরণ !
কাল নিশি নামিল সাগরে,
আকাশে অশনি ঘোর করে গরজন ;
ব্যোম-পথে বিদ্যুৎ বিহরে,
গ্রাসিতে ছুটিয়া আসে আসন্ন মরণ।
ঝঞ্ঝা যায় গভীর স্বননে,
গগন চুমিতে চায় তরঙ্গ পাগল ;

গর্জিয়া সাগর-স্রোত হানে—
ছিন্ন পাল, ভগ্ন দাঁড়, তরণী বিকল।
ভগ্ন-চূড়া পাহাড়ের মত
ধেয়ে আসে জলরাশি নাচি নিরবধি ;—
তুলে শিরে কাহারে ত্বরিতে,
কাহারে অতল-তলে জীবন্ত সমাধি।

মেঘের গান

এরিষ্টোফেনিস

মেঘমালা আদি-অন্তহীন !
ভাসিয়া আসি গো মোরা মানবের নেত্রপথে
শিশিরে মাজিয়া তনু ক্ষীণ !
ছাড়িয়া গভীর শান্তিময়
উচ্চভাষী সাগরের,— পিতা যিনি আমাদের—
সুখময় তাঁহার নিলয়,—
যাই মোরা উচ্চ গিরিকূটে ;
আঁখি মেলি' একবার দেখে লই চারিধার
গিরি সাজে বিটপী মুকুটে।
দেখি কত অর্বুদ গিরির,
ভ্রূকুটি করিয়া চায় আছে সদা পাহারায়
সর্ব-জীব-ধাত্রী পৃথিবীর !
দিই মোরা শস্যের জনম ;
চিরস্রোতা তটিনীর মন্দ্রভাষী জলধির
শুনি গান নিত্য মনোরম।
দেখি তীক্ষ্ণ দিবার নয়ন ;
চেয়ে আছে অনিমিখ পূর্ণ করি দশদিক,
দেখি সূর্য অশ্রান্ত-কিরণ !

মোদের অমর কায়া 'পরে
পরিয়া ঝটিকাবাস হাসি মোরা অট্টহাস,
দৃপ্ত রবি দেখি হেলা ভরে ;
মর্ত্যভূমি আতঙ্কে শিহরে !

একটি মূষিকের প্রতি

বার্নস্

ওরে কচি ! ওরে জড়সড় ! নতমুখ !
কত আতঙ্কে দুরুদুরু তোর বুক,
অত দ্রুত আর হবে না পলাতে
ত্বরিত চলি'
মারিতে ধরিতে আমি যাব না রে
লাঙল তুলি।
সত্যই ব্যথা পেয়েছি পরানে, ভাই,
স্বভাবের ভাব—মানুষ তা রাখে নাই ;
অকারণ নয় তোর এই ভয়,—
আমারে ত্রাস !
ধরাচর তবু তোরি সহচর,
মরণ-দাস।
সংশয় নাই,—তস্কর তুমি ভাই,
তাতেই বা কি ?—বেঁচে থাকাও তো চাই ;
বোঝা বোঝা ধানে দু-একটি শীষ,—
মাঙন এই ;
সবা সনে বেঁটে নেব দেব-দান
তাড়াতে নেই।
ছোট বাসাটিও ভেঙে গেছে, হায়,
যেটুকু আছে তা বাতাসে উড়ায় ;

নাহি ও কিছুই নূতন গড়িতে,—
পাতা কি ঘাস,
এসে প'ল ব'লে এদিকে পোষের
শীত-বাতাস।
দেখি মাঠ ঘাট হ'ল তৃণহীন,
শীত ঘনাইয়া আসে দিন দিন,
ভেবেছিলি হেথা জাড়ের ক'দিন
থাকিবি বেশ;
দলিয়া কোটর লাঙল কঠোর
গেল রে শেষ!
ওই অতগুলি তৃণ, পাতা, লতা,
কত শ্রমে কেটে এনেছিলি হেথা;
ফলে হ'লি দূর,—নাহি আর তোর
ঘর-দুয়ার;
সহিতে বিষম শিলা-বরিষন
হিম, তুষার।
একা তুই ন'স্ দেখ রে ইঁদুর
কল্পনা যার হয়ে গেছে চূর,
ইঁদুর নরের অনেক মানসই
হয় বিফল;
সুখ আশা হায়, পিছে রেখে যায়
ব্যথা কেবল।
তবু আছ বেশ, মোর তুলনায়,
শুধু অনুভব—আছ যে দশায়,
হায় রে মোরা যে পিছে দেখি ঘোর
ঘটনা-চয়;
সমুখে দেখি না,—শুধু অনুমান,—
তাতেও ভয়!

কোকিল

'ম-স্তো-শু' গ্রন্থ

আরেক পাখী সে বেঁধেছিল বাসা,
অতিথির বেশে হ'ল তোর আসা,
বাসার সবে যে হ'ল কোণ-ঠাসা,
কোকিল ! ওরে কোকিল !
অচেনা পক্ষী-জনকের কাছে,
অজানা পক্ষী-জননীর কাছে,
কণ্ঠে না জানি কি যে তোর আছে,—
পাগল যাহে নিখিল !
ছাড়িয়া আপন কানন-নিবাস,—
যেথায় রুপালী কুসুমের হাস,
সুরে ভরি' দিয়া ফাগুনী বাতাস
আয় তুই হেথা আয় !
কমলা-লেবুর শাখে নেমে পড়,
ফুলগুলি যার ঝরে ঝরঝর,
ফুল ঝরঝর গান নিরন্তর
আয়, আয় মধু-বায় !
সারাটি সকাল, সকল দুপুর
সারা দিনমান শুনি ওই সুর,
লাগে না যেন গো কভু অমধুর
ও সুর আমার কানে ;
মন দিব ঘুষ,—এস,—নিয়ে যাও,
দূর দেশে আর হয়ো না উধাও,
কমলা-লেবুর শাখে গান গাও,—
থাক, থাক এইখানে।

চাতকের প্রতি

শেলি

বন্দি তোমা' আনন্দ-মূরতি !
পাখী তুমি কখন তো নহ।
স্বর্গে কিবা তারি কাছে অতি
ভরা-প্রাণে ঢাল স্বপ্ন-মোহ ;
না শিখিয়া, না ভাবিয়া আহা, অজস্র গাহিছ অহরহ !

ঊর্ধ্বে দূরে,—দূর-দূরান্তরে
ধরা হতে উড়েছ উধাও,
গূঢ় নীল গগন-সাগরে
পুঞ্জ তেজ সম ছুটে যাও,
গাহিয়া উড়িয়া চল কত,—উড়িয়া কতই গান গাও।

শ্রান্তি-ভরে সূর্য পড়ে ঢলি,
তাহারি সে স্বর্ণ-আলোকে
মেঘ-মালা উঠিছে উজলি,
তুমি তাহে সাঁতারিছ সুখে ;
অশরীরী আনন্দ যেন গো ছাড়া পেয়ে ছুটেছে দ্যুলোকে।

গলিয়া পাণ্ডুর সন্ধ্যা মিশে
তোমারি প্রয়াণ-পথ 'পরে ;
পাই না তোমার আর দিশে,
তারা যেন তীব্র রবি-করে ;
উচ্ছ্বাসের উচ্চ স্বর তব, আহা তবু শুনি প্রাণ-ভ'রে।

শুভ্রকায়, রজত-গোলক,
শশাঙ্কের রশ্মির সমান,—

ক্ষীণ যার প্রদীপ্ত আলোক
উষার কিরণে ম্রিয়মাণ ;
নয়নে যায় না দেখা, শেষে, আছে শুধু হয় অনুমান।

মুখরিত ধরণী, সমীর,
হয়েছে তোমারি স্বরে হায়,
নির্মেঘ আকাশ যবে স্থির
নগ্ন-কায়া যামিনী ঘুমায়,
জ্যোৎস্না যেন বৃষ্টি করে চাঁদ, গগনের কূল ভেসে যায়।

তুমি যে কি আমরা জানি না,
জানি না কি তুলনা তোমার,
ইন্দ্রধনু হতেও ঝরে না
তেমন উজল বারিধার,—
তুমি যেথা সেথাই যেমন কলতান,—সংগীত বিথার।

ভাবাবেশে উন্মাদ পরান,
অচেনা সে কবির মতন,
অযাচিত গেয়ে যাও গান
মুগ্ধ ধরা নহে যতক্ষণ,—
অভিনব আশা-আশঙ্কায় যতক্ষণ নাহি ডুবে মন।

অবরিতা নৃপবালা হেন,
প্রাসাদের নিভৃত শিখরে,
ভালবাসা-ভারে উন্মন
ক্লান্ত হিয়া জুড়াবার তরে
প্রেমেরি মতন মধু-গান গাহ কুঞ্জ প্লাবিয়া সুস্বরে।

সোনালী সে জোনাকীর মত,—
হিম-জলে পাপড়ির স্তরে

ঢাল গো তরল আলো কত,
নিশীথে, অজ্ঞাতে, অগোচরে ;
ঝরা ফুল আর তৃণদল রাখে যারে ঘিরিয়া আদরে।

পুঞ্জ-পত্র কুঞ্জের ভিতরে
গোলাপের মত নিমগন ;
যতক্ষণ গন্ধ না বিতরে,—
তপ্ত বায়ু করে আলিঙ্গন ;
শেষে সেই সৌরভেরি ভারে ক্লান্ত-পক্ষ মন্থর পবন।

বসন্তের বর্ষণের রব
কম্পন-চঞ্চল তৃণ 'পরে,
বর্ষণ-জাগ্রত ফুলে সব ;
যত সুর নিখিলে বিহরে,—
ক্লেদহীন, উচ্ছ্বাসে নবীন—তব সুর জিনে সকলেরে।

পাখী কিবা কিন্নর ! শিখাও,
পূর্ণ প্রাণ কি ভাব-সৌরভে ;
এমন তো শুনিনি কোথাও
মদিরা কি প্রণয়ের স্তবে,
স্বরগের সুধার প্লাবন আবেগে ঢালিতে মর ভবে।

পরিণয়-নিশির সাহানা,
বিজয়ীর বিজয়ের তান,
ও গানের নহে সে তুলনা,
মিথ্যা তার মাধুরীর ভান ;
কি যেন অভাব সে সকলে,—লুক্কায়িত—তবু বর্তমান।

বল, পাখী, কোথা সে নির্ঝর,—
উৎসারিত যাহে তব গান ?
কোন্ গিরি, সাগর প্রান্তর ?
কোন্ মেঘ সোনার সমান ?
সে কোন্ পাখীর ভালবাসা ; সে কোন্ ব্যথার অবসান ?

তব গান বরিষে অমিয়া,
নাহি তাহে অবসাদ-লেশ,
কভু বুঝি বিরক্তির ছায়া
আসে নাই দিতে তোমা' ক্লেশ ;
প্রেম জান ; জান না প্রেমের তৃপ্ত সুখে দুঃখ কি অশেষ।

জাগিয়া কি স্বপনে ঘুমায়ে
জান কি বারতা মরণের ?
মর নর আমাদের চেয়ে
গভীর প্রকৃত কথা ঢের ?
নহে তব গীতি স্রোতস্বিনী কেন চির সৌন্দর্যের ফের ?

আগে-পিছে চাহি চারিভিতে,
কামনা—কোথাও যাহা নাই ;
আমাদের প্রাণের হাসিতে
মিশে আছে বেদনা সদাই ;
সব চেয়ে সুমধুর গান—সব চেয়ে দুখের কথাই।

তবু মোরা পারিতাম যদি
ঘৃণা, ভয়, গর্ব তেয়াগিতে ;
জনমি' যদি গো নিরবধি
নাহি হ'ত অশ্রু বরষিতে,
জানি না শকতি হ'ত কিনা তোমার ও আনন্দে মিশিতে।

আনন্দের ছন্দ আছে যত,
যত আছে স্বর, লয়, তান,—
রত্নসম কাব্য শত শত
গ্রন্থের ভাণ্ডারে শোভমান,—
কবি বলে, ধরণী-বিরাগী, সকলের শ্রেষ্ঠ তব গান।

আনন্দের জান যে বারতা,
শিখাও হে তাহার সন্ধান,
ওই তব সংহত মত্ততা
কণ্ঠে মোর দিক আসি' তান,
বিশ্ব যাহে শোনে গো বিস্ময়ে—মুগ্ধপ্রাণ আমারি সমান!

কাব্যাধিষ্ঠাত্রীর প্রতি

আলতাফ্ হুসেন আন্‌সারি

দুঃখ নাই কল্পনা আমার,—তুমি যদি নাহি হও জন-বিমোহিনী;
তবে যদি নাহি পার মর্ম পরশিতে,—অভাগিনী তুমি!
আজ যদি সমস্ত জগৎ ছলায়-কলায় বাঁধা পড়ে গো আপনি;—
সাহসে হৃদয় বাঁধ, দেখ—ছেড় না সরল পথ তুমি!
সত্য রত্ন অমূল্য সে ধন,—যদ্যপি সে ধনে ধরে ও হৃদয়-খনি,
সুখ্যাতি ও অখ্যাতির বায়ু-বাণ হতে মুক্ত তবে তুমি!
যদি তুমি না পার দেখাতে ফিরাইয়া জগতেরে নিজরূপ খানি,
দেখ গো আপনি চেয়ে আপনার পানে—গরবিনী তুমি!
বাস্তবের গভীর সাগর—তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ তারে করেছ আপনি;
হঠাৎ-কবির দল মরিবে ডুবিয়া, বেঁচে রবে তুমি!
সেকাল গিয়াছে চলে এবে,—মিথ্যা যবে কবিতার আছিল সঙ্গিনী;
এখন ফিরাও গতি, আর পূজা তার করিও না তুমি!

লুক্কায়িত গৌরবের 'ভেদ'—প্রাণপ্রিয় স্বদেশের আরাধনে, ধনি ;
কিংকরের যোগ্যতাও থাকে যদি তব—সম্রাট সে তুমি !
রসজ্ঞের নয়নে নয়নে থাকা যদি আনন্দের হয় বিমোহিনী,
সম্পর্ক রেখ না তবে মূর্খ, অরসিক, অন্ধ সনে তুমি !
যদি কেহ বুঝে তব গুণ, একজন ! একজন ! লও তারে গণি' ;
তোর গর্ব রেখে থাকে 'হালি' তার গর্ব রেখ সখী তুমি ।

কবি ও মানবজীবন

ইবসেন

জীবন—সে তো ভূতের সাথে রণ,
যে ভূত থাকে মনের গুহা মাঝে ;
কবি তো সেই—নিজেই সেই জন
বিচার করে নিত্য নিজ কাজে ।

ক্ষীর ও নীর

বৃদ্ধ চাণক্য

শাস্ত্র অনেক, কাব্য অনেক, আয়ু-সংক্ষেপ, হায় !
দুর্ঘটনার অন্ত নাহিক, বাধা দেয় পায়, পায় ;
সুধী সেইজন মরালের মত স্বভাবটি হয় তার,
সে করে যতনে ক্ষীর-সংগ্রহ নীর করি পরিহার ।

কর্ম্ম ও কল্পনা

গেটে

কে আছ হে সুচতুর ! কর শুভ কাজ,
দিন না ফুরায় শুধু শুভ কল্পনায় ;
জীবন-মরণ সাথে মিশাইয়া, আজ,
অনন্তকালেরে কর ছন্দ মধুময় ।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার

আলতাফ্ হুসেন আন্‌সারি

অদৃষ্ট, পুরুষকার,—মিছে তর্ক সব,
ও সব নহেক কোনো ধর্মের বিভব ;
ভাগ্যের প্রাধান্য মেনে গেছে ভীরু সবে,
সাহসী পুরুষকার ;—জীবন আহবে।

পৃথিবীর সার্থকতা

খুশ্‌হাল

মনে কর তুমি নাই,—অথচ তোমার
নিখিল বিপুল বিশ্বে পূর্ণ অধিকার !
এ কথা কেমন ?—শুধু কথামাত্র সার।
গ্রহ-তারা-পুষ্প-ফলে বিচিত্র দর্শন
বীজমন্ত্র সম এই নিখিল ভুবন ;—
ব্যাখ্যা, অর্থ, সার্থকতা সকলি 'জীবন' !

দেবদারু ও বনলতা

খুশ্‌হাল

বর্ষায় বাড়িয়া বনলতা,
উচ্চে উঠে দেবদারু বাহি' ;
"কত হ'ল বয়ঃক্রম তব ?"
জিজ্ঞাসে তরুর মুখ চাহি' !
তরু কহে, "বর্ষ দুই শত,—
মাস ছয় এদিক্-ওদিক্।"
লতা বলে, "এতে বৃদ্ধি এই !—
সপ্তাহে যা হ'ল মোর ঠিক !"
তরু বলে, "বাঁচ আগে শীতের তুষারে,
আয়ু ও বৃদ্ধির কথা হবে তারপরে।"

মৃৎপাত্র ও স্বর্ণপাত্র

পণ্ডিতা অবৈয়ার

স্বর্ণপাত্র ভাঙিলেও তার সোনা বলি সমাদর ;
ধননাশে জ্ঞানী জ্ঞানীই থাকে গো অক্ষয় গুণাকর ;
মূর্খের যদি হয় ধননাশ—কিবা সে মূল্য তার ?—
মাটির পাত্র ভাঙিবা মাত্র হয়ে থাকে ধূলিসার।

জ্ঞানের প্রতি

আলতাফ্ হুসেন আন্সারি

হে জ্ঞান ! করেছ ধনী কত না জাতিরে,
যাহারে ছেড়েছ সেই ডুবেছে তিমিরে ;
সংসারের সর্বরত্ন তাদেরি কারণ,
জানে যারা একমাত্র তুমি মূলধন।

মাতার প্রতি

হায়েন

উচ্চশির উচ্চে রাখা অভ্যাস আমার,
আমার প্রকৃতি, হায়, রুক্ষ ও কঠোর
রাজার (ও) অবজ্ঞা-দৃষ্টি পারেনাক মোর
নয়নেরে করিবারে নত একবার।
কিন্তু অয়ি স্নেহময়ী জননী আমার,
যখন নিকটে থাকে মূর্তিখানি তোর,
অতি তীব্র অভিমান দর্প অতি ঘোর
সব যায় ; বাল্য যেন পাই পুনর্বার !
সে কি দেবতাত্মা তব ?—শান্ত করে মোরে ?
দেবতাত্মা,—বিশ্ব যার মুঠার ভিতরে,—
আমোদে মেলিয়া পাখা ফিরে যে অম্বরে

মরমে মরি, মা, আজি স্মরিয়া আপন
কৃতকর্ম ;—যাহা বলিয়াছে তব মন ;
যে মনে—সবার বেশী পাই স্নেহধন।
অন্ধ খেয়ালের মোহে ছাড়িয়া তোমায়,
ফিরিলাম খুঁজিয়া খুঁজিয়া বিশ্বময়,—
মমতার যদি কভু দেখা মিলে, হায় ;
আশা ছিল, লভিলে তা জুড়াবে হৃদয় !
দেখিলাম যতদূর দৃষ্টি মোর যায়,
ফিরিলাম দ্বারে দ্বারে করাঘাত করি'
কাতরে কহিনু স্নেহ-ভিখারীরে, হায়,
ফিরায়ো না ; ঘৃণাভরে সবে গেল সরি'।
সেই আমি খুঁজিতেছি সারাটি জীবন,
মমতার, হায়, তবু দেখা নাহি পাই ;
আজি ফিরিয়াছে মন ভবনে আপন,
যেথা, মাগো, তুমি মোরে ডাকিছ সদাই।
আজি দেখিলাম যাহা দৃষ্টিতে তোমার,
সেই তো মমতা—চির-আরাধ্য আমার।

বন্ধু-গর্ব

মস্কিন অল্‌দরামি

তাদের গর্ব করে থাকি আমি,—সে কথাটি জানি আমি,
যাহারা নিয়ত আমারে ঘিরিয়া রয়েছে দিবস-যামী ;
আমার গর্ব, আমার সর্ব, আমার বন্ধু তারা ;—
এতগুলি মণি-রতনের মাঝে হয়ে আছি আমি হারা।
তারা ঢলঢল মুকুতার ফল,—তারা মুকুতার পাঁতি,
আমি একখানি রেশমের সূতা তাদের রেখেছি গাঁথি'।
পশি' পরশিয়া দেখিয়াছি আমি অন্তর সবাকার,
তাদের বক্ষ-নীড়ে গতিবিধি চিরদিন এ জনার ;

আমারে ঘিরিয়া আছে নিশিদিন, আমারে বেড়িয়া আছে,
মোরে নির্ভয়ে করি নির্ভর তারা হেসে-খেলে বাঁচে ;
তারা ঢলঢল লাবণ্য-জল-সিক্ত মুকুতা পাঁতি,
আমি একখানি রেশমের সূতা রেখেছি তাদের গাঁথি।

নিষ্কলঙ্ক দারিদ্র্য

রবার্ট বার্নস্

কেহ কি হয় অধোবদন
অকলঙ্ক দারিদ্র্যতায় ?
দৈন্য মোরা করি বরণ,
ভীরু যে জন গণি না তায়।

অকথিত, অকীর্তিত
কর্ম মোদের যেমনি হোক্,
মর্যাদা তো মুদ্রাচিহ্ন
মানুষ সোনা,—যেমনি হোক্।

শাকান্নে দিন যদিই কাটে,
'গড়া'—না হয় পরলামই তাই ;
মূর্খে সাজাও লম্বশাটে,
মানুষ তবু মানুষই ভাই !

যেমনি হোক্—যেমনি হোক্,
আড়ম্বর—তা যত সে হোক্,
সরল যে জন সেই মহাজন
দীন দরিদ্র যাহা সে হোক্।

দর্পে চলে,—দর্পে চাহে,—
ওই যে—যাহে বল্‌ছে 'প্রভু'—
যতই পূজা করুক তাহে
গণ্ডমূর্খ মাত্র তবু।

যেমনি হোক্ তাজটা তাহার,—
কল্কাদার সে যেমনি হোক্,
বুদ্ধি যাহার আছে সে জন
হাসবে দেখে, যেমনি হোক্।

রাজা পারেন মান্যদানে
সকল লোকেই কর্তে মানী,
গড়তে পারেন অথল প্রাণে
সামর্থ্য নাই সেটুক্‌খানি ;

যেমনি হোক্—যেমনি হোক্,
মান্য তাঁদের যত সে হোক্,
উচ্চ সকল পদের চেয়ে
যোগ্যতা ;—সে যেমনি হোক্।

বল গো তবে আস্থক ভবে
আসিবে যাহা স্থনিশ্চয়,
যোগ্যতা আর বুদ্ধি আবার
হউক্ জয়ী ধরণীময় !

যেমনি হোক্—যেমনি হোক্,
আসিবে সেদিন, যেমনি হোক্,
মানবে মানবে—ভাই ভাই হবে,
এ সারা ভুবনে যখনি হোক্

বনচ্ছায়ায়

শেক্সপীয়ার

সবুজ বনের সবুজ ছায়,
আয় গো কে তোরা মেলিবি কায় ;
পাখীর কণ্ঠে মিলায়ে তান,
গাহিবি মধুর—মধুর গান !

আয় গো হেথা আয় গো, হেথা আয় !
এখানে নাই—
কোনো বালাই,
শুধু শীত—শুধু শীতের বায়।

আকাঙ্ক্ষারে বিদায় করে,
মেলিবি কায় রবির করে,
ফলের রাশি কুড়িয়ে এনে,
ভুঞ্জিবি আয় হরিষ মনে,

আয় গো হেথা আয় গো, হেথা আয় !
হেথায় নাই—
কোনো বালাই,
শুধু শীত—শুধু শীতের বায়।

সাধের স্বপন

শেক্সপীয়ার

সাধের স্বপন কোথায় আছে ?—
প্রাণের মাঝে ?—মনের মাঝে ?
জন্ম কোথায় বল্ গো খুলে,
বাড়ে সে ধন কোন্ গোকুলে—
বল্ গো বল্।

আঁখির মাঝে জন্মে সে ধন,
দৃষ্টি-রসে পুষ্ট সে ধন,
যেথায় জনম সেথায় মরণ!
আমরা তাহার মরণ-ঘড়ি
বাজাই চল!
টুং-টাং-ঢং—টুং-টাং-ঢং
বাজাই অনর্গল!

বসন্তে

শ্রীহর্ষ

আম্র শাখায় ফুল দুলিয়ে,
মানিনীদের মান ভুলিয়ে,
পঞ্চশরের দূত এসেছে মধুর মলয় বায়;
ফুটেছে ফুল, অশোক বকুল,
মিলন আশে পরান আকুল,—
দূর প্রবাসীর নারী,—হৃদয় ধরতে নারে হায়।
ফাগুন এসে আগেই হিয়া
কোমল ক'রে যায় রাখিয়া,
শেষে মদন সুযোগ পেয়ে বাণ হানে গো তায়।

বসন্তে

খুশ্‌হাল

আবার ভাটেরা গান ধরিল নূতন,
নূতন কাহিনী বাঁশী কহে অনুখন,
থাকুন গুহায় যোগীবর, আমি আজ যাব উপবনে,
ওই দেখ বসন্তের ফুল আমায় যে ডাকিছে সঘনে!

স্থগিত রাখিতে ক্ষুধা ঘুমায় ভিখারী,
অধোমুখ আজো রাজা রাজ্য-কথা স্মরি’!
দেখিতে যা ভাল লাগে চোখে, দেখিলে তা দোষ যদি হয়,
তবে—তবে—তবে খুশ্‌হাল আজন্ম আসামী সুনিশ্চয়।

শিশু-কন্দর্পের শাস্তি

আনাক্রেয়ন

প্রেমের ক্ষুদ্র দেবতাটি হায় দেখিলেন একদিন,
রাঙা গোলাপের বুকেতে একটি ভ্রমর রয়েছে লীন!
জন্তুটি কি যে ভাবিয়া না পান,
অঙ্গুলি তার পাখায় চাপান
সে অমনি ফিরে অঙ্গুলি চিরে রাখিল হুলের চিন্‌!
অমনি আঙুল উঠিল জ্বলিয়া,
নয়নের জল পড়িল গলিয়া,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলিল ছুটিয়া শঙ্কায় বিমলিন;
জননী তাহার ছিলেন যেথায়
লুটায়ে সেথায় পড়িল ব্যথায়,
“আই—আই—মাগো মরেছি, মরেছি” কাঁদিয়া কহিল দীন,
“ওগো মা মরেছি, মরেছি, মরেছি,
ওগো মা সাপের বিষেতে জরেছি,
পাখ্‌না-গজানো সর্প-শিশুর গরলে হইনু ক্ষীণ!
জননী হাসিয়া কহেন, “বালক!
মধুপের হুল যদি ভয়ানক,
তবে যারে-তারে ব্যথা কেন দাও বাণ হানি’ নিশিদিন?”

যৌবন-মুগ্ধা

জেবুন্নিসা

যখন আমি ঘোমটা তুলি নয়ন 'পরে,
পাণ্ডুর হয় গোলাপগুলি ঈর্ষা ভরে ;
বিদ্ধ তাদের বক্ষ হতে ক্ষণে ক্ষণে,
ক্রন্দনেরি ছলে মধুর গন্ধ ক্ষরে !
কিংবা যদি সুগন্ধি কেশ আচম্বিতে
এলায়ে দিই মন্দ বায়ে আনন্দেতে,
চামেলি ফুল নালিশ করে ক্ষুণ্ণ মনে,
গন্ধটি তার লুকায় চুলের সুগন্ধিতে !
যখন আমি দাঁড়াই একা মোহন সাজে,
এম্‌নি শোভা হয় যে, তখন অম্‌নি বাজে,
শতেক শ্যামা পাখীর কণ্ঠে কলস্বনে
বন্দনা গান, স্পন্দন তুলি কুঞ্জ মাঝে !

হৃদয়ের নিধি

হায়েন

সাগর মাঝে মুকুতা রাজে,
গগনে তারা সাজে গো,
প্রাণের মাঝে ? হৃদয় মাঝে ?
আছে প্রণয় আছে গো।
বিরাট নভঃ, সিন্ধু বিশাল,
হৃদয় মহান্ আরো সে ;
কি ছার তারা মুকুতা জাল ?
প্রণয় উজল তার' যে !
এস কিশোরী হরষ মনে,
পরান তোমায় চায় গো,
হৃদয় সিন্ধু গগনের সনে
প্রণয়ে মিশিয়া যায় গো !

পূর্বরাগ

কালিদাস

নীরব যদিও রহে বালা আলাপনে,
আমি যবে কহি শোনে অবহিত মনে ;
যদিও সাহসে চাহে না সে মুখপানে,
দৃষ্টি তবুও তিষ্ঠে না কোনোখানে !

রূপসী

কালিদাস

লাবণ্য-খনি নিশামণি কি গো পিতা এই বালিকার ?
কিবা সেই আদি রসের রসিক, কুসুম আয়ুধ যার ?
কিবা সে পুষ্প-প্লাবিত চৈত্র ? হেন রূপ নিশ্চয়
বেদ-প্রণেতা সে বুড়া ব্রহ্মার স্থষ্টি কখনো নয়।

ভ্রমরের প্রতি

কালিদাস

তুমি বারবার পরশিছ তার ত্রস্ত চপল আঁখি,
কি গোপন বাণী কহ গুন্‌গুনি কানের সমীপে থাকি ;
হস্ত তাড়না গ্রাহ্য কর না, চুরি কর চুম্বন,
আমরা মূর্খ, ওগো মধুকর, তুমি সে রসিক জন।

প্রেম সংকট

শ্রীহর্ষ

দুর্লভ জনে অনুরাগ মম, হায়,
লজ্জা বিষম, আমি পরবশ তায় ;
একি সংকট, সখী একি হ'ল দায়,
মরণই শরণ, নিরুপায়, নিরুপায়।

উন্মনা

স্যাফো

মাগো, আমার মন বসে না
কাট্‌না নিয়ে থাকতে ঘরে ;
মন আইঢাই স্বস্তি না পাই,
বুকের ভিতর কেমন করে।
কালকে যারে দেখেছিলাম
তারেই নয়ন খুঁজে মরে ;
একটি বারের চোখের দেখায়
পরান কি গো এমনি করে !

প্রেমের বেদনা

স্যাফো

আবার ভালবাসা কাঁদায় মোরে,
অমৃত এনেছে সে তিক্তে ভরে ;
দুখের নিধি মম পরান প্রিয়তম,
বেঁধেছে সে আমায় ফুলের ডোরে,—
বেঁধেছে সূচীময় ফলের ডোরে।
একি গো ভালবাসা ঘটালে জ্বালা ?
পরালে গলে মোর কেমন মালা ?
ছিঁড়িতে নারি তায়, বহিতে প্রাণ যায়,
করিবি কিবা হায় মুগুধা বালা,
দোলায়ে দিল গলে কিসের মালা !

লাল মানুষের গান

(আমেরিকা)

বুকেতে বিঁধেছে তীর।
যাতনায় অস্থির,
ক্ষত মুখ বিঁধিছে কাঁটায় ;

নিশির দেবতা ! সাধি,
ক্ষত মোর দাও বাঁধি'
ঘুমের প্রলেপ দিয়া তায়।
নহিলে অসহ হলে
আঁখি যদি ভরে জলে,
ধরে তারে রাখা হবে দায় ;
কাঁদিলে ভীরুর মত
গৌরব হবে হত।
তাহাও সহিতে নারি, হায় !

অপূর্ব বিষাদ

গেটে

হৃদয়ে আমার বিষাদের ভার
গেছে মন-সুখ ফুরায়ে ;
বুঝি কভু হায় পাব না সে সুখ
এ জীবনে আর ফিরায়ে।
দরশন তার পাই না যেথায়,—
শ্মশান হেন গণি তায় ;
বেসুর নীরস সারা সংসার
আমার চক্ষে আজি হায়।
ভেঙে শত চূর হয়েছে হৃদয়,
মনের কিছুই নাহি ঠিক,
কোথা যেন হায় ভাসিয়া বেড়ায়
ঘুরিয়া মরে সে চারিদিক।
হৃদয়ে আমার বিষাদের ভার
গেছে মন-সুখ ফুরায়ে ;
বুঝি কভু হায় পাব না সে সুখ
এ জীবনে আর ফিরায়ে।

আমি চেয়ে থাকি তারি তরে শুধু
বাতায়ন পথে বিমনা ;
তারি তরে যাই ঘরের বাহিরে
আর কাজে মন লাগে না।
মরি কি মূরতি মনোবিমোহন
কি মধুর তার প্রকৃতি ;
সে অধরে সেই সুধামাখা হাসি,
সে চোখে প্রেমের কি জ্যোতি !
সে মধুর বাণী বহি' শত ধারে
হরণ করে গো প্রাণ মন ;
মরি কিবা সুখ পরশে তাহার ;
ওহো, আর সেই চুম্বন !
হৃদয়ে আমার বিষাদের ভার
গেছে মন-সুখ ফুরায়ে ;
বুঝি কভু হায় পাব না সে সুখ
এ জীবনে আর ফিরায়ে।
নিয়ত হৃদয় জ্বলিছে আমার
তারি তরে, হায়, কোথা সে ?
বারেকের তরে পাই যদি তারে
রাখি ধরি হৃদি-নিবাসে।
বারেক তাহারে পাইলে চুমিতে,
—সতত যেমন মানসে,—
বুঝি এ হৃদয় গলিয়া তখনি
চুম্বনে তার যাবে মিশে !

উষায় ও নিশায়

হায়েন

জাগিনু যখন উষা হাসে নাই,
সুধানু 'সে আজ আসিবে কি ?'
চলে যায় সাঁঝ, আর আশা নাই,
সে তো আসিল না, হায় সখি !
নিশীথ রাত্রে, ক্ষুব্ধ হৃদয়ে,
জাগিয়া লুটাই বিছানায় ;
আপন রচন ব্যর্থ স্বপন
দুখ ভারে নুয়ে ডুবে যায়।

মারাঠী গান

বাজিছে নাকাড়া-কাড়া, বাজিছে বাঁশী,
বঁধু বিনা জ্বলে বুকে অনল-রাশি ;
ফাগুনে সকল নারী সুখে বিহরে,
আমি শুধু দহি সই কুসুম-শরে।
কুহরে কোকিল নব রভস ভরে,
মরম উথুলে মোর মরমে মরে।
সে যদি আসিয়া করে হৃদয়-আলা,
তবে সই নেব তোর কুসুম-মালা ;
সে রয়েছে কোন্ দেশে, কে জানে কোথায়,
আমি এ 'ফাগুনী ফুল' কোথা রাখি হায় !

দুঃখের হেতু

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সকলে সুধায়, কেন খিন্ন দিন দিন,—
কেন আমি দুঃখে বিমলিন ?
সদাই বিরস কেন সদাই বিমনা ?
কৈশোরে এত কি দুর্ভাবনা ?

হায়! তারা বুঝে না রে এ মৃত্যু-যাতনা,
ঘুচাতে যা কেহ পারিবে না—
বিনা সে মধুর হাসি, বিনা সে চাহনি,—
(জগৎ-ভুলানো নির্ঝরিণী;)
কে ঘুচাবে দুঃখ জ্বালা? কে বর্ষিবে ঘুম?
হাহাকার করিবে নিঝুম!
সে কঠিনা, ক্ষমাহীনা, সুন্দীর সে নারী,
শিলা-সুকঠোর হিয়া তারি!
সে জানিতে নাহি চায় কেন আমি ক্ষীণ,
কেন বা গুমরি নিশিদিন;
আনন্দে যখনি, হায়, বিমুগ্ধ নয়নে,
চাহি সে মধুর মুখপানে,—
চাঁদমুখ ঘিরে ফেলে মেঘে,
কুটিল ভ্রূকুটি কি যে উঠে, হায়, জেগে;
বিরহে, নৈরাশ্যে, সদা ডুবে আছি তাই,
ক্ষুব্ধ খেদ ভিন্ন কিছু নাই;
জীবন বিজন মোর, গহন সে হায়,
বিষাদের বিষ-লতিকায়।

মুখর ও মৌন

সিরাজ অল্ ওয়ারক

আকুল কূজনে কপোত কাঁদিছে
মরম-যাতনা জুড়াতে তার;
আমারি মতন ব্যথিত সে জন,
মম সম বুকে দুখেরি ভার।

সে কাকলি শোনা যায় বনে বনে,
গোপন বেদনা আমারি শুধু ;—
তবু আঁখি জল ঝরে অবিরল,
লুকানো আগুন জ্বলে সে ধূ ধূ !
হায় পাখী, মোরা প্রেমের বেদনা
আধা-আধি বেঁটে নিয়েছি দোঁহে ;
মুখর কাকলি তোমাতে কেবলি,
মৌন ব্যথা সে আমারে দহে ।

একা

ভবভূতি

একাকী যদি কাটিল কাল, বাঁচিয়া সুখ নাই ;
শোভার নিধি কি হবে ?—যদি ভাবুক নাহি পাই ।
যে দিন দেখা না পাই তব সে দিন হ'ক নাশ,
তোমায় ছেড়ে সুখের আশা মরীচিকার আশ ।

পরিবর্তন

হায়েন্

বসন্তের গোলাপের আভা
শোভিছে ও কপোলে তোমার,
আর ওই হৃদয় ভরিয়া
বিরাজিছে শীতের তুষার !
কিন্তু ইহা যাবে উলটিয়া
কার্য সাধি গেলে বর্ষচয় ;—
তখন কপোল হবে হিম ।
সন্তাপিবে বসন্ত-হৃদয় !

গুপ্ত প্রেম

(তিব্বত)

ডাঙায় ওই উঁচু ডাঙায়,
ফুল ফুটেছে শাদায় রাঙায়,
ওরে রাখাল ভাই!
নূতন তর ফুল ফুটেছে,
আন্ রে তুলে তাই!
আন্ রে তুলে নূতন ফুলে,
আন্ রে তুলে তায়;
হাতটি দিয়ে তুলিস্ নে রে
শুকিয়ে যাবে হায়!
পরান দিয়ে তুলে এনে
হিয়ায় বাঁধ তায়;
বুকের মাঝে গোপন রেখে,—
প্রাণের মাঝে, হায়!

পথের পথিক

হুইট্‌ম্যান

পথের পথিক! তুমি জানিলে না কি আকুল চোখে আমি চাই;
তোমারেই বুঝি খুঁজেছি স্বপনে, এতদিন তাহা বুঝি নাই!
কবে এক সাথে কাটায়েছি কোথা নিশ্চয় মোরা দুটিতে,
মুখ দেখে আজ মনে পড়ে গেল পথের মাঝারে ছুটিতে!
সাথে খেয়ে শুয়ে মানুষ যেন গো, পুরানো যেন এ পরিচয়,
ও তনু কেবল তোমারি নহেক এ তনু শুধুই আমারি নয়!
চোখের মুখের সব অঙ্গের মাধুরী আবার আমারে দিয়ে,
আমার বাহুর বুকের পরশ চকিতের মত যাও গো নিয়ে।

কথা তো কহিতে পারিব না আমি মূরতি তোমার ভাবিব একা,
পথ 'পরে আঁখি রাখিব আমার ফিরে যত দিন না পাই দেখা।
আশায় রহিব আবার মিলিব তা'তে সন্দেহ আমার নাই,
দৃষ্টি রাখিব নিশিদিন যেন আর তোমা' ধনে না হারাই।

সার্থক দিন

ম্যাক্সিম গোর্কি

আজিকার দিন যায়নি বিফলে,
পেয়েছি গো আজি তাহার দেখা!
হাসিতে মানিক হাসিতে দেখেছি,
নয়নেরি জলে মুকুতা-লেখা!
দেখেছি দেখেছি তাহারি মুখ,
দুঃখ জীবনে জেনেছি সুখ;
(শুধু) তাহারে ফিরিয়া দেখিব বলিয়া
যাতনা ভুলিয়া যায় গো থাকা!

প্রস্থিতা

কালিদাস

নয়ন রে তোর উদিত ভাগ্য এখনি অস্ত যায়,
মরম দেশের মহা উৎসব ফুরায়ে গেল সে হায়!
ধৈর্য-দুয়ারে কপাট পড়িল, পড়িল সে চিরতরে,
পড়ে যবনিকা, লুকাল বালিকা, চ'লে গেল লীলা ভরে।

বালিকার অনুরাগ

চীন দেশের 'শী কিং' গ্রন্থ

(তার) রূপ দেখে হায় ঘরের কোণে মন কি রাখা যায়?
(সে যে) পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল আমার প্রতীক্ষায়!
(সে যে) মিথ্যা এসে ফিরে গেল তাই ভাবি গো হায়।

পথের আনাগোনার মাঝে কতই মানুষ যায়,
(আমি) কথ্‌খনো তো চক্ষে অমন রূপ দেখিনি, হায় ;
(তারে) দেখতে পেয়েও আজ কেন হায় যাইনি জানালায়।

ওড়নাখানি উড়িয়ে দেব অঙ্গরাখার 'পর
তোমরা সবাই জেনে থাক, আসবে আমার বর !
(আমি) বরের ঘোড়ায় চড়ে যাব কর্তে বরের ঘর।

ওড়নাখানি উড়ছে আমার বসন্ত হাওয়ায়,
ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ গো ওই দূরে শোনা যায়,
(আমি) পরের ঘরে কর্ব আপন, আমায় দাও বিদায়।

গোপিকার গান

টেনিসন

ছি ছি, কি লাজ, রাখাল ! রাখাল !
লজ্জা সরম নাই ;
চুমা দিয়ে পালিয়ে যাবে
দুইছি যখন গাই।
গোলাপ কত ফুটছে আবার,
বকুল হেসে লুটছে আবার
তুমি এসে চুমা দিলে দুইছি যখন গাই !

রাখাল এসে পিছন থেকে
চুমা দিয়েই পালাল ভাই,
ধরব তারে কেমন করে
দুইতে দুইতে গাই ;
পায়রা কত উড়ছে আবার,
কোকিলে গান জুড়ছে আবার,
রাখাল এসে চুমা দিলে দুইছি যখন গাই।

এস ফিরে রাখাল ! রাখাল !
চুমা দিয়ে যাও না ভাই,
এড়ানো কি যায় কখনো
ডুইতে ডুইতে গাই ;
পাপিয়া গানে মগন আবার,
আজকে যে গো মিলন সবার,
পিছন হতে চুমা দে যাও, ডুইতে ডুইতে গাই !

প্রেমের ইন্দ্রজাল

তামিল কবিতা

নীবিবন্ধন আপনি খসিছে, স্ফুরিছে ওষ্ঠাধর,
মনে মায়াবীজ বপন করেছে ; সখী, সে কি যাদুকর ?
যখনি আমার মদন-গোপালে নয়নে দেখেছি, হায়,
তখনি পড়েছি ইন্দ্রজালেতে,—সখী লো ঠেকেছি, দায় !
শুকপাখী এসে চলে গেছে, হায়, মোরে করি উদ্‌ভ্রান্ত,
এ যদি কুহক নহে তবে আর কুহক কি তাই জান্ তো ।
কাল নিশি হতে ঘুম আসি' চোখে কেবল পাগল করে ;
স্বপনে সে আসে, জাগিলে লুকায়, মর্ম বিদরে ওরে !
সখীরে সে শুধু চুম্বন দিতে চেয়েছিল এ অধরে ;
তোদের দেখিয়া মদন-গোপাল চ'লে গেছে রোষ ভরে ;
খেলা ছলে এসে ভালবাসা সে যে ঢেলে দিয়ে গেছে প্রাণে,
হায় সখি, মোর মদন-গোপাল না জানি কি গুণ জানে !

দেখে যাও

ভল্টেয়ার

তুমি কি দেখিবে বালা, কি মধুর আলো,
জ্বালিয়াছ হৃদয়ে আমার ?
কথায় ভাষায় শুধু তাই ফোটে ভাল
যে লালসা তুচ্ছ অতি ছার !

নীরবে,—দেখ গো চেয়ে—কত ভালবাসি,
প্রণয় নীরব চিরদিন,
এ নয়নে,—দেখে যাও—শুধু ওই হাসি
জাগায়েছে শকতি নবীন !

মৃত-সঞ্জীবনী

শেক্সপীয়ার

বসন্তের দিবা কি গো তুলনা তোমার ?
তুমি যে সুন্দরী আরো, অয়ি লজ্জাশীলা !
ব্যস্ত করে দস্যু হাওয়া ফুলদলে, আর
'মধু'র পত্তনি থাকে অতি অল্প বেলা।
কখনো প্রতপ্ত অতি স্বর্গের নয়ন,
বরন তাহার প্রায় মনে হয় ম্লান ;
হারায় সৌন্দর্য ক্রমে সৌন্দর্যের ধন,
পরিবর্তনের ফেরে হয় ম্রিয়মাণ।
কিন্তু তব অনন্ত বসন্ত কোনো দিন
হবে না মলিন ; হারাবে না এই দান,
গর্বে তোমা' মৃত্যু নাহি বলিবে অধীন,
অমর সংগীতে তুমি রবে বর্তমান !
মানব রহে গো যদি এ মর ধরায়,—
রবে ইহা ;—সঞ্জীবিত করিতে তোমায়।

প্রিয়ার পরশ

ভবভূতি

সরস পরশে তব ইন্দ্রিয়ের উপজে বিকার,
ও পরশ চেতনারে ভ্রান্ত করি চিরায় আবার !
নিশ্চয় করিতে নারি—হর্ষ ইহা কিংবা দুঃখভার,
মোহ-নিদ্রা,—মত্ততা কি সুধাসেক,—বিষের সঞ্চার !

রূপের মাধুরী

খুশ্‌হাল

মিথ্যা কথা, পদ্ম নহে তুলনা তাহার
লজ্জা মানে মৃগনাভি কেশবাসে যার ;
কৃষ্ণভুরু ধনু তার পক্ষ্মরাজী শর,
প্রতি শর লাগে হায় প্রাণের ভিতর।
তীক্ষ্ণ যেন তরবারি দুটি আঁখি তার,
প্রেমিকের প্রাণ ল'য়ে যুদ্ধ অনিবার!
অধরের কোণে কৃষ্ণ তিল শোভমান,
খুলেছে হাব্‌সী শিশু চিনির দোকান!
প্রদীপ্ত আলোক সম রূপশিখা তার,
প্রেমিক পতঙ্গ ফিরে ঘিরি' অনিবার।
কপোল পরশে শুধু কানের সে দুল,
অধর ছুঁইতে পায় লবঙ্গের ফুল!
অনিন্দ্য সে রূপ তার রূপের মাধুরী,
কেবল পাষাণ প্রাণ, এই খেদে মরি।
কে জানে কতই লোকে কত কি যে চায়,
খুশ্‌হাল মুগ্ধ শুধু রূপের প্রভায়।

ভালবাসার নামান্তর

ভিক্তর হুগো

পুলক-ভরা পাখীর গানে
আমরা কেন দিব গো কান?
সবার চেয়ে সুকণ্ঠ পিক
তোমার কণ্ঠে গাহিছে গান!
দেবতারা আকাশের তারা
দেখান কিংবা রাখুন ঢেকে,
সবার চেয়ে উজল তারা
ফুটেছে ওই তোমার চোখে!

বসন্ত আজ নূতন করে
ফুটাক ফিরে ফুলের কলি,
ফুলের সেরা ফুল যে ওগো
তোমার হিয়া, আমরা বলি!
গগন-শোভা দিনের রাজা,—
আবেগ-মাখা পাখীর ভাষা,—
বিকশিত হৃদয়-কুসুম,—
(তাদের) আরেকটি নাম ভালবাসা।

জোবেদীর প্রতি হুমায়ুন

সরোজিনী নাইডু

গোলাপে ফুটাও তুমি সৌন্দর্য তোমার,
জ্যোতি তব উষার কিরণে ;
পাপিয়ার কলস্বনে তোমারি মাধুরী,
মরালের শুভ্রতা বরণে !
জাগরণে স্বপ্ন সম সঙ্গে তুমি মোর,
চন্দ্র সম নিশীথে তন্দ্রায় ;
আর্দ্র কর, স্নিগ্ধ কর, মৃগনাভি সম,
মুগ্ধ কর রাগিণীর প্রায়।
তবু যদি সাধি তোমা' ভিখারীর মত
দেখা মোরে দিতে করুণায় ;
বল তুমি, "রহি অবগুণ্ঠনের মাঝে।
এ রূপ দেখাতে নারি হায়!"
তৃষা আর তৃপ্তি মাঝে রবে ব্যবধান—
অর্থহীন এ অবগুণ্ঠন ?

আমার আনন্দ হতে সৌন্দর্য তোমার
দূরে রাখে কোন্ আবরণ ?
একি গো সমর-লীলা তোমায় আমায় ?
ক্ষমা দাও, মাগি পরিহার ;
মরমের (ও) মর্ম যাহা তাই তুমি মোর,
জীবনের জীবন আমার !

নারী-বন্দনা

(এক ॥ মলয় উপদ্বীপ)

ললাট তোমার সিতপক্ষের তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ,
আদ-ফুটন্ত যূথিকার কলি স্ফুরিত নাসার ছাঁদ ;
রাঙা ছুটি গাল, পুষ্ট রসাল, ধরেছে মাত্র রং,
লেবু-গন্ধের তৃণের মতন কচি আঙুলের ঢং !
কুন্তল ঘন গন্ধ মগন গুবাক-ফুলের কাঁধি,
জোড়া-ভুরু যেন আকাশের পাখী চিত্রে রেখেছে বাঁধি !
নয়নে তোমার শুক্র-তারার চির-উজ্জ্বল বিভা,
পেকে-ফেটে-যাওয়া ডালিমের মত ওষ্ঠ অধর কিবা ;
তিনটি রেখায় নিবিড় লেখায় শোভিত কণ্ঠ তা'য়,
ক্ষীণ কটি যেন ফুলের বৃন্ত হিল্লোলে দোলে হায় !

(ছুই ॥ মিশর)

রমণীর মণি, মমতার খনি, রাজার দুলালী ধনী,
অমা যামিনীর তিমির জিনিয়া কালো তব কেশ গণি ;
কালো সে নিবিড় ফল-মণ্ডিত জম্বুবনের চেয়ে,
পৃষ্ঠ তোমার—স্কন্ধ তোমার—ললাট তোমার ছেয়ে !
কুসুম স্তবক স্তন ছুটি তব বিমুখ বিরাগ ভরে
তীক্ষ্ণ উজল দশন অমল হীরকে মলিন করে ;
লঘু লীলায়িত সকল অঙ্গ হিল্লোলে যেন দোলে,
তোমারে ঘিরিয়া যেন বসন্ত নব-পল্লব খোলে !

(তিন ॥ জাপান)

মূল-পাপড়ির জড়িমা-জড়িত আধ-বিকশিত আঁখি,
উজ্জ্বল যেন ছুরির মতন, শান্ত যেন গো পাখী!
সুন্দর কিবা দীর্ঘ ও গ্রীবা, বদন ডিম্বাকার,
বক্ষ ও উরু নহে নহে গুরু, ক্ষীণ পাণি পাদ তার ;
পাণ্ডুবদন, পাণ্ডুবরন, মাথায় কেশের রাশি,
অতুল শিল্প ওষ্ঠ-অধরে আধ-বিকশিত হাসি!

(চার ॥ গ্রাস)

কপোল তোমার গোলাপের মত, দুধে-আলতার রং,
নিশ্বাস মধু, সরল নাসিকা,—নহে গরুড়ের ঢং ;
দীঘল আঙুল, ক্ষুদ্র চরণ, উজল মাঝারি চোখ,
জোড়া নহে ভুরু,—ঈষৎ বক্র, হাসিতে তুষ্ট লোক ;
নগ্ন মূরতি সুন্দর অতি, ভূষণে তেমনি শোভা,
তনু কমনীয়, সুখ নমনীয়, নিখিল পরান লোভা!

(পাঁচ ॥ ভারতবর্ষ)

পূর্ণিমা-চাঁদ বদনের ছাঁদ, লাবণ্যে তনু ছায়,
আধ-বিকশিত সোনার কমল উজলিছে মহিমায় ;
পরশে তাহার শিরীষ-সুষমা, বলি-চিহ্নিত মাঝ,
কোকিল-কণ্ঠী, হরিণ-নয়না, হাসে ভাষে সদা লাজ।

(ছয় ॥ ইহুদী)

তোমার মুখের গন্ধ মধুর নাস্‌পাতি হতে মিঠে,
কিবা সর্বৎ—কিবা সে সরাব অধর অমৃত ছিটে!
তরুণ তরুর ছন্দ তনুর, নীল কুন্তলজাল,
হৃদয়কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে দ্রাক্ষা সে সুরসাল!
লুকায়ে ও বুকে উৎসুক মুখে ও কি মৃগশিশু দুটি ?
আবরণখানি করিলে মোচন—ওরা কি পালাবে ছুটি ?
স্ফটিকে গঠিত অঙ্গ তোমার, অমৃত-পাত্র কায়,
কোন্ রস তাহে আছে যে অভাব ভাবিয়া পাই না হায়!

(সাত ॥ য়ুরোপ : মধ্যযুগ)

অমলবরণী নবনীত জিনি'—জিনি' বরফের গুঁড়া,
কোমল চিকন চিকুর সোনালী জিনি' কাঞ্চন-চূড়া !
অধর অরুণ, হাসিটি তরুণ, করুণ নয়ন ছুটি,
ক্ষীণ তনু—তাজা, পরিক্ষীণ মাজা,—তবু সে পড়ে না টুটি'।
বুকের বসন তুলিয়া ধরিয়া আছে ছুটি আখরোট,—
সোহাগ-ভিখারী আছে আগু বাড়ি' সাথে আছে রাঙা ঠোঁট।

(আট ॥ কাফ্রি)

ওই কালো রূপ অমৃতের কূপ সুষমার খনি কালো,
শ্যাম পল্লব জিনিয়া পেলব কালো আমি বাসি ভাল ;
নিবিড় রূপের স্নিগ্ধ গাঢ়তা স্বপনে ডুবায় আঁখি,
স্নিগ্ধ শ্যামল বদনে উজল চঞ্চল আঁখি-পাখী !
ললাট-ফলক বেড়িয়া অলক খেলা করে বায়ু-ভরে,
কোমলে কঠোর—সংহত তনু কাফ্রির মন হরে।

(নয় ॥ পারস্য)

ঘন কুন্তল শত তরঙ্গে সতত রঙ্গ করে,
ভুরু ধনু কে গো করেছ যোজনা নয়ন-পক্ষ্ম-শরে !
গুম্ফ-বিহীন ওষ্ঠে চিবুকে নীল সুষমার লেখা,
দীঘল সরল তনু নির্মল, চোখে কজ্জল-রেখা ;
কালো তিল—খুঁটে কুড়ায়ে তুলেছে, ফুটায়ে তুলেছে রূপ,
অমল চরণে লুণ্ঠিত কত মুকুট-শীর্ষ ভূপ !

(দশ ॥ আরব)

বেতসী জিনিয়া নমনীয় তনু,—কিশলয় জিনি' কচি ;
বদন-ইন্দু ঘিরি' কুন্তল রেখেছে যামিনী রচি' !
কজ্জল-হীন কাজল-নয়ন রেশমী পক্ষ্মে ঘেরা,
কান্ত কোমল ক্লান্ত সে দিঠি সকল দিঠির সেরা ;
অধর অরুণ দশন তরুণ প্রবালে মুকুতা পাঁতি ;
ক্ষীণ কটি, গুরু উরু নিতম্ব, জোড়া ভুরু প্রাণঘাতী !
এক বৃন্তের ছুটি দাড়িম্ব হৃদি 'পরে হৃদি-লোভা,
লঘু পাণি, লঘু চরণ, আঙুলে হেনার রঙীন শোভা।

কবির প্রেম

স্যুইনবার্ন

গোলাপ যাহা প্রণয় যদি হ'ত তাই,
আমি তারি হতাম পাতার মত ;—
দোঁহার তনু বাড়িত একই সাথে,
গানের দিনে কিংবা দুখের রাতে,
ফুলের বনে কিংবা মাঠের মাঝে ভাই,
হর্ষে বিভোর কিংবা শোকে হত।
গোলাপ যাহা প্রণয় যদি হ'ত তাই !
আমি তারি হতাম পাতার মত !

'কথা' যাহা আমি গো যদি হতাম তাই,
প্রণয় যদি হ'ত 'সুরে'র মত ;—
মূর্ছনা কি উচ্চগ্রাম, খাদে,
দোঁহার সর্ব মিশিত এক (ই) সাথে,
দুপুর বেলা মধুর বৃষ্টিপাতে ভাই,
হর্ষে বিভোর পাখী দুটির মত ;
'কথা' যাহা আমিও যদি হতাম তাই,
প্রণয় যদি হ'ত সুরের মত !

জীবন যাহা—তুমি গো যদি হতে তাই,
আমি হতাম মরণেরি মত !
রৌদ্র বৃষ্টি হ'ত একই সাথে,
চৈত্র মাসের নূতন পাতে পাতে,
চৈত্র মাসের সকল শাখে শাখে ভাই
ফুলে যখন ফলের গন্ধ যত।
জীবন যাহা—তুমি গো যদি হতে তাই,
আমি হতাম মরণেরি মত।

তুমি গো যদি দুখের হতে ক্রীতদাস,
আমি হতাম হরষেরি সাথী ;—
ভাগ্য ল'য়ে চলিত শুধু খেলা,
কখনো হাসি, কখনো হেলাফেলা,
বালক সম—বালিকা সম পরিহাস,
অরুণ সাথে অশ্রুময়ী রাতি !
তুমি গো যদি দুখের হতে ক্রীতদাস,
আমি হতাম হরষেরি সাথী।

তুমি যদি 'মধু'র প্রিয়া হতে রানী,
আমি হতাম 'মাধবে'রি রাজা ;—
মুকুল, ফুল, রাখিয়া বাজি মেলা,
পাতার পাশা হ'ত মোদের খেলা,
নিশার মত হ'ত উষার হাসিখানি,
নিশি হ'ত অরুণ-রাগে মাজা !
চৈত্রনিশির তুমি যদি হতে রানী,
আমি হতাম বসন্তেরি রাজা !

তুমি যদি সুখের প্রিয়া হও রানী,
আর আমি হই বেদনারি রাজা ;—
মদনে মোরা করিব দোঁহে শিকার,
ছিঁড়িয়া পাখা ঘটাব তার বিকার,
মুখেতে তার লাগাম এক দিব টানি,—
শিখাব তারে নাচনেরি মজা !
তুমি যদি সুখের প্রিয়া হও রানী,
আর আমি হই দুঃখ-ব্যথার রাজা !

গোলাপ-গুচ্ছ

রবার্ট ব্রাউনিং

সারাদিন আমি বেঁধেছি গোলাপ
গুচ্ছ করি,
একে একে একে দলগুলি তার
নিতেছি হরি' ;
দিতেছি ছড়ায়ে যে পথে আমার
সে জন যায়,
একবার সেকি চাহিবে না ফিরি' ?
চাবে না ? হায় !
তবে পড়ে থাক্,— তবে পড়ে থাক্,—
মরিয়া যাবে ?
আমি ভেবেছিনু নয়নে তাহার
পড়িয়া যাবে।
হায়, কতকাল করিয়াছি শ্রম
সাধিতে হাত,
ফিরাতে কঠিন আঙুল বীণায়
দিবস-রাত ;
আজিকে আমার গাহিতে যতন
জানি যে গান,
সে কি শুনিবে না ? হায় গো সে জন
দিবে না কান ?
যাক ছিঁড়ে তার, গান থেমে যাক
হৃদয় তলে ;
আহা যদি আজ সে জন আমায়
গাহিতে বলে !
সারাটি জীবন শিখেছি শুধুই
বাসিতে ভাল,

এবার ভেবেছি সাধিয়া দেখিব
জ্বলে কি আলো ;
মরম-কাহিনী শোনাব সে জনে,
শুনিবে সে কি ?
দিবে সে কি মোরে স্বরগের সুখ ?
ভালই, দেখি।
যে খুশী হারাক আমি তো বলি গো
এমনি ধারা,—
স্বর্গ যাদের করতলে আসে
ধন্য তারা !

মিলন-সংকেত

শেলি

তোমারি স্বপন-সুখে জাগিয়া উঠি,
কাঁচামিঠে ঘুমটুকু পড়ে গো টুটি ;
মৃদু নিশ্বাসে যবে সমীর চলে,
রশ্মি-উজল তারা আঁধারে জ্বলে ;
তোমারি স্বপন-সুখে জাগিয়া উঠি,
তোমারি জানালা-তলে এসেছি ছুটি ;
চরণ কে যেন মোর আনে গো টানি,
কে জানে কেমনে ?—আমি জানিনে রানী !
নিথর নিবিড় কালো নদীর 'পরে
চলিতে চলিতে বায়ু মুরছি' পড়ে—
মিলায় চাঁপার বাস—নিবিয়া আসে,
ভাবের ভুবন যেন স্বপন-দেশে ;
পাপিয়ার অনুযোগ ফুটিতে নারি
মরমে মরিয়া হায় গেল গো তারি,
আমিও মরিয়া যাব অমনি ক'রে,
আদরিণি ! ও তোমার হৃদয় 'পরে।

এ তৃণ-শয়ন হতে তোলো আমারে,
মরি গো, মুরছি', ডুবে যাই আঁধারে !
পাণ্ডু অধরে আর নয়ন-পাতে,
বৃষ্টি কর গো প্রেম চুমার সাথে !
কপোল হয়েছে হিম, হায় গো প্রিয়া,
দ্রুততালে দুরুদুরু কাঁপিছে হিয়া ;
ধর গো চাপিয়া বুকে, এস গো ছুটি
তোমারি বুকের 'পরে যাক সে টুটি।

প্রেমের সুখদুঃখ

সুইনবার্ন

প্রেম রাখিল মাথাটি তার
কাঁটায় ভরা গোলাপ শেযে ;—
ঠোঁট দুটি তার শুকিয়ে এল,
আঁখির পাতা উঠ্‌ল ভিজে।
সঙ্গীহারা শিথানে তার
ভয়-ভাবনা রইল ঘিরে ;
তিলে তিলে পোহায় নিশি,
উষায় ধরা হাসে ফিরে ;
উষার সাথে হরষ এসে
চুমিল সেই মুখটি ধীরে,
ভয়-ভাবনা গেলেন সরে
ছিলেন যাঁরা শিথান ঘিরে !
আঁখিতে তার ফুট্‌ল আলো,
ঠোঁটে উষার হাসি-রাশি ;
নিশায় বিষাদ রাজ্য করুক্
উষা ফিরে আন্‌বে হাসি !

সন্ধির আনন্দ

বোয়ার্দো

কমল, গোলাপ আন ভরিয়া অঞ্জলি,
আন বেলা, ফুল্লযূথী ছড়াও পবনে ;
আমার ব্যথায় যারা ব্যথা পেলে মনে,—
এস আজ! আনন্দের অংশী হতে বলি।
আন গো অরুণ ফুল, আন শুভ্র কলি,
যে ফুল সাজিবে ভাল এ আনন্দ দিনে ;
সুগন্ধ সলিল-ধারা ঢাল গো ভবনে,
আমার ভাবের সাথে মিলে এ সকলি।
শান্ত সে বিপক্ষ মোর, করেছে মার্জনা,
শান্তি এবে, চাহে না সে মরণ আমার ;
দয়া মাত্র গর্ব তার,—নহে নহে ঘৃণা ;
আশ্চর্য হয়ো না তবে উৎসাহে আমার ;
এত সুখে—এ আনন্দে—ক্ষীণ-মনোবীণা—
নহে ছিন্ন তন্ত্রী!—এই বিস্ময় অপার!

মারাঠী গাথা

কানাই ॥ আবার কিনিলে মোরে, হে সুন্দরী!
গোপী ॥ আমি তো আসিনি ; টেনে আনে বাঁশরী ;
লহরিয়া উঠে হিয়া ঘনঘটাতে
কানাই ॥ বালিকা কেমনে এলে আঁধার রাতে?
কেমনে চিনিলে পথ? গভীর নিশা!
গোপী ॥ চমকে বিজলী মুহু—পাইনু দিশা।
কানাই ॥ পিছল সে বাঁকা পথ কাঁটায় ভরা,
বেদনা পেয়েছ বড়, বিম্বাধরা!
গোপী ॥ লঘু গতি, দৃঢ় মতি করে সে হেলা।

কানাই ॥ নিশি যে বিষম কালো,—তুমি একেলা !
গোপী ॥ না, না বঁধু, একাকিনী আসেনি রাধা,
প্রেম যার সাথী তার কিসের বাধা !

প্রেমের নেশা

সাদি

ধন্য সে,—প্রভাতে জাগি সতৃষ্ণ নয়নে
প্রতিদিন যেই জন দেখে ও বয়ান ;
মাতাল চেতনা পায় নিশা অবসানে,
প্রেমের কাটে না নেশা না গেলে পরান !

চুম্বন

রবার্ট ব্রাউনিং

প্রথমেতে কীটের চুম্বন !
চুম' মোরে,—যেন তুমি পার না বুঝিতে
কোনো মতে,—কোন্ ভাবে আজি রজনীতে,—
ফুল যারে বল তুমি—এ মোর আনন—
শতদল—গুটায়েছে পাপড়িগুলি তার ;
চুম্বন-পরশ দাও সর্বত্র তাহার !
ফুটিব পরশ চিনি' অমনি তখন !
ভ্রমরের চুম্বন এবার !
চুম' মোরে,—যেন তুমি পশেছ অন্তরে
হর্ষভরে,—একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে ;
উড়াতে না পারে হায় সে দাবী তো আর
মুকুল সাহস ক'রে ;—সব পর হাত ;
তাই শেষে, শ্লথ-দল পুষ্প সম, নাথ !
এ ফুলে পাড়াই ঘুম বাহুতে তোমার।

সাকীর প্রতি

(এক ॥ আব্দল্ সালম বিন রাগোয়ান্)

এস সাকী ! দেহ পাত্র ভরিয়া
রঙ্গিল মদিরায় ;
আর কারো হাতে এমন করিয়া
পাত্র কি লওয়া যায় ?
সে রস ধরে না আঙুরের ফল,—
নাহি সে মর্ত্য-লোকে,
সে যে রাঙিয়াছে তোমারি কপোল,
উজল করেছে চোখে।

(দুই ॥ খুশ্‌হাল)

ওগো সাকী মদিরা বিলাও,
পেয়ালা ভরিয়া বারেবার ;
মধুপান বিনা মধু যাবে ?
বলিয়ো না—দোহাই তোমার।
আর কবে ফুলদলে পাব,
ফুল্লমুখী সুন্দরী সঙ্গিনী ?
কোন্ বাধা বাঁধে মোরে আজি ?—
হেন দিনে,—বল তো রঙ্গিণী !
দেখ, কি বলিছে ওরা—শোনো,
কি বলিছে, বাঁশীতে বীণায়,—
'গেলে দিন আসে না ফিরিয়া'
কি দারুণ, কি বিষম হায় !
মিষ্ট বড় জীবনের সুখ,
হায়—যদি থাকে চিরদিন,
চিরকাল না থাকিল যদি—
গণ' তারে তুচ্ছ অর্থহীন।

কত না নূতন প্রেম হায়,
দলিত কালের পায় পায় !

(তিন ॥ হাফেজ)

সাকী ! যদি জানো আস্বাদ মদিরার,
সুরা বিনা তবে আনিয়ো না কিছু আর ;
ভজনা-গৃহের বেচিয়া মাদুর, দরী,
প্রেম-সুরা কিনে আনো তুমি সুন্দরী।
মাতাল ! এখনো সংজ্ঞা যদি হে থাকে,
ওই শোনো, তোমা' গোলাপের বনে ডাকে ;
বিষণ্ণ চিতে সান্ত্বনা কর দান,
অখ্যাতি হ'ক তাহাতে দিয়ো না কান।
প্রেমের জগতে মনের গোপন-ধারা,
বেণুর কাঁদনি বীণা'র তানের পারা।
আচারনিষ্ঠ দানশীল ধনী হ'তে
প্রেমিক ফকির শ্রেষ্ঠ সে বহু মতে।
সুলতান হেন পরী হের কে আসিছে,
সারা শহরের লোক তার পিছে পিছে।
মাত্র বারেক দেখেছে যে জন মুখ,
সেই পথ চেয়ে রয়েছে গো উৎসুক।
আর কতদিন বিরহ-বেদনা হাফেজ সহিবে, হায়,
বুক-ফাটা দুখ কবে হবে শেষ ? সে কথা সুধাব কা'য় ?

মেঘের প্রতি

শূদ্রক

আরো গম্ভীরে ডাক তুমি মেঘ, ডাক গম্ভীর স্বরে,
তোমার প্রসাদে পরান আমার অনুরাগ-রসে ভরে ;
নিবিড় পরশ-হরষ-আবেশে ঘন রোমাঞ্চ হয়,
নব-বিকশিত নীপের পুলক জাগে সারা তনুময়।

প্রিয়া যবে পাশে

হাফেজ

প্রিয়া যবে পাশে, হস্তে পেয়ালা, গোলাপের মালা গলে ;—
কেবা স্থলতান ? তখন আমার গোলাম সে পদতলে।
বলে দাও বাতি না জ্বালায় আজি আমোদের নাহি সীমা,
আজ প্রেয়সীর মুখচন্দ্রের আনন্দ-পূর্ণিমা !
আমাদের দলে সরাব যা চলে তাহে কারো নাহি রোষ।
তবে ফুলময়ী ! তুমি না থাকিলে পরশিতে পারে দোষ।
আমাদের এই প্রেমিক সমাজে আতর ব্যাভার নাই,
প্রিয়ার কেশের স্থরভিতে মোরা মগন সর্বদাই।
শরের মুরলী শুনি আমি ওগো সমস্ত কান ভরি,
আঁখি ভরি দেখি স্থরার পেয়ালা—তব রূপ স্থন্দরী !
শর্করা মিঠা আমারে বল' না, প্রিয়া ! আমি তাহা জানি,
তবু সব চেয়ে ভালবাসি ওই মধুর অধরখানি।
অখ্যাতি হবে ? অখ্যাতিতেই বেজে গেছে মোর নাম,
নাম যাবে ? যাক্, নামই আমার সব লজ্জার ধাম ;
মত্ত, মাতাল, ব্যসনী আমি গো, আমি কটাক্ষ-বীর,
একা আমি নই, আমারি মতন অনেকেই নগরীর।
মোল্লার কাছে মোর বিরুদ্ধে করিয়ো না অনুযোগ,
তাঁর আছে, হায়, আমারি মতন স্থরা-মত্ততা রোগ !
প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেক না হাফেজ ! ছেড় না পেয়ালা লাল,
এ যে গোলাপের চামেলির দিন—এ যে উৎসব কাল !

সাগরে প্রেম

তেয়োফিল গতিয়ে

আমরা এখন প্রেমের দেশে, তবে,
বল, এখন কোথায় যাব আর ?
থাকবে হেথা ?—যেতে কোথাও হবে ?

পাল তুলে দিই ?—ধরি তবে দাঁড় ?
নানান্ দিকে বহে নানান্ বায়,
ফাগুন চিরদিনই ফাগুন হায়,
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা তায়,
এখন বল, কোথায় যাব আর ?

চুমার চাপে যে দুখ গেছে মরি',—
অস্ত সুখের শেষ নিশাসে ভরি',—
প্রসাদ পবন মোদের হবে সে ;
ফুলে বোঝাই হবে নৌকাখান্,
পন্থা মোদের জানেন ভগবান,
আর জানে সেই কুসুম-ধনু যে !
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা হায়,
এখন বল, যাব আর কোথায় ?

মাঝি মোদের প্রণয়-গাথা যত,
ধ্বজে দুটি কপোত প্রণয়-ব্রত,
সোনার পাটা, সোনার হবে ছই,
রশারশি রসিক জনের হাসি,
নয়ন কোণে রবে রসদ রাশি,
রসদ রবে অধর প্রান্তে সই !
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায় !
এখন বল, যাব আর কোথায় ?

কোথায় শেষে নামাব, বল্, তোরে,—
বিদেশী সব যেথায় নিতি ঘোরে ?
কিংবা মাঠের শেষে গাঁয়ের ঘাটে ?—
যে দেশে ফুল ফোটে অনল মাঝে ?

কিংবা যেথায় তুষার বুকে সাজে ?
কিংবা জলের ফেনার সাথে ফাটে ?
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা হায় !
এখন বল,—যাব আর কোথায় ?

কয় সে ধীরে, "নামিও মোরে সেথা,
প্রেমের পাখী একটি মাত্র যেথা ;—
একটি শর, একটি মাত্র হিয়া !"
তেমন পুরী যেথায় আছে, হায়,
নরের তরী যায় না গো সেথায় ;
নারী সেথায় নামতে নারে, প্রিয়া !

রাজা ও রানী

চীন দেশের 'শী কিং' গ্রন্থ

"ওই শোনো গো কাক কোকিলে ডাকে,
সভায় তব লোক দেখ না কত !"
"না না, কোথায় কাক কোকিলে ডাকে ?
শব্দ হ'ল ঝিঁঝির ডাকের মত।"
"ওই দেখ গো ভোরের আলো পেয়ে,
সভা তোমার উঠছে যেন হেসে !"
"না না, ও নয় দিনের আলো, প্রিয়ে,
উদয় চাঁদের রশ্মি ওঠে ভেসে।"
"হায় প্রিয়তম, ঝিল্লি তানের মাঝে,
সুখের বড় নিদ্রা তব সনে ;
ভাবনা শুধু,—ফিরবে সভার লোক,
না জানি কি ভাব্‌বে তারা মনে !"

বিদায় ক্ষণে

আবু মহম্মদ

মাঝিরা বলিল "গেল বেলা গেল,
আর বিলম্ব নয়।"
সেই ক্ষণে প্রিয়া শিথা'ল হিয়ায়
আঁখি কত কি যে কয়!
উদ্বেল হিয়া কাছে এল প্রিয়া
কহিতে বিদায়-বাণী ;
মনের যে কথা মুখে মিলাল তা
আধেক চেতনা মানি'।
মুগ্ধ নয়ন জল-ভার-নত,
মেলি' দুইখানি কর,
গোলাপের বনে মলয়ার মত
পড়িল বুকেরি 'পর।
রাহু সম মোর উৎসুক বাহু
বেড়িয়া ধরিল তারে ;
সে কহিল কাঁদি "পরিচয় যদি
না ঘটিত একেবারে!"

প্রবাসে

চীন দেশের 'শী কিং' গ্রন্থ

হলুদ বরন পাখী, ওরে হলুদ বরন পাখী মোর,
শস্য খুঁটে নিস্‌নে আমার শস্য লুটে নিস্‌নে চোর!
বিদেশে বিদেশীর মাঝে পাইনে সাদর সম্ভাষণ,
চল্ রে উড়ে পালাই দেশে যেথায় আছে আপন জন।

হলুদ বরন পাখী, ওরে হলুদ বরন পাখী মোর,
ভুট্টা খুঁটে নিস্‌নে মোদের নিস্‌নে ওরে ভুট্টা-খোর!

বিদেশে কেউ মন বোঝে না মিথ্যা মুখের পানে চাই,
চল্ রে জেলে আপন দেশে আপন জনের কাছে যাই।

সোনার বরন পাখী, ওরে সোনার বরন পাখী মোর,
মোদের কড়ি দিলনে লুটি' পাখী রে পায় ধরি তোর ;
বিদেশে বিদেশীর মাঝে থাকতে মোরা পারি না, ভাই,
চল্ রে মোরা সবাই মিলে দেশের কোলে ফিরে যাই।

হাবসী নারীর গান

বাতাস গরজায়, বৃষ্টি পড়ে ;
পথিক দরজায়, বিদেশী অসহায়,
কাতর সে যে হায় বিষম ঝড়ে।
কাছে মা নাই তার দুধ কে দেবে আর ?
গরম ক'রে আর আদর ক'রে ?
বধূ সে কাছে নাই, শস কে ভাঙে ভাই,
কড়ি কে গড়ে বল্ তাহার তরে ?
বিদেশী অসহায়, কোথা সে যাবে হায় ?
আমরা তারে আয় বাঁচাই ঝড়ে,
নাই মা, বধূ নাই, খেতে কে দেবে ভাই ?
কে তারে দেবে ঠাঁই !—বৃষ্টি পড়ে।

স্মৃতি

শেলি

অম্বরে কাঁদিয়া ফিরে মোহময় তান,
থেমে গেলে গান !
বকুল শুকায়ে গেলে,—তবু তার ঘ্রাণ
মুগ্ধ করে প্রাণ।

গোলাপ ঝরিলে তার পাপড়ি বিছায়
প্রিয়ার শয্যায় ;
তুমি গেলে ভালবাসা পড়িবে ঘুমায়ে
স্মৃতিটি জড়ায়ে !

দুখ-শর্বরী মাঝে

কীট্‌স্

দুখ-শর্বরী মাঝে
বড় সুখী তরুলতা ;
শাখে আর নাহি জাগে
শ্যামল শোভার কথা !
উত্তর বায়ু পারে না পত্র ঝরাতে ;
বরষি' করকা তীব্র স্বননে ঝরাতে ;
নাহি পারে আর পিণ্ড-তুষার জরাতে ;
বিকাশের মুখে তা সবায়।
দুখ-শর্বরী মাঝে,
বড় সুখী নির্ঝর ;
বুদ্‌বুদে নাহি জাগে
রঙিন রবির কর !
শুধুই মধুর বিস্মৃতি ল'য়ে সুখেতে,
লালসা-লহর শান্ত করে সে বুকেতে ;
নিমেষের তরে উচ্চারে না তো মুখেতে
কঠোর কালের বারতায়।
আহা যদি সকলেরি
হ'ত গো এমনি হায় ;

অতীতের সুখ স্মরি'
কেনা কাঁদে যাতনায় ?
মরমে মরমে পরিবর্তন মানা,
প্রতিকার নাই,—চিকিৎসা নাই—জানা,
অথচ নহেক অপটু, বধির, কানা,
সে কথা লেখেনি কবিতায়।

বধূ

চীন দেশের 'শী কিং' গ্রন্থ

ছেলেবেলার কথা ভাবি যখন জ্বলে সাঁঝের দীপ ;
মনে পড়ে গাঙের ধারে তলতা বাঁশের দীর্ঘ ছিপ্।
বাম দিকে সেই ঝরনা ঝরে, ডাহিন দিকে বইছে নদী,
দূরে হলেও তোমরা আমার কাছেই আছ নিরবধি।
আঁখি যে ঠাঁই দেখতে না পায়, মন ছোটে সেই বাপের ঘরে,
বাপের মায়ের ভায়ের আদর না পেয়ে প্রাণ কেমন করে।
ঝরনা ঝরায় ঝংকারে আর নদীর কুলুকুলুর সাথে,
তোমাদের আনন্দ হাসি শুনি আমি আঁধার রাতে !
কেরল কাঠের নৌকা চ'ড়ে সরল কাঠের দাঁড়টি বেয়ে,
মাগো আমার ইচ্ছা করে তোমার কাছে জুড়াই গিয়ে।

উৎকণ্ঠিতা

চীন দেশের 'শী কিং' গ্রন্থ

ওই গো আমার আকাশ ডাকে,—
আকাশ ডাকে ওই !
এমন সময় বাইরে থাকে ?—
ছুটিই বা তার কই ?
ওগো, তুমি ফিরে এস, ফিরে এস গো !
তোমায় ঘরে দেখে আমি নির্ভাবনা হই।

আবার আকাশ উঠেছে ডেকে ;
কখন গেছে সেই ;
বাড়ছে বাতাস থেকে থেকে,
ফিরতে কি তার নেই ?
ওগো, তুমি ফিরে এস, ফিরে এস গো !
তুমি কাছে থাকলে তো ভয় পাইনে কিছুতেই।

ভেঙে বুঝি পড়ল আকাশ
পড়ল বুঝি ওই ;
এমন দিনেও নেই অবকাশ,—
একলা সারা হই !
ওগো, তুমি ফিরে এস ফিরে এস গো,
তোমার কাছে বসে আমি নির্ভাবনা হই।

প্রোষিতভর্তৃকা

চীন দেশের 'শী কিং' গ্রন্থ

প্রভু মম যোদ্ধা তেজীয়ান্,
বীরাগ্রণী বীর ;
নৃপ আগে রণে তিনি যান ;
করে ধনু তীর।
যুদ্ধে যবে গেল প্রিয়তম,
সে অবধি কি গ্রীষ্মে কি শীতে,—
রুক্ষ কেশ ওড়ে শণ সম ;
বাঁধিবে সে ? কাহারে তুষিতে ?
বৃষ্টি চাই, তবু সূর্য ওঠে
নির্মেঘ আকাশে ;
তাঁরি কথা প্রাণে সদা ফোটে,
মনে শুধু আসে।

কোথা মিলে বিস্মরণী লতা ?
আমি দ্বারে করিব রোপণ ;
জাগে যে কেবলি তাঁরি কথা,
হায় তাহে কেবলি রোদন !

ব্যাকুল

শিলার

ঘন গরজে, বন গহন,
মেঘে ছাইল সারা গগন,
ব্যাকুলা বালিকা
কেঁদে ফিরে একা
সাগর-তীরে দুঃখে মগন।
প্রচণ্ড ঢেউ পড়ে আছাড়ি
ত্রাসে বালিকা উঠে ফুকারি
একাকী—একাকী
কেঁদে রাঙা আঁখি,
শ্রান্ত, ব্যথিত, আকুল মন।
শূন্য জগৎ, চূর্ণ হৃদয়,
বাঁচিবার সাধ আর নাহি হায় ;
ডেকে নাও নাও
কোলে ঠাঁই দাও,
অনেক দেখেছে দুটি নয়ন।

সতী

য়ুরিপিডিস

প্রাণের আবেগে এসেছি ছুটিয়া
ছাড়িয়া ঘর ;
এসেছি খুঁজিতে অনল-সমাধি
চিতার 'পর।

অসহ জীবন   জীবন যাতনা
সহে না আর ;
মুক্ত করিতে   এসেছি, আমার
জীবন-ভার।
সেই তো মরণ   মধুর—মধুর—
বঁধুর সনে ;
পূরিবে কি সাধ ?   থাকে যদি আহা
বিধির মনে !
এই, এই শেষ ;—   সকলি দেখেছি,
সানুর তলে
এখনি মিশিবে   শরীরে শরীর
হেম-অনলে।
উচ্চ এ গিরি ;—   এখনি পড়িব
চিতার মাঝে,
চল প্রিয়তম   যাই সুরপুরে
দেবতা-সাজে !
আমি ? আমি রব   তোমারে ছাড়িয়া
ধরণী মাঝে ?
গেছে উৎসব ;   উৎসব-দীপ
আর কি সাজে ?

নব-সপত্নী-সম্ভাষণ

চীন দেশের 'শী কিং' গ্রন্থ

চকাচকীর ডাকাডাকি নদীর চরে শোনা যায়,
তুমি সতী ! যোগ্য পতির, ভাগ্যবতী তুমি হায়।
আন্ গো তুলে কুমুদমালা যেখানে পাস্ ডাহিন বাঁয়,
এই কুমারীর অন্বেষণে প্রভু মোদের ছিলেন, হায়।

অন্বেষিয়া না পেয়ে তায় মৌনে গেছে দীর্ঘদিন,
বিষাদ ভরে কেটেছে রাত শয্যা মাঝে নিদ্রাহীন !
আন্ গো তুলে কুমুদ ফুলে আঁচল ভ'রে নিয়ে আয়,
আজকে বালা মোদের হবে বাঁশী বীণার ঘোষণায় ।

গান

কালিদাস

নূতন মধুর লালসা-লোলুপ অলি হে !
আম্র-মুকুলে গিয়েছিলে তুমি চুমিয়ে ;
আজি কমলের দুয়ারে মাত্র বুলিয়ে,
একেবারে তারে গেলে কি ভ্রমর ভুলিয়ে !

যুগ্মপত্নীর প্রেম

লা ফন্তেন

যুগ্মপত্নী ছিল এক প্রাচীন জনের
প্রৌঢ়া এক, বালা এক,—এই দু'জনের ।
যখন বসিত বুড়া বালা-স্ত্রীর ঘরে,
পাকা চুল তুলিত সে আগ্রহের ভরে ;
প্রৌঢ়া কিন্তু পাকা চুল তুলিবার ছলে,
কাঁচা উপাড়িত !—নিজ মিলাতে কুন্তলে !
দিনে দিনে এইরূপে বেড়ে উঠে প্রেমের বিপাক,—
দেখা দিল বিপ্র শিরে মাথা-জোড়া বিপর্যয় টাক !

পদস্খলন

দান্তে

কৌতুকে পড়িতেছিনু একদা দু'জনে,
সুন্দরের কথা, তার প্রেমের কাহিনী ।
নিভৃতে দু'জনে ছিনু অসংশয় মনে,
চোখাচোখি হতেছিল ; শোণিত-বাহিনী

কপোল রঞ্জিয়াছিল দ্রুত অধ্যয়নে ;
শেষে একঠাঁয়ে মোরা ডুবিনু দু'জনে।
যখন পড়িনু মোরা,—চুমিল কেমনে
সে প্রেমিক ঈপ্সিত সে প্রফুল্ল আননে,—
যে আমারে ভুলিবে না কখনো জীবনে
কম্প্রবক্ষে মুখে মোর চুমিল অমনি !
পোড়া বই,—লিখেছিল কোন্ নষ্ট জনে,
সেদিন সে কাব্য-পাঠ থামিল তখনি।

সৌন্দর্য ও সাধুতা

হেরিক্

ভাবিতাম, পদ্মপর্ণ ! এ বিশ্ব-সংসারে
নাহি কিছু তোমা সম পুণ্য-সুবিমল ;
তবে কেন কুক্ষিগত শিশির-কণারে
মুক্তা বলি' লোকমাঝে প্রচার' কেবল ?

বাতুলতা

'ম-ন্যো-ও' গ্রন্থ

স্রোতের জলে লেখার চেয়ে বড়
একটা মাত্র আছে বাতুলতা ;—
সেটা কেবল তারি কথাই ভাবা,—
ভাবে না যে জন্মে তোমার কথা।

অভাগীর চরম সাধ

ষ্টিফেন ফিলিপস্

আর কি আমার নাম করে কেউ
আমাদের সেই গাঁয় ?
ঘাটের পথে,— মাঠের কোলে,—
প্রাচীন বটের ছায় ?

সেই যে, যেথা খেলেছিলাম
কতই খেলা, হায় !

মাগো, তোমায় মুখ দেখাতে
হয় মা আমার ভয়,
হতভাগীর এ অপরাধ
ক্ষমার যোগ্য নয় ;—
তবু তোমার আমার লাগি'
অশ্রু আজো বয়।

বাবা আমার পুরুষ মানুষ
তাঁর ভ্রূকুটি সয়,
তুমি নারী,— ওই তো বাধা
ওইখানেই তো ভয় ;
কেমন করে ছোঁবে ?—যে জন
ছোঁবার যোগ্য নয় ?

তবে আজি মরতে বসে
ডাকছি মা তোমায়,
ছেলেবেলার মতন আমায়
ঘুম পাড়াবি আয় ;
সামনে যে মা দারুণ আঁধার
দৃষ্টি ডুবে যায় !

বিচারক

অ্যাডেলেড অ্যান্ প্রোক্টার

পরের পরান মনের মাঝারে যত তোলাপাড়া হয়,
তার সনে যদি তোমার হিয়ার নাহি থাকে পরিচয়,—
আচরণ তার বিচার করিতে যেয়ো না যেয়ো না তবে,
তুমি যাহা ভাব কলঙ্ক, তাহা অস্ত্রের লেখা হবে ;

হয় তো সে রণে তুমি হেরে যেতে ; সে তবু হয়েছে জয়ী ;
ক্ষতের চিহ্ন বহিছে এখন ক্ষতের যাতনা সহি'।
তার যতখানি তোমার নয়ন অপ্রিয় বলি মানে,
হয় তো তাহার চরিত্র-বল বিকশিত সেইখানে ;
হয় তো সে কোনো রিপুর সঙ্গে জীবন-মরণ রণ,
যার স্মৃতি আজো হৃদে জাগরূক রয়েছে অনুক্ষণ ;—
যে রিপুর সাথে যুঝিতে হয় তো তুমি হতে অধোমুখ,
অধরে মিশাত আজিকার ওই বিদ্রূপ হাসিটুক্।
যে ত্রুটির তরে তুমি কর ঘৃণা হয় তো সে কিছু নয়,
হয় তো দেবতা নিয়েছেন তার শক্তির পরিচয় ;—
কঠিন মাটিতে পড়িয়া, আবার যাহে সে ভবিষ্যতে
পারে উঠিবারে আপনার বলে,—চলিবারে দৃঢ়পদে ;
কিবা অন্তরে তুচ্ছ জানিয়া ধরণীর ধনমানে,
উড়ে যেতে যাহে মন চাহে তার আকাশের নীড় পানে।
"একেবারে গেছে,—নষ্ট হয়েছে" এমন ভেবো না মনে,
রাখো আশা রাখো ভালবাসা, ঘৃণা কোরো না পতিত জনে ;
তার পতনের গভীরতা তার শোচনার পরিমাপ,
পতন যতই গভীর ততই উচ্চ সে পরিতাপ ;
এত নীচে পড়ে গিয়েছে অভাগা হয় তো সে পুনরায়,
হবে উন্নীত তেমনি উচ্চে বিধাতার মহিমায়।

নিষ্ঠুরা সুন্দরী

কীটস্

কি ব্যথা তোমার ওহে সৈনিক,
কেন ভ্রম একা ম্রিয়মাণ ?
শুকায় শেহালা হ্রদে হ্রদে, পাখী
গাহে না গান।
সৈনিক কিবা ব্যথিছে তোমায় ?
কেন বা শ্রীহীন ? কেন ম্লান ?

শাখা-মূষিকের পূর্ণ কোটর,
মরাইয়ে ধান।
কমলের মতো ধবল ললাটে
কেন বা ছুটিছে কাল-ঘাম ?
কপোল-গোলাপ উঠিছে শুকায়ে—
নাহি বিরাম।
"মাঠে মাঠে যেতে নারী সনে ভেট,—
সুন্দরী সে যে পরী কুমারী,—
দীঘল চিকুর, লঘুগতি, আঁখি
উদাস তারি।
"গাঁথি মালা দিনু শিরে পরাইয়া,
কাঁকন, মেখলা কুসুমে গড়ি' ;
চাহি মোর পানে আবেগে যেন সে
উঠে গুমরি।
"চপল ঘোড়ায় লইনু তুলিয়া,
অনিমিখ সারা দিনমান ;
পাশে হেলি' সে যে গাহিল কেবলি
পরীর গান !
"আনি' দিল মোরে কত ফলমূল,
দিল বন-মধু, সুধা রাশি গো ;
কহিল কি এক অপরূপ ভাষে,—
'ভালবাসি গো !'
"অপ্সর-বনে লয়ে গেল মোরে,
নিশ্বাসি' কত কাঁদিল হায় ;
মুদিনু তাহার ত্রস্ত নয়ন
চারি চুমায়।
"সেইখানে মোরে দিল সে নিদালি,
স্বপন দেখিনু কত হায়,

চরম স্বপন—তাও দেখেছি এ
গিরির গায়।
"মরণ পাংশু কত রথী, বীর,
কত রাজা মোরে ঘিরিয়া ঘোরে,
কহে তারা, "হায়, নিঠুরা রূপসী
মজালো তোরে!
"দেখিনু তাদের ক্ষুধিত অধর,
লেখা যেন তাহে 'সাবধান'
জেগে দেখি আমি হেথায় পড়িয়া,
গিরি শয়ান।
"সেই সে কারণে হেথা আমি আজ,
তাই ভ্রমি একা ম্রিয়মাণ ;
যদিও শেহালা মরে হ্রদে, পাখী
না গাহে গান।"

রাখাল ও রাজকন্যা

আইরিশ

চলিতে চলিতে কিশোর রাখাল
প্রাসাদ ছায়ায় দাঁড়াল আসি ;
নৃপ-বালা হায়, দেখিল তাহায়,—
প্রেমের লালসা হৃদয়ে বাসি'।
ধীরে কহে বালা, "হায় আমি যদি
নিকটে তোমার পেতাম যেতে,—
আহা কি ধবল বৎসের দল,
কিবা রাঙা ফুল ফুটেছে ক্ষেতে!"
নীচে হতে তবে কহিল রাখাল,
"একবার যদি এস গো হেথা,—
আহা কি অরুণ কপোল তরুণ
আহা কি ধবল ও বাহুলতা!"

তারপর, নিতি নীরব ব্যথায়,
প্রাসাদ ছায়ায় দাঁড়াত একা ;
নয়ন তুলিয়া রহিত ভুলিয়া
যে অবধি বালা না দিত দেখা।
"এস, এস, এস রাজার দুলালী !"
পুলকের ধ্বনি উঠিত বাজি' ;
মধুরে অমনি কহিত রমণী
"রাখাল রে ফিরে এসেছ আজি !"
গেল শীত ; এল ফুলের সময় ;—
মাঠে, ঘাটে, বাটে মুকুল-লেখা ;
রাখাল ফিরিল, প্রিয়ারে ঢুঁড়িল,
বৃথা হায়,—সে তো দিল না দেখা।
"দেখা দাও, ওগো, দেখা দাও ফিরে"
কহিল ফুকারি করুণ সুরে ;
ধ্বনিল অমনি অশরীরী বাণী—
"বিদায়—বিদায় রাখাল ওরে !"

প্রেম ও মৃত্যু

বের‍াঁজ্যার

ভালবাসা ! যদি তোর পূর্ণ ক্ষেত্র হতে
মরণ, সোনার শীষ তোলে ;—
দিস্ রে গলায়ে দিস্ শোকে মূঢ় প্রাণ,
সোনার প্রদীপ দিস্ জেলে।
নিরাশার কুমন্ত্রণা করি পরাজয়
শুনাস্ মধুর আলাপন ;
মরণ, ফসল তোর বাঁটি' যদি লয়
ছাড়িস নে বপন রোপণ।

প্রাচীন প্রেম

রঁস্যার্দ

যখন তুমি প্রাচীন হবে সন্ধ্যাকালে তবে,
উনন্ পাড়ে বসে বসে কাটবে সূতা যবে,
আমার রচা গানগুলি হায় গুনগুনিয়ে গাবে,
বলবে তুমি, "জানিস কি লো
আহা যখন বয়েস ছিল
লিখ্ত গানে আমার কথা কবি সে তার ভাবে!"
শোনে যদি দাসীরা সব আমার রচা গান,—
কাজ সেরে শেষ ঘুমায় যখন,—গানে তোমার নাম
শুনে যদি ওঠেই জেগে,
বল্‌বে তারা ক্ষণেক থেকে,
"ধন্য তুমি উদ্দেশে যার কবি রচে গান!"
মাটির তলে মাটি হয়ে ঘুমিয়ে আমি র'ব,
গাছের ছায়ে নিশির কায়ে, ছায়া যখন হ'ব,
তোমার গর্ব, আমার প্রীতি,
মনে তোমার পড়বে নিতি,
দিয়ো তখন—দিয়ো মোরে—দিয়ো প্রণয় তব;
তুমি যখন প্রাচীন হবে, আমি—ধূলি হ'ব।

জ্যোৎস্নার কুহক

ৎসিসাতু

ভঙ্গুর ভাবনা কতশত, কতশত অস্ফুট বেদনা,
মর্মরিয়া প্রাণে ওঠে জেগে, দাঁড়ায়ে যখন আনমনা
চেয়ে থাকি লাবণ্য-তরল শরতের চাঁদে; আত্মহারা;
তবু সে রুপালী কুহকেতে একা আমি পড়ি নাই ধরা!

স্বপ্ন

পেত্রার্ক

স্বপ্ন শেষে গেল লয়ে মোরে তার পাশে ;
বিশ্বময় অন্বেষি' পাই নি যার দেখা !—
দেখিলাম চন্দ্রলোকে সে আজি নিবসে,
হয়েছে সুন্দরী আরো, কোমলতা মাখা
হাতখানি হাতে রেখে, কহিল "যদ্যপি
মিথ্যা নাহি কহে আশা, তবে তুমি হেথা
রবে এসে চিরকাল মোর কাছে ; কবি !
কত না যাতনা দি'ছি—দি'ছি কত ব্যথা ;
কিন্তু দিবা মোর ফুরাল সন্ধ্যার আগে।
সে আনন্দ কে বুঝিবে ? ভুঞ্জি যাহা এবে ;
তোমার অপেক্ষা শুধু, আছি শুধু জেগে
নিরখি' তোমার পথ ; কবি, এস তবে।"
হায় রে ফুরাল কেন স্পর্শখানি তার,
কেন বা থামিল বাণী স্বর্গ সুষমার !

প্রেম ও গৌরব

বায়রন

মোরে শুনায়ো না খ্যাতির কাহিনী, ইতিহাসে খ্যাত নাম,
যৌবন-দিন শুধু মানবের সব গৌরব-ধাম !
বাইশ বছর বয়েসের সেই প্রেম-কুসুমের হার,
জয়মাল্যের চাইতে মূল্য শতগুণে বেশী তার
বলি-লাঞ্ছিত ললাটের 'পরে পুষ্প-মুকুট কেন ?
মরণ-পাংশু কুসুমের দলে স্নিগ্ধ শিশির হেন !
পাকা চুলে আর সাজায়ো না ফুলে, যাও নিয়ে যাও মালা ;
কে চাহে বিজয়-মাল্য ?—যদি সে শুধুই নামের জালা।
কীর্তি ! তোমার কৃপায় কখনো হর্ষ যদি বা আসে,
সে নহে তোমার শুনিতে-মস্ত কেতা-দুরস্ত ভাষে ;

সে পুলক শুধু তখনি জাগে গো যবে গৌরব গানে,
ভালবাসিবার অযোগ্য নহি,—প্রিয়া মোর বুঝে প্রাণে।
গৌরব আমি খুঁজেছি, পেয়েছি প্রিয়ার নয়ন মাঝে,
কীর্তি-ছটার প্রধান রশ্মি তারি চাহনিতে আছে ;
যখনি সে আঁখি উজ্জ্বল হয় চাহিয়া আমার পানে,
আমি মনে জানি সেই ভালবাসা, কীর্তি সে—জানি প্রাণে।

দিবাস্বপ্ন

হায়েন

তীর হতে দূরে সাগরে যে শিলা জাগে,
তারি 'পরে বসি দিবসে স্বপন দেখি ;
হুহু করে হাওয়া, সাগরের পাখী ডাকে,
ঘুরে ফিরে ঢেউ শিলায় শিলায় ঠেকি।
ভালবেসেছিনু কত এ জীবনে, আহা,
সুন্দর শিশু কত গো বন্ধু কত ;
কোথা তারা ? হায়, হাওয়া শুধু করে 'হা—হা',
ফেনমুখী ঢেউ ধায় পাগলের মতো।

যৌবন ও বার্ধক্য

বায়রন

জগৎ যে সুখ হরণ করে তা ফিরে আর দিতে নারে,
কিশোর ভাবের অরুণিমা, হায়, ক্ষয় সে অন্ধকারে ;
কপোল কেবলি হয় না পাণ্ডু যৌবন যবে যায়,
মনের পেলব কুসুম-সুষমা তা'রো আগে টুটে, হায় !
মগ্ন সুখেরে ঘিরিয়া তখনো যাহারা ভাসিতে থাকে,
অত্যাচারের আবর্তে কিবা মজে কলঙ্ক পাঁকে ;
দিক্-নিরূপণ হয় না তখন ; দিশা যদি মিলে, তবু,
সাগর অকূল ! ছেঁড়া পাল তুলে পৌঁছিতে নারে কভু।

মরণের হিম পরানে তখন নামিয়া ভরে গো বুক,
পরের বেদনা বুঝিতে না পারে, না ভাবে আপন দুখ!
অশ্রুজলের উৎস নিরোধ হয় সে হিমের ভারে,
আঁখি ছলছলে উজলে যদি বা—সে শুধু তুষার-ধারে।
রসের ভাষণে রসনা যদিও মনেরে ভুলায়ে রাখে,
নিশীথ অবধি; হেতু তার হায়, ঘুম চোখে নাহি লাগে।
সে যেন জীর্ণ প্রাসাদ ঘিরিয়া শ্যামা লতিকার শোভা,
নিকটে ধূসর জর্জর অতি, দূর হতে মনোলোভা!
হায় গো হইতে পারিতাম যদি যেমন ছিলাম আগে,
আগের মতন অনুভূতি যদি আবার মরমে জাগে;
অতীত স্মরিয়া তেমনি করিয়া আঁখি-জল যদি ঝরে,
সে আবিল ধারা মিঠা হবে মোর জীবন মরুর 'পরে।

জীবন-স্বপ্ন

এড্‌গার অ্যালেন পো

ললাটের 'পরে ধর চুম্বনখানি,
শুনে যাও মম বিদায়-বেলার বাণী;
আজনম মোর স্বপনে হয়েছে ভোর,—
বলেছে যাহারা বলেনি মিথ্যা ঘোর।
আশা-পাখীগুলি উড়ে যদি গিয়ে থাকে,—
দিনে কি নিশির নির্জনতার ফাঁকে,—
কি করিব? হায়, পালানো তাদের ধারা,
জাগো কি ঘুমাও পালায়ে যাবেই তারা;
সজাগ কিবা সে খেয়ালে রয়েছি ব'লে,
উড়িয়া পালাতে কখনো কি তারা ভোলে?
যা করি, যা ভাবি, যাই দেখি মোরা চোখে
সবই নব নব স্বপন স্বপ্ন-লোকে!
সিন্ধুর কূলে গর্জন গান শুনি,
করতলে ল'য়ে সোনার বালুকা গণি,

কত সে অল্প—তবু সব গেল ঝরি,
নীল পারাবার নিল গো তাদের হরি' !
এখন একেলা হৃদয়ে তাদের স্মরি'
কেঁদে মরি আমি,—আমি শুধু কেঁদে মরি।
হায়, বিধি, মোর কিছু কি শকতি নাই !—
দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিতে যে ধন পাই ?
এ জীবনে কভু বাঁচাতে কি পারিব না ?—
সিন্ধুর গ্রাস হইতে একটি কণা ?
যা করি, যা দেখি, সকলি কি তবে খেলা !
স্বপ্ন-সাগরে স্বপন-ঢেউয়ের খেলা !

দুঃখের শিক্ষা

গেটে

সজল চোখে জলগ্রহণ করেনি যে জন,
কাটায় নি যে দীর্ঘ নিশি উষার পথ চাহি,
ডাকৃতে যারে হয়নি কভু 'ত্রাহি, ত্রাহি, ত্রাহি',
হা ভগবান ! মোটে তোমায় চেনে না সে জন।
দুঃখে ভরা ধরার মাঝে পাঠাও তুমি সবে,
দাও না বাধা যখন মোরা পাপের পথে চলি ;
অনুতাপের অনল মাঝে মরি শেষে জ্বলি,
মুহূর্তেকের স্খলনে, হায়, জনম-দুখী ভবে।

দ্বিধার জীবন

সুইনবার্ন

যে অবধি না হয় ছিন্ন,
জীবনের এই মধুর চিহ্ন,
যে অবধি ব্যক্ত না হয়,—
ব্যক্ত যাহা হবেই হবে ;—

সে পর্যন্ত মন রে আমার,
পূজার্চনায় কি ফল তোমার ?
মন্ত্র জপে—ছেলেখেলায়
মিথ্যা নিয়ে মত্ত রবে ?
নূতন কিবা বল্‌ব কথা,
নব নিঝর বয় না সেথা,
নূতন করে পায় না ব্যথা
মানুষ কভু মরণ-শেষে ;
বরষ 'পরে বরষ নেমে,
দেয় গো ঢেকে কতই প্রেমে ;
হর্ষ-গীতি যায় গো থেমে,
অশ্রুজলের স্রোতে ভেসে !

একটি দিনের কর্ম যদি,
আবিল করে জীবন-নদী,
মানুষ যদি হয় গো ঋণী
মৃত্যু-মহাজনের কাছে ;—
ধাক্কা স'য়ে যদি সে তার
শক্তি ফিরে পায় দাঁড়াবার,
জেগেই যদি উঠবে আবার
দু'দিন আগে দু'দিন পাছে ;—

তবে কেন কান্নাকাটি ?
কেন হৃদয় ফাটাফাটি ?
জীবন কেন হবে মাটি
উপাসনায়—উপবাসে ?
যতই ডাক করপুটে,—
যতই মর মাথা কুটে,—
জীবন তবু যাবে টুটে
মৃত্যু সাড়া দিলে এসে।

কাল !—সে বটে সবার প্রভু ;—
এড়িয়ে কেহ যায় না কভু ;
একটু হাসিখুশি তবু
ওরি মধ্যে লুটতে হবে ,
নইলে শুধু জীবন, মরণ,
দুঃখ ও সুখ, শান্তি ও রণ,
কেবল গণন এবং স্মরণ
কর্ত্তে শুধু থাকবে ভবে !
দু'দিন পরে ভাঙলে মেলা
সকল তাতেই সমান হেলা,—
ইষ্টমন্ত্র, জপের মালা,
কর্ম্ম, খেলা, কান্না, হাসি ;
যে ক'টা দিন আছিস্ বেঁচে,
ফিঙের মতো বেড়াস্ নেচে,
বিশ্ব ব্যাপার এঁচে, এঁচে
মরিস্ নে আর শূন্যে ভাসি'।

শান্তিহারা

জার নিকোলাস্

আমার সুখের জন্ম নিশীথে, বৃদ্ধি আঁধারে তার !
ক্লান্ত পরানে তাই ঘুরি-ফিরি যেথায় অন্ধকার।
চিত্ত ব্যাকুল অন্ধের মতো কি যেন হাঁতাড়ি মরে,
মনের কুয়াশা মন জুড়ে আছে কিছুতেই নাহি সরে !
কাতরে কাটাই সারা দিনমান, কাঁদিয়া কাটাই নিশা,
সহি, দহি, ডাকি ভগবানে তবু শান্তির নাহি দিশা।

বিচিত্রা

ভর্তৃহরি

হেথায় উঠিছে বীণাধ্বনি,
হেথায় শোকের হাহাকার ;
হেথা তর্ক করে জ্ঞানী, গুণী,
মাতালের হোথায় চীৎকার !
হেথায় সুন্দরী মনোহরা,
হোথা বৃদ্ধা,—জীর্ণ দেহখান্ ;
না বুঝিনু কেমন এ ধরা,—
অমৃত কি গরলে নির্মাণ !

বিড়ম্বনা

মন্ত্‌ নাইকেন্

বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা, হায় !
একটুকু প্রেমের আরাম,
একটুকু জীবন-সংগ্রাম,
তারপর ?—বিদায়, বিদায় !
লীলাখেলা দু'দিনে ফুরায় ;
এতটুকু আশার কিরণ,
এতটুকু মধুর স্বপন,
তারপর ?—নীরবে বিদায় !

নিয়তি

খুশ্‌হাল

দিন দিন নিয়তির নূতন ব্যাভার,
প্রণয়ে প্রশ্রয়ে তার নাহিক প্রত্যয় ;
একদণ্ডে শক্তিমানে করে ধূলিসার,
ধূলার কীটেরে তুলি তারি গাহে জয় !

নিশ্ছিদ্র নূতন তরী ডুবায় সলিলে,
ভগ্নতরী কভু ঝড় তুফানে বাঁচায় ;
একা আমি কি করিতে পারি এ নিখিলে ?
কে আছে সুহৃদ্ মম ? কারে ডাকি হায় !
যাহা করি বাধা দেয় নিয়তি তাহায়,
কেহ নাই শুনিবারে এ মম ক্রন্দন ;
অদৃষ্ট অ-দৃষ্ট যদি না থাকিত হায়,
কিংবা মোরে দৃষ্টি হতে করিত বর্জন !
মহতের দুঃখ হেথা, নীচের উন্নতি ;
শিশু বালিকার অঙ্গে বস্ত্র শত শত,
ছিন্ন বাসে লজ্জা পায় বরাঙ্গী যুবতী,
জ্ঞানীর না মিলে রুটি, মূর্খে মেওয়া যত।
বিশ্বাসী ভক্তের গৃহে আসন দুর্লভ,
বঞ্চকের ঘরে দেখ রক্ত মখমল ;
সাজ সওয়ারের ভারে ক্লিষ্ট ঘোড়া সব,
বাজারে অবাধে গাধা খায় নানা ফল !
আনন্দে সকল পাখী কেলি করে বনে,
বন্দী শুধু—সেই যার সুকণ্ঠ, সুঠাম ;
সত্য কি কল্পনা ইহা বুঝাব কেমনে ?
শান্ত হও খুশ্‌হাল ভাগ্য তোর বাম।

নিয়তি

ইমাম সাফাই মহম্মদ বিন্ ইদৃস্

নিয়তির গতি অপরূপ অতি,
নহে সে ধনের মানের বশ ;
খণ্ডিত শির দিগ্বিজয়ীর
শকুনিতে খায় শোণিত রস !

কেহ আজনম না রহে অধম
দীন বলহীন বলিয়া শুধু,
যেই মাছি মরে পরশের ভরে
রাজার পাত্রে পিয়ে সে মধু !

যুগ্মক

হোরেস্

হেয় মানি পারস্যের মহা আড়ম্বর,—
পল্লবিত সোনার মুকুট ;
খুঁজিও না,—পাওয়া যায় কোথায় সুন্দর
বারমাস গোলাপ অস্ফুট।
নবীন রসাল পাতে গাঁথ, সখী, মালা,
আমাদের সেই সাজে বেশ,—
বসি' যবে দ্রাক্ষা-জটা-ছায়ায় নিরালা
দ্রব-চুনি সুরা করি শেষ !

রুবাইয়াৎ

ওমর খৈয়াম

বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি পাই যদি একখানি,
পাই যদি এক পাত্র মদিরা, আর যদি তুমি রানী !
সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া গাহ গো মধুর গান,
বিজন হইবে স্বর্গ আমার তৃপ্তি লভিবে প্রাণ।

সাকী ! তুমি আজ পাত্র ভরিয়া এনো তাই নিশ্চয়,
ভুলায় যাহাতে অতীত শোচনা ভবিষ্যতের ভয় ;
আগামী কল্য সে ভাবনা আমি উড়ায়ে দিয়েছি হেসে,
আগামী কল্য চ'লে যেতে পারি গত-কল্যের দেশে।

জীবন-খাতায় তোমার আমার হিসাবনিকাশ হলে,
ভেব না কখনো এমনটি আর হবে না ভূমণ্ডলে ;
চিরদিবসের সাকী আমাদের পাত্রটি হতে তার
এমন ঢেলেছে কোটি বুদ্বুদ—ঢালিছে সে অনিবার।

পথের মধ্যে ক্ষণিক বিরাম, ক্ষণেকের আহ্লাদ,
মধ্য-মরুর উৎসে ক্ষণিক জীবনের আস্বাদ ;
আঁখি পালটিতে, আর কেহ নাই ! ছায়া-যাত্রীর দল
নশ্বরতায় লয় হয়ে গেছে ; ওরে তোরা ছুটে চল।

নরক অথবা স্বর্গের আমি করিনে ভরসা ভয়,
এইটুকু জানি,—মানব জীবন প্রতি মুহূর্তে ক্ষয়,
এইটুকু খাঁটি, বাকী যাহা বল তাহা মিথ্যার জাল,
বারেক যে ফুল ফুটিল তাহারে চিরতরে নিল কাল !

অদ্ভুত !—নয় ? কত লোক গেছে মৃত্যু-দুয়ার দিয়ে,
একটি প্রাণীও ফিরিয়া এল না পথের বার্তা নিয়ে ;
কোটি কোটি লোক আমাদের আগে গিয়েছে গো ওই পথে,
ওর সন্ধান নিতে হলে তবু নিজেকেই হবে যেতে !

পর জীবনের পুঁথি পড়িবারে যাত্রা করিল মন,
আঁখি যাহা কভু না পায় দেখিতে করিবারে দর্শন ;
ফিরে এসে ধীরে চুপে চুপে মোরে কহিল সে, "ওরে ভাই,
আমিই স্বর্গ, আমিই নরক, সে আর কোথাও নাই।"

স্বর্গ—সে শুধু পূর্ণ কামনা,—স্বপন পূর্ণতার,
নরক—সে অনুতপ্ত মনের বিকট অন্ধকার ;—
যেমন আঁধার হতে কিছু আগে বাহির হয়েছি সবে,
যেমন আঁধারে একদিন, হায়, ডুবিতে আবার হবে।

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়,
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে তা'রো বীজ আছে তায় ;
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাত লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচার-কর্ত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই।

বটে গো এমন প্রতিজ্ঞা আমি করেছি বারংবার
অনুতাপে মোর ক্ষীণ চিত্তের করিব সংস্কার ;
বিচার ক্ষমতা ছিল কি তখন ? ফুল হাতে ঋতুরাজ
জীর্ণ আমার অনুতাপটুকু ছিন্ন করেছে আজ !

তবু বসন্ত গোলাপের সাথে দু'দিনেই লয় পায়,
কুসুম-গন্ধী যৌবন-পুঁথি পলে উলটিয়া যায় ;
কাল যে পাপিয়া এই তরু-শাখে গাহিতে ছিল গো গান,
কোথা হতে এসে কোন্ পথে হায় করিল সে প্রস্থান !

ওই যে উদয়-শিখরে চন্দ্র খুঁজিছে মোদের সবে,
মোদের অন্তে এমনি কতই অস্ত-উদয় হবে ;
উদয়-শিখরে উঁকি দিয়ে ধীরে তখনো সন্ধ্যা হলে,
আমাদের সবে এইখানটিতে খুঁজিবে সে—নিষ্ফলে।

মাতাল

কালিফ্ এজিদ

আমার ত্রুটির মার্জনা নাই ?
রোষের শান্তি নাই কি তব ?
আঙুর ফলের জলটুকু খাই ;—
ভর্ৎসনা তাই নিয়ত সব ?
এমন করিলে সুরা দিব ছেড়ে ?
তুমি মনে মনে ভেবেছ তাই ?

কারণ-সংখ্যা গেল শুধু বেড়ে,
এবার দেখিবে কামাই নাই।
সুরার পেয়ালা বড় ভাল লাগে,
আরো ভাল লাগে উষ্মা তব;
পরিতোষ হেতু পান করি আগে
তোমারে জ্বালাতে ভরিব নব!

মাতালের যুক্তি

আনাক্রেয়ন

কালো মাটি কালো মেঘের ভাঁটিতে
চোঁয়ানো খাঁটিটি খায়!
গাছপালাগুলো তারি পাত্রের
একটু প্রসাদ পায়!
সাগর দিব্য প্রভাতে প্রদোষে,
নদীর মদিরা বসে বসে শোষে!
আকাশে সূর্য সাতটা সাগর
একাই শুষিতে চায়!
দিন বুঝে বুঝে ক্রমে ক্ষীণ চাঁদ,
রবির ভাণ্ডে দিয়ে বসে হাত!
বল দেখি তবে আমারেই সবে
কেন বা দূষিছে হায়!

সম্ভোগ

তারিফ্

ভালবাসি অস্ত্র খেলা, প্রেম ভালবাসি,
তাই ব'লে এসেছ ভৎর্সিতে?
যদি সব ছেড়ে দিয়ে বনে আমি পশি,
সুনিশ্চিত অমরতা পারিবে তো দিতে?

বাঁচাতে না পার যদি মৃত্যুবাণ হতে
বাক্য তবে বাড়ায়ো না আর ;
মৃত্যু আসিবার আগে হইবে ভুঞ্জিতে
উপভোগ্য যা আছে ধরার।

বেলুচির গান

অজ্ঞাত

শোনো বীর ! শোনো বন্ধু আমার, শোনো নবতর তান,
আমি কবি—আমি গাথার গায়ক গাহিব নূতন গান !
মানিক কুড়ায়ে পেয়েছি গো আমি বিঁধেছি মুক্তাফল,
ছন্দের ফাঁদে বাঁধিয়া ফেলেছি ভাবরাশি চঞ্চল !
কল্য নিশীথে ছিলাম যখন মগন নিদ্রা-ঘোরে,
স্বপনে আমার কল্পনা এসে দেখা দিয়ে গেছে মোরে !
তাজা ঘাসে ভরা ক্ষেত্রের চেয়ে নধর সে কচি মুখ,
'দুম্বা' মেষের পুচ্ছ জিনিয়া রসে ডগমগ বুক !
শীর্ণবৃন্ত কুসুমের মতো বায়ুভরে দোলে কায়,
নাগকেশরের পেলব সুষমা সকল অঙ্গ ছায় !
আমি ভাবি মনে বুঝি তার সনে মিলিব দিনের শেষে,
চির-আলোকিত পরীর রাজ্যে,—শত উৎসের দেশে !

মুমূর্ষু তাতার সিপাহীর গান

ঘোড়াটি আমার ভালবাসিত গো শুনিতে আমার গান,
এখন হতে সে ঘোড়াশালে বাঁধা রবে সারা দিনমান
জিনি' তরঙ্গ সুন্দরী মোর তাতার-বাসিনী সাকী,
লীলা-চঞ্চলা, রঙ্গনিপুণা,—শিবিরে এসেছি রাখি !
ঘোড়ার আমার জুটিবে সওয়ার, ইয়ার পাইবে সাকী,
শুধু মা আমার এ বুড়া বয়সে কাঁদিয়া মুদিবে আঁখি !

নেপালী শ্লোক

আর ছায়া ছায়া নয়,—বটেরি ছায়া ;
আর মায়া মায়া নয়,—ঘরেরি মায়া।

দিবাস্বপ্ন

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ

সরু গলির মোড়ে, যখন, দিনের আলোক ঝরে,
ময়না দাঁড়ে গাহে, এমন গাইছে বছর ধ'রে ;
সুসান্‌ যেতে পথে, হঠাৎ শুনতে পেলে গান,
শব্দ সাড়া নাইক ভোরে শুধুই পাখীর তান।
মন ডুবিল গানে, একি, কি হ'ল ওর আজ,—
দেখছে যেন, জাগে পাহাড় গাছের পরে গাছ ;
উজল হিমের ঢেউ চলেছে গলিটির মাঝ দিয়ে,
ঘেঁষাঘেঁষি বস্তি মাঝে চল্‌লো নদী ধেয়ে !
সবুজ গোঠের ছবি, তাহার পাহাড় দু'টি ধারে,
সে পথ দিয়ে গেছে কত কলসী নিয়ে ভ'রে ;
একটি ছোট ঘর সে যেন বাবুই পাখীর বোনা,
তার চোখে সে ঘরের সেরা, নাইক তার তুলনা ;
স্বর্গের সুখ পরানে তার ; মিলিয়ে আসে ধীরে,—
ঘোর কুয়াশা, ছায়া, নদী, পাহাড় যত তীরে ;
বইবে না রে নদী, পাহাড় তুলবে না আর শির,
স্বপন টুটে, নয়ন ফুটে, মুছে নয়ন নীর।

নারী ও কংফুশিয়ো

শিষ্যসহ কংফুশিয়ো লঙ্ঘিছেন যবে
'টই' নামে পর্বতের শ্রেণী ;—
শুনিলেন আচম্বিতে, হাহাকার রবে
কাঁদে এক নারী অভাগিনী।

আজ্ঞায় চলিল শিষ্য নারীর উদ্দেশে,
দেখা পেয়ে কহিল তাহারে,
"হেন শোক হয় শুধু মহা-সর্বনাশে,—
হাঁগো মাতা, হারায়েছ কারে?"
নারী কহে "যা কহিলে সত্য সে সকলি,
বাঘের কবলে গেছে স্বামী,
শ্বশুর গেছেন, গেছে নয়ন-পুতলি
পুত্র মোর; আছি শুধু আমি!"
"তবু তুমি দেশ ছেড়ে যাও নাই চলে?"
জিজ্ঞাসিলা কংফুশিয়ো মুনি;
"সে কেবল সু-রাজার রাজ্যে আছি ব'লে।"
উত্তরিলা নারী। তাহা শুনি
শিষ্যদলে ডাকি মুনি কহিলেন শেষ,—
"বাঘ হতে ভয়ংকর কু-রাজার দেশ!"

রাজার প্রতি

ভর্তৃহরি

রাজন্! যদি দুহিতে চাও মহীরে নিরবধি,
বৎস সম পালন কর সবে;
প্রজায় যদি তুষ্ট কর,—পুষ্ট কর যদি,
রাজ্য তোমার কল্প-ধেনু হবে।

জাতীয় সংগীত

(এক ॥ কেরি—ইংলণ্ড)

রাজারে রক্ষা কর কর ভগবান্!
রাজা আমাদের হউন আয়ুষ্মান্!
জয়ী কর তাঁরে, দাও তাঁরে যশ,
দাও দাও তাঁরে বিমল হরষ,
সুখে শান্তিতে রাজ্য করুন এই কর ভগবান্!

জাগ, জাগ, প্রভু! জাগ, জাগ, ভগবান্!
শত্রু দলিতে হও হে অধিষ্ঠান।
নষ্ট কর হে শত্রুর ছল,
নাশ দুষ্টের বুদ্ধি ও বল,
হে চির-শরণ, বিপদে মোদের অভয় কর হে দান।

ভাণ্ডারে তব যা আছে শ্রেষ্ঠদান,
সদয় হৃদয়ে দেহ তাঁরে ভগবান্;
রাজা আমাদের বিধি ও বিধান
বজায় রাখুন; হে কৃপা-নিধান!
মোরা যেন সদা মনে সুখে তাঁর গাহি মঙ্গল-গান।

(দুই॥ জনষ্ট্যার্ন জোর্নসন্—নরওয়ে)

ঝঞ্ঝা-মথিত সাগরোত্থিত
ভালবাসি এই দেশ,
হ'ক বন্ধুর,— আকর্ষণের
তবু তার নাহি শেষ।
ওগো ভালবেসো, তারে ভালবেসো,
না ভুলি পূর্ব-কথা,
ভুলো না মোদের 'সাগা' সংগীত,—
স্বপ্নময়ী সে গাথা।

বীর সৈন্যের সহায়ে হ্যারল্ড
এই দেশ বাঁচায়েছে,
হাকন্ রক্ষা করেছে, ইভিণ্ড্
গান তার গেয়ে গেছে;
রক্তে এঁকেছে ক্রুশের চিহ্ন
নিশানে ওলাফ্ রাজা,
স্বেয়ার ভেঙেছে ভণ্ডামি,—ভয়
করেনি পোপের সাজা।

নর্সম্যান্! তুমি যেখানেই থাক
গাহিয়ো তাঁহার জয়,
জয়ী যিনি তোমা' করেছেন, যবে
জয়ে ছিল সংশয়।
পিতৃগণের বীর জল্পনা,—
মায়েদের আঁখিজল,—
পন্থা মোদের করেছে বিশদ।
অধিকার অবিচল।

বটে গো আমরা বাসি ভাল এই
ঝঞ্ঝা-মথিত দেশ!
হ'ক বন্ধুর,— মায়ামন্ত্রের
তবু তার নাহি শেষ!
পূর্বপুরুষ যুঝিল যেমন
দেশের মুক্তি তরে,
ডাক পড়িলেই মোরাও সকলে
যুঝিব তেমনি করে।

(তিন॥ রুজে দেলিল্—ফ্রান্স)

ফরাসী ভূমির সন্তান সবে আয় রে আয় রে আয়!
কীর্তিলাভের শুভ অবসর যায় রে বহিয়া যায়।
অত্যাচারের উদ্যত ধ্বজা রক্তে করিয়া স্নান,
আমাদের 'পরে বৈর সাধিতে হয়েছে অধিষ্ঠান!
শুনিছ কি সবে কি ভীষণ রবে কাঁপায়ে জলস্থল,
দম্ভের ভরে গর্জন করে শত্রু-সৈন্য-দল!
তারা যে আসিছে কেড়ে নিতে বলে তোমার সকল-ধন,
গ্রাসিতে শস্য-ক্ষেত্র নাশিতে পুত্র ও পরিজন!
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক, বাঁধ দল, বাঁধ দল!
চল্ রে চল্ রে চল্!
ঘৃণ্য শোণিতে হবে কি সিক্ত মোদের ক্ষেত্রতল!

বিশ্বাসঘাতী ক্রীতদাস-দলে জিজ্ঞাস' কিবা চায় ?
ওই অতগুলা রাজার জটলা কেন বা আজি হেথায় ?
কিসের জন্ত ঘৃণ্য শিকল হইতেছে নির্মাণ ?—
যুগ যুগ ধরে কাহাদের তরে ?—আজি ল'ব সন্ধান।
আরে অপমান! ফরাসী! ফরাসী! সেনা কি মোদেরি তরে!
ফরাসী! ফরাসী! একি গো সহসা! একি আজি অন্তরে!
একি উল্লাস! আমরা প্রথম সাহসে করিয়া ভর,
ধার্য করেছি দাস্য-নিগড় ছিঁড়িব অতঃপর।
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক…ইত্যাদি।

একি অভাগ্য! একি অপমান! বিদেশীর দল এসে,
বিধি ও বিধান করে ব্যবস্থা ফরাসীর এই দেশে!
একি অপমান! অর্থের লোভে বিদেশী সৈন্ত যত,
ফরাসীর বল ধূলি-লুণ্ঠিত করিতেছে অবিরত।
ওগো ভগবান্! এমনি করিয়া রহিব কি চিরকাল ?
নতমস্তকে বহিব লাঙল, হাতে শৃঙ্খল-জাল ?
যাহারা ঘৃণ্য যাহারা অধম—তাদেরি বাড়িবে বল ?
ভাগ্য-বিধাতা হবে কি মোদের অত্যাচারীর দল ?
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক…ইত্যাদি।

ভয়ে কেঁপে মর; বিশ্বাসঘাতী অত্যাচারীর দল!
সকল দলের তোরা কলঙ্ক সবার ঘৃণার স্থল;
ভয়ে কেঁপে মর; সময় এসেছে, পাবি তোরা এইবার,
পিতৃদ্রোহের ফন্দীর যাহা যোগ্য পুরস্কার!
তোদের সঙ্গে যুঝিতে দেশের সকলেই আজি সৈন্ত,
যদি হত হয়!—কি ভয় ? মোদের লোকের নাহিক দৈন্ত;
এ মাটি আবার দিবে উপহার প্রসবি' নূতন বীর,
তারাও তৈয়ার হইবে যুঝিতে তারাও তুলিবে শির;
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক…ইত্যাদি।

আমরা ফরাসী,—পালন করিব বীরের ধর্ম্ম যত,
বীরের মতন করিব আঘাত, সহিব বীরের মতো ;
যারা বিপক্ষে যুঝিছে মোদের লজ্জা-জড়িত মনে,
অভাগা তাহারা ; তাহাদের মোরা ক্ষমিব হে প্রাণপণে।
কিন্তু এ দেশে রক্ত-পিপাসু দস্যু যে সব আছে,—
যারা 'বুইয়ে'র পাতকের ভাগী—ফিরে তারি পাছে পাছে,
শার্দূল সম যারা নির্মম, নাহি প্রাণে মমতাই—
আপন মায়ের বুক চিরে যারা তাহাদের ক্ষমা নাই।
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক···ইত্যাদি।

আমরা পশিব একে একে একে কর্মক্ষেত্র মাঝে,
যখন মোদের জ্যেষ্ঠের দল দেখিব বিরত কাজে ;
পশিব ক্ষেত্রে, দেখিব তাঁদের দেহ-অবশেষ ধূলি,
গুণের চিহ্ন দেখিব চক্ষে দেখিব কীর্তিগুলি।
তাঁহাদের ধারা রাখিব আমরা—শুধু বেঁচে থাকা নয় ;
তাঁদের মতন সমাধি যেন গো আমা-সবাকার হয়।
আমাদের হবে সেই গৌরব তুলনা যাহার নাই ;
অত্যাচারের রুধিবারে গতি না হয় মরিব ভাই !
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক···ইত্যাদি।

জন্মভূমির নির্মল প্রেম ! ওগো চির-সম্বল !
তোমার শত্রু নাশে উদ্যত এ বাহুতে দেহ বল।
ওগো স্বাধীনতা ! প্রিয় স্বাধীনতা ! হও ত্বরা পরকাশ !
আমাদের সাথে মিলিয়া আপন শত্রু করহ নাশ ;
দাঁড়াও আসিয়া আমাদের এই জয়-পতাকার ছায়,
ভৈরব রবে উচ্চার আজি তোমার সে ঘোষণায় !
হিংসায় জলে যেন মরে যায় তোমাদের শত্রুচয়,
আমা-সবাকার গৌরব দেখি'—তোমার দেখিয়া জয়।

ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক ! বাঁধ দল। বাঁধ দল !
চল্ রে চল্ রে চল্ !
ঘৃণ্য শোণিতে হবে কি সিক্ত মোদের ক্ষেত্রতল !

(চার ॥ রুশিয়া)

সকল ভয়ের ভয় তুমি প্রভু ! তোমাদের নমস্কার ;
বজ্র তোমার রণ-দুন্দুভি, বিদ্যুৎ তরবার !
তোমার রাজ্যে করুণা তোমার হউক মূর্তিমান্,
শান্তির ধারা বর্ষণ কর কালে কালে ভগবান্।

হে কৃপা-নিধান ! তোমায় বিধান জগৎ ভুলিছে হায়,
তোমার নিদেশ ঠেলিছে মানুষ প্রত্যহ পায় পায় ;
রুদ্র তোমার ক্রোধ জেগে উঠে না যেন দহে গো প্রাণ,
শান্তির ধারা শিরে আমাদের বরিষ হে ভগবান্ !

প্রতিশোধ তুমি শোধন করিছ, বল তব বৈভব,
অজ্ঞাতে কর বিচার সবার দেখ অলক্ষ্যে সব।
কৃপায় মোদের রক্ষা কর হে বিপদে পরিত্রাণ,
শান্তির ধারা বর্ষণ কর কালে কালে ভগবান্।

(পাঁচ ॥ পটোফি—হাঙ্গেরি)

দেশের দশের ডাক শোন ওই,
ওঠ, ওঠ, ম্যাগিয়ার !
এই বেলা যদি পার তো পারিলে,
নহিলে হ'ল না আর।
মুক্ত হবে ? না,—রহিবে অধীন ?
বুঝে চিনে লও পথ,
'ম্যাগিয়ার আর রবে না অধীন'
করিনু এই শপথ।

আমরা সকলে করিনু শপথ
লয়ে দেবতার নাম।
আর রহিব না অধীন,—হে প্রভু!
পূরাও মনস্কাম।

(ছয় ॥ মিশর)

ওগো নীল-নদ-প্লাবিতা ধরণী! আমি ভালবাসি তোরে,
ওই ভালবাসা ধর্ম আমার—আমার পুণ্য, ওরে?
হে মিশর ভূমি! গরীয়সী তুমি, তুমি মহিমার ধাম,
অযুত যুগের জননী এ দেহ তোমারেই সঁপিলাম।
কত কীর্তির শ্মশান তুমি গো পুণ্য মিশর ভূমি,
তব সন্তানে যে করে পীড়ন তারেও গ্রাসিবে তুমি,
আকাশের তারা উপাড়িতে কভু সম্ভব যদি হয়,
আমাদের আশা নির্মূল করা সম্ভব তবু নয়।
যুগের নিদ্রা করি পরিহার জেগেছি চলিতে আগে,
বিধির দত্ত মোদের স্বত্ব পুরোভাগে ওই জাগে;
অতীতে স্মরণ কর দেশবাসী! ভুলো না ভবিষ্যৎ,
মোদের সহায় ধর্ম আছেন উজলি' মোদের পথ।

(সাত ॥ রাজর্ষি সুদাস—ঋগ্বেদ)

রথের অগ্রে ইন্দ্রের তেজ, মোরা পূজা করি তায়,
আমরা অটল শত্রুর ব্যূহে ইন্দ্রেরি মহিমায়,
তিনি আহ্বান শুনুন মোদের পূর্ণ রাখুন তূণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অধম ধনুর্গুণ।
নিঃশেষে হত শত্রু যাঁহার মোরা তাঁর গাহি জয়.
আদেশে সিন্ধু দেশে দেশে ধায় মেঘে বর্ষণ হয়;
বিশ্বের ধন কর হে পোষণ পূর্ণ রাখ হে তূণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অপটু ধনুর্গুণ।
অরাতির চোখে কভু আমা সবে দেখ না দেখ না দেব!
হিংস্র জনের মাথায় বজ্র কর প্রভু নিক্ষেপ;

বসুধার বসু দান কর আর পূর্ণ রাখ হে তূণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অধম ধনুগুর্ণ।
আমাদের আয়ু লক্ষ্য করিয়া, যারা ব্যাঘ্রের প্রায়,
ফিরিছে নিয়ত, আমাদেরি পায়ে নত কর তা সবায় ;
তুমি যে বিবাধ, শক্তি অগাধ, মোদেরো পূর্ণ তূণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অপটু ধনুগুর্ণ।
শত্রু মোদের হউক সনাভি, দস্যু অথবা দাস,
আকাশের মতো ছেয়ে ফেলে সবে নিঃশেষে কর নাশ ;
কর অভিভূত তাদের নিয়ত, মোদের ভর হে তূণ।
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অধম ধনুগুর্ণ।
হে দেব ! তোমার অনুগত মোরা, তোমার শরণ চাই,
হে সখা ! সকল পাপ ত্যজি' যেন পুণ্যের পথ পাই ;
বন্দনা করি মোরা প্রাণ ভরি তুমি দেহ ভরি তূণ,
হীন শত্রুর হউক ছিন্ন অপটু ধনুগুর্ণ।
সেই বিদ্যাটি শিখাও মোদের যার বলে অনিবার,
দুহিতে পারি হে ধরণী-ধেনুর অফুরান্ ক্ষীরধার ;
যাহাতে বৃদ্ধি যাহাতে সিদ্ধি যাহাতে ভরে যে তূণ।
যাতে অক্ষয় চিরদিন রয় মোদের ধনুগুর্ণ।

(আট ॥ বঙ্কিমচন্দ্র—ভারতবর্ষ)

বন্দনা করি মায় !
সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, চন্দন-শীতলায় !
যাঁহার জ্যোৎস্না-পুলকিত রাতি
যাঁহার ভূষণ বনফুল পাঁতি,
সুহাসিনী সেই মধুরভাষিণী—সুখদায়—বরদায় ।
বন্দনা করি মায়।
সপ্তকোটির কণ্ঠনিনাদ যাঁহার গগন ছায়,
চৌদ্দটা কোটি হস্তে যাঁহার

চৌদ্দটা কোটি ধৃত তরবার,
এত বল তাঁর তবু মা আমার অবলা কেন গো হায় ?
বন্দনা করি মায় ।

চিঠি

পৃথ্বী কবি

হিন্দুর 'পরে নির্ভর করে হিন্দুর যত আশা,
তবু মহারাণা ভুলিয়া আছেন তাহাদের ভালবাসা !
রাজপুতানার যত সর্দার পৌরুষহীন আজ,
রাজপুতানার কুল-ললনার গেছে সম্ভ্রম-লাজ ।
আকবর শাহ সমভূম সবে করিয়া ফেলিল প্রায়,
সবার দৃষ্টি আজিকে কেবল প্রতাপের মুখ চায় ।
আকবর শাহ দালাল হয়েছে রাজপুতানার হাটে,
সবারে কিনেছে ; প্রতাপে কিনিতে ধন নাই তার গাঁটে ।
রাজপুতকুলে জন্ম লভিয়া মান কে হারাতে চায় ?
তবুও সে ধন অনেকেরি গেছে বিকায়ে নৌরোজায় !
যবে একে একে হবে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ রত্নহীন,
চিতোরের নারী আসিবে কি রাণা এই হাটে কোনো দিন ?
অর্থ গিয়েছে, রাজ্য গিয়েছে তবুও প্রতাপ রায়,
পরম যতনে আছেন নিরত সে নিধির রক্ষায় ।
নিরুপায় হয়ে অনেকে গিয়েছে, অপমানে জর্জর,
সে কালিমা মুখে মাখে নাই শুধু হামির বংশধর ।
প্রতাপ কোথায় এত বল পায় লোকে জিজ্ঞাসা করে,
শকতি তাঁহার তরবারে আর বীরোচিত অন্তরে ।
মানুষ-হাটের এ দালাল কিছু রহিবে না চিরকাল,
মরিতে হইবে ; তখন দেশের দূরে যাবে জঞ্জাল ;
সে দিন সবারে হবে বাহিরিতে প্রতাপের সন্ধানে,
বীর্যের বীজ হইবে রোপিতে বিজন রাজস্থানে ;

তুমি শুধু জানো মান বাঁচাইতে, তাই সবে মুখ চায়,
দেশের গর্ব কর প্রতিষ্ঠা অভিনব মহিমায়।

স্বদেশ-বন্দনা

স্যামুয়েল স্মিথ

স্বদেশ! আমার মাতৃভূমি!
স্বাধীনতার ধাত্রী তুমি;
সবে গাহি তোমার জয়-গান।
পিতৃগণের পুণ্য-ভবন,
আর্যগণের গৌরব ধন,
সকল বনই জাগাক ধ্বনি
স্বাধীনতার তান।
স্বদেশ! আমার জন্মভূমি!
স্বাধীনতার ধাত্রী তুমি,
ভালবাসি মধুর তব নাম;
ভালবাসি গহন তোমার,—
তোমার নদী, চৈত্য, বিহার,
প্রেমোল্লাসে হৃদয় আমার
আকুল অবিরাম।
সুরে বাতাস উঠুক ভ'রে
সকল বনে বাজুক ফিরে
সুধাময় স্বাধীনতার গান;
সকল মুখে ফুটুক বাণী,
মিলুক এসে সকল প্রাণী,
মৌনী-গিরির প্রতিধ্বনি
দীর্ঘ করুক তান।
পিতার পিতা! বিশ্বপাতা!
স্বাধীনতার জন্মদাতা!
মোরা তব—চরণে গাই গান,

স্বদেশ মোদের যুগে যুগে,
থাকুক স্বাধীনতার সুখে,
তোমার বলে রাজাধিরাজ!
হ'ক সে বলীয়ান্।

পদস্থ বন্ধুর প্রতি

বের্‌াঁজ্যার

না হে বন্ধু, কাজ নাই আর, অভাব আমার নাইক বড়;
তোমার 'ভালাই' নিয়ে তুমি অন্য কোথাও সরে পড়।
রাজবাড়ীর উচ্ছিষ্টগুলো,—তোমার হয় তো লাগে ভাল;
দোহাই তোমার,—আমিরী জাল আমার তরে কেন গড়?
ভালবাসার যত্ন সোহাগ আমি কেবল চাই রে ভাই,
খুব আমুদে সঙ্গী দু'জন,—মনের মতন যদি পাই;
পরিশ্রমের অন্ন দু'টি নিজের ঘরে খাব খুঁটি;
'মস্ত হবার ব্যস্ততা নাই' ভগবানের হুকুম তাই।
(আমি) আপন মনে পথে পথেই গেয়ে বেড়াই প্রতিদিন,
তোমাদের জাঁকজমকগুলো কর্বে আমায় ভরসাহীন;
নিয়তির উচ্ছিষ্ট যদি ভাগ্যে পড়ে নিরবধি,
বল্‌ব "আমি যোগ্য নহি—আমি যে ভাই অতি দীন।"
আপনি খেটে আপন হাতে আনবো খুঁটে যা কিছু পাই,
সবার চেয়ে বেশী রকম এইটে আমার সাজে রে ভাই;
যা হ'ক আমার ভিক্ষা ঝুলি,—কখ্‌খনো হবে না খালি;
'মস্ত হবার ব্যস্ততা নাই'—ঈশ্বরেরও হুকুম তাই।
সে দিন আমি স্বপ্নে দেখি,—উড়েছি ওই নীল আকাশে,
সেখান হতে জগৎ পানে দেখছি চেয়ে বিষম ত্রাসে,—
বিশাল এক জীয়ন্তের নদে যায় রে ভেসে পদে পদে
কত রাজা, সৈন্য কত,—কত জাতি ঘোর হুতাশে!
স্তব্ধ হলাম শব্দ শুনে, জয়ধ্বনি সেইটে ভাই!
দেশ-বিদেশে একজনের নাম চল্লো ধেয়ে শুনতে পাই;

ওগো মস্ত লোকেরা সব! তোমাদেরও হয় পরাভব?
'উচ্চ আশার নাই প্রয়োজন' ভগবানের হুকুম তাই!
যা হ'ক তা হ'ক সবার আগে তোমাদেরি ধন্য বলি,
ওগো মোদের কর্মপটু রাজ্য-তরীর নাবিকগুলি!
পরস্পরের শান্তি-সুখে পরস্পরে দিচ্ছ ফুঁকে,
ভগ্নতরীর একটা দিকেই পড়ছ ঝুঁকে সবাই মিলি'!
কূলে থেকে বলছি আমি 'ভ্যালা রে মোর ভাই রে,
যা করেছ খুব করেছ,—এমনি ধারাই চাই যে!'
তারপরে ফের রৌদ্রে বসে রোদ্ পোহাতে থাকব ক'সে,
'উচ্চ আশার নাই প্রয়োজন' ঈশ্বরেরও হুকুম তাই!
ঘৃতে আর চন্দনের কাঠে পুড়বে তুমি বুঝছি বেশ,
সুঁদরী কাঠের চিতায় শুয়ে আমি হব ভস্মশেষ,
তোমার শেষ-পালঙ্ক ধরে, আমীর উজীর চলবে ঘিরে,
আমি যাব বাঁশের দোলায় নিয়ে আমার কাঙাল-বেশ।
মরণ কিন্তু মরণই—ঐ তোমারও যা আমারও তাই;
তোমার মশাল জললো না আর আমার প্রদীপ নিব্‌ল রে ভাই।
তফাতটা যা দেখছি ঘাটে, চন্দনে আর সুঁদরী কাঠে;
'উচ্চ আশার নাই প্রয়োজন' ভগবানের হুকুম তাই!
তাই বলি ভাই আমার আমি মনের মতন হব, ওরে,
চলে যাব জন্মের মতো সেলাম করে আড়ম্বরে;
তোমার এ সব রঙিন দেখে বাইরে ভাই এসেছি রেখে—
ছেঁড়া আমার চটিটা আর ভাঙা আমার বাঁশীটিরে।
আমি আমার বাঁশীর মতো সমান স্বাধীনতাই চাই,
তাতে তোমার রঙিন কাচের ঘরের কোনো ক্ষতিই নাই;
স্বাধীনতার বিজয় গীতে গাইব মোরা পথে পথে,
'মস্ত হবার ব্যস্ততা নাই' ঈশ্বরেরও হুকুম তাই।

অবিচার

শেলি

দুর্যুগে হাওয়া গুমরি কাঁদে রে,
কথার অতীত ব্যথা তার ;
দুর্জয় হাওয়া,—যখন বাজে রে
মেঘ-মৃদঙ্গ অনিবার ;
ক্ষুব্ধ পবন অশ্রু-বিকল,
নগ্ন কানন মসী-শাখাদল,
গিরি-গহ্বর বিহ্বল জল
স্মরি' জগতের অবিচার !

পুণ্যের ক্ষয়

থিয়োগ্নিস

দেবতার মধ্যে এবে এ অধম দেশে
আশাদেবী আছেন কেবল,
অন্য সবে সুমেরুর স্বর্ণচূড়া বাহি'
গেছেন ত্যজিয়া ভূমণ্ডল।
অন্তর্হিত ধর্মদেব সত্যদেব সহ,
শ্রী গিয়েছে ধী গিয়েছে চ'লে,
এ ভীরুর দেশে শুধু ধর্মভীরু নাহি,
প্রতিজ্ঞা পালিতে এরা ভোলে।
দুশ্চরিত্র দুর্জনেরে করিতে বরণ
নারীদের দ্বিধা নাহি আর।
পাত্র ধনী ? ধন করে কলঙ্কমোচন,
কুৎসিতে সুন্দরে একাকার !
কুবেরের যূপে বলি পড়ে জোড়া জোড়া
লুব্ধ, নীচ, কুক্কুরী কুক্কুর,
পুণ্যের প্রাচীন যুগ অতীতে বিলীন,
ন্যায় ধর্ম হয়ে গেছে দূর।

বন্দীর প্রার্থনা

সিঙ্কিভিচ

বন্দী মোরা—মোরা ভাগ্যহীন ;
ভগবান্! দাও হে সুদিন।
কর প্রভু শৃঙ্খল-মোচন,—
দূর কর অধর্মাচরণ ;
ল'য়ে চল উষার মন্দিরে,
স্নিগ্ধ শান্ত স্বর্গনদী তীরে ;
ল'য়ে চল আনন্দের চির নিকেতনে,
ল'য়ে চল শান্তি ধামে,—সান্ত্বনা-ভুবনে ;
শোনো প্রভু মোদের প্রার্থনা,
প্রভু মোরা হয়েছি ব্যাকুল ;
দুর্ভাগার—বন্দীর প্রার্থনা,
দয়াময় হও অনুকূল!

উদ্দীপনা

ম্যাক্সিম গোর্কি

ওহো! দেখ দাবানল জ্বলিল অন্তরে!
লম্ফে লম্ফে অট্টহাসে ছাইল কানন ;
অশ্ব মোর তীরবেগে ছোটে বায়ু-ভরে।
এ বাহু কিনেছে নাম যুদ্ধে অগণন।
ওহে ভাই, দূর কর নিদ্রা, তন্দ্রা সব,
উদয়-গিরির দিকে চল মোর সাথে ;
আঁধারে মগন দেশ, নিস্পন্দ নীরব,
অরুণ কিরণ মোরা পাব পথে যেতে!
তপ্তলোহ বক্ষে মোর আবেগের ভরে
উঠিছে দুলিয়া,—তুমি এখনো ঘুমাও?
অপূর্ব পুলকে মোর আঁখি আসে ভ'রে
ছুটেছি জ্যোতির দিকে উধাও, উধাও!

উঠ ভাই! জাগ ভাই! নহিলে এখনি
জাগাবে বিষাচি বায়ু দংশিয়া সঘনে ;—
পুড়িবে কপাল, শিরে পড়িবে অশনি,
বরণ করিতে হবে বিফল মরণে।

মানুষ

স্টিফেন ফিলিপস্

পথ দেখিয়ে যায় গো নিয়ে
এমন মানুষ কই ?
বাক্-চাতুরী কর্বে না যে
ব্যাকুল যবে হই ;
কোথায় আজি কাজের কাজী
তেমন মাঝি কই ?

তুষ্ট আছে যে জন মনে
সত্য-মহিমায়,
দীর্ঘ নিশি দেশে যখন
ডুবায় কালিমায়,
তখনো যেই জানছে মনে
তপন সে কোথায়।

হঠাৎ লড়াই বাধিয়েছ তাই
দিব না হায় দোষ,
হওনি জয়ী তাতেও তেমন
হইনি অসন্তোষ,
সৈন্য এত নষ্ট হ'ল
করিনি তায় রোষ।

তবে যে ওই　　　চিত্ত লঘু
　ওরেই করি ভয়,
নেতা যে জন　　　ব্যঙ্গ করা
　তার কি উচিত হয় ?
নটের মতো　　　ভঙ্গী,—ও তো
　রণভূমির নয়।

পরাজয়ের　　　জন্ম কারেও
　দিই নে অপরাধ,
মৃতের সংখ্যা　　　দেখিয়ে দিতে
　নাহি মোদের সাধ ;
শুধু অধীর　　　করে হে বীর !
　লঘু বিসংবাদ।

দেশের লোকে　　　তেজের বাণী
　শুনতে যবে চায়,—
অপমানে　　　চক্ষে মুখে
　আগুন বাহিরায়,—
তখন দলাদলির　　　গোলে
　ব্যস্ত হলে ?—হায়।

উদ্যত যার　　　হয়নি বাহু
　নাইক এমন লোক,
যাহার দিকে　　　তাকিয়েছি হায়
　ঝল্‌সে গেছে চোক্ ;
তোমরা শুধু　　　বুঝলে নাক'
　দেশের দুঃখ শোক !

যায় গো নিয়ে পথ দেখিয়ে
এমনি মানুষ চাই,
কাঁদলে ব্যথায় বাক্-চাতুরী
কর্বে না যে ভাই,
নিপুণ মাঝি চাই গো আজি
কাজের কাজী চাই!

ইতালির প্রতি

ফিলিকাজা

ইতালি! ইতালি! এত রূপ তুমি কেন ধরেছিলে, হায়,
অনন্ত ক্লেশ লেখা ও ললাটে নিরাশার কালিমায়;
এমন ভাগ্য কেন করেছিলে? করেছিলে কোন্ পাপ?
অপরের বর অদৃষ্টে তব কেন হ'ল অভিশাপ?
হ'ত ভাল যদি হতে কুৎসিত, অথবা সে হতে বলী,—
ভয়ে আসিত না, ভালবাসিত না, চরণে যেত না দলি'।
রূপের গরিমা, মহিমা তোমার পলে পলে তবু, হায়,
আত্মকলহে প্রত্যহ আজি তিলে তিলে ক্ষয় পায়।
হলে রূপহীনা সহিতে হ'ত না বর্বর অভিযান,
গিরি লঙ্ঘিয়া আসিত না 'গল্' রক্ত করিতে পান;
তাহলে এ ছবি দেখিতে হ'ত না, মরিতে হ'ত না লাজে,
পরের অস্ত্র হস্তে ধরিয়া তুমি ভ্রম' রণ মাঝে।
কেন যে এ রণ জান না কারণ, তবুও যুঝিছ, হায়,
জয়-পরাজয় সমান তোমার চির-শৃঙ্খল পায়!

মৃত্যুঞ্জয়

স্বইনবার্ন

প্রতি জনে যোগ্য কর্ম প্রতি জনে যোগ্য পুরস্কার,—
ভাগ্য রহে দিতে;
যে পোষে বিশ্বের প্রাণ, বিসর্জন করি আপনার,—
মরে সে বাঁচিতে।

যথালাভ

টলষ্টয়

হৃদয় চহিয়াছিল নিধি ;
নিরখি' সে আনন্দ অপার !
পূর্ণ ধন নাহি পাই যদি
যা পেয়েছি,—প্রচুর আমার।

ফার্সী উদ্ভট

সাদি

জিজ্ঞাসি' বৃশ্চিকে ধীরে ধীরে,—
শীতে কেন এস না বাহিরে ?
বিছা বলে, "গ্রীষ্মে বড় করেছি সুকাজ,—
তা বাহির হব আজ !"

*　　　*　　　*

জিজ্ঞাসিনু বুড়া-বিপত্নীকে,—
কেন তুমি কর নাক' নিকে ?
"বৃদ্ধার রূপ বড়ই ঠেকে ফিকে।"
অর্থ আছে বালা-নারী লহ।
"বৃদ্ধা যদি আমারি অসহ,
বালা কেন চাইবে বুড়ায় ? কহ !"

নিশীথে

মূর

কতদিন নীরব নিশীথে,
নিদ্রা যবে নাগপাশে বাঁধিবারে চায়,
স্মৃতি এসে জাগায় চকিতে
যে দিন গিয়েছে তারে নবীন আভায় ;
সেই হাসি, অশ্রু, গীতি,
সেই কৈশোরের স্মৃতি,

প্রণয় নিয়ত কত নাচা তো হিয়ায় ;
যে চোখে জ্বলিত জ্যোতি
আজি সে মলিন অতি,
ভেঙে গেছে ফুল্ল-প্রাণ এবে নিরাশায় !
এমনি রে নীরব নিশীথে,
ঘুমের বাঁধন যবে বাঁধিবারে চায়,
দুখ-স্মৃতি জাগায় চকিতে
অতীত দিনের ছবি নবীন আভায় !
মনে পড়ে যখন আবার,—
অটুট বাঁধনে বাঁধা বন্ধু সমুদায়.
একে একে সম্মুখে আমার
শিশিরে পল্লব সম ঝরে গেছে হায়,—
মনে হয় যেন আমি
একাকী মন্দিরে ভ্রমি'
উৎসবান্তে যবে সবে লয়েছে বিদায়,—
শুকায়েছে ফুল-হার,
প্রদীপ জ্বলে না আর,
একা আমি,—আর কেহ নাহিক হেথায় ।
এমনি গো নীরব নিশীথে,
নিদ্রা যবে নাগপাশে বাঁধিবারে চায়,
স্মৃতি এসে জাগায় চকিতে
অতীত দিনের ছবি নবীন আভায় ।

বৃদ্ধের স্বপ্ন

অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস্

আহা নিমেষের যৌবন-সুখ
ফিরে কর মোরে দান,
বালকের মতো হাসি আরবার,
চাহি না বুড়ার মান ।

দূর হ্‌ কালের লুণ্ঠিত ধন,
যশের মুকুট নাও,
যায় ছিঁড়ে যাক জ্ঞানের লিখন,
জয়-ধ্বজা ভেঙে দাও।
শিরায় শিরায় অনল-উৎস
কৈশোর এসে ফিরে,
দিক্‌ ভালবাসা কীর্তির আশা
মদির স্বপনে ঘিরে।
শুনিল দেবতা প্রার্থনা মম
হাসিয়া কহিল ধীরে,
"এখনি তোমার কামনা পূরিবে,—
যদি হাত রাখি শিরে।
কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, এর
রাখিতে চাহ কি কিছু ?
কামনা তোমার পূরাতে সময়
এখনি হটিবে পিছু!"
আহা প্রাণাধিকা পত্নীরে ছেড়ে
কে বল বাঁচিতে পারে ?—
পারি না ছাড়িতে প্রিয়ারে আমার,
রাখিতে দিবে কি তারে ?
লইল দেবতা স্বর্ণ লেখনী,—
ডুবাইয়া জোছনাতে,—
লিখিল—'বালক হইবে আবার
পতি হবে তারি সাথে!'
"নাহি তবে আর প্রার্থিত কিছু ?—
এখনি বালক হবে,
বয়সের সাথে যা কিছু পেয়েছ,
মনে রেখ, সব যাবে।"

রহ দেখি, আহা ! কত আনন্দ
জনক-জীবনে, মরি,
পুত্র, দুহিতা —তাহাদের হায়,
তেয়াগ কেমনে করি ?
ফেলিয়া লেখনী মধুর হাসিয়া
দেবতা কহিল, "হায়,
বালক হইয়া পিতা হতে চাও
বলিহারি কামনায় !"
আমি হাসিলাম, —ভাঙিল স্বপ্ন
হাসির আবেগ-ভরে,
লিখিনু কাহিনী তরুণ-পরান
প্রবীণ জনের তরে।

বৃদ্ধের যৌবন-স্বপ্ন

খুশ্‌হাল

বুড়া হয়ে যৌবন যে চায়,
বল তারে "ওগো মহাশয় !
যে কর্ম্ম করেছ তার এই যোগ্যবেশ, এই পরিচয় ;
তবে কেন মিছামিছি আর
আপন লজ্জার কথা তোলা বারংবার ?"

মরণেরে কেন ভয় করা
এখন তো দেহে মোর জরা ;
প্রিয়জন কত গেছে আগে, কাঁচা চুলে চলে গেছে তারা !
আর আমি ভেবে হব সারা ?
পাগল না হয়ে তবু পাগলের পারা !

মানুষ তো বালুকার ঘর,
ভাঙিছে-গড়িছে নিরন্তর ;

ভাল করে আঁখি মেলে দেখ, —সন্দেহ রবে না অতঃপর।
নিয়তির চুল্লী কে এড়ায় ?
খুশ্‌হাল, স্বচক্ষে দেখেছে,
শুষ্ক, শ্যাম সব সে পোড়ায় !

দশা-চক্র

শেক্সপীয়ার

প্রথমে কাঁদুনে ছেলে মায়ের কোলে,
যত দুধ খায় তার আধেক তোলে।
ক্রমে খুঙ্গী পুঁথি ল'য়ে পাঠশালে যায়,
চকচক করে মুখ প্রভাতী প্রভায় !
ক্রমশঃ হৃদয় তলে জাগে পিরিতি,
রচিছে হঠাৎ-কবি প্রণয়-গীতি !
মুখ ভরি' গোঁফ দাড়ি বাড়িয়া ওঠে,
যশ লাগি' মাথা দিতে সমরে ছোটে !
তারপর বিজ্ঞবর,—বেজায় ভুঁড়ি,
পঞ্চায়তে পায় মান,—জ্ঞানের ঝুড়ি।
তারপর নড়বোড়ে ঠিক যেন সঙ,
দিনে দিনে ফিরে পায় শৈশবের ঢঙ !
তারপর ক্ষীণ তনু শয্যাতলে লীন,
দৃষ্টিহীন, সংজ্ঞাহীন,—সন্নিকট দিন।

চরম-শান্তি

শেক্সপীয়ার

প্রথম সূর্যের তাপে কি ভয় এখন ?
দুরন্ত শীতেরে কেবা ডরে ?
সমাপ্ত হয়েছে কর্ম পেয়েছ বেতন,
গেছ চলি' আপনার ঘরে।
স্বর্ণ জিনি' বর্ণ যার সে জন (ও) নিশ্চয়,
ধাঙ্গড়ের সঙ্গে হবে ধূলি মাঝে লয়।

অত্যাচার নারে আর স্পর্শিতে তোমায়,
ভ্রূকুটির ভয় নাহি আর,
এড়ায়েছ অশনের বসনের দায়।
তৃণ, তরু, সমান তোমার।
পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য, রাজ্য,— তাও সুনিশ্চয়,
এমনি করিয়া হবে ধূলি মাঝে লয়!

বজ্র বিদ্যুতের ভয় নাহি, নাহি আর,—
যারে ভয় করে সর্বজন;
নিন্দা নারে পরশিতে কিংবা তিরস্কার,
দুঃখ সুখ সব সমাপন।
প্রেমিক-প্রেমিকা, হায়, তারাও নিশ্চয়,
এমনি করিয়া হবে ধূলি মাঝে লয়।

পূর্ণ-বিকাশ

টেনিসন

নারী গর্ভে জন্ম লভিয়া
কে আছে এমন ভুবনে?
ব্যাঘ্র অথবা বানরের ভাব
জাগেনিকো যার জীবনে?
মানুষ এখনো অপুষ্ট ভ্রূণ,
আজো বাকী তার অনেক-ই;
হবে না তাহার নব উন্মেষ
নব নব যুগ সনে কি?
এখনো যে তার আবছায়া সব,
কত জাতি জীয়ে মরে গো;—
ত্রিকালদর্শী হেরে,—চিত্রের
রশ্মিতে ছায়া হরে গো!

এইরূপে যবে সবি এক হবে,
নির্মল হবে দৃষ্টি,
গাহিব তখন, "জয় ভগবন্,
মানুষ হয়েছে সৃষ্টি !"

নদী-সংবাদ

(ঋগ্বেদ, তৃতীয় মণ্ডল, ৩৩ সূক্ত—বিশ্বামিত্র)

বিশ্বামিত্র ॥ ত্যজি' গিরি-জঙ্ঘায়,
ভাঙিয়া মন্দুরায়,
সাগর সঙ্গে মিলিত রঙ্গে চলেছে তটিনী সঘনে ;
এলায়ে সলিল-পাশ,
শতদ্রু সনে বিপাশ,—
সুন্দর তনু ধেনু-যুগ্মক ছুটেছে বৎস-লেহনে !

ইন্দ্র প্রেরিত রথী
সিন্ধুর পথে গতি,
ইন্দ্রাভিলাষ-পূর্ণকারিণী বাঞ্ছিত ধন কর দান ;
একই প্রবাহে দুলি'
তরঙ্গে রঙ্গে ফুলি'
সমান গমনে ঊর্মি মিলায়ে সাগরে কর গো অভিযান ;

বৎস-লেহনকামী
ধেনু সম দ্রুতগামী
যেন মিলি দোঁহে সন্তান মোহে চলেছ অধীর গমনে ;
শতদ্রু মাতার পাশে
বিপাশা নদী সকাশে
আসিয়া হয়েছি উপনীত আজি —ক্লান্ত হইয়া ভ্রমণে।

নদীদ্বয় ॥ আমরা রঙ্গে চলেছি,
সিন্ধুর দিকে ঢলেছি,
ফিরিবার নহে আমাদের গতি ফিরিবার নহে কভু সে ;
কেন বার বার তবে,
ডাকে ঋষি আমা সবে,
সব জেনেশুনে কেন অকারণে ডাকে আমা সবে তবু সে ?

বিশ্বামিত্র ॥ ওগো জলময়ী নদী
ক্ষণতরে দোঁহে যদি
দাঁড়াও, শুনাই নূতন স্তোত্র প্রসাদের অভিলাষী গো,
আমি কুশিকের পুত্র,
রচিব নূতন স্তোত্র,
যাহে শত ধারে ঈপ্সিত সোম ক্ষরি' পড়ে রাশি রাশি গো ?

নদীদ্বয় ॥ নাশিয়া বিরোধী বৃত্রে
নদী ও নদ খনিত্রে
খনিলা ইন্দ্র বজ্র-আয়ুধ,— চলেছি তাঁহারি নিদেশে,
দ্যুতিমান, পটু হস্ত,
যে কাজে করিলা ন্যস্ত,
তাই সাধিবারে ছুটিয়াছি মোরা, —ছুটিয়াছি দেশে-বিদেশে।

বিশ্বামিত্র ॥ বাসবের বীরকর্ম
কীর্তন করা ধর্ম,—
কেমনে ইন্দ্র বজ্রে বিঁধিলা জলের অরাতি অহিরে,
বাসবের গাহি জয়
কেমনে সলিল চয়
আসিয়া মিলিল, মিলিয়া ধাইল উর্বরা করি মহীরে।

নদীদ্বয় ॥ ওগো ঋষি, ওগো হোতা,
বলিলে আজি যে কথা
ভুলিয়ো না তাহা, উক্‌থ রচিয়া আমাদের কর তুষ্ট,

করি গো নমস্কার,
আমাদের তুমি আর
পুরুষের মতো কোর না কোর না   বাচালতা-দোষ-দুষ্ট !

বিশ্বামিত্র ॥   শোনো গো আমার স্তুতি
দাও দোঁহে অনুমতি
বহুদূর হতে এসেছে এ জন   ল'য়ে ধন নানা মতো ;
তোমাদের যত জল
যাক্ সে রথের তল,
সুখে পরপারে যেতে দাও মোরে   হও ওগো অবনত।

নদীদ্বয় ॥   ওগো ঋষি, ওগো হোতা,
শুনিনু সকল কথা ;
সুখে হও পার ল'য়ে সে তোমার   রথ ও তুরগ যত ;
সন্তানে দিতে স্তন
পতিরে আলিঙ্গন,
নারী সে যেমন হয় অবনত,   রহিলাম তারি মতো।

বিশ্বামিত্র ॥   পার হয় যত নর
ভরত-বংশধর,—
ইন্দ্রপ্রেরিত তাহারা তোমার   নিদেশে নেমেছে নীরে ;
পেয়েছি গো অনুমতি
রচি' তোমাদের স্তুতি
গা'ব সব ঠাঁই থাকি সে যেথাই,   —যজ্ঞে যজ্ঞে ফিরে।

ভরত-বংশধর
পার হ'ল যত নর,
রচি' মনোজ্ঞ উকৃথ নবীন   করিছেন স্তুতি বিপ্র ;

অন্নদে! ধনপ্রদে!
ক্ষুদ্র নদী ও নদে
পবিত্র জলে ভরিতে ভরিতে চল দেশে দেশে ক্ষিপ্র।

অগ্নি

সামবেদ—উপস্তুত

হে চির-নবীন! স্তুতির নিধান! বিচিত্র তব কাজ!
স্তন্য তেয়াগি' আহুতির লাগি' যজ্ঞে আসিলে আজ!
স্তনহীনা তব জননী অরণি, তাই কি হে অদ্ভুত!
জন্মমাত্র যৌবন লভি' হলে দেবতার দূত!

নীলনদের বন্দনা

মিশরের চিত্রলিপি

জয় নীলনদ! জয়তু গোপনচারী!
স্বরূপ তোমার প্রকাশ মিশর দেশে;
আমা সবাকার তুমিই পালনকারী,
জীবন বাঁচাও কখন নিভৃতে এসে।
নিশিরে তুমিই দিবসে মিলাও আনি',
তুমি আনন্দে পূর্ণ কর হে প্রাণ;
বরষে বরষে জীবে জীবে প্রাণ দানি'
বন্যার জলে ভিজাও সকল স্থান।
বরষে বরষে কর রসার্দ্র দেশ,
নামিয়া গোপনে স্বর্গ-সোপান হতে;
ওগো বলি-প্রিয়! ওগো বিমুক্ত-কেশ!
শস্যের ভার নিয়ে এস নীল স্রোতে।
দেবতা মানুষে গাহিছে তোমার জয়,
সবাই তোমারে ভালবাসে, করে ভয়।

মিত্র-বন্দনা

'অবস্তা' গ্রন্থ

নিদ্রাবিহীন, চির-জাগ্রত, সারা ভূভাগের পতি,
অযুত নেত্র, অযুত কর্ণ, মিত্রের করি স্তুতি।
সভার মুখ্য, সত্যের মূল সুন্দর কলেবর,
জ্ঞানের আকর, বলের নিধান, সবার পূজ্যবর!
যুদ্ধের আগে যোদ্ধারা যাঁরে বলি দেয় উপহার,
ঘোড়ার পৃষ্ঠে বসিয়া সওয়ার অর্চনা করে যাঁর;—
নিজের জন্য স্বাস্থ্য মাগে সে অশ্বের দ্রুতগতি,
প্রার্থনা করে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে শত্রু প্রতি;
মিত্রের বরে প্রার্থনা পূরে শত্রুর হয় ক্ষয়,
দিবার মতন বলি দিব আজি গা'ব মিত্রের জয়!

মৃত্যুরূপা মাতা

বিবেকানন্দ

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য-বায়ু-বেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরান বহির্গত বন্দীশালা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরি-চূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার,—মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর!—দুঃখ রাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তা'রা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালী! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,—
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

মায়া

বেদগান

শূন্য ব্যোম্‌ মনে হয় বিরাট বিমান,
জোনাকী—জোছনা-কণা,—হয় অনুমান।
অবাধ, অগাধ ব্যোম জানি তবু হায়,
জানি গো জোনাকী চুরি করে না জ্যোৎস্নায়।

বৈরাগ্যোদয়

'বৌদ্ধজাতক' হ'তে

বনের মধ্যে আমের বৃক্ষ দেখিলাম সুবিশাল,
শ্যামল তাহার পল্লব-ছায়া ফল তার সুরসাল ;
পথিকেরা এসে ফলের লালসে ভাঙিয়া ফেলিল শাখা !
হৃদয় কহিল, 'সংসার মাঝে আর শ্রেয় নয় থাকা।'
চিকন দু'খানি সোনার কাঁকন পরিল যখন নারী,
শব্দ হ'ল না বিন্দুমাত্র ; হায়, কিছু পরে তারি
কাঁকনে কাঁকন ঠেকিল যেমন শব্দ উঠিল বাজি' !
হৃদয় কহিল, 'আর কেন ? চল, সংসার সুখ ত্যাজি !'
পক্ষীর দলে এসে পড়েছিল ভিন্ন দলের পাখী,
মুখে ছিল তার খাদ্যের ভার, তায় ছিল সে একাকী ;
চঞ্চু আঘাতে সকলে মিলিয়া ব্যস্ত করিল তারে !
হৃদয় কহিল, 'পালাও, পালাও, কাজ নাই সংসারে।'
মসৃণ দেহ, উচ্চ ককুদ, উদ্ধত, বলবান্‌
বৃষ চলিয়াছে ; ভয়ে তার কাছে কেহ নহে আগুয়ান ;
সে করিল এক ধেনুর কামনা,—অমনি শৃঙ্গাঘাত !
আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র ; সংসারে প্রণিপাত।

লামার গান

লামা মিলরাপা

আকাশের পথে রবি শশী ধায়
সোহাগে ধরায় বেড়িয়া ধরে,

দিবাকর দীপ আলো করে দিক্
কিবা দক্ষিণে কি উত্তরে ;
সে আলোকে সুখে জাগে নরলোক,—
তারে কি লুকাবে মলিন করে ?

হত্বর পূরবে আবরি আকাশ
তুষার শীর্ষ জাগে শিখরী,
গগন পরান তারি গহ্বরে
হিংসা বিরত ফিরে কেশরী ;
সে তো নহে ক্রূর, যে শীত বাতাস,
তবে কেন হত তাহার অরি

দক্ষিণ বনের রাণী সে বাঘিনী
সকল শাসন অধীন তার,
যখন সাহসে অনপারে পাশে
শোভা গৌরব হরে না আর ;
হে বসুন্ধরা! মঙ্গল-করা!
অপকার যেন না হয় তার।

পশ্চিমে,—জলে অপার সলিলে
নানা জীব সুখে নৃত্য করে,
সোনালী দু'চোখ তুলে ভেসে চলে
দেখিবারে দূর রত্নাকরে ;
বাঁকা বঁড়শি কি ছলকরা জালে
তারা যেন কভু ধরা না পড়ে।

উদীচী শিখরে পাহাড়ের নীচে
শুভ্র বিহরে পাখীর চূড়া,
সে নহে হন্তা নহে নরঘাতী,

তুষ্ট সে পেলে ক্ষুদ্ কি কুঁড়া ;
বিষ-মাখা বাণ পেয়ে সন্ধান
গরিমা যেন গো না করে গুঁড়া ;

লামা মিললাপা ইহাদের মাঝে
এই গহ্বরে বসতি করে,
রচে গান, জপ-চক্র ঘুরায়
নিখিল জীবের হিতের তরে ;
নিশাচরী কোনো যাদুকরী যেন
ভ্রষ্ট না করে ভিক্ষুবরে।

বৌদ্ধের তপস্যা

লামা মিললাপা

শশক-বর্ষ আসেনি তখনো ব্যাঘ্র-বর্ষ যায়,
ধর্ম-চক্র ধরিতে হৃদয় ব্যাকুল হইল হায় ;
তাই সে একদা তুষার সীমায় হইনু উপস্থিত,
সঙ্গীবিহীন নির্জন গিরি, শঙ্কাবিহীন চিত্।
পবনে গগনে যুক্তি করিয়া বৃষ্টি করিল শিলা,
চন্দ্র তপন হইল বন্দী, কেবলি মেঘের লীলা ;
লোহার নিগড়ে নয় গ্রহ বাঁধা পড়িলেন একে একে,
তুনো উজ্জ্বল 'তুক্' তারা শুধু দেখা যায় থেকে থেকে।
নয় রাতি নয় দিনমান ধরি বরফ-ফুল্‌কি ঝরে,
সরিষার মতো কোনোটি পঙ্গপালের আকার ধরে!
বরফের গুঁড়া জমাট বাঁধিল বড় বড় চূড়া ব্যেপে,
নীচে বনভূমি মূরছিয়া পড়ে গুরুভার বুকে চেপে ;
শিলা কঙ্কাল পূরিল তুষারে, ঘুচিল কালিমা রেখা ;
ললাটের বলি-চিহ্ন মুছিল, ফুটিল জ্যোতির্লেখা!

উর্মিল জল স্থির হ'ল নদী থামিল মধ্য পথে,
স্থল কিবা জল হ'ল সমতল, চিনিব সে কোন্ মতে ?
কিবা পশু পাখী কিবা সে মানব খাদ্য না পায় কেহ।
বিফলে চকোর বরফ খুঁটিল, মূষিক খুঁড়িল গেহ ;
গবয়, চমরী, ছাগ, কস্তুরী খুলিতে না পারে মুখ
হেন দুর্যোগে মিললাপা ! তুমি কতই পেয়েছ দুখ !
একা গুহাতলে বন্দী ছিলাম বরফের কারাগারে
ভিক্ষুজনের জীর্ণ বসন হটায়েছে বাত্যারে ;
স্খলিত-দন্ত শীত-শার্দূল পলায়ে গিয়াছে দূরে।
তপের তাপেতে গলেছে তুষার অযুত ধারায় ঝুরে !
দুরন্ত ঝড় হয়েছে শান্ত ঘন ধারা বরিষণে,
প্রণত পঞ্চভূতের শীর্ষ বুদ্ধের শ্রীচরণে।

বহ্নির কূলে জন্ম আমার, ব্যাঘ্র সে জ্ঞাতি মম,
বসতি আমার তুষারাবৃত গিরি-চূড়া দুর্গম,
সিংহের কূলে জনমি' শুনেছি সংঘের মহাবাণী,
যে পথে গেছেন অর্হত সবে আমিও সে পথ জানি ;
মহাযান-পথে যাত্রী আমরা মরণেও মোরা ধন্য,
ওগো উপাসক ! তথাগতে জান, চিত্ত কর না অন্য ;
দুখ মাঝে সুখে ছিল মিললাপা না ছিল হৃদয়ে শোক,
ওগো উপাসক ! তোমা সবাকার চির-কল্যাণ হোক্ !

চির-শরণ

রাজা দায়ুদ

আমার রাখাল আপনি দয়াল, আমার ভাবনা কিয়ে
তিনি রেখেছেন শ্যামল ক্ষেত্রে শান্ত হ্রদের তীরে ;
তিনিই আমায় দুর্বল চিতে শক্তি করেন দান,
সুপথে চালান আমায় দয়াল নামের রাখিতে মান ;

মরণের ছায়া ঘিরে যদি তবু করিব না কিছু ভয়,
তুমি আছ সাথে সহায়! শরণ! জানি আমি নিশ্চয়!
শত্রুপুরীতে রক্ষা করেছ আমারে দণ্ডধর!
অভিষেক মোরে করি আনন্দে ভরেছ এ অন্তর;
এমনি করুণা রহে যেন প্রভু! মোর 'পরে চিরদিন,
চিরদিন যেন তোমারি ছায়ায় রহি গো ভাবনা হীন।

নাম কীর্তন

রাজা দায়ুদ

আমার প্রভুর নাম কীর্তন কর মন্দিরে তাঁর
তাঁহারি প্রকাশ আকাশের তলে গাও হে বারংবার।
তাঁর সে বিশাল কীর্তি-কাহিনী কর সবে কীর্তন,
তাঁহার অপার মহিমার কথা গাও হে অনুক্ষণ;
তূরীতে ভেরীতে বীণা বাঁশরিতে গাও সবে তাঁরি নাম,
কীর্তন-সুখে নৃত্য করিয়া ফির হে অবিশ্রাম!
বাজায়ে মুখর করতাল সবে গাও হে ভরিয়া প্রাণ,
নিশ্বাস নিতে শিখেছ যে জন সেই কর নাম গান।

ব্যাকুল

রাজা দায়ুদ

কতদিন তুমি এমন করিয়া ভুলিয়া রহিবে? প্রভু!
কতদিন হেন রহিবে গোপনে? দেখা কি পাব না কভু?
কতদিন হেন যুক্তি করিব আপন মনের সনে?
শত্রুকুলের হর্ষ কতই দেখিব দুঃখ মনে?
প্রভু! ভগবান্! বিচার করিয়া রাখ এ মিনতি মোর,
নয়নে কিরণ বিথারিয়া নাশ কাল-নিদ্রার ঘোর।
আমার প্রাণের ব্যাকুলতা হেরি' শত্রু যেন না হাসে,
আমারে বেদনা দিতে যেন কেহ না পারে নিন্দা-ভাষে।

আমি বিশ্বাস রেখেছি তোমার অনন্ত করুণায়,
ওই হাতে আমি মুক্তি লভিব আছি সেই ভরসায় ;
চিরদিন আমি তোমারি চরণে গাহিব হে ভগবান্,
আমারে ঘিরিয়া রয়েছে তোমার রাজ-হস্তের দান।

অনুতপ্ত

লোপ ডি ভেগা

প্রভু ! কেবা আমি ?—আমার ভাবনা তুমি ভাব অবিরত ?
দুয়ারে এসেছ খুঁজিতে আমায়, কষ্ট হয়েছে কত ;
শীতের বিষম রাত্রি কাটালে আমারি প্রতীক্ষায়,
দুরন্ত হিমে দুয়ার বাহিরে দাঁড়ায়ে একাকী, হায় !
প্রভুরে চিনিতে ভ্রম হ'ল মোর, ঘরে না লইনু বরি',
ইহ-পরকালে কি হবে আমার তাই সে ভাবিয়া মরি।
কণ্টক-ক্ষত চরণে তোমার শুকায় শোণিত-ধারা,
কিছুই হ'ল না এ অকৃতজ্ঞ অধম জনের দ্বারা।
দৈববাণীতে ক'য়ে গেছে মোরে—'ওরে কান পেতে শোন,
হৃদয়-দুয়ারে নিয়ত আঘাত করেন নিরঞ্জন !'
কতবার আমি শুনেছি সে বাণী, শুনেছি আপন কানে
মৃদুল মধুর বিষণ্ণ সুর আসিয়া লেগেছে প্রাণে,—
তবু উঠি নাই ;—বলেছি 'দুয়ার সকালে খুলিব কাল,'
হয়েছে সকাল, তবু বলি 'কাল',—একি হ'ল জঞ্জাল !

করুণার বার্তা

কোরান

মধ্য-দিনের আলোর দোহাই, নিশির দোহাই,—ওরে !
প্রভু তোরে ছেড়ে যান্‌নি কখনো, ঘৃণা না করেন তোরে।
অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভাল হবে রে ভবিষ্যৎ,
একদিন খুশী হবি তুই লভি' তাঁর কৃপা সুমহৎ।

অসহায় যবে আসিলি জগতে তিনি দিয়েছেন ঠাঁই,
তৃষ্ণা ও ক্ষুধা,—দুঃখ যা ছিল ঘুচায়ে দেছেন তাই ;
পথ ভুলেছিলি,—তিনিই সুপথ দেখায়ে দেছেন তোরে,
সে কৃপার কথা স্মরণে রাখিস্—অসহায় জনে, ওরে !
দলিসনে কভু ; ভিখারী আতুর বিমুখ যেন না হয়,
তাঁর করুণার বারতা ঘোষণা কর রে জগতময়।

হাফেজের রুবাইয়াৎ

তুমি বলেছিলে, "ভাবনা কি ? আমি তোমারেই ভালবাসি ;
আনন্দে থাক, ধৈর্য-সলিলে ভাবনা সে যাক ভাসি।"
ধৈর্য কোথায় ? কিবা সে হৃদয় ? হৃদয় যাহারে কয়,
সে তো শুধু এক বিন্দু শোণিত আর ভাবনার রাশি।

সমীর ! গোপনে আমার কথাটি বলিয়া এস হে তায়,
জানাও আমার মরমের জ্বালা তারে শত জিহ্বায় ;
তেমন করিয়া বলো না যাহাতে বেদনা সে মনে পায়,
নানা বারতার মধ্যে আমার কথাটি জানায়ো, হায়।

মরণের বাণ জীবন-দেউল যখন করিবে চূর্ণ,
সেই মুহূর্তে জীবন-পাত্র ভরিয়া হইবে পূর্ণ !
তখন হাফেজ ! সতর্ক থেকো, যবে ল'য়ে যাবে তুলি'
জীবন-গৃহের সব তৈজস ক্রমশঃ কালের কুলি।

নদী-তীরে যেয়ো মদিরা-পাত্র সাথে লয়ে,—যদি পারো,
প্যানপেনে যত কুনোদের ছেড়ে দূরে থেকো, ভাল আরো ;
এমন সাধের জীবন মোদের দিন দশ বই নয়,
তাজা বুকে হাসি মুখে থাকা ওগো তাই তো উচিত হয়।

গোপনে গোলাপ-মুকুল রয়েছে তোমায় দেখে,
সরমে চামেলি রয়েছে হোথায় মু'খানি ঢেকে ;
গোলাপের কলি কোথা পাবে হায় অমন কায়া ?
যে রবির রূপে রূপসী সে,—তাহা তোমারি ছায়া !

তোমার বিরহে তপ্ত অশ্রু গলিছে বাতির মতো,
পেয়ালার মতো গোলাপী আঁখির জল ঝরে অবিরত ;
হৃদয়ের, এই সংকট-দিনে শুনি যদি বীণা-তান,
আঁখি-বারি রূপে হৃদয়-রক্ত ঝরে ব্যাকুলিয়া প্রাণ।

হৃদয়ে করেছি কাঁদিবার ঠাঁই তোমার বিরহে স্বামী !
সান্ত্বনা—তাও রেখেছি হৃদয়ে যতনে লুকায়ে আমি,
শত ঝঞ্ঝার আঘাতে পরান যতই পীড়িছ প্রভু !
অটল হৃদয়,—প্রত্যয় তার ভাঙিয়া পড়ে না তবু।

সকল কামনা সফল করিতে তুমি আছ কৃপাময় !
তুমি কাজী, তুমি কোরান আমার, তুমি মোর সমুদয়,
আমার মনের কথাটি তোমায় কি আর জানাব আমি ?
তোমার অজানা কিছু কি জগতে আছে অন্তর্যামী !

প্রেম-বিমুখ

সূরদাস

ওরে মন ! তুই ছেড়ে চলে আয় প্রেম-বিমুখের সঙ্গ ;—
কুমতি উদয় যার সাথে হয়,—হয় রে ভজন ভঙ্গ।
কাকে কি করিবে কর্পূর খেয়ে ? কুকুর গঙ্গা নেয়ে ?
গাধা কি করিবে অগুরু গন্ধে ? মর্কট মালা ল'য়ে ?
নাহিক সুমতি, সাধু সংগতি, বিষয়ে ডুবিয়া মরে ;
কহে সূরদাস কালো কম্বলে অন্য রঙ কি ধরে ?

প্রিয়-বিরহে

কবীর

ওগো প্রিয়তম! তোমার কথাই ভাল লাগে মোর মনে,
লক্ষ যতনে যা বোঝায় লোকে লাগে না মনের কোণে ;
ক্ষীর দিয়া মুখে যদি পালঙ্কে রাখ গো জলের মীন,
তবু ধড়ফড়ি মরিবে সে, হায়, হইবে সংজ্ঞাহীন।
জহুরী চিনেছে হীরায়,—তাই সে হাতুড়ি হানে না আর,
স্বাতীর সোয়াদ পাপিয়াই জানে বিরহের ব্যথা যার ;
কবীর কহিছে ভাবের ভুবনে গোপন নাহিক আর।

জপের গুটি

নানক

জীবে প্রেম যাঁর চরম শিক্ষা আমি সে গুরুর শিখ,
মর্মতলেরো মর্ম যেজন জাগ্রত অনিমিখ ;
অনুসন্ধান যে করেছে তাঁর সেই তো পেয়েছে ঠিক !

নিশ্বাসগুলি যে মালার গুটি সে কেমন জপ-মালা !
নিভৃতে আসিয়া করেছে আপনি অনাগত কাল আলা !
নিশ্বাস-মণি-মালা কে দেখেছে !—মালার উজল জ্বালা

পরমেষ্ঠী

প্রজাপতি ঋষি

তখন ছিল না 'অস্তি' 'নাস্তি' না ছিল আকাশ
ভূমণ্ডল,
কে ছিল শরণ ? কিবা আবরণ ? সে কিগো গহন
গভীর জল ?
মৃত্যু ছিল না, না ছিল অমৃত, না ছিল রাত্রি
না ছিল দিন,

বায়ুহীন দেশে নিশ্বাস লয়ে ছিল সেই 'এক'
ক্রিয়া-বিহীন।
আঁধারের বুকে ঘনান্ধকার, ঠাহর না হয়
আকার কোনো,
সে-মহার্ণবে আপনার তপে বাড়িতে লাগিল
মহিমা ঘন!
সেই আদিমের মনো-বিন্দুতে ধীরে ধীরে ধীরে
উপজে কাম,
কবিরা জানেন 'নাস্তি'র সাথে সেই অস্তির
মিলন ধাম।
বিশ্বের বীজ অঙ্কুরি' উঠে, মহা-মহিমায়
অখিল ভরে;
প্রযত্নবান পুরুষ ঊর্ধ্বে, নিম্নে প্রকৃতি
নিজেরে ধরে।
বিপুল সৃষ্টি!—কোথা হতে এল? কে জানে ইহার
জনম দিন;
সৃষ্টি কাহিনী কেমনে জানিবে? সৃষ্ট দেবতা
অর্বাচীন?
পরম ব্যোমের পরমপুরুষ,—বিশ্বলোকের
যে জন ধাতা,—
সে কথা হয় তো তিনিই জানেন, অথবা তিনিও
জানেন না তা!

কে

হিরণ্যগর্ভ ঋষি

কে ছিল আদিতে? কে রাখিল ধরি'
দ্যুলোকে-ভূলোকে আপন স্থানে?
কে অদ্বিতীয় পতি সকলের?
কোন্ দেবে পূজি হব্য-দানে?

শকতি ও প্রাণ যে করিল দান ?
দেবতারা যাঁর শাসন মানে ?
মৃত্যু অমৃত ভৃত্য যাঁহার ?
কারে পূজি মোরা হব্য-দানে ?

যিনি মহিমায় করেন বিরাজ
নিখিল জীবের নয়নে প্রাণে ?
পশু, পাখী, নর, যাঁহার অধীন ?
কার পূজা করি হব্য-দানে ?

রসের আধার সমুদ্র আর ?
হিমাচল যাঁর কীর্তি জানে ?
দিকে দিকে যাঁর অভয় হস্ত ?
কোন্ দেবে পূজি হব্য-দানে

অসীম ব্যোমের পরিমাণ করি,
বাতাস উজলি' কিরণ-স্নানে,—
পৃথিবীরে দৃঢ় করেছেন যিনি ?
কারে পূজি মোরা হব্য-দানে ?

লভি' প্রতিষ্ঠা ক্রন্দসী যাঁর
নিরত নিয়ত মহিমা গানে ?
যাঁহার বিভায় দীপ্ত তপন ?
কার পূজা করি হব্য-দানে ?

ত্রিভুবন-ব্যাপী সলিল-গর্ভে
জাত জাতবেদা যাঁহারে আনে ?
নিখিল দেবের জীবন-বস্তু ?
কোন্ দেবে পূজি হব্য-দানে ?

নিপুণ চক্ষে বিপুল বিশ্ব
যিনি হেরিলেন সলিলাধানে,
সকল দেবের অধিদেব যিনি?
কারে পূজি মোরা হব্য-দানে?

পৃথিবীর পিতা, স্বর্গ-জনিতা,
তিন লোক বাঁধা যাঁর বিধানে,
তিনি যেন কভু না হ'ন বিমুখ,
যাঁরে পূজি মোরা হব্য-দানে।

সকল প্রজার প্রজাপতি! দেব!
বিশ্ব-শাসিতে কে আর জানে?
মোদের আহুতি কর হে গ্রহণ,
কামনা পূরাও কাম্য-দানে।

সৎস্বরূপ

তলবকারোপনিষৎ

বাক্য যাঁহারে বর্ণিতে নারে, বচন স্বষ্টি যাঁর,
তিনিই ব্রহ্ম; লোকে যাহা পূজে তাহা কতটুকু তাঁর

মন যাঁরে মনে করিতে না পারে, মন কল্পনা যাঁর,
তিনিই ব্রহ্ম; লোকে যাহা পূজে তাহাই করো না সার

নয়ন যাঁহারে পায় না দেখিতে, নয়ন রচনা যাঁর,
তিনিই ব্রহ্ম; লোকে নাহি জানে পূর্ণ-প্রকাশ তাঁর।

কান যাঁর কথা শুনিতে না পায়, কানে রে শোনান্ যিনি,
তিনিই ব্রহ্ম; লোকে যাহা পূজে শুধু তাহা নন্ তিনি।

প্রাণ অপারগ যাঁর প্রণিধানে, প্রাণের প্রণেতা যিনি,
তিনিই ব্রহ্ম ; লোকে যাহা বলে শুধু তাই নন্ তিনি।

ভাল মতে তাঁরে আমিও জানিনে; জানিনে যে তাহা নয়,
এটুকু যে জন জানে অনুভবে,—জেনেছে তারি হৃদয়।

যে ভাবে জানিনে সে কিছু জেনেছে ; জানে না—যে ভাবে জানি ;
ধারণা ধরিতে পারে না তাঁহারে,—যে কহে তাহারে মানি।

অন্তরযামী বলি যে তাঁহারে জেনেছে—অমৃত তারি,
আত্মার বলে বিত্মায় লভি' অমৃতের অধিকারী।

সমাপ্তে

আমারে মার্জনা কর, হে কবি-সমাজ !
—এতক্ষণ গাহিলাম যাহাদের গান,—
ভুল যদি ঘটে থাকে ক্ষমা কর, আজ
বিদায়ের অশ্রুজলে হোক অবসান

আমার সকল ত্রুটি। ভালবাসি ব'লে,
চেয়েছিনু বাড়াইতে তোমাদের যশ,—
গিয়েছিনু ছড়াইতে নব নব দলে
তোমাদের অন্তরের চির-নব রস ;—

আনন্দের আত্মীয়তা করিতে স্থাপন,—
লঙ্ঘিয়া সকল বাধা,—ভাষা, কাল, দেশ,
বর্ণ, জাতি, পাঁতি, কুল ;—ছিল এ মনন ;
নাহি জানি কি করিতে করিনু কি শেষ।

সুদূর অতীত হতে পাব কি ইঙ্গিত ?
ব্যর্থ কি সার্থক, হায়, আজিকার গীত !

উপন্যাস

জন্মদুঃখী

ভূমিকা

নরওয়ের সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক Jonas Lie রচিত Livsslaven নামক উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে ‘জন্মদুঃখী’ রচিত হইল। বিখ্যাত সমালোচক Edmond Gosse-এর মন্তব্য পড়িয়া এই গ্রন্থখানি পাঠ করি এবং পরে অনুবাদ কার্যে প্রবৃত্ত হই। ইহা ধারাবাহিকরূপে এক বৎসরকাল “প্রবাসী”তে প্রকাশিত হয়, এখন একটু-আধটু পরিবর্তন করিয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রাঙ্কিত করা গেল। আশা করি, দরিদ্রজীবনের এই করুণ-কাহিনী পাঠকসাধারণের নিকট সমাদর লাভে বঞ্চিত হইবে না।

কলিকাতা

দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি

১৩১৯

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

* * *

উৎসর্গ

“প্রবাসী” সম্পাদক

পরম শ্রদ্ধাভাজন

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্. এ.

মহাশয়ের করকমলে

আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অর্পিত হইল।

সত্যেন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর

প্রথম পরিচ্ছেদ

[illegible]বিক্রয়

লোকে কথায় বলে, "শৈশবে রাজার ছেলে এবং গরীবের ছেলেতে কোনো তফাত নেই; স্বয়ং দেবতারা শিশুদের রক্ষক।" কিন্তু বার্বারার ছেলে নিকোলার উপর যে কোন্ দেবতার প্রসন্নদৃষ্টি ছিল তাহা বুঝিয়া ওঠা ভারী কঠিন।

শহরের বাহিরে পাকা রাস্তার উপর টিন-মিস্ত্রীর দোকান-ঘর। সেই ঘরখানিতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত টিমটিম করিয়া প্রদীপ জ্বলিত এবং সময়ে সময়ে নগর-যাত্রী আগন্তুকের দল অন্যত্র রাত্রিবাসের সুবিধা করিতে না পারিলে উহারি মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইত। কত মাতাল আসিয়া হল্লা করিত, হাঙ্গামা করিত, পরস্পর মারামারি করিতে করিতে শিশু নিকোলার দোলা উল্‌টাইয়া ফেলিত; কখনো বা নেশার ঝোঁকে তাহার উপরেই আড় হইয়া পড়িত।

নিকোলার মা বার্বারা পল্লীগ্রামের মেয়ে, যেমন গড়ন তেমনি রঙ, তেমনি স্বাস্থ্য। তাহার মুখ নিটোল, বুক পিঠ পরিপুষ্ট, দাঁত যেন ঠিক টাট্‌কা দুধের ফেনার মতো। গ্রামের হাটে যাহারা গরু বেচিতে আসিত, তাহাদের মুখে শহরের গল্প শুনিতে শুনিতে শহর দেখিবার জন্য তাহার মন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিছুদিন পরে সে গতর খাটাইবে বলিয়া শহরে চলিয়া আসিল।

শহরের সঙ্গে কিন্তু সে কিছুতেই খাপ্ খাওয়াইতে পারিল না। বার্বারার পক্ষে নগরে বাস করা গরুর পক্ষে সিঁড়ি ভাঙিয়া ওঠার মতো দুঃসাধ্য বোধ হইতে লাগিল। সে বাজারে বাজারে ঘাস বিচালির স্তূপ দেখিয়া বেলা কাটাইত এবং শহরের ঘাস যে তাহার দেশের ঘাসের মতো নয়, এ কথা সে পরিচিত অপরিচিত সকলের কাছেই বড় গলা করিয়া বলিতে ছাড়িত না।

কিন্তু সে যে এই রকম করিয়া সমস্ত সকাল বেলাটা নষ্ট করিবে তাহার মনিবের ঠিক সে রকম কল্পনা ছিল না। সুতরাং স্বভাবতঃ বদ্‌মেজাজী না

হইলেও, বার্বারাকে প্রায়ই মনিব বদলাইতে হইত। বার্বারা চোর নয়, বিশেষ কুচরিত্রা নয়, তাহার প্রধান দোষ সে শহরের লোকের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারে না, শহরের চাকরি করিতে হইলে যে সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন বার্বারার তাহা কিছুই নাই।

কিন্তু সমাজ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নয়। সে কলে ফেলিয়া অকেজো লোকের প্রকৃতি বদলাইয়া তাহাকে নিজের কাজে খাটাইয়া তবে ছাড়ে। সে বার্বারাকেও ছাড়িল না, পাড়াগেঁয়ে বার্বারাকে সমাজ শহরের কাজে লাগাইল। বার্বারা 'ছেলের-ঝি' হইল।

এই উন্নতির যুগে, নাচ, ভোজ ও হুজুগের হিড়িক্ ক্রমে এতটা বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, বড় ঘরের মেয়েদের পক্ষে ছেলের-ঝি ভিন্ন একদণ্ড চলা অসম্ভব।

এখন ডাক্তারেরাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, "ইহাই তো প্রকৃতির নিয়ম—গরুর মতো দুধ যোগাইবে, আবার সেই সঙ্গে মানুষের মতো বুদ্ধি খরচ করিয়া কাজ করিবে, এমন তো হইতে পারে না। শিশুর স্নায়ু সবল করিতে হইলে যে শ্রেণীর লোকের রক্ত ভাল এবং স্বভাবতঃ স্নায়ু সবল, তাহাদের স্তন্যের বন্দোবস্ত কৃত্রিম উপায়েও শিশুর মঙ্গলের জন্য করা উচিত।"

সুতরাং কৌসুলী ভীর্গ্যাং সাহেবের সদ্যজাত যমজদের জন্য একজন অসাধারণ রকমের স্বাস্থ্যসম্পন্ন ছেলের-ঝির খোঁজ চলিতেছিল।

কৌসুলী সাহেবের মাহিনা-করা ডাক্তার, ভীর্গ্যাং-গৃহিণীর মন যোগাইবার জন্য, ছেলের-ঝি'র খোঁজ করিতেছিলেন। একদিন তিনি একগাল হাসিয়া শ্রীমতী ভীর্গ্যাংকে বলিলেন, "পাওয়া গেছে, চমৎকার ছেলের ঝি'র সন্ধান পাওয়া গেছে। চমৎকার স্বাস্থ্য। মহম্মদকে পর্বতে যেতে হ'ল না, পর্বতই মহম্মদের কাছে হাজির। তার গা থেকে গোহালের গন্ধ এখনো সম্পূর্ণ যায়নি। ঐ রকমই তো চাই; বিশেষ যখন গরুর দুধেও ফুকো চলছে, তখন এরকম দুগ্ধভাগ্য তো সৌভাগ্যের কথা। বয়সও অল্প, কুড়ির বেশী নয়।"

বার্বারা যখন রাস্তার কলে জল লইতে কি কাপড় কাচিতে আসিত, তখন সে স্বপ্নেও জানিত না যে সে একজন বড় ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই শহরের মধ্যে একজন বিশিষ্ট লোক হইতে চলিয়াছে।

বড়লোকের ছেলের ঝি একজন বিশিষ্ট লোক, সে অনেক গরীবের উপর ভক্তির দাবী রাখে। ছেলের ঝি মনিবের ছেলে মানুষ করিতে গিয়া একদিকে নিজের ছেলেকে স্তন্যে এবং স্নেহে বঞ্চিত করিতে বাধ্য হয়। অন্য দিকে সে দমের গদিতে শুইতে পায়, ভালমন্দ খাইতে পায়, মনিবের কাছে আব্দার জানায় এবং দাস-দাসীদের উপর আধিপত্য করে। শেষে যখন দুধ ছাড়িয়া যায় এবং মনিবের গৃহে নূতন শিশু জন্মগ্রহণ করে, তখন নূতন ছেলের ঝি আসিয়া তাহাকে স্থানচ্যুত করে এবং অন্নে মারে।

কিন্তু গরীবের মেয়ে যদি তাহার একমাত্র নিজস্ব সম্পত্তি—তাহার বুকের রক্ত—স্তনের দুধ তাহার নিজস্ব ছেলেকে দেওয়াই ভাল মনে করে, সে স্বতন্ত্র কথা। সে যদি নিজের ভালমন্দ না বোঝে, সমাজের ভদ্র লোকদের কাজে না লাগে, তবে পরিণামে তাহারই অদৃষ্টে দুঃখ আছে, ইহা আমাদের সমাজতত্ত্বজ্ঞ ডাক্তার সাহেবের মত।

বার্বারা এমনি বোকা যে, প্রথম প্রথম সে সমাজতত্ত্বের এই গোড়াকার কথাটা মোটেই কানে তুলিত না,—এমনি একগুঁয়ে।

রাস্তার মোড়ে গাড়ি রাখিয়া ডাক্তার সাহেব ইহারি মধ্যে তিন-চার দিন টিন-মিস্ত্রীর দেকানে আসিয়া বার্বারার সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছেন। প্রতিবারেই মাহিনা বাড়াইয়া বলিয়াছেন, কত বুঝাইয়াছেন, বার্বারা বাগ্ মানে নাই। বর্তমানে বার্বারার যে সামান্য রোজগার তাহাতে ছেলে মানুষ করা যায় না, ডাক্তার সাহেব তাহাও বলিয়াছেন। কৌঁসুলী সাহেবের বাড়িতে চাকরি লইলে যে মোটা টাকা মাহিনা পাইবে, তাহার অতি সামান্য অংশ টিন-মিস্ত্রীর হাতে মাসে মাসে দিলেই, সে নিজের ছেলের মতো করিয়া বার্বারার ছেলেটির তত্ত্বাবধান করিবে। ইহা ছাড়া সে ছেলেকে একেবারে ছাড়িয়া যদি নাই থাকিতে পারে, মাঝে মাঝে যদি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে মাঝে মাঝে—চাই কি প্রতিমাসেই সেজন্য একবার করিয়া ছুটিও পাইতে পারে। ডাক্তার সাহেব সে বন্দোবস্তেরও ভার লইতে প্রস্তুত আছেন।

ডাক্তার সাহেব মিষ্ট কথা জোরের সঙ্গে বলিতে জানিতেন। তাঁহাকে দেখিলে বার্বারার নিজের বাপের কথা মনে পড়িত। ক্রমশঃ তাঁহার গাড়ি

আসিতে দেখিলেই বার্বারার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইত। সাপ দেখিলে পাখী যেমন করিয়া নিজের অসহায় শাবকগুলি পক্ষপুটে ঢাকিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে তাহার গতি নিরীক্ষণ করে, বার্বারাও তেমনি ডাক্তারের গাড়ি দেখিলে তাড়াতাড়ি ছেলের দোলা আগ্‌লাইতে যাইত।

ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ওঠা ছাড়া ডাক্তারের প্রশ্নের সে অন্য জবাব জানিত না। কথাবার্তা যাহা বলিবার তাহা টিন-মিস্ত্রীর গৃহিণী বলিত। যতক্ষণ তাহাদের কথা চলিত; বার্বারা কেবল ছেলেকে বুকের ভিতর লুকাইয়া শহর ছাড়িয়া পলাইবার ভাবনাই ভাবিত।

শেষে কিন্তু ডাক্তার সাহেব এত বেশী টাকা কবুল করিলেন এবং এম্‌নি আপনার জনের মতো ব্যবহার করিলেন যে, বার্বারা প্রায় তাঁহার কথায় স্বীকারই হইয়া পড়িল। ডাক্তার সাহেব তাহার ছেলেটিকে নিজে কোলে করিয়া আদর করিতে করিতে যখন বলিলেন, "এমন সুন্দর ছেলেকে উপায় থাকতে কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখতে পারে এমন নিষ্ঠুর কেউ নেই। পয়সার অভাবে এই কচি ছেলে শীতে খিদেয় কষ্ট পাবে, এ একেবারে অসহ্য।" তখন বার্বারা একেবারে গলিয়া গেল।

খানিক পরে একজন প্রতিবেশী আসিয়া ঠিক ঐ কথাই বলিল। পয়সার অভাবে, ঔষধ-পথ্যের অভাবে এই গরীবের বস্তিতে গত দুই বৎসরের মধ্যে কত শিশুই যে অকালে মারা গিয়াছে, তাহারই বর্ণনা করিতে বসিল। টিন-মিস্ত্রীর গৃহিণীর মুখেও ঐ একই কথা!

বার্বারা ছেলের কাছটিতে নীরবে বসিয়া সমস্তই শুনিল। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, দম বুঝি বা বন্ধ হইয়া যাইবে। এক-একবার ভাবিতেছিল দেশে ফিরিয়া যাইবে, কিন্তু সেখানে এই অনাথার ভার কে লইবে?

সে আত্মসংবরণ করিল।

সেই রাত্রে তাহার কান্নার বেগ এতই বাড়িয়া উঠিল যে, বাড়িওয়ালা বিরক্ত হইবে ভাবিয়া, সে আস্তে আস্তে রাস্তায় বাহির হইয়া অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পাইয়া সে কতকটা যেন ঠাণ্ডা হইল।

পরদিন সকালে বার্বারা এবং একজন পাড়ার মেয়ে রাস্তার কলের কাছে

দাঁড়াইয়া একখানা প্রকাণ্ড সদ্যধৌত চাদরের দুই মুড়া দুইজনে ধরিয়া নিংড়াইতেছে, এমন সময়ে টিন-মিস্ত্রীর দোকান-ঘরের সম্মুখে একখানা গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল এবং জরির পোশাক পরা কোচম্যান গাড়ি হইতে নামিয়া ভিতরে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে বার্বারার সঙ্গিনী বলিয়া উঠিল, "এই তোমার শেষ কাপড় কাচা দিদি, এখানকার বরাত তোমার উঠল; ঐ দেখ কৌশুলী সাহেবের গাড়ি।"

বার্বারা এমনি জোরে মোচড় দিল, যে চাদরে একবিন্দুও জল রহিল না। আর ভাবিবার সময় নাই। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে।

বার্বারা ঘরে গিয়া ছেলেটিকে জামা পরাইল, তাহার মুখ মুছাইল। অথচ সে যে কি করিতেছে সে বিষয়ে তাহার হঁশ ছিল না।

এদিকে কোচম্যানটা টিন-মিস্ত্রীর হাতে কয়েকটা যে টাকা গুঁজিয়া দিয়াছিল, তাহা তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। লোকটা সেই সজ্জাহীন দরিদ্রের ঘরে নাক যেন সর্বদা উঁচু করিয়াই আছে। অথচ বার্বারা তাহার দিকে তাকাইলেই—"তাড়াতাড়ি নেই।" বলিয়া আশ্বস্ত করিতে ত্রুটি করে না। "কৌশুলী সাহেবের বাড়ি আটটার আগে কেউ বিছানা ছাড়ে না, যথেষ্ট সময় আছে।" এই কথা বলিয়া সে পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিল। যখনি সে ঘড়ির দিকে তাকায়, বার্বারা তখনি ছেলেটির দিকে চায়। হুকুম আসিয়াছে, তলব পড়িয়াছে, কোলের ছেলে ফেলিয়া যাইবার সময়টুকু পর্যন্ত মাপা হইয়া গিয়াছে।

শিশু ঘুমাইয়া পড়িল। যদি জাগিয়া ওঠে—ভারী মুশকিল হইবে, তখন হয়ত বার্বারা তাহাকে কোলছাড়া করিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে না।

"তাড়াতাড়ি নেই।" কোচম্যান আবার তাহার রূপার ঘড়িটা বাহির করিয়া বলিল, "তাড়াতাড়ি নেই।"

কোচম্যানের তাড়াতাড়ি না থাকিলেও বার্বারার বিশেষ রকম তাড়াতাড়ি ছিল। সে আবিষ্টের মতো কাহারো দিকে না চাহিয়া যন্ত্রের মতো গাড়ির ভিতরে গিয়া বসিল। গাড়ি চলিতে আরম্ভ হইলে তাহার যেন চমক ভাঙিল।

গ্রীষ্মের সময়ে কৌশুলী সাহেবের পরিবারের সঙ্গে ছেলের ঝি বার্বারাও হাওয়া খাইতে গেল। ঠেলাগাড়িতে শিশু দুটিকে লইয়া সে রাস্তায় বাহির

হইলেই লোকে বলাবলি করিত, "একেই তো বলি ছেলের-ঝি! কী স্বাস্থ্য!" বার্বারার এই সুখ্যাতিতে কৌঁসুলী-গৃহিণীও মনে মনে বেশ একটু গর্ব অনুভব করিতেন।

কিন্তু এই নূতন ঝিটিকে লইয়া মাঝে মাঝে ইহাঁদের ভারী মুশকিলে পড়িতে হইত। মাঝে মাঝে সে কেমন বিমর্ষ হইয়া থাকিত, অন্ন জল ছুঁইত না, মনিবের ছেলে দুটিকে কাছে লইয়া তাহার স্তন্য-বঞ্চিত মাতৃক্রোড়-চ্যুত নিজের ছেলেটির কথা মনে করিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থ করিত।

ভারী মুশকিল! ছেলের-ঝির মন ভাল না থাকা ভারী মুশকিলের কথা। মন ভাল না থাকিলে শরীরও ভাল থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে স্তন্যও বিষ হইয়া ওঠে, শিশুদেরও শরীর খারাপ করে।

ভীর্গ্যাং-গৃহিণী উহার মন খুশী রাখিবার জন্য নূতন নূতন চাটনি আচার খাওয়াইতে লাগিলেন, রকম রকম কাপড় জামা বকশিশ করিলেন এবং প্রত্যহ উহার ছেলের খোঁজখবর করিবার জন্য চাকরবাকরের উপর কড়া হুকুম জারি করিয়া দিলেন।

বর্বারা অল্পদিনেই বুঝিতে পারিল যে, তাহাকে অত্যন্ত বাড়াইয়া তোলা হইতেছে। সেই যেন বাড়ির কর্ত্রী। ভাল খাইতে পায়, ভাল পরিতে পায়, অথচ কাজকর্ম কিছুই করিতে হয় না। সে দেখিল, তাহার কাজ-করা কড়া হাত ক্রমশঃ ভদ্রলোকের মতো নরম হইয়া উঠিতেছে। সে আরও বুঝিতে পারিল যে, দিনরাত্রি কাছে কাছে থাকিয়া, হাতে করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া মনিবের এই যমজ দুটির উপর তাহার কেমন যেন মায়া বসিয়া যাইতেছে।

কৌঁসুলী পরিবার হাওয়া খাইয়া শহরে ফিরিবার কয়েক দিন পরে, বার্বারা একদিন ছেলেকে দেখিতে যাইবার ছুটি পাইল। তাহার সেই পরিচিত পথটি এখন অত্যন্ত অপরিষ্কার বলিয়া মনে হইতেছিল। মনিব-বাড়ি ফিরিয়া প্রথমেই যে তাহাকে জুতার কাদা সাফ করিয়া লইতে হইবে এই কথাই সে ভাবিতেছিল। আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ছেলেকে দেখিতে পাইবে ভাবিয়া তাহার শরীর রোমাঞ্চিতও হইতেছিল। মাঝে মাঝে কান্নাও পাইতেছিল। কিন্তু, উপায় কি? যাহা হইয়াছে ভালই হইয়াছে, এখন ছেলের দুধের জন্য তাহাকে ভাবিতে হয় না, সে এখন দুধের দাম দিতে পারে।

বেড়ার পাশ দিয়া ঘুরিবার সময় দোকান-ঘরখানি চোখে পড়িতেই তাহার গতি মন্থর হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার বুক কেমন কাঁপিয়া উঠিল।

এমন সময়ে তাহার জল আনিবার, কাপড় কাচিবার সঙ্গিনীটির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। সে বার্বারাকে এক নিশ্বাসে পাড়ার ছোট বড় সকল খবর দমকলের মতো অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল। টিন-মিস্ত্রীর দোকানে সম্প্রতি ভারী হাঙ্গামা গিয়াছে। বার্বারাকে সে সকল কথা খুলিয়াই বলিবে। হাজার হউক সে হইল সই, তাহার ভাল তাহাকে তো দেখিতে হয়। টিন-মিস্ত্রীরা মনে করে লোকের চক্ষু নাই, কেউ কিছু বুঝিতে পারে না। এদিকে কিন্তু উহাদের সর্বস্ব বন্ধক পড়িয়াছে, বৃষ্টি আটকাইতে ভাঙা জানালায় দিবার মতো একখানা টিন পর্যন্ত ঘরে নাই! কেমন করিয়া যে সংসার চলে তাহা ভগবান জানেন। লোকে বলে, বার্বারা তাহার ছেলের জন্য যে টাকা পাঠায়, তাহার জোরেই নবাবী। ছেলেটাকে তো ফেন খাওয়াইয়া রাখিয়াছে, কাঁদিলে নাকি একটু একটু মদ গেলাইয়া অজ্ঞান করিয়া রাখে। হাঙ্গামার পর হইতে পুলিশ বসিয়াছে বলিয়া কেহ তো আর ওখানে মাথা গলায় না।

"আমার পরামর্শ যদি নাও, সই, তবে ছেলেটাকে হল্‌ম্যান ছুতারের কাছে রেখে যাও—ঐ যে, যার জেটির ধারে ঘর। ভারী খাঁটি লোক। আমার মুখে ছেলেটার কষ্টের কাহিনী শুনে বেচারা ভারী সেদিন দুঃখ কচ্ছিল।"

হল্‌ম্যান ছুতার! হল্‌ম্যান ছুতার! বিমর্ষভাবে দোকান-ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বার্বারার কানে ঐ নামটাই বারবার বাজিতেছিল।

ঘরে ঢুকিয়া বার্বারা দেখিল, তাহার আদরের নিকোলা কতকগুলা ময়লা কাঁথার মধ্যে শুইয়া আছে। অযত্নে তাহার শরীর শীর্ণ, বর্ণ ফ্যাকাশে। চোখের দৃষ্টি সদাই যেন সশঙ্ক। বার্বারা তাহাকে কোলে লইতে গেলে সে কাঁদিতে লাগিল; নিকোলা তাহার মাকে চিনিতে পারিল না, বার্বারার অবস্থাও প্রায় ঐরূপ।

ছেলের এই অবস্থা দেখিয়া রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে সে টিন-মিস্ত্রীর স্ত্রীকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিল। কিন্তু ঠিক ঐ সঙ্গে, নিকোলার গা মুছাইয়া দিতে দিতে তাহার মনিবদের ছেলের তুলনায় তাহার নিজের ছেলেকে কেমন অদ্ভুত,

কুৎসিত মনে হইতেছিল। এখন তাহার পক্ষে এই নোংরা ছেলেটাকে হাতে করিয়া মানুষ করা যে এক রকম অসম্ভব, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল।

সে যাই হোক্, মনিব-গৃহিণীকে বলিয়া, নিকোলাকে কালই হল্‌ম্যান ছুতারের বাড়িতে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এ যদি সে না করে তবে তাহার নাম বার্বারা নয়।

সে কাঁদিয়া-কাটিয়া মুখ চোখ লাল করিয়া মনিব-বাড়ি গিয়া হাজির হইল এবং মনিব-গৃহিণী তাহার নিকোলা সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্তে রাজী হইলে তবে ঠাণ্ডা হইল।

এমনি করিয়া নিকোলার হল্‌ম্যান-ছুতারের বাড়িতে থাকাই সাব্যস্ত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরের ঘর

কষ্টে যাহাদের শিশুকাল কাটিয়াছে এবং আদর যাহারা যথেষ্ট পায় নাই, তাহাদের পক্ষে ছেলেবেলার কথা ভুলিয়া যাওয়াই মঙ্গল। শৈশবের ক্ষত সারিয়া ওঠে শীঘ্রই, কিন্তু দাগ ঘুচে না।

ছুতার-গৃহিণী বলে, "যে দিনই ছেলেটা এ বাড়িতে পা দিয়েছে, সেই দিনই বুঝতে পেরেছি যে ও চোরের আড্ডায় মানুষ হয়েছে। ওর চারিদিকে চোখ। যখন কথা কইতে শেখেনি তখন থেকেই হাড়ে হাড়ে বজ্জাত, তখন থেকেই অবাধ্য। এই দেখলুম দিব্যি চুপচাপ করে ঘুমুচ্ছে—আর আমি যেই চোখ বুজিছি, অম্‌নি চৌকিদারের মতো চেঁচাতে আরম্ভ করেছে। হাড় পাজী, হাড় পাজী!"

হল্‌ম্যানদের যাহারা জানিত তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিত, "হল্‌ম্যানদের পক্ষে ছেলেটাকে আশ্রয় দিয়ে লাভ না থাক, ছেলেটার লাভ আছে। এমন ঘরে ঠাঁই পাওয়া ভাগ্যের কথা।" ছুতার-গৃহিণীর কর্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে মতভেদ ছিল না। এই ঝরঝরে, খরখরে, মাছের চোখের মতো চক্ষুবিশিষ্ট,

লম্বা ছিপছিপে স্ত্রীলোকটিকে দেখিলেই মনে হয়, ভাবের আতিশয্যে লাভ লোকসানের কথা ভুলিয়া যাইবার পাত্র সে একেবারেই নহে।

বার্বারা বৎসরে যে দুই-চারবার নিকোলাকে দেখিতে আসিত—(এখন তাহার পক্ষে ইহার বেশী আসা দুর্ঘট, কারণ ভীর্গ্যাং-পরিবার এখন প্রায়ই শহরের বাহিরে বাহিরে হাওয়া খাইয়া বেড়ায়)—প্রত্যেক বারেই সে দেখিতে পাইত, নিকোলা ক্রমশঃ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া না উঠুক অন্ততঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় আছে। সে যতক্ষণ হল্‌ম্যানের বাড়ি থাকিত, ততক্ষণই কেবল নিকোলার একগুঁয়েমি এবং দুষ্টুমির ইতিহাস ছুতার-গৃহিণীর মুখে শুনিত। টিন-মিস্ত্রীর ঘরে থাকিয়া, অকেজো টিনের চাদরের মতো নিকোলার স্বভাবটা নাকি একেবারে বাঁকিয়া তেউড়িয়া গিয়াছে।

সে বেশ হাঁটিতে পারে, অথচ কেমন যে স্বভাবের দোষ—এখনো হামা দিয়াই চলিবে। এদিকে আবার, হল্‌ম্যান-গৃহিণী একটু পাশ ফিরিয়াছে কি অমনি একটা-না-একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে! হয় জল ঘাঁটিতেছে, নয় পেয়ালা সান্‌কির গোছা ধরিয়া টানিতেছে, না হয় সদরে ঘণ্টার দড়িটা ছিঁড়িয়া রাখিয়াছে। বিড়ালের খাবার প্রায়ই তো বাটিসুদ্ধ উল্‌টাইয়া রাখে। কাজেই বাধ্য হইয়া বেতগাছটাকেও নীচু করিয়া চোখের সামনে ঝুলাইয়া রাখিতে হইয়াছে। কারণ এখন হইতে ভয় না দেখাইলে এ ছেলে একেবারে দুর্দান্ত হইয়া উঠিবে। পরের ছেলে মানুষ করিয়া তোলা যে কি বিষম ব্যাপার তাহা অন্ততঃ বার্বারার বুঝিতে পারা উচিত।

মনে যতই ব্যাথা লাগুক, বার্বারা এ সমস্ত কথার কোনো জবাব খুঁজিয়া পাইত না। কাজেই সে ছুতারের ঘরে, নিজের ছেলেকে দেখিতে আসিয়াও, বেশীক্ষণ বসিতে চাহিত না। অপ্রিয় কথা উঠিলেই ছুতা করিয়া নিজেই উঠিয়া পড়িত। হল্‌ম্যানদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার এক বিষয়ে একটু উপকার হইয়াছিল। সে অনেক চোখা চোখা কথা শিখিয়াছিল ; বর্তমান মনিবের সঙ্গে কোনো কারণে বনিবনাও না হইলে, তাহার পক্ষেও যে বলিবার কথা অনেক আছে, ছুতার-গৃহিণীর দৃষ্টান্তে সে তাহা বেশ ভাল করিয়াই শিখিয়াছে।

এদিকে নিকোলার বয়স বাড়িতে লাগিল, কিন্তু একগুঁয়েমি কমিল না।

হল্‌ম্যান-গৃহিণীর মুষ্টিপ্রয়োগের সঙ্গে সময়ে সময়ে হল্‌ম্যানকেও যোগ দিতে হইত। সে বেচারা সহজে এই দুশ্চিকিৎসায় রাজী হইত না ; গৃহিণীর গঞ্জনা যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত, কেবল তখনি নিঃসহায় নিকোলার পৃষ্ঠে দুই-চারিটা চড়-চাপড় মারিত। এ কাজটা ক্রমশঃ গৃহিণীর গৃহকর্মের অন্তর্গত বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। সুতরাং নিকোলার নিগ্রহ হল্‌ম্যানের অভিধানে গৃহিণীর গৃহকর্মের সহায়তার নামান্তর হইয়া পড়িল।

হল্‌ম্যান লোকটি নিরীহ, অল্পভাষী। সে রোজ সকালে কাজে যাইত এবং বৈকালে মন্থরগতিতে বাড়ি ফিরিত। দরজার কাছে আসিয়া, জুতা ঝাড়িয়া, কেমন যেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বাড়ি ঢুকিত। নিজের বিবাহিত-জীবন সম্বন্ধে তাহার যে কি ধারণা, তাহা হল্‌ম্যানের মুখ দেখিয়া বুঝিবার জো ছিল না। তবে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, গৃহিণী হিসাবে শ্রীমতী হল্‌ম্যান একখানি অমূল্য রত্ন, উহাকে মাথায় করিয়া রাখিলেও উহার যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয় না।

গরীয়সী গৃহিণীর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নিত্য-নিয়ত ভাবিতে ভাবিতে বেচারা হল্‌ম্যানের বুদ্ধিশুদ্ধি প্রায় লোপ পাইবার মতো হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ এ বিবাহে যে এই রকম হওয়াটাই স্বাভাবিক—গৃহের শান্তিরক্ষার পক্ষে অনিবার্য, তাহা দু'জনেই বেশ জানিত। শ্রীমতী হল্‌ম্যানকে একবার দেখিলেই কিংবা একবার উহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিলেই এ ব্যাপারটা বোঝা শক্ত হইবে না। হল্‌ম্যান নিজের রোজগারের টাকায় সংসার চালায় অথচ কেমন করিয়া এমন হয় ইহার মধ্যে এইটুকুই বোঝা কঠিন।

পত্নীভাগ্য যাহার এমন অনন্যসাধারণ, সে যে মাঝে মাঝে বেএক্তার অবস্থায় বাড়ি ফেরে—এই ব্যাপারটাই পাড়ার লোকের কাছে আবার সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ।

নিকোলাকে পালন করিবার ভারগ্রহণের কয়েক বৎসরের মধ্যেই হল্‌ম্যান ছুতারের ঘরে এক দৈবঘটনা ঘটিল, বুড়া বয়সে ছুতার-গৃহিণী একটি কন্যা সন্তানের জননী হইল। সুতরাং পরের ছেলেকে আর বেশীদিন ঘরে স্থান দেওয়া উচিত কিনা, ইহা লইয়া স্ত্রীপুরুষে তর্ক চলিতে লাগিল। শেষে নিয়মিত মাসহারার মোহই জয়ী হইল। স্থির হইল, নিকোলা যেমন ছিল

তেমনি থাকাই ভাল; তাহাকে খুকীর সেবায় লাগানো যাইবে। সে বসিয়া থাকে,—না হয় খুকীর দোলার দড়িটা ধরিয়া মাঝে মাঝে দোল দিবে। খুব হাল্কা কাজ, ছোট ছেলেদের ঠিক উপযুক্ত কাজ, একটু শিখিলেই বেশ পারিবে। কিন্তু ছুতার-গৃহিণীর এই ন্যায্য আশাও ঠিক পূর্ণ হয় নাই। এই হাল্কা কাজেও নিকোলার গাফিলি। গৃহিণী কার্যান্তরে যাইবার সময় নিকোলাকে দোলার কাছে রাখিয়া যাইত কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিত, নিকোলা জানালায় দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া রাস্তায় ছেলেদের খেলা দেখিতেছে। সময়ে সময়ে বেচারা দরজা খোলা রাখিয়া একেবারে রাস্তায় নামিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এমন ব্যাপারও ছুতার-গৃহিণী দেখিয়াছে। এমন অসাবধান! লক্ষ্মীছাড়া পরের ছেলেটার হাড় কয়খানা গুঁড়াইয়া না দিলে উহার চৈতন্য হইবে না।

নিকোলার আর্ত চীৎকারে অতিষ্ঠ হইয়া যখন উপরতলার ভাড়াটিয়াদের ঝি মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা, আজ আবার কি হয়েছে? ছেলেটা অমন ক'রে কাঁদছে কেন?" তখন ক্ষণকালের জন্য হাত বন্ধ রাখিয়া ছুতার-গৃহিণী মুখ খুলিয়া দিল। সে বলিল, "পরের কথা, পরের দরদ তাহার ভাল লাগে না; অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। পরের জ্বালায় সে জ্বালাতন, সে হতভাগাটাকে ঘরে বন্ধ রাখিয়া দেখিয়াছে, উহাকে খাইতে না দিয়া দেখিয়াছে, বকিয়া দেখিয়াছে, মারিয়া দেখিয়াছে, কিছুতেই ছোঁড়া বাগ মানে না। কোনো কাজের ভার দিয়া যদি নিশ্চিন্ত হইবার জো আছে। যে একগুঁয়ে সেই।"

ইহার পর ছুতার-গৃহিণী এক নূতন ফিকির আবিষ্কার করিল। সে নিকোলাকে ভূতের ভয় দেখাইয়া দোলা ছাড়িয়া যাইতে বারণ করিয়া দিল। সে বলিয়া রাখিল, "ত্যাখ, ঐ মশারির চালে শয়তান বসে আছে, তুই কি করিস্ না করিস্, দোলা ছেড়ে উঠিস্ কি না উঠিস্, সে সব দেখতে পায়।"

বেচারা ছেলেমানুষ ভয়ে আর হাত পা নাড়িতে পারিত না। বাতাসে মশারি নড়িলেই, তাহার মনে হইত শয়তান মাথা তুলিয়া তাহাকে দেখিতেছে। মাঝে মাঝে বাহিরের কলরবে সে জানালায় না গিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু যেমনি শয়তানের কথা মনে পড়িত, অমনি এক দৌড়ে নিজের জায়গায় গিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকিত।

যখন দোলা দিবার প্রয়োজন ফুরাইল, তখন নিকোলা হল্‌ম্যান-কন্যা উর্সিলাকে খেলা দিবার এবং চোখে চোখে রাখিবার চাকরি পাইল। এদিকে কিন্তু রাস্তায় পা দিবার হুকুম ছিল না। হল্‌ম্যান-গৃহিণী আগে হইতে খুব শাসাইয়া রাখিয়াছে; নিকোলা এখন আর সাহস পায় না। সে গৃহিণীর নিষেধ না মানিয়া দেখিয়াছে, নিকোলা ঠেকিয়া শিখিয়াছে। এখন তাহার পক্ষে নিষেধ মাত্রেই লোহার বেড়ি এবং বেতের বেড়ার সমান হইয়া উঠিয়াছে। গণ্ডীর বাহিরে পা দেওয়া তাহার চক্ষে এখন সকলের চেয়ে গুরুতর পাপ। শ্রীমতী হল্‌ম্যানকে ধন্যবাদ! এই রকম না করিলে ছেলেটা কোন্ দিন বিপদ ঘটাইয়া বসিত; রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মত্ত হইয়া অসাবধানে মেয়েটাকে এতদিন হয় গাড়ি চাপা দিয়া, নয় তো সরকারী কুয়ায় ডুবাইয়াই মারিত।

উর্সিলা যে তাহার নিজের চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর জীব, নিকোলার এই রকম একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। উর্সিলাকে লোকে এক চোখে দেখে, নিকোলাকে দেখে আর এক চোখে; ইহা সে বরাবর দেখিয়াছে।

যদিও উর্সিলার জন্য সে অনেক সহ্য করিয়াছে, তবু কতকটা—বোধ হয় উহার জন্য অতটা সহিয়াছে বলিয়াই—উর্সিলাকে নিকোলার আপনার বলিয়া মনে হইত। উর্সিলার উপর উহার একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। কথাটা নূতন ঠেকিতে পারে, কিন্তু কথাটা খাঁটি। উর্সিলার সকল ভার যে তাহারই উপর ন্যস্ত, এই ভাবটা ক্রমশঃ তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, সে উহাকে আশ্চর্য রকম ভালবাসিত; শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত বলিলেও ভুল হয় না। যখন হল্‌ম্যান-গৃহিণী উর্সিলাকে নীল রঙের ঘাগরা এবং ফুলদার টুপি পরাইয়া দিতেন, তখন নিকোলার মুখে হাসি ধরিত না। নিকোলা ক্ষুদ্র উর্সিলার কোনো কথায় 'না' বলিতে পারিত না। উর্সিলার হুকুম সে হল্‌ম্যান-গৃহিণীর হুকুমের চেয়ে কম জরুরী মনে করিত না। উর্সিলা মুঠি মুঠি ধূলা নিকোলার মাথায় দিত, নিকোলা হাসিয়া কুটিকুটি হইত। এইরূপ খেলিতে খেলিতে বালিকা বাহানা করিয়া জুতা জামা খুলিয়া দিতে বলিত। যদি নিকোলা তাহার কথা শুনিয়া খুলিয়া দিত, তবে বাড়িতে তাহাকে প্রহার খাইতে হইত। আর যদি না দিত, তবে উর্সিলা কাঁদিয়া-কাটিয়া এমনি অনর্থ করিত যে, তাহাকে অকারণে কাঁদানোর অপরাধে নিকোলা সেই প্রহারই লাভ করিত

নিকোলা অনির্ভরের উপর ভর করিয়াছিল, সংশয়ের মাঝখানে বাস করিতেছিল। সে চোরকুঠরির দিকে এমনি ভয়চকিত ভাবে চাহিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, ঐ জিনিসটা নজরে পড়িলেই, কোনো দোষ না করিলেও নিজেকে তাহার দোষী বলিয়া মনে হইত। তাহার বাল্য-জীবন এই ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

ছুতার-গৃহিণী বলিত, "ও যে পাজী তা' ওর চোখ দেখেই বোঝা যায়।" কথাটা মিথ্যা নয়, পাছে কিছু অন্যায় করিয়া ফেলে এই ভয়ে নিকোলার দৃষ্টি সদাই শঙ্কিত।

শাস্ত্রে বলে, "সৎপ্রতিবেশী ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান।" বর্তমান যুগে প্রতিবেশীই নাই, তা সৎ আর অসৎ। আমরা কেহ কাহারও প্রতিবেশী নই। নীচের তলার ভাড়াটিয়া উপর তলার ভাড়াটিয়াকে চিনে না, এ বাড়ির লোক ও বাড়ির লোকের খোঁজ রাখে না। সুতরাং নিকোলার নির্যাতনে কেহ বড় একটা কথা কহিত না। প্রতিবেশীর নূতন পিয়ানো-শিক্ষা যেমন করিয়া বরদাস্ত করা যায়, ইহারা তেমনি করিয়া নিকোলার চীৎকার সহ্য করিত। এমন হতভাগা ছেলেকে যে শুধরাইবার অন্ততঃ চেষ্টাও হইতেছে, এজন্য হয়তো কেহ কেহ বা মনে মনে খুশীই ছিল। নিকোলা ও উর্মিলা এক সঙ্গে বাড়ির সম্মুখে ফুটপাথের উপর পায়চারি করিত; লোকে উর্মিলাকে বন্ধুভাবে 'গুড্ মর্ণিং' বলিত; কিন্তু নিকোলাকে ঐ রকম কিছু বলা তাহারা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করিত।

হল্‌ম্যানেরা যে বাড়িতে ভাড়াটিয়া ছিল, রাঁধুনী মারীন্ সম্প্রতি ঐ বাড়ির একটা ঘরে উঠিয়া আসিয়াছে। সে ধর্মিষ্ঠা ছুতার-গৃহিণীর কর্তব্যনিষ্ঠ চরিত্রের কোনো খবর রাখিত না, সুতরাং সে এমন একটা কাজ করিয়া বসিল, যাহা শ্রীমতী হল্‌ম্যানের মতে অনধিকার চর্চা। মারীন্ অনভিজ্ঞ সুতরাং তাহাকে মার্জনা করিলেও করা যাইতে পারে।

স্থূলাঙ্গী মারীন্ একদিন সন্ধ্যাবেলায় লণ্ঠন হাতে কাঠকয়লা কিনিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বোঝাই নৌকার মতো হেলিয়া-দুলিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে, এমন সময় সিঁড়ির নীচে অন্ধকার চোরকুঠরির দিক হইতে একটা কান্নার আওয়াজ তাহার কানে পৌছিল। তাহার মনে হইল, যে লোকটা

ফোঁপাইতেছে, তাহার কাঁদিয়া কাঁদিয়া যেন গলা ধরিয়া গিয়াছে, আর যেন স্বর বাহির হইতেছে না, যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। ক্ষীণকণ্ঠের ভাঙা আওয়াজে মারীনের মন গলিয়া গেল, সে স্থির থাকিতে না পারিয়া লণ্ঠনের আলোকে শব্দের অনুসরণ করিয়া চোরকুঠরির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রুদ্ধদ্বারের দিকে ঝুঁকিয়া মারীন্ জিজ্ঞাসা করিল, "ভিতরে কে গা? ঘরের ভিতর কে কাঁদে?"

হঠাৎ কান্নার শব্দ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

মারীন্ দরজায় ধাক্কা দিতেই ভিতর হইতে একটা চীৎকারধ্বনি উঠিল। মারীন্ আলো নামাইয়া শিকলটা খুলিয়া ফেলিল।

"আরে! এই অন্ধকারে এমন জায়গায় এই কচি ছেলেটাকে কে শিকল দিয়ে গেছে?" লণ্ঠনের আলোকে মারীন্ দেখিল, নিকোলা সভয়ে তাহারই দিকে ক্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছে।

"ও! তুমি! মারীন্! আমি বলি শয়তান। শয়তান অমনি করে দরজায় ধাক্কা দেয়!"

"তোর 'ভুতুড়ে' কথা রাখ্ বাছা! এখনো আমার বুকের ভিতর কাঁপছে।"

"আমাদের গিন্নী বলে, তাই বল্‌ছি।" হঠাৎ নিকোলা ঔৎসুক্যের সঙ্গে মারীন্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, গিন্নী যা' বলে সে কি সব সত্যি? না, আমি চিনির ঠোঙায় হাত দেব বলে আমায় ঐ সব বলে ভয় দেখায়?"

"ও! তাই বুঝি তোকে আট্‌কে রেখেছে?"

"না গো না, আমি চুরি করিনি; কিছু নিলেও বলে চুরি করিছি, না নিলেও বলে চুরি করিছি। এইবার থেকে সব খেয়ে-টেয়ে শেষ করে রাখব। দেখ না, এই দেখ না, সেদিন কাঁচের বাটির ঢাকনিতে একটুখানি চিনি লেগেছিল, সেইটুকু আমি জিবে দিইছিলুম, তা' আমাকে ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দিলে। এইবার থেকে লুকিয়ে সব শেষ করে রাখব, মজা দেখতে পাবে।" নিকোলা রাগে গনগন করিতে করিতে বলিল, "সব খেয়ে রাখব, চুরি করে খেয়ে রাখব, টেরটি পাবে।"

হঠাৎ মারীনের কাপড় ধরিয়া নিকোলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো তুমি থাক, তুমি যেয়ো না, আমার অন্ধকারে বড় ভয় করে; অন্ধকার হলেই শয়তান আসবে, যেয়ো না। থাক।"

মারীন্ ভারী মুশকিলে পড়িল, সে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; নিকোলাকে ছাড়িয়া দিতে তাহার সাহস হইল না। সে নিকোলার হইয়া না হয় ছুতার-গৃহিণীকে দু'কথা বলিবে।

নিকোলা বলিল, "না, না, তুমি কিছু বল্‌তে যেয়ো না, তাহলে আবার আমায় মারবে।"

তবে আর উপায় কি? মারীন্ এই কচি ছেলেকে অন্ধকারে একলা ফেলিয়া যাইতে পারিবে না। সুতরাং ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া সে নিকোলাকে বলিয়া ফেলিল, "আচ্ছা, তবে আয় আমার সঙ্গে আজ রাত্তিরটা আমার ঘরেই ঘুমুবি; কেমন?"

এবার নিকোলা হল্‌ম্যান-গৃহিণী কি বলিবে সে বিষয়ে চিন্তা না করিয়াই একেবারে দুই হাতে মারীনের বস্ত্রপ্রান্ত চাপিয়া ধরিল। মারীন্ নিকোলাকে লাংবোটের মতো পিছনে বাঁধিয়া মন্থরগতিতে জাহাজের মতো বন্দরে ফিরিল।

তোরঙ্গ খুলিয়া মারীন্ তাহার পুরানো গরম কাপড়গুলি বাহির করিয়া, বেঞ্চির উপর বিছাইয়া নিকোলাকে শুইতে দিল। আনন্দে বালক তাহার সকল দুঃখ ভুলিয়া গেল। তাহাকে এমন যত্ন কেহ কখনো করে নাই।

তাহা ছাড়া এই রাঁধুনীর ঘরের দেয়ালে কত নূতন জিনিস, কত চকচকে টিনের বাসন। আবার একটা বিড়ালও আছে, এ বিড়ালটাকে সে কতবার দেখিয়াছে, কিন্তু এ যে মারীনের তাহা সে জানিত না। সে গুড়ি মারিয়া বিড়ালটাকে ধরিতে গেল। ঐ যা, টেবিলে ধাক্কা লাগিয়া কেট্‌লিটা উল্‌টিয়া পড়িয়া গেল। ভয়ে নিকোলা ঘর ছাড়িয়া পালায় আর কি! কিন্তু কি আশ্চর্য! মারীন্ তো তাহাকে ধমক দিল না, মারিতেও গেল না। এ ভারী আশ্চর্য! নিকোলা ঐ চকচকে টিনের বাসনগুলা দেখিয়াও এত আশ্চর্য হয় নাই, মারীনের ঘরে বিড়ালটাকে দেখিয়াও না।

বাতের ব্যথায় অনেকক্ষণ ধরিয়া এপাশ-ওপাশ করিয়া অবশেষে মারীন্ ঘুমাইয়া পড়িল। সহসা একটা চীৎকার-শব্দে সে জাগিয়া উঠিল।

"কি? কি? কি হয়েছে? নিকোলা! নিকোলা!" মারীন্ তাড়াতাড়ি পোড়া বাতির মুড়াটুকু জ্বালিয়া দেখে, নিকোলা উঠিয়া বসিয়া হাত পা

ছুড়িতেছে। ঝাঁকানির চোটে ঘুম যখন ভাল করিয়া ভাঙিল, তখন বেচারা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "ওরা আমায় কাট্‌তে এসেছিল।"

নিকোলাকে ঠাণ্ডা করিয়া বাতি নিবাইয়া, পুনর্বার ঘুমের আয়োজন করিতে করিতে মারীন্ ভাবিতেছিল, তাহার যে সন্তান হয় নাই সে জন্য সে খুব খুশী আছে, মাথার উপর কোনো ঝুঁকি নাই। তবে একটা না একটা জ্বালা মানুষ মাত্রেরই আছে, এই দেখে না, যার সন্তানের জ্বালা নাই সে বাতের ব্যথায় কষ্ট পায়।

পর দিন সকালে যখন হল্‌ম্যান-গৃহিণী মারীন্‌কে তাহার অনধিকারচর্চার জন্য বাড়িসুদ্ধ লোকের সম্মুখে দশ-কথা শুনাইয়া দিল, তখন মারীন্ অপরাধীর মতো একেবারে চুপ করিয়া রহিল! নিকোলার দৌরাত্ম্যে হল্‌ম্যানদের প্রত্যেককে প্রত্যহ যে কি যন্ত্রণা ভুগিতে হয় এবং কি জন্য যে উহাকে প্রতিদিনই শাস্তি দিতে হয়, হল্‌ম্যান-গৃহিণী তাহা এমনি করিয়া বর্ণনা করিল যে কাহারো আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। শ্রীমতী হল্‌ম্যান সব সহিতে পারে, কেবল সংসারের বিশৃঙ্খলা সহিতে পারে না, বেচাল দেখিতে পারে না! তাহার কাছে থাকা সত্ত্বেও কাহারও অশিষ্ট স্বভাব ঘোচে নাই—এর চেয়ে নিন্দার কথা সে কল্পনাও করিতে পারে না।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় নীচের তলায় কাঠ কাটিতে কাটিতে মারীন্ যখন হল্‌ম্যানদের ঘর হইতে নিকোলার কান্নার শব্দ শুনিতে পাইল, তখন আর তাহার উপরে যাইতে পা উঠিল না। যতক্ষণ কান্নার শব্দ শুনিতে পাইল, ততক্ষণ বেচারা নীচেই রহিল। সে এমন করুণ কান্না আর কখনো শুনিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। শাস্তি, সুবিচারের ফলেই হোক্ আর অবিচারের ফলেই হোক্, মারীন্ কান্না সহিতে পারে না।

ক্রমশঃ মারীনের ঘর নিকোলার আশ্রয়ের বন্দর হইয়া উঠিল। শাসনের ঝড়ে সে অনেক সময় এইখানে লুকাইয়া বাঁচিয়া যাইত। সে ইঁদুরটির মতো এককোণে বসিয়া ছুরি দিয়া কাঠের ছোট ছোট নৌকা কুঁদিত। হল্‌ম্যানকে টিফিন খাওয়াইতে গিয়া সে প্রায়ই এই সব অকেজো কাঠের টুকরা কুড়াইয়া আনিত।

নিকোলার শিশু-জীবন যে নিছক নিরানন্দেই কাটিয়াছে, একথা বলিলে

কিন্তু একটু অত্যুক্তি হইবে। নিকোলা হল্‌ম্যান-গৃহিণীর কাছে যেমন প্রহার খাইয়াছে, মাঝে মাঝে তেমনি প্রশংসাও পাইয়াছে। অবশ্য সে প্রশংসা ঠিক তাহার নিজের প্রশংসা নয়, তাহার নৈতিক উন্নতির জন্য ছুতার-গৃহিণী স্বয়ং যে কি পরিশ্রমটাই করিয়াছেন তাহারি প্রশংসা।

ছয় মাস অন্তর নিকোলার খরচের জন্য হল্‌ম্যান-পত্নীকে কৌঁসুলী সাহেবের বাড়ি যাইতে হইত। নিকোলা কি ছিল এবং তাহার যত্নে কি হইয়া উঠিয়াছে, সে বর্ণনাটাও সেই সময়েই হইত। কৌঁসুলী সাহেবের যে গাড়িখানা করিয়া হাটের জিনিস যাইত, মাঝে মাঝে নিকোলাও সেইটাতে চড়িয়া মা'র সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার ছুটি পাইত।

যেদিন সে মা'র কাছে যাইত, সেদিন পূর্বাহ্ণে, হল্‌ম্যান-গৃহিণী তামার পাত্র যেমন তেঁতুল দিয়া, বালি দিয়া মাজিয়া ঘষিয়া লাল করিয়া তোলে, তেমনি নিকোলাকেও মাজিয়া ঘষিয়া লাল করিয়া তুলিত। সে যতক্ষণ গাড়িতে থাকিত গাড়োয়ানকে প্রশ্নের উপর প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তুলিত। সেদিন আর তাহার মুখের একদণ্ড বিশ্রাম থাকিত না। সকলের চেয়ে কৌঁসুলী সাহেবের কালো ঘোড়াটাই নিকোলার কাছে কৌতূহলের সামগ্রী ছিল। সেইটেই সাহেবের সব চেয়ে ভাল ঘোড়া? না, ইহার চেয়েও ভাল ঘোড়া আছে? সেকি রেলগাড়ির চাইতে জোরে চলে? না, রেলগাড়ি তার চেয়ে জোরে চলে? সে কাহার চাইতে এবং কিসের চাইতে আগে যাইতে পারে?···ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর গাড়ির মোড় ফিরিয়া একেবারে কৌঁসুলী সাহেবের রন্ধনশালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত। ইশ! ঘোড়াটা কি শীঘ্রই দৌড়ায়।

তারপর একজন চাকর আসিয়া নিকোলাকে ঘরের পর ঘরের ভিতর দিয়া তাহার মা'র কাছে লইয়া যাইত।

"ওরে, ওর জুতোয় কাদা, জুতোয় কাদা; বলি, তোদের কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই? ওকে ঐ কাদা পায়ে এখানে এনে হাজির করেছিস্?" বার্বারা নিকোলাকে উঁচু করিয়া তুলিয়া একেবারে একখানা চৌকির উপর বসাইয়া দিল। রুটি, মাখন, দুধ প্রভৃতি খাইতে দিয়া বার্বারা চলিয়া গেল; যাইবার সময় বলিয়া গেল, "খাওয়া হলে এইখানে স্থির হয়ে বসে থেকো, আমি এখন লিজি আর লাড্‌ভিগের কাপড়ে সাবান দিতে চল্লুম।"

বার্বারা যাইতে না যাইতে লাড্‌ভিগ্‌, লিজি নিকোলার কাছে হাজির; বয়সে নিকোলা তাহাদের সমান। তাহারা নিকোলার সঙ্গে খেলিতে আসিয়াছে, মেয়েটির দুই হাতে দুইটা বড় বড় পোশাক-পরা পুতুল। ছেলেটি একটা মস্ত কাঠের ঘোড়া দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া আনিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা ঘরের চারিদিকে ঘোড়দৌড় আরম্ভ করিয়া দিল। লাড্‌ভিগ্‌ ঘোড়ায় চড়িয়া বসিল, নিকোলা তাহার ঘোড়ার দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল। অনেকবার টানিয়া শেষে নিকোলা নিজে একবার চড়িতে চাহিল, লাড্‌ভিগ্‌ নামিতে রাজী হইল না। নিকোলা দড়ি ফেলিয়া রাগ করিয়া লাড্‌ভিগের একটা পা ধরিয়া উহাকে ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল।

"হতভাগা, ঝি'র ছেলে, তোর এত বড় আস্পর্ধা?" "ঝি'র ছেলে? তুমি ঝি'র ছেলে!" বলিয়া নিকোলা লাড্‌ভিগ্‌কে যেমন ধরিতে গেল, অমনি সে ছুটিয়া খাটের পিছনে দাঁড়াইয়া বালিশ ছুড়িতে লাগিল। গোলমাল শুনিয়া বার্বারা ছুটিয়া আসিল এবং নিকোলাকে খুব খানিক বকিয়া শেষে বলিল, "লিজি-লাড্‌ভিগ্‌ যা বলে তাই শুনবি, বুঝিছিস্? ওরা হ'ল কৌন্সুলী সাহেবের ছেলে; ওদের গায়ে হাত তুলতে গিয়েছিস্? বুড়ো ছেলে লজ্জা করে না!"

তারপর লাড্‌ভিগ্‌কে কোলে বসাইয়া তাহার কোটের ধূলা ঝাড়িয়া আদর করিয়া বার্বারা বলিতে লাগিল, "এমন ছেলে কেউ দেখেনি! এমন ভাল ছেলে কি আর হয়? একটু বসো, বাবা আমার, মানিক আমার, দেখ দেখি, নূতন ইস্তিরি করা কলারটা একেবারে ভেঙে ছাই করে দিয়েছে। নিকোলা লাড্‌ভিগের জামাটা ধর, আমি ওর কলারটা বদলে দিই।"

বার্বারার আদরে খুশী হইয়া লাড্‌ভিগ্‌ মারামারির কথা ভুলিয়া গেল এবং নিকোলাকে তাহার গির্জায় যাইবার নূতন পোশাক দেখাইবার জন্য বার্বারাকে দেরাজ খুলিতে বলিল।

নিকোলা অবাক হইয়া লাড্‌ভিগ্‌ ও লিজির জামা কাপড় দেখিল, কত রকমের পুতুল দেখিল, বাজনা দেখিল, ছবি দেখিল। দেরাজ বন্ধ করিবার সময় বার্বারা বলিল, "ওরা আমার লক্ষ্মী বলে, শান্ত বলে এই সব পেয়েছে।"

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া নিকোলা ভাবিতে লাগিল, "এরা নিশ্চয়ই খুব—খুব ভাল, সেই জন্যে এত সব খেলবার জিনিস পেয়েছে, আর সেই জন্যে"… নিকোলার চক্ষে জল আসিতেছিল, "আর সেই জন্যে আমার মা আমার চাইতে এদেরি বেশী ভালবাসে।" নিকোলার মন দমিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে তিনটা বাজিয়া গেল, কৌশুলী সাহেবকে কাছারী হইতে আনিবার জন্য যে গাড়ি শহরে যাইবে,. নিকোলাকে সেই গাড়িতে পৌছাইয়া দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। বার্বারা নিকোলাকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে লিজি লাড্ভিগ্ও গেল। "শান্ত হয়ে থাকিস নিকোলা, বুঝিছিস, দৌরাত্ম্যি করিস নে। হল্ম্যানরা যা বলে শুনিস। দেখ, দেখ, অমন করে পা ঠুকছিস কেন, গাড়ির বার্নিস যে সব চটে যাবে। কোথায় পা রাখলে, দেখ, ওরে গদিতে যে কাদা লাগবে। ওরকম চুলবুল করিসনে, যতক্ষণ গাড়িতে যাবি, চুপ করে বসে যাবি, নড়িস-চড়িসনে, বুঝিছিস? লাড্ভিগ্ কেমন, লিজি কেমন, ওরা তো তোর মতোন নয়, কেমন গাড়িতে বসে যায়; না লাড্ভিগ্? না লিজি?" গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল।

দিনটা ভালই কাটিয়াছিল, উপরন্তু আসিবার সময় নিকোলা একখানা বড় 'কেক্' উপহার পাইয়াছিল, সেটা খাইতেও চমৎকার, কিন্তু গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিবার কিছুক্ষণ পরে নিকোলা চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সে সারাটা পথ কেবল কাঁদিল।

তার পর দিন সকালে নিকোলা যখন উর্সিলাকে বাড়ির সম্মুখে টহলাইতেছিল, তখন হল্ম্যান-গৃহিণী বাড়িওয়ালীকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিতেছিল তাহার কিছু কিছু নিকোলার কানে গেল।

"ভাল বলতে হয় বইকি, খুব ভাল; আমরা গরীব; বলতে গেলে, আমাদের পাঁচ পাতের কুড়িয়ে খেতে হয়, তাই আমরা ঠাঁই দিইছি। ভদ্রলোকের পক্ষে খুব আশ্চর্যি, নিজের ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে বসতে দাঁড়াতে দেওয়া খুবই আশ্চর্যি। ছোঁড়ার ভাগ্যি; নইলে কোথাকার কে তার ঠিক নেই; বাপ নাকি বিবাগী হয়ে গেছে; ভগবান জানেন। লোকের কাছে তো মা'র পরিচয়েই ওর পরিচয়।"

পথের ধারে একটা মুরগীর মাথা পড়িয়াছিল, রাগে অপমানে নিকোলা

সেটা জুতা দিয়া এমনি করিয়া মাড়াইল যে, সেটা একটা ডবল পয়সার মতো চেপ্টা হইয়া গেল।

ভূতের ভয় দেখাইয়া যখন আর কাজ হাসিল হইত না, তখন হল্‌ম্যান-গৃহিণী নিকোলাকে পাঠশালায় পাঠাইবার ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। উহার ধারণা পাঠশালাই ছেলে 'ঢিট্‌' করিবার একমাত্র প্রকৃষ্ট স্থান।

নিকোলার এ সম্বন্ধে ধারণাটা বেশ স্পষ্ট ছিল না। যে ভাবে কথাটা পাড়া হইত, তাহাতে জায়গাটা যে অভাবনীয় রকম ভয়ানক, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না।

শেষে সত্যই তাহাকে ইস্কুলে পাঠানো ঠিক হইয়া গেল। আগামী সপ্তাহে তাহাকে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইবে।

বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি,—নিকোলা গণিয়া দেখিল মোটে আর চারটি দিন বাকী। এই কয়দিন সে উর্মিলাকে—তাহার আদরের সিলাকে—একদণ্ডও কাছ ছাড়া করিবে না। দেখিতে দেখিতে কয়টা দিনই কাটিয়া গেল, এখন তাহার হাতে আছে কেবল রবিবারের সন্ধ্যাটা।

চায়ের সময় নিকোলা সিলার মুখে শুনিল যে, সে ইস্কুলে যাইবার দিন এক স্যুট নূতন কাপড় পাইবে। কথাটাতে সে যেন একটু সান্ত্বনা লাভ করিল। সে রাত্রে ঐ কথা ভাবিতে ভাবিতে বেচারা ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে কিন্তু নিকোলাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

হল্‌ম্যান-গৃহিণী কত খুঁজিল, উদ্দেশে কত লোভ দেখাইল, কত ভয় দেখাইল, কিন্তু কোনো মতেই নিকোলার সাড়া পাওয়া গেল না ; সে একেবারে অন্তর্ধান করিয়াছে।

রন্ধন শেষ করিয়া মারীন্‌ ঘরে ঢুকতে গিয়া হঠাৎ নিকোলাকে তাহার তক্তপোশের তল হইতে বাহির হইতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। শেষে চিনিতে পারিয়া সে উহাকে কিছু খাইতে দিল এবং হল্‌ম্যানদের কাছে ফিরিয়া যাইতে বলিল। নিকোলা কিন্তু অন্ধকার হইবার আগে ফিরিতে কিছুতেই রাজী হইল না।

যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন নিকোলা গুটিগুটি বাহির হইয়া পড়িল। নদীর কিনারা দিয়া চলিতে চলিতে একখানা খালি নৌকা তাহার চোখে

পড়িল ; সে সেইটার উপর চড়িয়া বসিল এবং সেটাকে খানিকক্ষণ দোলাইল। তারপর হেমন্তের কুয়াশার ভিতর দিয়া আসিয়া বান্-হাউসের তারের বেড়ায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া দূর হইতে তাহার অনেক দিনের বাসগৃহের দিকে তাকাইয়া রহিল। হল্‌ম্যান দোকান হইতে ফিরিয়া আসিল এবং অভ্যাস মতো একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঘরে ঢুকিল, ঘরে আলো জ্বালা হইল, মিনা শুইতে গেল ; নিকোলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিতে লাগিল। সেই অন্ধকার বাড়ির আলোকিত ক্ষুদ্র জানালা তাহার কাছে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির রক্তচক্ষুর মতো ভয়ানক বোধ হইতেছিল। ঐখানে তাহার অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তি উদ্যত হইয়া আছে, তাহা যেন সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল।

তাহার পর আলো নিবিয়া গেল।

সেই দিন গভীর রাত্রে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে, বান্-হাউসের চৌকিদার লণ্ঠন লইয়া সদ্য-নামানো স্তূপাকার মালের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে আরাম করিতে গেল। সে নিকোলাকে দেখিতে পাইল না। অথচ বালক সম্মুখেরি কয়েকটা বস্তার আড়ালে—যেখানে জল-কাদার দিনে ব্যবহার্য কয়েকখানা তেরপল এবং লম্বা তক্তা জমা করা ছিল—সেইখানে লুকাইয়া হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছিল।

নিকোলা ঘুমাইয়া আপনাকে ভুলিয়াছিল, সব দুঃখ ভুলিয়াছিল, সে এক রকম নির্বাণ লাভ করিয়াছিল। এখন তাহার কাছে ইস্কুলের ভয় নাই, হল্‌ম্যান-গৃহিণীর ভয় নাই,—সে এখন সকল ভয়ের অতীত ; কারণ সে একে বালক, তাহার উপর সে নিদ্রাতুর।

এই একদিনের অভিজ্ঞতায় নিকোলা বুঝিল যে হল্‌ম্যানের বাড়ির বাহিরেও তাহার আশ্রয় আছে। এখন হইতে সে এই কালো কালো তেরপলগুলিকে বন্ধুর চক্ষে দেখিতে লাগিল। হল্‌ম্যান-গৃহিণীর তাড়াইয়া দিবার ভয় এবং তাড়নার ভয় তাহার কাছে আর আগেকার মতো ভয়ংকর রহিল না।

সে যাহা হউক, ইস্কুলে তাহাকে ভর্তি হইতে হইল, কিন্তু সেখানে ছুতার-গৃহিণী-বর্ণিত বধমঞ্চের মতো প্রহারমঞ্চ বলিয়া কোনো জিনিস যে নাই, ইহা জানিয়া সে আশ্বস্ত হইল।

নূতন বুট জুতায় পা ঢোকানো যেমন কষ্টকর, প্রথম প্রথম নিকোলার কাছে লেখাপড়া শেখাও তেমনি কষ্টকর বোধ হইয়াছিল।

অনেক জিনিস সে বুঝিত, অনেক জিনিস বুঝিত না। যাহা সে না বুঝিত, তাহা হাজার বুঝাইলেও বুঝিত না। বরং উল্টা হইয়া যাইত, মাথার ভিতর সমস্ত গোলমাল হইয়া যাইত, কান্না আসিত। সে কেবল পিছাইয়া পড়িত, আবার ছুটির পর বন্ধ থাকিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া কোনো রকমে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত। নিকোলার সহপাঠীদের মধ্যে অধিকাংশই কিন্তু বেশ ভাল ছেলের মতো সব মুখস্থ করিয়া ফেলিত। হায়! সবাই তাহার চেয়ে ভাল!

শাস্তিই পাক আর পড়াই না পারুক্, বাড়ির চেয়ে নিকোলার ইস্কুলই ভাল লাগিতে লাগিল। বাড়িতে তাহার সন্ধ্যাটা আর কাটিতে চাহিত না; বিশেষ, সে পড়া করিতেছে কিনা দেখিবার জন্য হল্‌ম্যান-গৃহিণী তাহার কাছেই চোখ পাকাইয়া বসিয়া থাকিত; সুতরাং সে সাহস করিয়া একটি বার সিলার দিকে চাহিতেও পারিত না, কথা কওয়া তো দূরের কথা।

হল্‌ম্যানের কথা ছাড়িয়া দাও, সে কিছু দেখিয়াও দেখিত না, শুনিয়াও শুনিত না। সে সেল্‌ভিগের দোকানে একটি চমৎকার ঔষধের সন্ধান পাইয়াছিল; উহারই গুণে সে শ্রীমতী হল্‌ম্যানের সমস্ত তিরস্কার অক্লেশে পরিপাক করিতে সমর্থ হইত।

সে প্রত্যহ কাজ সারা হইলেই সেল্‌ভিগের দোকানে গিয়া হাজির হইত, কিন্তু ঘড়ির কাঁটা সাতটার কাছাকাছি হইলেই একেবারে দড়ি-ছেঁড়া হইয়া বাড়িমুখো ছুটিত। মদের দোকানে আসিয়াও হল্‌ম্যান ঘড়ি ধরিয়া চলিত বলিয়া অন্যান্য মাতালেরা উহাকে 'মিলিটারী ম্যান্' ও 'হু-কাম-দার' বলিয়া ঠাট্টা করিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মারামারির ফলাফল

গ্রামার স্কুলের গলি যেখানে বোর্ডিং স্কুলের রাস্তায় মিশিয়াছে, সে মোড়টি কোনো ছেলের পক্ষেই সুবিধার জায়গা নয়। এই জায়গাটাতে দুই স্কুলের ছেলেদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি বাধিয়া যাইত।

লাড্‌ভিগ্‌ ভীর্গ্যাং, সীলের চামড়ার দপ্তর পিঠে ফেলিয়া এই পথ দিয়াই ইস্কুলে যায়। তাহার মাথা ছোট, ঘাড় লম্বা, নাক বাঁকা, চলনভঙ্গী অদ্ভুত; ছেলেরা তাহার নাম রাখিয়াছিল উটপাখী। ইস্কুলের পথে নিকোলার সঙ্গে তাহার প্রায়ই দেখা হইত, কিন্তু সে তাহাকে দেখিয়াও দেখিত না। নিকোলাও শিস দিতে দিতে, জুতার ঠোক্করে পথের বরফ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যাইত।

নিকোলার সহপাঠীরা মিলিয়া তক্তা জুড়িয়া জুড়িয়া অনেক দিনের পরিশ্রমে একখানা ঠেলাগাড়ি তৈয়ার করিয়া তুলিয়াছিল। ইস্কুলের ছুটির পর উহারা প্রায়ই আনন্দে চীৎকার করিতে করিতে সকলে মিলিয়া ঐ গাড়িটাকে রাস্তায় রাস্তায় টানিয়া লইয়া বেড়াইত। একদিন এমনি হুড়াহুড়ি করিয়া গাড়িটা মোড় ফিরাইতেছে, এমন সময়ে নিকোলার সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া ভিন্ন ইস্কুলের ছাত্র লাড্‌ভিগের হাত হইতে পেনসিলের ঠুঙিটা পড়িয়া গেল। কলম, উড্‌ পেন্সিল, শ্লেট পেন্সিল রাস্তাময় ছড়াইয়া পড়িল। "কুড়িয়ে দে কুকুর, কুড়িয়ে দে", বলিয়া লাড্‌ভিগ্‌ নিকোলাকে এক ধাক্কা দিল।

নিকোলা জবাব না দিয়া আল্‌গা বরফের উপর জুতার ঠোক্কর মারিল।

"এখনো বলছি কুড়িয়ে দে; নইলে আজই বাবাকে ব'লে তোকে ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা করবে; তুই যে এই সব বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াদের সর্দার হয়ে উঠেছিস, সে কথাও বলে দেব।"

"উটপাখীর নাকটা ধরে নেড়ে দেব নাকি?"

"একবার দেখনা দিয়ে! আমরা টাকা দিই, তবে খেতে পাস্‌, তা জানিস! আবার চোট! মার খাইয়ে মাপ চাইয়ে তবে ছাড়ব। যার বাপের নেই খোঁজ তার আবার চোট। রাস্তার কুকুর! ঝি'র ছেলে!"

শেষ কয়টা কথা লাড্‌ভিগের মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে নিকোলা রাগে পাগলের মতো হইয়া দুই হাতে ঘুষি বৃষ্টি করিতে লাগিল। সে বংশগত বৈষম্য ও অবস্থার তারতম্য কয়েক মিনিটের জন্য একেবারে ভুলিয়াছিল। "ডাক না এইবার বাপকে ডাক। বাপ-মা যে-যেখানে আছে সব্বাইকে ডাক।"

নিকোলার সহপাঠীরা এই দিনটাকে তাহাদের ইস্কুলের ইতিহাসে একটা

স্মরণীয় দিন বলিয়া মনে করিত, কারণ ঐ দিনে লাড্‌ভিগের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ইস্কুলের সকল ছেলেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়াছিল। এমন কি মারামারির পরদিনেও, টিফিনের সময়ে, তাহারা সকলে মিলিয়া, যে গ্যাস-পোস্টের কাছে মারামারি হইয়াছিল, সেইখানকার বরফে উটপাখীর নাক কাটিয়া রক্ত পড়িয়াছে কিনা, তাহারাই চিহ্ন খুঁজিতে আসিয়া জটলা পাকাইয়া তুলিয়াছিল।

নিকোলা ইস্কুলের ছেলেদের কাছে দিগ্বিজয়ীর সম্মান পাইলেও ঘরে যে তাহার জন্য ভিন্ন রকমের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা আছে, একথা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। ভীর্গ্যাংদের বাড়ি হইতে হল্‌ম্যানদের কাছে এতক্ষণ আর খবর আসিতে বাকী নাই।

বাড়ি যতই নিকট হইতে লাগিল, নিকোলার গতি ক্রমশঃ ততই মন্থর হইতে লাগিল। শেষে, তাহার সঙ্গীদের মধ্যে যে ছেলেটি সব চেয়ে তাহাদের পাড়ার কাছে থাকে, সেও যখন বাড়ি পৌঁছিল, তখন নিকোলা হঠাৎ রাস্তার মধ্যে একবার থামিয়া, এদিক-ওদিক চাহিয়া, যে গলির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, সেটা তাহার বাড়ি যাইবার রাস্তাই নয়।

এইবার লইয়া নিকোলা তিন রাত্রি বাড়ির বাহিরে কাটাইল। শ্রীমতী হল্‌ম্যান চৌকিদারকে ঠিক এই কথাই বলিতেছিলেন। এজন্য যদি সে পুলিশের হাতে ঠেঙানি খায় তো ভাল বই মন্দ হয় না। ভদ্রলোকের ছেলের গায়ে হাত তোলা! তাও আবার যে-সে নয় কৌঁস্থলী সাহেবের ছেলে!—যাদের অন্নে জীবন!

আচ্ছা, এই বরফ, এই ঠাণ্ডা—ছোঁড়াটা গেল কোথায়? বান-হাউসের খোলা চত্বরে, হাজার তেরপল মুড়ি দিলেও তো এ শীত মানিবার নয়! নিকোলার গুপ্ত কেল্লার সন্ধান চট্ করিয়া বলিয়া ফেলা মোটেই সহজ কথা নয়। কারণ, সে বাড়ির এত কাছে লুকাইয়াছিল যে, সে জায়গায় তাহার খোঁজ করিতে গেলে নিজের জামার পকেটগুলাও একবার খুঁজিয়া হাতড়াইয়া দেখিতে হয়।

মরিবার ভয় থাকিলেও পতঙ্গ যেমন বাতি ছাড়িয়া দূরে যাইতে পারে না, নিকোলাও তেমনি মার খাইবার ভয় সত্ত্বেও বাড়িরই কাছে লুকাইয়া ছিল।

হল্‌ম্যান-গৃহিণীর গঞ্জনার ভয়ে সে বাড়ি গেল না, সিলার কাছ ছাড়া হইয়া বেশী দূরে যাইতেও তাহার মন সরিল না।

সেই রাত্রে শুইয়া শুইয়া নেশার ঝোঁকে হল্‌ম্যানের কেবলি মনে হইতে-ছিল—নিকোলার ব্যাপারটা কেমন যেন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। বাহিরে বরফ গলিয়া রাস্তায় জল জমিয়াছে, মাঝে মাঝে সেই জল ভাঙিয়া লোক চলিতেছে। হল্‌ম্যানের মনে হইতেছিল সেই গতিবিক্ষুব্ধ জল কেবলি বলিতেছে, নি—কো—লা! নি-ই-কো-ও-লা-আ!

বেচারা ছেলেমানুষ! ব্যায়রামে পড়িবে দেখিতেছি।

সমবেদনার আকস্মিক উত্তেজনায় হল্‌ম্যান কম্বল ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। ছেলেটা গেল কোথায়? হুঁ! পোড়ো আস্তাবলে যে ভাঙা গাড়িখানা কাপড়-ঢাকা পড়িয়া আছে—তাহার ভিতর নাই তো!

হল্‌ম্যান বাহির হইয়া পড়িল।

নিকোলা অঘোরে ঘুমাইতেছিল। যখন সে জাগিল, তখন হল্‌ম্যান তাহার জামার কলার ধরিয়া বিড়াল ছানার মতো উঁচু করিয়া তুলিয়াছে।

নিকোলা যে মুহূর্তে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারিল, সেই মুহূর্তেই অবস্থাটা বুঝিয়া লইল এবং ব্যাপার বুঝিয়া একেবারে সটান হইয়া শুইয়া পড়িল। সে পা ছুড়িতে লাগিল এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিছুতেই সে বাড়ি যাইবে না; মারিয়া ফেলিলেও না।

নিকোলা এমনি ক্ষেপিয়াছিল এবং পা ছুড়িতেছিল যে, তাহার কথায় সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্রও অবসর ছিল না।

হল্‌ম্যান উহাকে একবার বাড়ির ভিতর পুরিতে পারিলে হয়, চাবুকের চোটে সিধা করিবার লোক দরজায় দাঁড়াইয়া আছে।

হল্‌ম্যান-গৃহিণী লণ্ঠন হাতে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারি আলোকে সে দেখিল, নিকোলার ক্রুদ্ধ চোখ আগুনের মতো জ্বলিতেছে, তাহার কচি মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া উঠিয়াছে।

"যার ঘর নেই তার ঘরে দরকারও নেই, ছেড়ে দাও বলছি ছেড়ে দাও"—বলিতে বলিতে রোরুদ্যমান নিকোলা হঠাৎ এক ঝট্‌কায় হলম্যানের হাত ছাড়াইয়া, তীরের মতো ছুটিতে ছুটিতে ফটক পার হইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নিকোলার দুঃখ যে কেবল মাড্‌ফিশের মাকে বাধিয়াছিল তাহা নয়, উহা বার্বারার বুকেও বাজিয়াছিল। কিন্তু যখন সে শুনিল, নিকোলা হল্যান্ডের ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এবং শীঘ্রই তাহাকে 'সাংঘাতিক' নামে জেলেদের জেলে পাঠাইবার কথা উঠিয়াছে, তখন সে পূর্ণবেগে কান্নাকাটি জুড়িয়া দিল। সে জেলের জন্যে অনেক দুঃখ সহিয়াছে, কিন্তু এ ধাক্কা সে সামলাইতে পারিবে না ; জেলে জেলে গেলে সে বাঁচিবে না। মনির ঠাকুরানীকে বলা করিতেই হইবে, নিকোলার এ দুর্গতি সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিবে না। বার্বারা জোরজবর্দস্তি করিয়া কাজ করে নাই, প্রাণ দিয়া খাটিয়াছে। মাড্‌ফিশ, নিজেকে নিজের মতো করিয়া মানুষ করিয়াছে। তাহার এ অনুরোধ রাখিতেই হইবে। নইলে, কি যে ঘটিবে, বার্বারা কি যে করিবে তাহা সে নিজেই জানে না ; হয়তো তাহাকে বাধ্য হইয়া এ চাকরি ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বার্বারা কাঁদিয়া কাটিয়া বাড়িশুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া তুলিল। ছেলেরা পর্যন্ত তাহার কাছে ঘেঁষিতে সাহস পায় না।

এই রকম কান্নার পালা প্রায় একদিনের অধিক স্থায়ী হইত না, কিন্তু এবার তিন-চার দিনেও থামিল না। বাড়িশুদ্ধ লোক বিরক্ত। জোর্ড্যান-গৃহিণীর মাথার অসুখ চাগিয়া উঠিল। অসুখের সময়ে তিনি গোলমাল সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রায় সাধারণতঃ ঘুমাইলেই তাঁহার মাথা পরিষ্কার হইয়া যাইত।

এই রকম অসুখের সময় বার্বারাই গোলমাল থামাইয়া বেড়াইত, গৃহিণীর মহলে চৌকিদারী করিত, কিন্তু আজ সে নড়িল না ; নিজের ঘরে একলাটি বসিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

আজ, এই অসুখের সময়ে মনির ঠাকুরানী যে একবারও বার্বারাকে ডাকিলেন না, ইহাতে সে মনে মনে একটু বিস্ময় বোধ করিতেছিল। আবার স্বয়ং মনিবও যে তাহার মেজাজ বুঝিয়া চলিতেছেন, ইহা ভাবিয়া সে একটু খুশীও হইয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল, জোর্ড্যান-গৃহিণী উঠিলেন না। কৌশলী সাহেব বাড়ি আসিলে মাথায় শাল জড়াইয়া নিজেই প্রদীপ জ্বালিলেন বার্বারাকে ডাকিলেন না। মানসিক উত্তেজনায় তাঁহার গলার আওয়াজ কাঁপিতেছিল।

করিতে হাঁপাইয়া উঠিতে না পারিলে বাবাজীর যে এ বাড়িতে চাকরি থাকা পোষাইবে না, এ কথা কৌশল্যা-গৃহিণী স্পষ্টাক্ষরে বাবাজীকে পূর্বাহ্নেই জানাইয়া রাখিতে চান।

বাবাজীর হাত-পরিষ্কারের জন্যই বাড়িতে খরচ বেশ বাড়িয়াছে। ছেলেদের মুখ চাহিয়া এতদিন গৃহিণী সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, কোনো কথায় কথা কহেন নাই,—কর্তাও সে কথা জানেন,—কিন্তু আর বরদাস্ত করা যায় না। তা' ছাড়া ছেলেরাও বড় হইয়া উঠিয়াছে, এখন বাবাজীকে ছাড়াইয়া দিলেও ক্ষতি নাই। গৃহিণীর মতে, এই সুযোগে বাবাজীকে বরখাস্ত করাই যুক্তিসঙ্গত, ছেলেদের আর দরকার নাই।

সুতরাং এ বাড়ি হইতে শীঘ্রই যে বাবাজীর অন্নজল উঠিবে, সে কথা তাহাকে সকলে অতঃপর জানাইয়া দেওয়া হইল। কৌশল্যা-গৃহিণীর বন্ধু ও আত্মীয়দের সকলেই একবাক্যে এই পাকা চালের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সেকেলে মানুষ বাবাজীকে যে আর বেশীদিন আটকে রাখা চলিবে না, এ কথা তাঁহারা আগে হইতেই জানিতেন।

বিস্মিত হইল কেবল বাবাজী, বজ্র-গর্জন-বিদ্যুতের মতো বাক্যবাণীর অর্থ গ্রহণ করিতে তাহার বেশ একটু দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইল। সে—কৌশল্যা বাড়ির বাবাজী—নিমি আর কিনুর বাবুর্চীটা—সে না হইলে একদণ্ড চলে না—সে নিমি আর কিনুকে ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে? তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে? বাবাজীর ইহা বিশ্বাস করিতে দেরি লাগিল।

বাবাজী একটু গম্ভীর হইয়া উঠিল। বিনা অপরাধে যে তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে, ইহা সবাই বুঝুক,—উহার গম্ভীর হইবার কারণ অনেকটা এই রকম। ইহাতে কিন্তু ফল হইল না, গৃহিণী ঠাকুরাণী গলিলেন না। বাবাজী মনে মনে বুদ্ধির অবশ হইয়া গেল। ইহার পর সে কত মিনতি করিল, কত কাঁদিল, কিন্তু নিষ্ঠুরহৃদয়া কৌশল্যা-গৃহিণীর ঐ এক কথা, ছেলেরা বড় হইয়াছে, এখন আর তাহাকে প্রয়োজন নাই। বাবাজী ছেলেদের অনেক করিয়াছে, সেজন্য গৃহিণী, কর্তাকে বলিয়া মাহিনা বিদায়ের পূর্বে তাহাকে কিছু পারিতোষিক দেওয়াইয়া দিলেন।

বাবাজী চলিল, সে শহরে যাইবার নাম করিয়া এক বেলার ছুটি চাহিয়া

বার্বারা মনে মনে ঠিক করিল, এবার অন্যত্র চাকরি লইবার পূর্বে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া লইবে। সে কিছুদিন গাঁয়ে গিয়া থাকিবে। চৌদ্দ বৎসর বেচারী কেবল পরের জন্য খাটিয়া মরিয়াছে।

বিদায়ের দিনটা এতদিন তাহার কাছে ভারী ভয়ানক হইয়াই ছিল; কিন্তু কাটিল সহজেই। ঠিক সেই দিনেই ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি কৌঁস্থলী সাহেবের নিমন্ত্রণ। গৃহিণী এবং ছেলেমেয়েদের যাইতে হইল; সুতরাং গাড়িতে উঠিবার সময়ে, বার্বারার বিদায়গ্রহণ ব্যাপারটা সংক্ষেপেই সমাপ্ত হইয়া গেল।

গাড়ি চলিয়া গেল; লিজির লোমশ কোমল পোশাকের স্পর্শ হাতে জড়াইয়া বার্বারা দরজার কাছে অনেকক্ষণ একা দাঁড়াইয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গুপ্ত সাক্ষাৎ

বাড়ি ফিরিবার পূর্বে, যেন কতকটা সাহস সঞ্চয় করিবার জন্যই হল্‌ম্যান-ছুতার প্রত্যহ যথাসময়ে সেল্‌ভিগের দোকানে গিয়া হাজির হইত। বোতল খুলিয়া নিয়মিত মাত্রা চড়াইলেই তাহার মুখখানা ভাবহীন নির্জীব মুখোশের মতো হইয়া উঠিত; মনের অশান্তি এবং চোখের অস্থিরতা বিন্দুমাত্রও আর প্রকাশ পাইত না। গৃহিণীকে ঘরে আনিয়া অবধি বেচারা দিন দিন যেন জড়ভরত হইয়া পড়িতেছিল, কোনো বিষয়েই সে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারিত না। ক্রমশঃ গৃহিণীর কথায় সে উঠিতে-বসিতে লাগিল। এইরূপ হীনতার মধ্যে তাহার সকল গ্লানি ভুলিবার ঔষধ হইয়াছিল মদ।

তাড়াতাড়ি কয়েক পাত্র নিঃশেষিত করিয়াই হল্‌ম্যান দার্শনিকের মতো গম্ভীর হইয়া পড়িত। তাহার দৃষ্টি নিশ্চল, মন চিন্তামগ্ন। সে কি যে ভাবিত তাহা কেউ জানে না। হল্‌ম্যানের অন্তরঙ্গেরা বলে, দাম্পত্য-জীবনের সুখ-দুঃখ বিচারই উহার চিন্তার একমাত্র বিষয়। কার্যকারণের এত বাঁধাবাঁধি সত্ত্বেও, কোন্ কর্মফলে দস্তুরমতো সংসারী হইয়াও সে সারাটা সন্ধ্যা সেল্‌ভিগের দোকানে কাটাইয়া যায়, ইহাও একটা ভাবনার কথা বটে।

প্রতি সপ্তাহের শেষে শনিবার বৈকালে একটি লম্বা ছিপছিপে মেয়ে,

একখানা ফর্দ এবং একটা চুপড়ি লইয়া হল্‌ম্যানের দোকানে আসিত এবং হল্‌ম্যান বাড়ি না পৌঁছানো পর্যন্ত উহার সঙ্গ ছাড়িত না। মেয়েটি সিলা।

হল্‌ম্যান হপ্তার রোজগার পকেটস্থ করিয়া, দোকানের ঝাঁপ ফেলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িত। মেয়ের সঙ্গে কিছু দূর চলিয়াই তাহার গতি মন্থর হইয়া আসিত, শেষে সেল্‌ভিগের দোকানের কাছে আসিয়াই, "দেখ, একটা জিনিস ফেলে এসেছি, দাঁড়াও, এখুনি আস্‌ছি", বলিয়া সিলাকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া হল্‌ম্যান মাতালের দলে ভিড়িয়া যাইত।

"এখুনি" যে কতক্ষণ, তাহার আন্দাজ সিলা প্রতি শনিবারেই পাইয়া থাকে ; সুতরাং সেও বিলম্ব না করিয়া লোহার কারখানার দিকে চলিয়া যায় এবং এখুনির মেয়াদ ফুরাইবার আগেই যথাস্থানে আসিয়া হাজির হয়।

শরৎকালের অপরাহ্ণ। পুলের উপর দিয়া কলের মজুর এবং কারিগরেরা দলে দলে বাসায় ফিরিতেছে—কাহারো সঙ্গে স্ত্রী, কাহারো সঙ্গে ছেলে, কাহারো সঙ্গে মেয়ে। আজ বেতন পাইবার দিন ; এক সপ্তাহের রোজগার পাছে এক ঘণ্টায় উড়াইয়া দেয়, এই ভয়ে আপনার লোকেরা আজ তাহাদের চোখে চোখে রাখিয়াছে।

যে সব ফটকের ভিতর হইতে পিঁপড়ার সারির মতো লোক বাহির হইতেছে, সিলা তাহারি একটার মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানকার রাস্তার কাদা তেলচিটার মতো কালো, দুই পাশে লোহা-লক্কড়।

সিলা যেখানটাতে গিয়া দাঁড়াইল সেটা আনাগোনার পথ, পথের এক পাশে একটা প্রকাণ্ড রাবিশের স্তূপ। লোকের ভিড় আর কমে না, সিলাও পিছাইতে পিছাইতে ক্রমশঃ ঢিবির উপরে গিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে এখনো অনেকে মাহিনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সিলা উঁচুতে দাঁড়াইয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতেছে।

হঠাৎ নীচে হইতে কে বলিয়া উঠিল, "কি গো ভালমানুষের মেয়ে, বঁধুর খোঁজে নাকি ?"

ঠিক এই সময়ে নিকোলার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় সিলা আগ্রহে হাতের ফর্দ নাড়িয়া উহাকে ডাকিতে লাগিল, অসভ্য লোকটার কথায় কর্ণপাত করিল না।

নিকোলা বাহির হইয়া আসিল, সে এখনো হাত-মুখ ধোয় নাই, কারখানার কালিতে তাহার সর্বশরীর অপরিষ্কার।

"লোকটা সরে গেছে!"

"কে?"

"নাম তো জানিনে, চুলগুলো তামাটে, জামাটা নীল; বোধ হচ্ছে গ্রন্‌লীনে থাকে; আমায় বলে, "বঁধুর খোঁজে এসেছ নাকি?"

"বঁধু দেখিয়ে দিই একবার হাতে পেলে, পিটিয়ে লম্বা করে দিই বাছাধনকে। ছিঁড়ে—পিঁজে ফেলি—পুরানো কাছির মতোন—ওর ওই তামাটে চুলগুলো; আলকাতরায় ডুবিয়ে নিলে দিব্যি মশাল হবে।"

নিকোলা কটমট করিয়া চারিদিকে চাহিল, কিন্তু লোকটার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না।

হঠাৎ নিকোলার রাগ পড়িয়া গেল। সে সিলাকে বলিল, "এখন? রুটির দোকানে?"

আজ তাহার হাতে সপ্তাহের রোজগার, সুতরাং রুটির দোকানে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না।

নিকোলা খুব খাইল, খুব খাওয়াইল। বিশেষ, 'জ্যাম্' দেওয়া একরকম দামী 'কেক' কিনিতে উহার অনেক পয়সা খরচ হইয়া গেল। সে যে পয়সায় এ সপ্তাহে দুইটা গেঞ্জি কিনিবে মনে করিয়াছিল, তাহা আজ দুইজনে খাইতেই ফুরাইয়া গেল।

নিকোলা নিজে যে কেমন লায়েক ছোকরা হইয়া উঠিয়াছে তাহাও সিলার কাছে গল্প করিল। সে এ সপ্তাহে ছয়টা জাহাজী গজাল তৈয়ার করিয়াছে। শুধু পিটাইলেই হয় না; পিটাইতে হয়, তাতাইতে হয়, ঠিক মতো সময়ে বাঁকাইতে হয়, তবে হয়। অন্য ছোকরারা কাস্তে, কোদাল আর গাড়ির সাজ গড়িতে শিখিতেছে, নিকোলা তালা-চাবির কাজ, না হয় ঢালাইয়ের কাজ শিখিবে।

সিলা কিন্তু এসব কথায় তেমন কান দেয় নাই; গত রবিবারে বড় কারিগরের সঙ্গে নিকোলা বনভোজনে গিয়াছিল, তাহারই বর্ণনা শুনিতে সে উদ্‌গ্রীব। "খুব মজা হয়েছিল! না?" "হ্যাঁ হয়েছিল বইকি! খুব আমোদ,

খুব খাওয়াদাওয়া। অ্যাণ্ডার্সবার্গ লোকটি খাসা; মাসখানেকের মধ্যেই দোকান ক'রে ফেলবে, বিয়েও করবে।"

"আচ্ছা তোমাদের সঙ্গে সেদিন আর যে মেয়েরা ছিল, তারা কেমন? সবারি কি বিয়ের ঠিকঠাক হয়েছে?"

"হুঁঃ!"

"অ্যাঁ?"

"আরে ছ্যাঃ!"

"কেন? কি হয়েছে? আমাকে বলবে না?"

"তাদের আবার বিয়ে! আজ এর সঙ্গে মিশছে, কাল ওর সঙ্গে বেড়াচ্ছে। কোন ভদ্র কারিগরের সঙ্গে একঘরে ঘর করবার মতো তারা মোটেই নয়! আমি যখন কারিগর হব,—সিলা,—তোমার ফেরবার সময় হয়েছে—না? চল ফেরা যাক্।"

"কই? কোথায় সময় হয়েছে? তুমি জ্যামের পুর দেওয়া আরেকখানা কেক কিনে নিয়ে এস, লক্ষীটি,—এস নিয়ে!"

নিকোলা চট্ করিয়া আর একখানা 'কেক' কিনিয়া আনিল। "যেতে যেতে খাওয়া যাবে, কি বল সিলা? নইলে তোমারি দেরি হয়ে যাবে। আর তোমার মা যদি টের পান যে তুমি আমার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে এসেছিলে, তাহলে রক্ষে থাকবে না।"

"তাড়াতাড়ির কোনো দরকার নেই, সেল্‌ভিগের দোকান থেকে বাবার এখনো বেরুতে দেরি আছে"—বলিয়া সিলা অপ্রস্তুতভাবে ঢোক গিলিল। "মা যদি কিছু বলে তো বলব বাবার জন্যেই দেরি হয়েছে। তা' ছাড়া আজ শনিবার,—বলব—দোকানে যে ভিড় ফর্দ মিলিয়ে জিনিস কেনা দূরে থাক,—দোকানের কাছে ঘেঁষে কার সাধ্যি? এদিকে এখন যে রকম খাওয়া হ'ল, এতে রাত্তিরে আর খেতে পারা যাবে না। মাকে বলব, দোকানের ভিড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা ধরে ভারী অসুখ কচ্ছে, কিছু খেতে পারব না। যদি টের পায় তোমার কাছে এসেছিলুম, তাহলে যা চট্‌বে!—তুমি অমন গম্ভীর হয়ে উঠলে কেন?"

"দেখ দেখি, হক্-না-হক্ তোমাকে এই মিথ্যা কথাগুলো কইতে

হয়, প্রত্যহ কইতে হয়,—এর নাম শাসন! ওঁর সম্মুখে ভয়ে কারু সত্যি কথা কইবার জো নেই! ওঁর কাছে সত্যি কথা ব'লে সেটা বজায় রাখতে হলে যথেষ্ট মনের জোর এবং সঙ্গে সঙ্গে গায়ের জোরেরও দরকার, নইলে আমার মতোন মার খেয়ে মরতে হয় আর কি! আমার জন্তে ভয় করিনে, সে তো চুকে-বুকে গেছে। কিন্তু তুমিও যে ভয়ে ভয়ে সত্যি কথা বলতে সাহস পাও না, এ একেবারে অসহ্য! একটা বদ অভ্যাস জন্মে যাচ্ছে।"

সিলা হাসিয়া কথাটা হাল্কা করিয়া দিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু পারিল না। সে এ বিষয়ের আলোচনা ভালই বাসিত না, কারণ সে জানিত, নিকোলা যতই রাগ করুক, মিথ্যা না বলিলে সিলার জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিবে। মা'র সঙ্গে একটি দিনও বনিবে না।

"দেরি হয়ে যাচ্ছে, নিকোলা। চল, ও কথা পরে হবে এখন।"

পকেটে হাত রাখিয়া হাত গরম করিতে গিয়া হঠাৎ সিলার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল। সে দুই হাতে দুইটা পকেট হাঁতড়াইল, এদিক-ওদিক দেখিল, তাড়াতাড়ি বডিসের বোতাম খুলিয়া খুঁজিতে লাগিল।

"নিকোলা! আমার টাকা।" কাপড় ঝাড়া দিয়া পাগলের মতো এদিক-ওদিক চাহিয়া সিলা আবার বলিয়া উঠিল, "আমার টাকা! দু'খানা পাঁচ টাকার নোট আরো কী খুচরো জড়িয়ে বাবা আমার হাতে দিলেন, আমিও তখুনি পকেটে রেখেছি। কি হবে, নিকোলা? আমি কি করব?" সিলা কাঁদিয়া ফেলিল।

দু'জনে মিলিয়া কত খুঁজিল।

তাই তো! এতক্ষণ কাহারো খেয়াল হয় নাই! সিলা যখন রাবিশের স্তূপে দাঁড়াইয়া কাগজের ফর্দ নাড়িয়া নিকোলাকে ডাকিতেছিল, নিশ্চয় তখনই টাকাটা পড়িয়া গিয়াছে। ঐখানেই আছে, কোনো সন্দেহ নাই। কোনো ভয় নাই। তখন সবে চাঁদ উঠিয়াছে। ফিকা আলোয় আস্তিন্ গুটাইয়া নিকোলা অনেকক্ষণ খুঁজিল, তন্ন তন্ন করিয়া রাবিশ ঘাঁটিল। পুলের ধার পর্যন্ত খুঁজিয়া আসিল, তবুও টাকা পাওয়া গেল না।

এদিকে রাত বাড়িতেছে। বাড়িতে হয়তো সিলার খোঁজ পড়িয়াছে। সিলা আবার কাঁদিতে লাগিল।

নিকোলা ইহার পূর্বে তাহাকে দুই-একবার চুপ করিতে বলিয়াছিল, এবার কিন্তু সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সিলা, চল, জন্মের শোধ আর একবার একসঙ্গে জ্যামের পুর দেওয়া কেক খেয়ে দু'জনে মিলে জলে ঝাঁপ দিই। আর তাহলে কোনো ভয় থাকবে না।" প্রস্তাবটা তামাশাই হোক আর নাই হোক, সিলা ও কথায় কান দিল না। সে একখানা প্রকাণ্ড কাঠের কুঁদার উপর বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সতেরো বছরের ছেলে নিকোলা সমস্ত সপ্তাহের কালিঝুল মাখিয়া বিমর্ষভাবে আকাশপাতাল ভাবিতেছে। তাহার দৃষ্টি ছিল একটা কাঠের কুঁদার একটা ছিদ্রে। চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইতেছিল ছিদ্রটা অতবড় কাঠখানাকে অসার করিয়া ফোঁপরা করিয়া ফেলিয়াছে। সতেরো বছরের শিক্ষানবিস ভাবনার কোনো কূলকিনারা পাইল না। সিলারও কোনো উপায় হইল না।

সিলা উঠিল। চুপড়িটি লইয়া নতমুখে গৃহাভিমুখে চলিল। যতদূর যাইতে সাহসে কুলাইল, ততদূর পর্যন্ত নিকোলাও সঙ্গে সঙ্গে গেল। সে সিলাকে অভয় দিতে চেষ্টা করিল, বলিল, "ভয় কি? সত্যি তো আর মেরে ফেলবে না।" সিলা চুপটি করিয়া চলিয়া গেল।

সিলা চলিয়া গেলে নিকোলা পুলের উপর দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ উহার দিকে চাহিয়া রহিল। সিলা চলিয়াছে, অবনত মুখে মন্থরগতিতে। একবারও থামিল না, একবারও ফিরিয়া দেখিল না।

অন্ধকারে নিকোলা চুপি চুপি হল্‌ম্যানের জানালার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। সিলা ফোঁপাইতেছে।

হল্‌ম্যান-গৃহিণীর প্রশ্নের ধমকে সিলা স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে যে, সে নিকোলার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল! আর যায় কোথা? তবে তো টাকা হারাইবেই; আধ-পেটা খাইয়া যাহার দিন কাটে সেই হতভাগার সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা করিতে গেলে টাকা হারাইবে না তো কি? পেটের মেয়ে যখন এত নিষেধ সত্ত্বেও কথা শোনে না, তখন তো এ সব ঘটিবেই। নহিলে এত কষ্টের পয়সা কি কাৎলীর গরম জলের মতো ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যায়? ছোঁড়া ঐ তর্কেই ছিল, সুবিধা বুঝিয়া হাতাইয়াছে আর কি!

বাসায় ফিরিয়া দেখিল, তাহার সমস্ত জিনিসপত্র দেউড়িতে পড়িয়া আছে। বাসার ঝি আসিয়া কোনো কথা না বলিয়া তাহার হাতে একখানি কাগজ দিল। নিকোলা পড়িল, "তোমার ঘরে অন্য ভাড়াটিয়া আসিয়াছে। জিনিসপত্র উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাও।"

কেন যে তাহাকে উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে, সে বিষয়ে নিকোলা কোনো প্রশ্নই করিল না। তাহার সঙ্গে যে কেহ কথা কহিল না ইহাতেই সে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছিল।

এদিকে আবার কারখানায় যাইতে হইবে; সর্দারের কাছে, মিস্ত্রীদের কাছে আবার মুখ দেখাইতে হইবে,—নিকোলা লজ্জায়, সংকোচে মরিয়া যাইতেছিল। না জানি অ্যাণ্ডার্সবার্গ কি মনে করিতেছে।

নিকোলা ফিরিয়াছিল আর কি, কিন্তু ফিরিলে চলে কই। নিকোলা আবার বুক বাঁধিল, সোজা হইয়া শিস দিতে দিতে কারখানার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। হঠাৎ মোড় ফিরিয়া কারখানার ভুসো-মাখা রেলিঙে নজর পড়িতেই নিকোলার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম বাহির হইয়া পড়িল।

কামারশালায় ঢুকিয়াই সে কোনো দিকে না চাহিয়া ঝোড়ায় করিয়া কয়লা তুলিতে লাগিল। এখানেও কেহ তাহার সঙ্গে কথা কহিল না।

অ্যাণ্ডার্সবার্গ ঠিক সেই সময়ে আর একজন মিস্ত্রীর সঙ্গে মিলিয়া একখানা প্রকাণ্ড তপ্ত লোহা পিটাইতেছিল। সে হাতের কাজ সারিয়া খানিক পরে নিকোলার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "আমি জানতুম ঠিক খালাস পেয়ে যাবে; এই নাও, এই চাবি তিনটেতে উখো লাগাও দেখি।"

নিকোলা কাজ পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। অ্যাণ্ডার্সবার্গের হৃদ্যতায় সে আবার আগেকার মানুষ হইয়া উঠিয়াছে; ঠিক তেমনি আদর, তেমনি খাতির!

নিকোলা কাজে লাগিয়া গেল; কামারের কাজে যে এত গৌরব, এত আনন্দ তাহা নিকোলা পূর্বে জানিত না। সে মোটা উখা রাখিয়া দিয়া একেবারে সরু উখা লইয়াই কাজ শুরু করিয়া দিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই কেঠো-ফটকের নিরেট চাবিটা দেরাজের দামী চাবির মতো উজ্জ্বল

করিয়া তুলিল। নিকোলার উখার শব্দ হাতুড়ির শব্দকেও আজ ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

নিকোলার ঠিক পাশেই একজন মিস্ত্রী মাথাওয়ালা পেরেক তৈয়ার করিতেছিল, উহার হাপরে ছিল একজন ছোকরা। উহারা দুইজনে মিলিয়া আজ খুব হাসি-গল্প চালাইয়াছে। প্রথমে নিকোলা সে দিকে কান দেয় নাই, নিজের কাজেই ব্যস্ত ছিল; হঠাৎ মাথা তুলিয়া নিকোলা দেখিল ছোকরাটা নিকোলাকে লক্ষ্য করিয়া মুখভঙ্গী করিতেছে, নিকোলার চোখ কান অমনি সজাগ হইয়া উঠিল। সে বুঝিল যে, সে নিজেই উহাদের আলোচনার বিষয়।

জান্ পিটার এক-একবার হাপরের কাছে আসিয়া, এ কি বলিতেছে এবং ও কি ঠাওরাইতেছে তাহার খবর দিয়া যাইতেছে। এখন নিকোলা মোটামুটি সবই শুনিতেছে।

চিড়িয়াখানার পশু যেমন সকলের কৌতুকের বিষয়, নিকোলা আজ তেমনি—না, তাহারও অধম সে গাঁটকাটা,—অন্ততঃ তাহার সঙ্গীরা ইহাই ঠাওরাইয়াছে। এখন হইতে উহারা কেহই যে আর নিকোলাকে এক বাসায় জায়গা দিবে না, এ কথা নিকোলা স্পষ্ট বুঝিল। নিকোলার মনে হইতে লাগিল, উহারা যেন সকলে মিলিয়া নিকোলার হৃৎপিণ্ডটা হাতুড়ি দিয়া পিটাইতেছে, উখা দিয়া ঘষিতেছে। উহাদের হাসিতে বিদ্রূপ, চাহনিতে অবজ্ঞা। নিকোলা সব বুঝিয়াছে।

যে লোকটা পেরেক গড়িতেছিল সে হঠাৎ হাপরের ছোকরাটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "জানিস্ রে, ম্যাথিয়াস্! কামারের কাজ কষ্টের কাজ; এর চেয়ে একটা খুব সোজা কাজ আছে, রোজগারও খুব—তারে বলে পাঁচ আঙ্গুলের প্যাঁচ; সেইটে শিখে নে, বুঝিছিস্?" "হিঃ—হিঃ—হিঃ" ছোকরাটা হাসিয়া উঠিল।

"আর তা যদি না পারিস তো ঘাগরার পকেট মারার মতো চিমটে গড়াতে শেখ; শহরের যত মেয়ের পকেট মারবি, কেমন?"

লোকটার সঙ্গে নিকোলার চোখোচোখি হইল; লোকটা বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে দেখিয়া নিকোলা রাগে আগুন হইয়া উঠিল। তাহার মাথা গোলমাল হইয়া গেল, নিকোলা ঝাপসা দেখিতে লাগিল।

লোকটা পেরেক লইয়া মাঝে মাঝে নিকোলার পাশ দিয়াই আনাগোনা করিতেছিল। এবার যেমনি যাইবে অমনি নিকোলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রকাণ্ড একটা উখার ঘায়ে তাহাকে শোয়াইয়া দিল। পেরেকগুলা ছড়াইয়া পড়িল।

বিস্মিত কারিগরেরা মুহূর্তের মধ্যে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

ইতিমধ্যে নিকোলা একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি তুলিয়া লইয়াছে। সে একধার হইতে সকলকে শোয়াইয়া দিবে, তাহার নামে যাহারা মিথ্যা বদ্‌নাম দিতে সাহস করে, তাহাদের সকলকে সে একবার দেখিয়া লইবে।

কিন্তু কামারের দল তাহাকে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার মোটেই অবসর দিলে না। একজন পিছন হইতে উহার হাতুড়িটা কাড়িয়া লইল, তারপর প্রহার। প্রহারের চোটে নিকোলা সর্ষে ফুল দেখিতে লাগিল। মার, মার, মার, দল বাঁধিয়া মার, হাত বাড়াইয়া মার, হুম্‌ড়ি খাইয়া মার। এত বড় আস্পর্ধা হাতিয়ার তোলে, এখনই উহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হোক।

কোটের কাপড়ের সঙ্গে গায়ের মাংসসুদ্ধ মোচড়াইয়া ধরিয়া নিকোলাকে কারখানার বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইল। ফেলিয়া দিল অ্যাণ্ডার্সবার্গ, নহিলে বেচারা মারের ধমকে সেইখানেই মরিয়া যাইত।

কারখানার সঙ্গে নিকোলার সম্বন্ধ ফুরাইল।

সেদিন আর নিকোলা বাসা খুঁজিল না। তাহার চেহারা এবং পোশাকের দুর্দশা দেখিলে, তাহাকে এ অবস্থায় জায়গাও কেহ দিত কিনা সন্দেহ। তাহার উপর, কারখানায় সে যে কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে, ইহার পর কাহারো কাছে মুখ দেখাইতে তাহার সংকোচ হইতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিকোলা নিঃশব্দে বান্‌-হাউসের চত্বরে ঢুকিয়া পূর্বের মতো তেরপল মুড়ি দিয়া জীবনের আরেকটা রাত্রিযাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইল।

সে রাত্রে কিন্তু পূর্বের মতো সহজে ঘুম আসিল না। আকাশ ভরিয়া তারা উঠিয়াছে ; আর প্রহৃত, অবমানিত, নিরাশ্রয়, নির্দোষ নিকোলা তেরপলে শুইয়া মনে মনে আওড়াইতেছে—

"এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান,
সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেকার

নিকোলা এখন একেবারে বেকার।

সে কাজের জন্য কোনো লোহার কারখানাতেই উমেদারি করিতে গেল না। কারণ নিকোলা জানিত, একটা কারখানা হইতে যাহার অন্ন উঠিয়াছে, অন্য কোনো কারখানাতেই তার আর আশা-ভরসা নাই। কারিগরে কারিগরে আলাপ, সুতরাং খবর রটিতে বিলম্ব হয় না। এদিকে, সে যে-ছুতারের ঘরে রাত্রে মাথা গুঁজিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে, সেও আজ কয়দিন হইতে নিকোলার কারখানা ত্যাগের বিবরণ শুনিবার জন্য হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, যেন উহা না শুনিলে আর লোকটার ঘুম হইবে না। পরের কথায় অত মাথাব্যথা কেন বাপু?

নিকোলা জবাবদিহির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সরিয়া পড়িল।

ডকে—এত জাহাজ, এত বোঝাই খালাসের কাজ,—এ জায়গায় দশজনের উপর আর একজন বাড়িলে বেশ চলিয়া যাইবে, অথচ কাহারো বিশেষ ক্ষতি করাও হইবে না। আধপেটা খাইয়া, উপবাস করিয়া আর চলে না; নিকোলা শেষে সাহসে বুক বাঁধিয়া কাজের আশায় ঐ ডকেই গিয়া হাজির হইল।

সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, তাহার আগমনে মুটিয়ামহলে বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। খুব চালাক ছোকরা! চালাকির জোরে পুলিশের হাতে পড়িয়াও কেমন উদ্ধার পাইয়া আসিয়াছে! মুটিয়ারা সব জানে! এই শ্রেণীর লোকের চক্ষে পুলিশের হাত ফস্‌কাইয়া পলাইয়া আসাটাই সকলের চেয়ে বাহাদুরির কাজ। সুতরাং ইহাদের সমাজে নিকোলা একজন বাহাদুর বলিয়া সহজেই পরিচিত হইয়া উঠিল।

নিকোলাকে নিষ্কর্মা ফুর্তিবাজ ভাবিয়া প্রথম প্রথম মুটিয়ারা বেশ একটু খাতির করিত। শেষে যখন দেখিল যে জাহাজ আসিতেই ছোঁড়াটা উহাদেরি মতো যাত্রীদের ট্যাঙ্ক ঘাড়ে করিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে, তখন উহারা ভারী চটিয়া গেল। নিকোলার কি জেটিতে ঢুকিবার চাপরাশ আছে? না,

ছোকরা ভাবিয়াছে—পরের রুটিতে ভাগ বসান ভারী সহজ? ও যে কি রকমের লোক তাহা আর উহাদের জানিতে বাকী নাই।

নিকোলা মনে মনে জানিত যে, যখন কারখানা হইতে তাহার নাম কাটিয়া দিয়াছে, তখন জেটিতে ঢুকিবার চাপরাশ চাহিতে যাওয়া তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা; সুতরাং পেটের জ্বালা নিবারণ করিবার জন্ম, তাহাকে চোখ রাঙাইয়া এবং দরকার হইলে অন্য মুটিয়াদের সঙ্গে ঘুষোঘুষি করিয়াও মোট মাথায় তুলিতে হইবে; পয়সা রোজগার করিতে তো হইবেই। অন্য মুটিয়ারা গালিই দিক আর যাহাই বলুক, নিকোলা যে-মোট প্রথম ছুঁইয়াছে, সে মোট সে আর কাহাকেও ছুঁইতে দিবে না; সে কোনো কথায়, কোনো টিটকারীতে কান দিবে না, এ অবস্থায় নিকোলা বদ্ধকালা।

এদিকে, যেখানে একটা মোট, সেখানে দশটা মুটিয়া, সুতরাং এততেও নিকোলার পেট ভরিত না। কাজেই, সে লোকের বাড়িতে ভাঙা কুলুপ সারিয়া, দরজা জানলার কব্জা বদলাইয়া মাঝে মাঝে দুই চারি আনা উপরি রোজগার করিতে বাধ্য হইত। ইহাতেও কিন্তু কুলাইত না। বিশেষতঃ শীতকালে, আগুন পোহাইবার কাঠ কিনিতে গেলে পেট ভরিত না, আবার পুরা পেট খাইতে গেলে শীতে কষ্ট পাইতে হইত। নিকোলা এক বেলা খাইতে আরম্ভ করিল; রাত্রে সে খালিপেটে শুধু একটু মদ খাইয়া থাকিত। কি সুবিধা! মদ খাইয়া শরীরটা বেশ গরম হইয়া ওঠে, সুতরাং আগুন পোহাইবার কাঠের খরচাটা আর লাগে না; আবার পেটেও কিছু পড়ে, সুতরাং ক্ষুধাটাও তত প্রখর থাকে না। ভারী মজা!

এদিকে কিন্তু ভাবনার অন্ত নাই, সকালে উঠিয়াই আবার কাজের খোঁজে বাহির হইতে হইবে। হয় জেটিতে মোট বহা, না হয় এই শীতে বরফ কাটিয়া কাটিয়া লোকের দরজা খোলসা করিয়া দেওয়া। না আছে একটা ওভার-কোট, না আছে একটা আস্ত জামা। সম্বলের মধ্যে শুধু সেই কারখানার দরুন পোশাকটা।

আজকাল পথে-ঘাটে পুরানো কারখানার কোনো মিস্ত্রীর সঙ্গে দেখা হইলে নিকোলা অবজ্ঞার ভঙ্গীতে হাসিয়া উঠে, সে যে এখন উহাদের মতো কারো

তাঁবেদার নয়, সে যে এখন স্বাধীন, এইটাই যেন সে জোর করিয়া সকলকে জানাইতে চায়।

নিকোলা একদিকে যেমন কারখানার পথ মাড়ানো বন্ধ করিয়াছিল, অন্য দিকে তেমনি হল্‌ম্যানদের বাড়ির রাস্তা দিয়াও হাঁটিত না। কারণ যাহাই হোক, সিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তাহার আর মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

কারখানা হইতে মারপিট করিয়া যেদিন সে চলিয়া আসে, সেই দিন সিলার সঙ্গে তাহার শেষ আলাপ। সেদিনকার কথা নিকোলা ভুলে নাই। সেদিন সিলা যতক্ষণ এক সঙ্গে ছিল, ততক্ষণ যেন কেমন সন্ত্রস্ত, কেমন যেন আড়ষ্ট,—নিকোলা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। নিকোলা কাছে ঘেঁষিয়া আসিলেই সে তফাতে সরিয়া যায়, এদিক-ওদিক চায়। বাড়ির লোকের ভয়? না, তাহা তো নয়। হঠাৎ নিকোলার মাথা খুলিয়া গেল, সে বুঝিল, আজ সিলা তাহার সঙ্গে একত্র দাঁড়াইয়া কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিতেছে—বিশেষতঃ পথে, লোকের সম্মুখে। বুঝিতে পারিয়াই নিকোলা তাড়াতাড়ি 'গুড্‌বাই' বলিয়া সিলার কাছ হইতে যেন ছুটিয়া চলিয়া আসিয়াছিল।

তারপর সে সিলাকে যতবার দেখিয়াছে, ততবারই মনে হইয়াছে যেন সে বিষণ্ণ। নিকোলা বুঝিত, তাহার সঙ্গে মিশিতে সিলা উৎসুক। ইহাতে নিকোলা মনে মনে খুশী হইত; কিন্তু সিলাকে কাছে ঘেঁষিতে দিত না। কেক খাওয়াইবার পয়সা যাহার নাই, তাহার সঙ্গে আর ঘনিষ্ঠতা কেন?

যাহাদের কোর্তা তেমন পুরু নয় এবং সংখ্যাতেও খুব বেশী নয়, তাহাদের একজন চমৎকার বন্ধু আছে, তার নাম সূর্য। সে রোজ এমন হাজার হাজার শীতবস্ত্র বিতরণ করে,—তাহাকে বলে রৌদ্রের ওভার-কোট। সেই বন্ধুর দেখা পাইলে অসাড় হাত পায়েও সাড় ফিরিয়া আসে, খোরাকি রোজগারের আর ভাবনা থাকে না। পুরা সকালটা জেটিতে খাটিয়া নিকোলা রৌদ্রে দাঁড়াইয়া হাই তুলিতেছিল। হঠাৎ সে দেখিল, রৌদ্র নিবারণের জন্য মাথায় রুমাল বাঁধিয়া একটি ছিপছিপে মেয়ে দ্রুতগতিতে তাহারই দিকে আসিতেছে—এ আর কেউ নয়—এ সিলা।

সিলা তুঁতপোকার মতো বক্রগতিতে জাহাজ-ঘাটায় সদ্য আনীত মাছের ঝোড়াগুলার ভিতর দিয়া যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতেছে। সোৎসুক

দৃষ্টিতে সে একবার এদিকে চায়, একবার ওদিকে চায়। এইবার সে নিকোলাকে দেখিতে পাইয়াছে।

"নিকোলা! নিকোলা!" তাড়াতাড়িতে তাহার কথাগুলা মুখের মধ্যে জড়াইয়া যাইতেছে। "ভারী সুখবর! ভারী সুখবর! আমার সেই নীল জামাটাকে মেরামত করতে গিয়ে, তার অস্তরের ভিতর থেকে মা সেই হারানো টাকাগুলো পেয়ে গেছে, নোট টাকা সব ছিল—ওই অস্তরের পাশে পড়ে! আমি বাবাকে দোকানে খাবার দিতে এসেছিলুম, অমনি তোমাকেও তাড়াতাড়ি খবরটা দিয়ে যাচ্ছি। যাচ্ছি কারখানায়—তাদেরো সব বলতে হবে, মিছামিছি তোমার অপমান করেছিল। একি কেউ স্বপ্নেও জান্‌ত? ঠিক অস্তরের আর জামার কাপড়ের মাঝখানটিতে! আমি যে—আমি যে—কী খুশী হয়েছি তা বলে জানাতে পারি নে। মাকে যদি দেখতে—একেবারে মুখ গম্ভীর!"

নিকোলার মন গলিল না, সে অন্য দিকে চাহিয়াই বলিল, "আমার এতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তুমি তোমার মা-বাপকে এই কথা বলগে।" কথাটা সিলার কানে পৌঁছিবার আগেই সে কারখানার দিকে ছুটিয়াছে।

অবশ্য নিকোলারও তাহাতে আপত্তি ছিল না। দিক খবর কারখানায়, সে যে নির্দোষ সে কথা সকলে জানুক। তবে, অ্যাণ্ডার্সবার্গ এখন শহরের বাহিরে গিয়া দোকান করিয়াছে, সে আর কারখানায় নাই; নিকোলা অন্য মিস্ত্রীদের মতামতের বড় একটা তোয়াক্কা রাখে না। সে এখন স্বাধীন।

নিকোলা প্যাণ্টের পকেটে হাত পুরিয়া সাগরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কয়েকজন কুলিদের ছেলে সাঁতার দিয়া একখানা পাঁউরুটি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। পাঁউরুটিখানা নোনাজল খাইয়া ভারী হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় ডুবুডুবু।

হায়! সিলা যতই চেষ্টা করুক, নিকোলার সুনাম আর ফিরিবে না। একবার যাহাকে চোর বলা হইয়াছে, ঐ পাঁউরুটিখানার মতো নোনাজল ঢুকিয়া তাহাকে অব্যবহার্য করিয়া ফেলিয়াছে। যাক্,—সে তো আর কারখানায় কাজের উমেদারিতে যাইতেছে না; সে এখন স্বাধীন, কারো তোয়াক্কা রাখে না—"এই ছোঁড়ারা! ধর্‌তে পারলিনে পাঁউরুটি? তবে ছাখ কি করে ধরতে

হয় ; খেতে হবে কিন্তু তোদের,—বলে রাখছি।” বলিতে বলিতে নিকোলা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

হল্‌ম্যান-ছুতার সেল্‌ভিগের দোকানের পুরানো খরিদ্দার। সকলে তাহাকে চিনিত এবং সে যে টাকার মানুষ এমন ধারণাও অনেকের ছিল। সুতরাং সে ধারেও মদ পাইত ; হিসাব চলিয়াই আসিতেছিল। হল্‌ম্যান-গৃহিণী এ খবর মোটেই জানিত না। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, হল্‌ম্যান যখন পকেট খরচ বলিয়া প্রতি সপ্তাহেই কিছু পয়সা নিজের কাছে রাখিয়া থাকে, তখন মদ ভাঙ যাহা খায় ঐ পয়সাতেই খায়।

এক শনিবারে, অভ্যাসমতো হল্‌ম্যান দোকানে ঢুকিয়াছে, সিলা বাজারের চুপড়ি লইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। আজ সিলা বেশ একটু ফিটফাট। হঠাৎ তাহার মনে হইল, রাস্তার মোড়ে নিকোলার মতো কাহাকে যেন সে দেখিল, গত শনিবারেও তাহার ঐ রকম মনে হইয়াছিল।

কয় মাসের মধ্যে নিকোলার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিবারও সুযোগ সে পায় নাই।

সিলা দ্রুতপদে মোড়ের দিকে চলিল ;—নিকোলাই তো, নিশ্চয় নিকোলা। কিন্তু মোড়ের কাছে গিয়া আর সিলা তাহাকে দেখিতে পাইল না। কাজেই সেল্‌ভিগের দোকানের সবুজ দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বিষণ্ণ মনে সিলা যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল।

সিলা জানিত সাতটা বাজিলে আর হল্‌ম্যান সেখানে একদণ্ডও দাঁড়াইবে না। সুততাং সে দরজার কাছে গিয়া আবার হঠিয়া আসিল। আচ্ছা, সাতটা কি এখনো বাজে নাই? রাস্তার দুইধারে অনেক দোকানই তো বন্ধ হইয়া গেল। সিলা ছটফট করিতে লাগিল। আজ আর কিছুই কেনা হইবে না, দেখিতেছি। সব দোকান প্রায় বন্ধ হইল।

তাহার বাপ চলিয়া যায় নাই তো? সিলা যখন মোড়ের দিকে গিয়াছিল সেই সময়ে হল্‌ম্যান বাহির হয় নাই তো? সে তো কোনো দিন এমন দেরি করে না।

হঠাৎ দোকানের সবুজ দরজা খুলিয়া একজন পরিচারিকা খালি মাথায়

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। এক মিনিটের মধ্যে আরো একজন লোক ঐ রকম তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল; লোকটা ছুটিয়া গেল বলিলেই হয়। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য লোক দোকান ঘরের ভিতর হইতে একেবারে বাহিরের সিঁড়ি কয়টার উপর আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

কি একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে।

পর মুহূর্তে ঝনঝন করিয়া দোকানের একটা শাসি কে ভাঙিয়া ফেলিল। ব্যাপার কি ?···কোনো মাতাল হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছে, আর কি ?···আজ শনিবার কিনা····মাত্রা ঠিক রাখিতে পারে নাই,···এখন বোধ হয় উহাকে পুলিশের হাতে দিতে হইবে।

সিলা এমন কাণ্ড অনেকবার দেখিয়াছে, সুতরাং ভয় পাইল না। হল্‌ম্যান সম্বন্ধে তাহার কোনো আশঙ্কা ছিল না, কারণ সে বেচারা কখনো কোনো হাঙ্গামায় ভিড়িত না।

কিন্তু···সবাই দোকান হইতে বাহির হইয়া পড়িল···হল্‌ম্যান কই ?

সিলা ভাঙা শাসির ভিতর দিয়া উঁকি দিয়া দেখিল···কয়টা মরকুটে জেরেনিয়মের গাছ,···কিন্তু বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিবার পূর্বেই মদের দোকানের উৎকট গন্ধে সিলাকে অবিলম্বে মুখ ফিরাইতে হইল।

সিলার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং সে দুর্গন্ধ অগ্রাহ্য করিয়া পুনর্বার উঁকি মারিল।

ও কে ?···ওই যে বুকের বোতাম খোলা···টেবিলের উপর সটান্‌···একখানা হাত ঝুলিয়া পড়িয়াছে ?···ওকি সিলার বাপ ?···হল্‌ম্যান ?

"লোকটা যেন নড়ছে বলে বোধ হ'ল···নিকটে কারো কাছে একটা ল্যান্‌সেট পাওয়া যায় না···একটা ল্যান্‌সেট কোথাও নেই ?"

ইহার পর যে কি হইল তাহা সিলা জানে না; শুধু এইটুকু মনে আছে যে, কে যেন তাহাকে ঘরের ভিতর ঢুকিতে বারণ করিতেছিল এবং কে যেন বলিল, "যেতে দাও,—ও হল্‌ম্যানের মেয়ে।"

জ্ঞান হইয়া সিলা দেখিল তাহার বাপের মাথা তাহার কোলের কাছে। তাহার মনে হইতেছে যেন সে খুব উঁচু হইতে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল।

আগে হল্‌ম্যানের গলা হইতে একটা ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যাইতেছিল, এখন

তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার বিস্ফারিত চক্ষের দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে।

দরজার কাছে একখানা বেঞ্চির উপর একটা গুণ্ডা রকমের লোক বসিয়া আছে। সিলা উহাকে চেনে। মাতালদের মধ্যে কেহ হাঙ্গামা করিলে ওই লোকটাই দমন করে…ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দেয়।

ঘর নিস্তব্ধ; কেবল একটা মদের পিপার ছিপি-দেওয়া নলের মুখ হইতে একটা টিনের মগে টুপটাপ্ করিয়া মদ টোপাইতেছে।

এই সময়ে একজন চশমা-পরা ছোকরা ঘরে ঢুকিল; বোধ হয় সে ডাক্তার। সে যন্ত্রের ব্যাগ খুলিতে খুলিতে বাঁধি গতের মতো উপর্যুপরি অনেকগুলো প্রশ্ন করিয়া, হল্ম্যানের বুকে একটা স্টেথোস্কোপ্ লাগাইল। পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া ল্যান্সেট বাহির করিয়া সিলার দিকে চাহিয়া বলিল, "কামিজের কফটা গুটিয়ে ধর; দেখো, যেন নেমে না পড়ে।"

ডাক্তার যতক্ষণ অস্ত্র ফুটাইতেছিল সিলা ততক্ষণই এমনি করুণ ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল যে, দেখিলে মনে হয়, যেন ঐ ডাক্তারেরই কাছে সে নিজের বাপের জীবন ভিক্ষা করিতেছে।

ল্যান্সেটে যাহা উঠিল তাহা রক্ত বলিয়া চেনা এক রকম অসাধ্য…ঘন, কাল্চে, চিটা গুড়ের মতো।

ডাক্তার আবার নাড়ী দেখিল, বুক পরীক্ষা করিল, আবার ল্যান্সেট লাগাইল। শেষে নীচের ঠোঁট দিয়া উপরে ঠোঁটটা ঠেলিয়া তুলিয়া মেডিকেল কলেজের বড় ডাক্তারের মতো গম্ভীর চালে বলিয়া উঠিল, "হয়ে গেছে; অতিরিক্ত মদ খেয়ে মারা গেছে।"

সিলা চীৎকার করিয়া হল্ম্যানের বুকে লুটাইয়া পড়িল। ছোকরা ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে? ওর মেয়ে নাকি?"

ডাক্তার যাইবার পূর্বে আলোর কাছে গিয়া সযত্নে অস্ত্রশস্ত্র মুছিয়া গুছাইয়া লইতে লাগিল এবং চশমার পাশ দিয়া বারংবার সিলার দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিল।

সিলা বুক-ভাঙা কান্না কাঁদিতেছিল, তাহার অন্ত দিকে তখন দৃষ্টি ছিল না। ডাক্তার যথাসম্ভব বিলম্ব করিয়া বিদায় হইল।

একজন বছর কুড়ি বয়সের ছোকরা এক হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে আর এক হাতে আস্তে আস্তে সিলাকে হল্‌ম্যানের মৃত শরীর হইতে তফাত করিতে চেষ্টা করিতেছিল।

"সিলা! সিলা! শুনছ? আমি এসেছি; আমি—নিকোলা।" নিকোলা দুই-তিনবার চেষ্টা করিয়াও সিলাকে নড়াইতে পারিল না।

ইতিমধ্যে একজন পুলিশের লোক আসিয়া দোকানের লোকদের জবানবন্দী লিখিয়া লইতেছিল।

দোকানের কর্ত্রী জেরায় যাহা বলিল তাহা মোটামুটি এই :

হল্‌ম্যান বরাদ্দ মতো একটা পুরা বোতল এবং তিন গ্লাস শেষ করিয়া আবার হাত বাড়াইল; যে লোকটা মদ দিতেছিল সে ভাবিল বুঝি আবার চাহিতেছে। সেই মুহূর্তেই কিন্তু হল্‌ম্যান্ কেমন অবসন্ন ভাবে বেঞ্চিতে শুইয়া পড়িল, সকলেই ভাবিল লোকটার নেশা হইয়াছে। হল্‌ম্যানের এত নেশা হইতে কিন্তু কেহ কখনো দেখে নাই; যতই মদ খাক্ না কেন, সে টলিত না; খুব মাতাল হইলে, বড় জোর বাড়ি যাইবার সময়, সঙ্গে একজন লোক লইয়া যাইত, এই পর্যন্ত।

সেল্‌ভিগের দোকানে যাহাদের নিত্য যাতায়াত ছিল, শেষ কথাটায় তাহারা সকলেই একবাক্যে সায় দিল।

দারোগা লিখিল, "দোকানের বিশিষ্ট বাঁধা খরিদ্দারেরা সকলেই সাক্ষ্যদান-কালে একমত হওয়া বিধায় তাহাদের কথা প্রমাণ ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইল।"

এই সকল নির্বাক বাঁধা খরিদ্দারের মধ্যে অনেকেই কিন্তু গোলমাল দেখিয়া গোড়াতেই টলিতে টলিতে সরিয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের অব্যবহৃত খোলা বোতল এবং ভরা গেলাস এখনো কেহ গুছাইয়া তুলিয়া রাখে নাই।

গোঁফে মোচড় দিয়া দারোগা যাইবার সময় আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আর কোনো হেতু নাই তো?"

দোকানের কর্ত্রী প্রথমে এ প্রশ্নের কোনো উত্তর ভাবিয়া পাইল না; শেষে ইতস্ততঃ করিয়া যাহা বলিল, তাহার মর্ম কতকটা এইরূপ :—

পুরানো খরিদ্দারকে সে বেশী পীড়ন করিতে চায় না, কিন্তু কি করিবে?

সে বিধবা, তাহার উপর তাহার দুইটি অবিবাহিত মেয়েকে প্রতিপালন করিতে হয়; কাজেই, সে আজ হল্‌ম্যানকে বলিয়াছিল যে, এখন হইতে সে আর ধারে মদ দিতে পারিবে না; যদি খাইতে হয় তো নগদ পয়সা ফেলিয়া খাও। সে অনেককাল অপেক্ষা করিয়া দেখিয়াছে; হল্‌ম্যানের অনুরোধে সে কখনো বাড়িতে তাগাদা করিতে লোক পর্যন্ত পাঠায় নাই। এ দিকে টাকা তো আর চিরদিন ফেলিয়া রাখা যায় না; কাজেই জিনিসপত্র নীলাম করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইবে—এ কথা সে আজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও হল্‌ম্যানকে বলিয়া ফেলিয়াছিল।

এই সময়ে সেই গুণ্ডা-রকমের লোকটা আর দুইজন লোকের সাহায্যে মদের পিপা বহিবার ঠেলাগাড়িতে ধরাধরি করিয়া হল্‌ম্যানের মৃতদেহ শোয়াইয়া দিল, এবং দোকানের টেবিল-ঢাকা কাপড় দিয়া শব ঢাকিয়া ফেলিল।

খরিদ্দারের শবদেহ এমন করিয়া রাস্তা দিয়া লইয়া গেলে দোকানের দুর্নাম হইবে ভাবিয়া সেল্‌ভিগ-গৃহিণী একখানা কালো রঙের কাপড় খুঁজিতে গেল। না পাইয়া অভাবে একখানা সবুজ রঙের পুরানো পর্দা চাপা দিয়াই মড়া বিদায় করিবার ব্যবস্থা করিল।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিলার চোখ মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। এখন নিকোলা ভিন্ন তাহার কাছে আর কেহই নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ কেবল একটা মশা কানের কাছে আসিয়া ক্রমাগত ভোঁ ভোঁ করিতেছে।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া নিকোলা বলিল, "তোমার বাপ, তোমার উপর খুশী ছিলেন, আমার উপরও ছিলেন। আমায় যে ভালবাসতেন, একজনের জন্যে, সে কথা তিনি কখনো মুখফুটে বলতে পারেন নি।"

মিলা চুপ করিয়া রহিল।

"বাড়ি ফিরতে তাঁর ভারী ভয় ছিল,—আর বাড়ি যেতে হবে না। ভয় ভাঙতে মদের দোকানেও আর ঢুকতে হবে না।"

মিলা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নিকোলা কহিল, "শোনো মিলা, কেঁদো না, চুপ কর। বাপ মা কারু চিরদিন থাকে না। বাপ গেছে, ভাবনা কি? তোমার ভাবনা ভাববার

লোক তোমার কাছেই আছে। এই দেখ না, আমি কখনো বাপের যত্ন পাইনি, বাপ যে কেমন তা' চক্ষেও দেখিনি। আমি নিজে নিজের ভার নিয়েছি, আর তোমার ভার নিতে তো আমি চিরদিনই প্রস্তুত। তোমাকে আমার মনের কথা জানিয়ে রাখলুম। আমি অল্পদিনের মধ্যেই কিছু একটা হয়ে উঠছি। তোমাকে বেশী দিন খেটে খেতে হবে না, সিলা!"

নিকোলার এই সকল কথা সিলার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল কিনা সন্দেহ।

"তোমাকে গলির মোড় পর্যন্ত আজ এগিয়ে দেব এখন; রাত্রেও কাছাকাছিই থাকব;—যদি কোনো দরকার হয়—বুঝেছ?"

সিলা ভাঙা গলায় মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ, নিকোলা, তুমি আজ কাছে কাছেই থেকো।"

রাস্তায় লোক চলাচল কমিয়া গেলে, গুণ্ডাটা হল্‌ম্যানের শবদেহ ঠেলা-গাড়ি করিয়া দোকানের বাহির করিল। ময়লা কালো পোশাক পরা দুইটা কুলি মড়া কাঁধে করিল; আগে আগে চলিল গুণ্ডাটা, পিছনে সিলা ও নিকোলা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মেয়ে কুলি

রাজধানীর গলিঘুঁজিতে, আবর্জনার মধ্যে যে সমস্ত ছেলেমেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে, সংসারে তাহাদের যে কি গতি হয় তাহা কেহই ঠিক বলিতে পারে না।

বেশির ভাগ যায় মারাত্মক ব্যাধির কবলে। যাহারা টিঁকিয়া যায় তাহাদের মধ্যে কতক হয় কুলি, কতক ফিরিওয়ালা মুটিয়া, কতক নিষ্কর্মা ভিক্ষুক; কতক গাঁটকাটা, কতক নেশাখোর, কতক বা গুণ্ডা। ইহাদের বিশ্রামের স্থান হয় কয়েদখানা নয় দাওয়াইখানা। আজকাল আবার বড় বড় কারখানাগুলাও ইহাদের আশ্রয় দিতেছে;—এখন একেবারে হাজার দরজা খোলা।

যে সমস্ত ভদ্রলোক ধর্মতঃ ইহাদের ভরণপোষণের দায়ী, তাঁহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন; ঘাড়ের বোঝা অনেকটা নামিয়া গিয়াছে। খাটিয়া

খাইবার পথ এখন মুক্ত,—হতভাগারা খাটিয়া খাক্। তাহার উপর, কারখানার বাঁধাবাঁধিটাকে নৈতিক শাসনের স্বলাভিষিক্ত করিয়া এই দুর্ভাগাদের গুপ্ত মুরুব্বিরা এখন একেবারে লম্বা ছুটি লইয়া বসিয়াছেন।

কৌশলী ভীর্গ্যাংয়ের একটা কারখানাও ছিল। এই কারখানায় শহরের অনেক অসহায় ছেলেমেয়ে কুলির কাজ করিত।

এই কারখানার একটা ঘরে লেনা, ষ্টিনা, ক্রিস্টোফা, জোসেফা প্রভৃতি অনেকগুলি মেয়ে কুলি সার বাঁধিয়া বসিয়া গিয়াছে। ইহাদের বাপ-মার কোনো খবর ইহারা জানে না, জিজ্ঞাসা করিলেও ভাল করিয়া জবাব দেয় না।

কল চলিতেছে; হাজার হাজার চরকা ঘুরিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে গল্পও চলিতেছে। এঞ্জিনের স্পন্দনে সমস্ত বাড়িটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

মেয়ে কুলিদের বয়স যোল হইতে কুড়ির মধ্যে; ইহাদের ভিতর অনেকেই নবাগত, শিক্ষানবিস; এখনো ভাল করিয়া কাজের 'বাগ্' বুঝিতে পারে নাই। হল্‌ম্যানের মেয়ে সিলা এখন এই দলের।

সিলা ক্রমাগত কাশিতেছে, তাই বলিয়া কথা একদণ্ডও বন্ধ নাই। অল্প পরিশ্রমেই বেচারা হাঁপাইতেছে।

জোসেফার নূতন ফুলদার জ্যাকেট লইয়া আজ মেয়ে-কুলিমহলে তুমুল তর্ক। জ্যাকেট যে উহার 'দাদী' দিয়াছে এ কথা উহারা কেহই বিশ্বাস করে না, লেনাও না, ষ্টিনাও না, জ্যাকোবিনাও না। ঠিক এই সময়ে ক্রিস্টোফা গত রবিবারের কাহিনী জুড়িয়া দিল। সে যে কেমন করিয়া ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাদের বনভোজনে জুটিয়া গিয়াছিল তাহারি একটা আজগবি বৃত্তান্ত। দুঃখের বিষয় ক্রিস্টোফার এই সমস্ত বৃত্তান্ত যে পরিমাণে শ্রুতিসুখকর সে পরিমাণে সত্য নহে।

ক্রিস্টোফার বর্ণনা শেষ হইলে আগামী রবিবারে লেট্‌ভিগুে যে নাচ হইবে তাহারি জল্পনা চলিতে লাগিল; সিলা একেবারে উৎকর্ণ। কে ভালো নাচে, কাহার পোশাক ভালো, কে পোশাক ধার করিয়া পরিয়া আসে, আর কে বা ভালো খাওয়ায় এই আলোচনাই ঘণ্টাখানেক ধরিয়া চলিল। নাচের সঙ্গে যে এবার বেহালারও বন্দোবস্ত হইয়াছে একথা একা ক্রিস্টোফাই বিশ্বস্তসূত্রে

জানিয়াছে। এবারকার নাচে জাহাজের কর্মচারীরা তো আসিবেই, তা'ছাড়া কলেজের ছেলেরাও নাকি আসিবে।

এই সময়ে কয়েক জন বাহিরের লোক কারখানা দেখিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা ঘরে ঢুকিতেই মেয়েরা একমনে নিজের নিজের চরকায় তেল দিতে আরম্ভ করিল।

বড় বড় জানালা দিয়া শুরু রৌদ্র আসিয়া কলের চরকিতে, কাপড়ের গাঁটে ও কুলিদের পিঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বেলা প্রায় বারটা। শেষ ঘণ্টাটা আর কাটিতে চায় না; তেলের গন্ধ এবং এঞ্জিনের গরম দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে।

এখনো কয় মিনিট বাকী। চারিদিকেই উসখুস। অবশেষে টিফিনের ঘণ্টা পড়িল।

চক্ষের নিমেষে চুল ঠিক করিয়া ফিটফাট হইয়া মেয়ের দল টিনের পাত্র হাতে টিফিনের জন্ম নীচে নামিয়া পড়িল। বাহিরে বসন্তের নির্মল বাতাসে বেচারারা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বেড়ার উপরে যে বরফ জমিয়াছিল সিলা তাহাই একটু ভাঙিয়া মুখে দিল। ক্রিস্টোফার নাচের বৃত্তান্ত তাহার মাথার মধ্যে এখনো ঘুরিতেছে।

কারখানার সামনের রাস্তাটা খুব চওড়া নয়, কাজেই সেখানে অল্পেই ভিড় জমিয়া উঠে।

"ছাখ্, ছাখ্ ক্রিস্টোফা! ভীর্গ্যাং!—ফিরে এসেছে; এরি মধ্যে ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসেছে!" সোৎসুক মেয়ের দল গা-টেপাটিপি করিতে লাগিল। "নূতন ওভারকোট! ফিঁকে—ফিঁকে খাকী!"

"হুঁ! কাল যখন জাহাজ থেকে ও নামছিল আমি তখনি দেখেছি; সঙ্গে কতকগুলো ইংরেজ; সব খাকীরঙের পোশাক। খাকীরঙেরি কত রকম! কাল আমি প্রায় সাত-আটটা রকম শুনেছিলুম—কোনোটা ফিঁকে, কোনোটা ঘোর।" যে মেয়েটি জিহ্বা ছুটাইতেছিল সে আগে দর্জির দোকানে কাজ করিত, সে জোসেফা।

"এবারে কারখানায় এলে ও পোশাকে ওঁকে খুব সাবধানে চলতে হবে, নইলে যদি তেলকালি কি চর্বি লাগে"—মেয়েরা হাসিয়া উঠিল।

জিস্টোফা বলিল, "ছাখ্ সিনা ছাখ, কেমন চেহারা! কি চমৎকার মুখ, ভাই! বুক পকেটে আবার কি সুন্দর রুমাল,—লাল টুকটুক করছে।" মেয়েরা কারখানার বেড়ার কাছে ভেড়ার দলের মতো একেবারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

লাড্‌ভিগ কোর্ণাং বুক ফুলাইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল। মেয়ের দল মূঢ়ের মতো চাহিয়া রহিল, দুই-একজন কটাক্ষ করিতেও ভুলিল না। লোকটা লাল স্যামন্ মাছের মতো অবলীলায় জনতার ঢেউ দু'ফাঁক করিয়া চলিয়া গেল।

"মাথার পিছনে আবার সিঁথে!"…"নূতন ফ্যাশান"…"আহা অত জোরে নিশ্বাস ফেল না, বেচারা যে রোগা!"

…"ঠিক বাপের মতোন হয়ে উঠেছে"…"কি দেমাক্! কোনো দিকে চাওয়া নেই!"

উহাদের সকলেরি দৃষ্টি লাড্‌ভিগের দিকে।

"যেমন গম্ভীর দেখছ, লোকটি ঠিক অত গম্ভীর নয়। কারখানাতেই গম্ভীর। সেদিন ইস্ত্রি-ঘরের জোহানা বলছিল যে, সে নাকি মেলায় এক মুখোশ পরা নাচের মজলিসে ওকে চিনে ফেলেছিল। জোহানা আমাকে নিজে বলেছে।"

জ্যাকোবিনা বলিয়া উঠিল, "কত বড়লোকই যে মেলায় আসে তার ঠিকানা নেই; হয়তো যার সঙ্গে নাচা যাচ্ছে, মুখে তার মুখোশ বলে মনে ভাবা যাচ্ছে, সে বুঝি একজন যে-সে, কিন্তু মুখের কাপড় সরে গেলেই বুঝতে পারবে যে লোকটা নিতান্ত কেওকেটা নয়। মুখোশ না খুললেও,—অমনিও চেনা যায়, একটু নজর করে দেখলেই ধরতে পারা যায়, জামার কলারে, এসেন্সের গন্ধে নাচের ভঙ্গীতে—প্রতিপদেই চিনতে পারা যায়।"

"আমাদের দিকে আবার ফিরে ফিরে দেখা হচ্ছিল;—তা' দেখেছ?" সিনা একটু থতমত খাইয়া কহিল, "হ্যাঁ, আমাকে ও চেনে কিনা"—একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল, "এই বাচ্চা কাকটাও ডাকতে শিখেছে নাকি?"

বাচ্চা কাকটার শরীর আগুন হইয়া উঠিল, সে কোনো উত্তর করিল না। সিনা বেশ জানিত যে লাড্‌ভিগ তাহাকে চেনে। সে মায়ের সঙ্গে অনেকবার

উহাদের বাড়ি গিয়াছে। এই সেদিনও কারখানায় কাজের জন্য দরখাস্ত লইয়া কৌসুলী সাহেবের কাছে যখন যায়, তখন ঐ লাড্‌ভিগও সে অফিস্-ঘরে ছিল।

এই সময়ে সকল কারখানারই ছুটি। আর একদল মেয়ে মজুর আসিয়া সিলাদের দলে মিশিয়া দল ভারী করিয়া শহরের নানা গলি-ঘুঁজির ভিতর দিয়া বস্তির দিকে চলিল। বস্তির কতক ঘর কাঠের, কতক শ্লেটের, কতক খোলার।

সিলা একটা স্যাঁৎসেতে সরু গলির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। উহারা যে ঘরে থাকে তাহার নর্দমা দিয়া গরম ক্ষারজলের ধোঁয়া অল্প অল্প বাহির হইতেছে। ঘরে ঢুকিবার আগেই, সিলা, শ্রীমতী হল্‌ম্যানের নীরস কণ্ঠের ওজন-করা কথা শুনিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে-ভয়ে আস্তে আস্তে দুয়ার খুলিয়াই দেখে, অ্যাণ্ডার্সনদের ঝি কাপড়ের তাগাদায় আসিয়া রাগে আগুন হইয়া উঠিয়াছে; তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। এদিকে সিলার মা গরম জলের টবের কাছে দাঁড়াইয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে কাপড় নিংড়াইতেছে, উত্তেজনার চিহ্নমাত্রও নাই।

"অ্যাণ্ডার্সন-গিন্নীকে বোলো তুমি যে, এই সব ছেঁড়া গলা কাপড় এক হপ্তায় তৈরী হতে পারে না। অসম্ভব! আমরা যে এত গরীব, আমরাও কখনো, ছেঁড়া ফুটো না সেরে কাপড় ধোপার বাড়ি দিইনে। এই সব কাপড়, —এ স্বোয়ামী পুত্তুরকে মানুষে পরতে দ্যায় কি করে?···তর্ক ক'র না বাছা, তর্ক করবার আমার সময় নেই; আমি বাজে কথা কইনে, খাঁটি কথা কই। দেখ দেখি মোজার ছিরি!···গোড়ালির কাছটা ছিঁড়ে হাঁ হয়ে গেছে, তা' একটা টোনের দড়ি দিয়ে আট্‌কে রাখা হয়েছে। ছি! ছি! এমন জিনিস হাতে করে কাচতেও লজ্জা করে; বলে—

"শাল-দোশালা যেই যা' পরে,
ছাপা সে নেই ধোপার ঘরে।"

অপরপক্ষকে নির্বাক, হতভম্ব, দেখিয়া হল্‌ম্যান-গৃহিণী সিলার উপর পড়িলেন—"একটু আগে যদি আসতিস সিলা, তাহলে, আমার একটু কাজের সাহায্য হ'ত; সে দিকে খেয়ালই নেই। আমি এখন ম'লেই ভালো। কর্তা গিয়ে অবধি আমারও আর বেঁচে থাকবার সাধ নেই, মলেই নিষ্কৃতি।"

"আমি সব নিংড়ে টাঙিয়ে দিচ্ছি, মা !"

"থাক্ না, রাখ ; এমন সব হয়ে গেল কিনা, এখন এলেন কাজ দেখাতে। কারখানার ছুঁড়ীদের সঙ্গে গল্পটা একটু কমিয়ে, একটু সকাল সকাল এলেই তো হয়! এই যে একটা মানুষ একলা সকাল থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেটে মরছে, ধর্ম ভেবেও তো তার মুখ চাইতে হয়। এমন,—মানুষে পরেরও করে থাকে।"

সিলা চুপ করিয়া রহিল। ঠিক এই সময়ে হুতবাক অ্যাণ্ডার্স্ন্-বাড়ির ঝি বলিয়া উঠিল, "তা' বেশ বাছা, আমাদের কাপড় আর তোমায় কাচতে হবে না ; আমরা নিতান্ত সাধারণ লোক, আমাদের সাদাসিধে কাপড়, তোমার মতোন অসাধারণ ধোপানীর হাতে না পড়লেও বেশ ফর্শা হবে। বলি, জিবে তো এদিকে ক্ষুরের ধার, তবে ক্ষারে কেন ময়লা কাটে না ?"

উত্তরের অবসর না দিয়াই দাসী চলিয়া গেল।

হল্‌ম্যান-গৃহিণীর চরিত্রে প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সে অন্যের অন্যায় একেবারেই দেখিতে পারিত না। বাঁচিয়া থাক সিলা। অদৃষ্টের গুণে তাহার নিজের ঘর কেহ কখনো অপরিচ্ছন্ন থাকিতে দেখে নাই। বিধি-বিধানের উৎসর্গ এবং অপবাদ দুই যাহার নিজের হাতে, সুবিধা তাহার চতুর্দিকে।

সময় সকলেরই ফেরে ; হল্‌ম্যান-ছুতারেরও ফিরিয়াছিল—মরণান্তে ! হল্‌ম্যানের মৃত্যুর পর হইতে হল্‌ম্যান-গৃহিণী লোকটার যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মোট কথাটা এই যে, গরীব গৃহস্থের ঘরে একজন পুরুষ মানুষের একটা বাঁধা রোজগার থাকা এবং না থাকা,—এই দু'য়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ইহার উপর আবার সেল্‌ভিগের দোকানের দেনা। হল্‌ম্যান নিজে প্রতি সপ্তাহে হাত-খরচের জন্য টাকা আলাদা রাখিয়াও, কেন যে এত দেনা করিতে গেল শুধু এই কথাটা শ্রীমতী হল্‌ম্যান আজ পর্যন্ত কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না।

যেদিন দেখিলেন যে খাটিয়া খাওয়া, না হয় উপবাস, ইহা ছাড়া সংসারে তাঁহাদের তৃতীয় পন্থা নাই, সেদিন শ্রীমতী হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন।

স্বামীর রোজগারের টাকা কেমন করিয়া খরচপত্র করিয়া ফুরাইয়া দিতে

হয়, ইহাই এতদিন তাঁহার একমাত্র ভাবনা ছিল। এতদিন তিনি পরের কাঁধে চড়িয়া বসিয়াছিলেন, এখন নিজের কাঁধে বোঝা বইতে হইবে।

এই রকম দুরবস্থায় পড়িয়া, হল্‌ম্যান-গৃহিণী ভাবিলেন, খাটিতে হয়তো এই তাহার ঠিক সময়,—অথচ কে যে খাটিবে সেটা তেমন স্পষ্ট করিয়া বলা হইল না। সুতরাং বিলম্ব না করিয়া পূর্ব-পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া সিলাকে কারখানায় ভর্তি করিবার জন্য স্বয়ং কৌঁসুলী সাহেবের কাছে গিয়া হাজির হইলেন।

সমর্থ মেয়ের বসিয়া থাকাটা ভাল নয়। সিলা কারখানায় কাজ করুক, সিলার মাও বসিয়া থাকিবেন না। তিনিও বাড়ি বসিয়া পাড়ার লোকের কাপড় রিফু করিবেন, এমন কি কাচাই ইস্ত্রিও কিছু কিছু করিবেন। ইহার পরেও যদি লোকে তাঁহার নিন্দা করে তবে সেটা কেবল লোকের স্বভাবের দোষ।

হল্‌ম্যান-গৃহিণী কন্যার নাকে দড়ি দিয়া দুইজনের খাটুনি খাটাইয়া কর্তব্য-পালন করিতেছিলেন। কারখানায় পুরাদমে খাটিয়া আসিয়াও সিলার নিস্তার ছিল না। সমর্থ মেয়ের বসিয়া থাকিতে নাই। সমস্ত সন্ধ্যাটায় কেবল সেলাই আর তালি, তালি আর সেলাই; এমনি করিয়াই তো মানুষ ধীর শান্ত হয়, নহিলে ঘোড়ার মতো লাফাইয়া বেড়ানো কি ভাল?

টিমটিমে তেলের আলোয় যতক্ষণ বেচারা সেলাই ফোঁড় করিত, ততক্ষণই কেবল, কারখানার মেয়েদের বনভোজনের আর নাচের গল্প ছায়াবাজির ছবির মতো সজীব হইয়া তাহার মনের ভিতরে ঘুরিতে থাকিত। তাহার মনে হইত এসব যেন তাহার নিজের জীবনের ঘটনা; তাহার মন ভরিয়া উঠিত, বুদ্‌বুদের পর বুদ্‌বুদ,—আহ্লাদের আতিশয্যে সিলা এক-একবার মায়ের সম্মুখেই হাসিয়া ফেলিত। ময়লা একটা মোজার মধ্যে মজাটা যে কোথায়, এবং এত হাসিই বা কোথা হইতে আসে, হল্‌ম্যান-গৃহিণী অনেক মাথা ঘামাইয়াও কোনো মতেই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। মেয়েটার সবই অদ্ভুত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রূপার বঁড়শি

হীগবার্গের লোহার কারখানায় এবার 'ফাঁকা সোমবারের' উপর 'ভ্যাস্তা মঙ্গলবার' হইতে চলিয়াছে। রবিবারের বন্ধের পর মিস্ত্রী মজুর কাহারও দেখা নাই। অতবড় কারখানায় মোটে একটি ছোকরা হাজির।

নূতন ডকের দরুন রাশীকৃত কোদাল, গাঁতি, কুড়ুল প্রভৃতি শানাইবার অপেক্ষায় পড়িয়া আছে। সেগুলার উপর প্রায় এক আঙুল পুরু ধূলা। হীগবার্গ তো রাগে আগুন। ভাল লোক আর পাইবার জো নাই, সব হতভাগা। শিক্ষানবিস ছোকরাদের সব সে তাড়াইয়া দিবে। মিস্ত্রীদেরও জবাব দিতে ছাড়িবে না। ইহা যদি না করে, তবে তাহার নাম হীগবার্গ নয়।

যে ছোকরাটি আজ কাজে আসিয়াছে, সে ছুটির দিনেও কাজে আসে। সে চটপট মিস্ত্রী হইতে চায়। দুনিয়ার গতিকই এই; কেহ বা এক সপ্তাহের রোজগার একদিনে উড়াইয়া দেয়,—মদ গিলিয়া কাজ কামাই করে; আর কেহ বা ছুটির দিনে খাটিয়া,—পেটে না খাইয়া, একটি একটি করিয়া পয়সা জমাইয়া গৃহস্থালীর গোড়াপত্তন করে। ছোকরাটি কাজের লোক বটে,—যদি পুলিশের ফ্যাসাদে না পড়িত, তাহা হইলে কোনো কথাই বলিবার ছিল না। হাঁ,…তবে…পুলিশের হাতেও ছোকরা বেকসুর খালাস পাইয়াছে। সে যে দোষী, এমন কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না।

যাহার কথা হীগবার্গ আলোচনা করিতেছিল, সে নিকোলা। নিকোলা আবার কামারের কাজে ভর্তি হইয়াছে। এবার সে ওস্তাদ না হইয়া ছাড়িবে না।

এতক্ষণে! গদাই-লস্করী চালে দুইজন কারিগর এতক্ষণে কারখানায় আসিয়া হাজির হইল।

হীগবার্গ দেখিয়াও দেখিল না; সে হাপর হইতে একখানা গরম গাঁতি টানিয়া লইয়া হাতুড়ির আঘাতে আগুন বৃষ্টি করিতে লাগিল।

ওস্তাদ হইয়া চুল পাকাইয়া হীগবার্গ আজ কুলির কাজ করিতেছে! কারিগর দুইজন ইহাতে মনে মনে ভারী লজ্জা বোধ করিতেছিল। তীব্র তিরস্কারেও উহারা এত লজ্জিত হইত কিনা সন্দেহ।

কারিগরেরা ক্রমশঃ দুই-একজন করিয়া কারখানায় আসিয়া জুটিতে লাগিল। কাহারও মুখ অত্যন্ত লাল; কাহারও একেবারে ফ্যাঁকাশে; কাহারও চোখের কোলে কালশিরা; কাহারও নাকের উপর ন্যাকড়ার পটি বাঁধা। সকলেরি গলা ভাঙা। সকলেই আস্তে আস্তে কাজে বসিয়া গেল। এত কাজ জমিয়া গিয়াছে যে, হাড়-ভাঙা খাটুনি না খাটিলে সমস্ত দিনেও তাহা সাবাড় হইবার সম্ভাবনা নাই।

সমস্ত দুপুরবেলাটা নীরবে কাজ চলিল। বৈকালের দিকে কাজ অনেকটা হাল্কা হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া, হীগবার্গ তাগাদায় বাহির হইয়া গেল।

এই সময়ে ঘর্মাক্ত কারিগরদের মধ্যে একজন গুনগুন করিয়া গান ধরিল, জন দুই অলস ভাবে আড়ামোড়া দিয়া হাই তুলিল। কামাইয়ের দিনটা কে যে কেমন করিয়া কাটাইয়াছে, প্রত্যেকের মুখে এখন তাহারই বর্ণনা।

একা নিকোলা উহাদের গল্পে যোগ দেয় নাই। সে কতকগুলা কব্জায় ইস্ক্রুপ পরাইবার জন্য বিঁধ করিতে ব্যস্ত। সমস্ত সপ্তাহে তাহার হাতের কাজ সারা হইবে কিনা সন্দেহ। গল্পে যোগ দিবার সময় তাহার মোটেই নাই।

মিস্ত্রীরা বহ্নি-উৎসবের গল্প করিতেছিল। কে কয়টা পুরানো আলকাতরার পিপা পুড়াইয়াছে, পকেট খালি করিয়া সমস্ত পয়সা মদে উড়াইয়াছে,—তাহারি বিস্তৃত কাহিনী। জান্ পিটার আবার নৌকায় চড়িয়া জলটুঙিতে গিয়াছিল, পাহাড়ের কত জায়গায় বন পোড়ার আগুন সে দেখিয়া আসিয়াছে।

এত গল্প-গুজবের মধ্যে নিকোলার ছোট হাতুড়িটির শব্দ মুহূর্তের জন্যও বন্ধ নাই।

জান্ পিটারের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে আর একজন লোক গল্পের আসর জমাইয়া তুলিল। "গ্রীফসেন পাহাড়ে একরকম বিনামূল্যেই কাল মদ বিতরণ হয়েছিল। মদের ঝরনা ঝরেছিল বললেই হয়। ভীর্গ্যাং সাহেবের ছেলে—কলের মেয়ে মজুরদের সকলকে একেবারে খুশী করে ছেড়ে দিয়েছে। তারা আস্ত একখানা পুরোনো নৌকা প্রায় আধ পিপা আলকাতরা দিয়ে পুড়িয়েছে। সমস্ত রাত গান-বাজনা। আজ বেলা আটটার পর সেখান থেকে নেমে আসা গেছে।"

হাতুড়ি নীরব হইয়া গেল। "ভীর্গ্যাং সাহেবের ছেলে! কলের মেয়ে

মজুর !" নিকোলা কান খাড়া করিয়া রহিল। যে লোকটা গল্প জুড়িয়াছিল, তাহার বর্ণনা শেষ না হইতেই, হাত মুখ ধুইয়া নিকোলা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

সিলা গোয়ালাবাড়ি হইতে দুধ কিনিয়া বাহির হইতেছে, এমন সময় দরজার কাছে নিকোলার সঙ্গে সাক্ষাৎ। সিলা বেশ জানিত নিকোলা উহারি সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, নিকোলা কিন্তু বলিল অন্যরূপ। সে বলিল, "গোয়ালাবাড়িতে তোমায় ঢুকতে দেখলুম, তাই দাঁড়িয়ে আছি।"

"কাল যে কি মজাই হয়েছিল তা' আর তোমায় কি বলব নিকোলা!" সিলা দুধের পাত্র মাটিতে নামাইয়া বলিতে লাগিল, "এমন মচ্ছব আমি জন্মে দেখিনি।"

"গ্রীফসেন পাহাড়ে?"

"তুমি জানলে কি করে? তুমি কি করে জানলে? অ্যাঁ! বল, তুমি জানলে কি করে?"

"আমি,—আমাদের একজন কারিগর,—সেও গিয়েছিল,—সেই বললে। আচ্ছা তুমি তোমার মার কাছ থেকে ছাড়া পেলে কেমন করে?"

সিলা চকিতের মতো একবার চারিদিক দেখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "সেও ভারী মজা! মা গিয়েছিল মাসীর বাড়ি সেণ্টজনের প্রসাদ খেতে। আমায় বলে গেল, 'বাড়ি আগলে থাকিস্, আর কাপড়গুলো ইস্ত্রি করে রাখিস্।' ন'টা বাজতে না বাজতে আমিও মেলা দেখতে বেরিয়ে গেলুম।" সিলা হাসিতে লাগিল। "বেলা পর্যন্ত আমায় ঘুমুতে দেখে, মাসীর বাড়ি থেকে সকালে ফিরে এসেই মা খুব খানিক আমায় বকে দিলে।...আমরা আবার রাত্রে কেমন সরবৎ খেয়েছিলুম, তা' শুনেছ?"

"খাওয়ালে কে?"

"বলব? আচ্ছা, তোমায় বলছি, কিন্তু কাউকে বল না। খাইয়েছিল একজন—লোক"—

"বটে!"

"সে বড় যে-সে নয়,—ভীর্গ্যাং সাহেবের ছেলে,—সেও বন-পোড়া দেখতে এসেছিল।"

"সে তোমাদের সরবৎ খাইয়েছে ?—তোমাকেও খাইয়েছে ?"

"হ্যাঁ ! আমায় দেখিয়ে দোকানীকে বললে, ওই-যার-কালো-চোখ—ওকে ভাল করে সরবৎ তৈরী করে দাও।"

"আগে থেকেই আলাপ হয়েছে বোধ হয় ?"

"হ্যাঁ ! সে জানে আমার নাম সিলা, তবুও বলছিল, ওই-যার-কালো-চোখ।—ওর সঙ্গে আমার রোজই দেখা হয়, তা বুঝি জান না ?"

"বটে !" নিকোলার মুখ কালি হইয়া উঠিল।

"শনিবারে মাহিনা দেবার সময়, সে আমার হিসাবে দু'শিলিং বেশী জমা করে ফেলেছে। শেষে আর কি হবে ? হিসাব তো কাটাকুটি করা চলে না,—তাই বললে, "ও দু'শিলিং তোমায় আলাদা দিয়ে দেব ; তুমি কেক্-টেক্ কিনে খেয়ো।"

"হাঃ ! হাঃ ! তাই বললে নাকি ? খুব তো তার দয়া ! কসাইদেরও খুব দয়া ! কাটবার আগে মুরগীর সামনে মটর ছড়িয়ে দেয়, নইলে যে মুরগী ধরাই দেয় না !"

নিকোলা যতক্ষণ কথা কহিতেছিল, ততক্ষণই সে সিলার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল। সিলা ক্রমশঃ কি সুন্দরীই হইয়া উঠিতেছে ! যেমন মুখ তেমনি গড়ন ! নিকোলা বলিয়া উঠিল, "কি বোকা মেয়ে ! নিজে যে সুন্দরী সে কথাটাও নিজে জানে না।"

সিলার ঠোঁট ফুলিয়া উঠিল। সে যে বোকা, এ কথাটা সে মোটেই আমল দিতে চায় না।

"একখানা রুমাল, একখানা কেক্ পেলেই খুশী ; বোকা মুরগীর মতো গলা বাড়িয়ে দেয়, যে খুশী ছুরি চালাতে পারে। এত দেখ শোনো, এটুকু বুদ্ধি তোমার হওয়া উচিত, সিলা ! যে মেয়েদের সঙ্গে তুমি বেড়াও, ওদের আচরণ কি তোমার ভাল লাগে ? ওদের একজনকেও কি কোনো ভদ্র রকমের কারিগর বিয়ে করতে চাইবে ? না, ওরা তার উপযুক্ত ? দু'দিন ফুর্তি,—ব্যস্, তারপর সব ফরসা। কোনো ভদ্র পরিবারে ওদের বসতেও জায়গা

দেবে না। আর ঐ যে ভীর্গ্যাং সাহেবের ছেলে—ওকে আমার ভাল মনে হয় না সিলা! ও তোমার জন্যে ঠিক 'ওত' পেতে আছে। আমিও ওর জন্যে 'ওত' পেতে আছি।" নিকোলার মুখ আবার ভয়ংকর হইয়া উঠিল।

"তুমি কী বলছ নিকোলা?...কি ঠাউরেছ মনে মনে...বল দেখি?... আমি তোমার ভাব কিছু বুঝতে পারিনে। কী যে বল তার ঠিক নেই!"

"কি যে মনে করছি তা' তুমিই বুঝে দেখ। তোমাকে বাঘ ভালুকের মুখের সামনে ছেড়ে দিয়ে সারাটা দিন কেবল হাতুড়ি পিটব আর উখো ঘষব—এতে সুখও নেই, স্বস্তিও নেই। আমার আজন্ম ঐ রকমই চলছে।—আমার ভাগ্যে সবই উলটো।"

সিলা মাথা হেঁট করিয়া রহিল। নিকোলার এই সব কথা তাহার মোটেই ভাল লাগিত না।

নিকোলা কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আমরা দু'জনে, সিলা, বলতে গেলে, একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। আর যে হাঙ্গামার মধ্যে মানুষ হয়েছি তা' তোমার সবই জানা আছে। আমি বেটাছেলে, আমার পক্ষে বিগ্‌ড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী ছিল না, কেন না, অত্যাচারে আমি দমে যেতুম না, আমার মনের জোর ছিল, জবাব দিতে পারতুম। কিন্তু তুমি দুর্বল, তোমার পক্ষে বিগ্‌ড়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। অনেক মিথ্যা তোমায় মাথা পেতে নিতে হয়েছে; অনেক কষ্টে মন পরিষ্কার রাখতে হয়েছে। সেই জন্যে—সেই জন্যে ভেবেছিলুম—যখন বরাবর আমরা পরস্পর পরস্পরের দোষ ঢেকে এসেছি, বরাবর পরস্পরকে সাহায্য করেছি, তখন আমাদের উচিত হচ্ছে চিরকাল একত্র থাকা, পরস্পরের হাত ধরে সংসারের বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়ে পরস্পরকে বাঁচিয়ে চলা। আমাদের উচিত হচ্ছে, একটা সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া...বিয়ে করা। তোমার যদি আপত্তি না হয়, তবে"—

সিলা চুপ করিয়া রহিল। উহাকে মৌন দেখিয়া নিকোলা কতকটা সাহস পাইল। সে আবার বলিতে লাগিল—

"এখন আর আমি এক পয়সাও বাজে খরচ করিনে। জলপানি হিসেবে যা পাই, সব এখন থেকে জমিয়ে রাখছি। অল্পদিনের মধ্যেই আমি একজন কারিগর হয়ে উঠব। তখন চাই কি, তোমাকে আর কলে গিয়ে কালিঝুলিও

মাখতে হবে না, বাড়িতে মার কাছে বকুনিও খেতে হবে না—তখন সিলা তুমি হবে কারিগরের স্ত্রী। তোমাকে কেউ কখন যত্ন করেনি, আমি তোমাকে যত্ন করব।—খুব যত্ন করব। ছেলেবেলায় যেমন করতুম ঠিক তেমনি। তা'ছাড়া আমি কখনো মা-বাপের আদর যত্ন পাইনি, তাদের ভালবাসবারও অবসর পাইনি। সঙ্গী?—তাও পুলিশের হাঙ্গামার পর থেকে বড় বেশী নেই।"—নিকোলা একবার থামিল। "তুমি, সিলা, কারিগরের স্ত্রী হলে ভারী চমৎকার হবে। কামারের মনের মতোন চোখ যদি কারো থাকে,—সে তোমার! চোখ নয় তো যেন হাপরের আগুনের ফুলকি! কাজ থেকে যখন ঘরে ফিরে আসবো, দরজায় না ঢুকতেই তোমার মুখ দেখতে পাব। সে কেমন হবে! চিরকাল কুকুরের মতো থেকেছি,—কুকুরের অধম চোরের মতো হয়ে থেকেছি—এখন যদি শুধু তোমায় পাই তো সে সব দুঃখ ভুলে যাব, খুব সুখে দিন কাটবে। জাহাজী গোরাদের সঙ্গে আর ছোকরা বাবুদের সঙ্গে নেচে বেড়ানোর চেয়ে, নিজের সিন্দুকে তালা লাগিয়ে নিজের ঘরে জোরের সঙ্গে থাকা ঢের ভালো সিলা,—সে ঢের ভালো।"

শেষ কয়টা কথা না বলিলেই ভাল ছিল। সিলা ভিজিয়াছিল; নিকোলার শেষ ক'টা কথায় সে আবার গরম হইয়া উঠিল, সে বেশ একটু চটিয়া উঠিল। সিলা বলিল—

"তুমিও আমায় হেসেখেলে বেড়াতে দেবে না? আমি কোথাও যাব না, কারো সঙ্গে কথা কইব না?—এই কি তোমার ইচ্ছে? ছেলেবেলা থেকে মা যেমন করে খাঁচায় পুরে রেখেছে, তুমিও তেমনি রাখবে?" সিলা কাঁদিয়া ফেলিল। "নিকোলা তুমি এমনি ক'রে আমায় সুখী করবে? তোমার এইসব কথায় আমার মন ভারী খারাপ হয়ে যায়। এইসব কথা শুনলে তোমাকেও আমার কেমন ভয় করে।"

"আমাকে ভয় করে? সিলা!"

"কলের মেয়েরা সবাই আমায় ঠাট্টা করে—বলে, খুকী, মায়ের আঁচল ধরে বেড়াও গে। তুমিও এখন মায়ের দিকে হ'লে? বেশ! বেশ! খুব ভাল! সবাই মিলে আমায় জব্দ করে রাখ। যতদিন মা'র অধীন আছি, মা জব্দ করে রাখুক। যখন তোমার হাতে পড়ব, তখন তুমিও তাই কোরো। এরকম

কিন্তু ভাল নয় নিকোলা। এ আমি কিছু চিরদিন সইব না।" সিলা রাগে, দুঃখে, অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

"আচ্ছা, কাঁদ, আমি কিছু বলব না, বলতে চাইও না। এখন তোমায় সান্ত্বনা দেবার আরো ঢের লোক হয়েছে।"

সিলা সহসা চোখ মুছিয়া নিকোলার কাছে গিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিল এবং আর্দ্র চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তোমায় ছাড়া আমি আর কাউকেই তো বিয়ে করব না, এ কথা কি তুমি জান না?…নিকোলা!" সিলার চোখে আবার জল ভরিয়া উঠিতেছিল।

"সে তো বেশ কথা, সিলা! সে তো ভাল কথা। আমিও দেখাব যত্ন কাকে বলে। ভালবাসলে লোকে যে কতদূর পর্যন্ত কাজের লোক হয়, তাও তোমার অগোচর থাকবে না।"

"কিন্তু নিকোলা, মাকে আমার ভারী ভয়। যদি জানতে পারে যে, লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করি, তাহলে রক্ষে থাকবে না। কোনো কাজের অছিলায় বাইরে দেরি হলে মা এমনি ক'রে চায় যে আমার বুক শুকিয়ে যায়। সন্ধ্যা বেলা রোজ ছেঁড়া কাপড় সেলাই করি, তখন এক-একদিন মনে হয় তুমি যেন বড়লোক হয়েছ।—হীগবার্গের কামারশালার মালিক হয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছ। এ যদি হয়, তাহলে আর মা অমত করতে পারবে না।"

"না, না! সত্যি?—তুমি এই সব ভাব? সিলা! সত্যি? আস্‌ব, নিশ্চয় আসব। বড় লোক হয়ে না হ'ক, পাকা কারিগর হয়ে তোমাদের বাড়ি আসব। তা'হলেও তোমার মা আর অমত করতে পারবে না।"

একি! পড়ন্ত রৌদ্র আজ এমন উজ্জ্বল হইল কি করিয়া? উদ্ভিন্ন পল্লবের ভারে গাছের শাখা যে ভরিয়া উঠিল। পুলের তলে জলের কল্লোল আজ ঠিক কলহাস্যের মতোই শুনাইতেছে। নিকোলা তো নেশা করে নাই! মধ্য নিদাঘের প্রশান্ত সন্ধ্যা সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল যে!

সিলা দুধের পাত্র হাতে লইয়া দেখিতে দেখিতে দূরে চলিয়া গেল। নিকোলার দিকে চাহিতে চাহিতে সে বাড়ির অরণ্যে হারাইয়া গেল।

মোটের উপর দুনিয়াটা জায়গা নেহাত মন্দ নয়। কুলুপের কলের মতো

মাঝে মাঝে খারাপ হইয়া যায় বটে, কিন্তু মোটের উপর, খতাইয়া দেখিলে ইহাকে নিতান্ত খারাপ বলা চলে না। আর বিগড়াইলেই বা এমন কী ক্ষতি? একটু হাত দুরস্ত হইলে, একটু ধৈর্য থাকিলে, সব ঠিক হইয়া আসে।

না, দুনিয়া বেশ জায়গা, খাঁটি জায়গা। একটু ভিতরে প্রবেশ করিলেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। বাহিরে পুলিশ পাহারা, ওস্তাদ-উপরওয়ালা; তাও ঐ কুলুপের কলটা ঠিক রাখিবার জন্য।

নিকোলা এইবার পাকা মিস্ত্রী হইল। সার্টিফিকেট পাইল। পৃথিবী তাহার কাছে গোলাপী রঙে রঙীন হইয়া উঠিল। সংসারের সঙ্গে আজকাল যে তাহার বেশ বনিবনাও হইতেছে, সে যে বেশ মানাইয়া চলিতে শিখিয়াছে, সে কথা এখন উজ্জ্বল প্রশস্ত মুখের পরতে পরতে লেখা। এখন সে সকল কাজই বেশ সহজ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারে।

মিস্ত্রী হইয়া তাহার মাহিনা বাড়িয়া গেল। পাস-বহিতে প্রতি সপ্তাহেই বেশ কিছু জমিতে লাগিল। শ্রীমতী হল্‌ম্যানের ভয়ে সে এখনও সিলাকে কোনো জিনিস উপহার দিতে সাহস করে না, সুতরাং বাজে খরচ একটি পয়সাও নাই। যে পয়সাটা বাঁচানো যায় সেইটাই লাভ; আর আজই হোক, দুইদিন পরেই হোক, এ সবই তো সিলার।

শনিবারের বৈকালে কারখানার ছুটি হইয়া গেলে, সে কাজের সাজে সিলাদের পাড়ার দিকেই যাইত; যেন কাজের খোঁজে চলিয়াছে। যাইবার সময় হাতুড়ি সাঁড়াশি কিংবা একটা কলুপ হাতে লইতে ভুলিত না। মনের কথাটা সিলার সঙ্গে দেখা করা; নির্ভর দৈবের উপর।

দেখা হইত দৈবাৎ। এক-একবার সিলার বদলে সিলার মা'র সঙ্গেও চোখাচোখি হইয়া যাইত। নিকোলা পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িত। কোনো দিন দেখিত, সিলা মেয়ে মজুরদের সঙ্গে টো টো করিতেছে। দেখা না হওয়া বরং সহ্য হয়, কিন্তু অন্য মেয়ে মজুরদের সঙ্গে সিলাকে একত্র দেখা নিকোলার পক্ষে একেবারে অসহ্য।

ওই হতভাগা মেয়েগুলোর সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা বেড়াইবার কী দরকার? সিলার মতো মেয়ের একি ভাল দেখায়? বেচারীর বয়স কম, বুদ্ধিও কাঁচা, এদের সঙ্গে

মিশিবার যে কী পরিণাম তাহা সে বোঝে না। ভদ্রলোকের ছেলেদের ভদ্রতার যে কী মর্ম তাহা সিলা এখনো তলাইয়া দেখে নাই। উহাদের শিষ্টতা যে শুধু সুন্দর মুখেরই জন্য তাহা সে এখনো জানে না। আমোদ-আহ্লাদ করিতে চায়,—করুক। ঘানিতে পড়িলে গুঁড়া হইয়াই বাহির হইবে।

না! সিলাকে এই সুদুস্তর পঙ্ক হইতে তুলিতেই হইবে।

নিকোলা এখন চোখ কান বুজিয়া কেবল হাতড়ি পিটুক, উখো ঘষুক, পয়সা জমাক। রূপার বঁড়শিটা বেশ একটু বড় না হলে সিলাকে গাঁথিয়া তোলা মুশকিল,—ভারী মুশকিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আকস্মিক আবির্ভাব

মিস্ত্রী হইবার কিছুদিন পরেই মাতৃস্নেহে বঞ্চিত নিকোলা মাকে ফিরিয়া পাইল। হঠাৎ একদিন বার্বারা আসিয়া হাজির। নিকোলা যে এখন রোজগার করিতে শিখিয়াছে, সে খবর বার্বারা গ্রামে বসিয়াই পাইয়াছে। একখানা তক্তা বোঝাই গাড়ি শহরে আসিতেছিল, উহার গাড়োয়ানকে বলিয়া কহিয়া ঐ গাড়িটাতে চড়িয়াই বার্বারা শহরে আসিয়াছে। বেচারী ভারী খুশী। সে নিকোলার জন্য কত কাঁদিয়াছে,—বলিতে বলিতে সত্য সত্যই সে পাটকরা রুমাল দিয়া পুনঃপুনঃ অশ্রু মার্জনা করিতে লাগিল।

বার্বারা অনেক দুঃখ সহ্য করিয়াছে; তবে ছেলে যখন মানুষ হইয়াছে,—ছেলেকে যখন সে ফিরিয়া পাইয়াছে, তখন আর ভাবনা নাই। নিকোলা এখন কত বড়টি হইয়াছে। বলি, গির্জায় যাইবার মতো ভাল জামাজোড়া তৈয়ার করাইয়াছে তো? একটা টুপি তাহাকে কিনিতেই হইবে। এসব বিষয়ে মা'র কথা শুনিতেই হইবে। অবস্থার মতো ব্যবস্থা নহিলে লোকে কি বলিবে? বার্বারা পোশাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে নিকোলাকে যথেষ্ট উপদেশ দিতে পারিবে। সে সংসারের অনেক দেখিয়াছে।

নিকোলা মা'র উপর খুশী হইবে কি চটিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। বার্বারার আকস্মিক আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে খরচ এবং বাজে খরচ অনেক বাড়িয়া উঠিল।

নিকোলা বহুবৎসর মাকে দেখে নাই; মাতার যে ছবি তাহার অন্তরে অঙ্কিত ছিল, তাহাও অজস্র অশ্রুপাতে লুপ্তপ্রায়। পুরানো স্মৃতি খোঁচাইয়া তুলিবার ইচ্ছাও তাহার খুব বেশী প্রবল ছিল না। কারণ, নিকোলার পক্ষে পূর্বস্মৃতি 'আগাগোড়া কেবল মধু' নহে। সে বর্তমানের স্বচ্ছ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝখানে অতীতের আবিলতা ঘোলাইয়া তুলিতে রাজী নয়। মনে মনে কিন্তু নিকোলার মা'র প্রতি একটা টান আছে, এ কথা সে অস্বীকার করিতে পারে না। সে মাকে ভালবাসে, সুতরাং মা আসিয়াছে,—ভালই।

একটা শনিবারের অপরাহ্ণে নিকোলা কর্মস্থান হইতে ফিরিয়া মাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইল। সে হোটেলে গিয়া বার্বারাকে দামী রুটি এবং মাংস কিনিয়া খাওয়াইল। বার্বারা খাইতে পারে বেশ। শেষে ঠিক পুরাপুরি ইচ্ছা না থাকিলেও, আনন্দের ক্ষণিক আতিশয্যে, সে সমস্ত সপ্তাহের সঞ্চিত অর্থে বার্বারার জন্য একখানি প্রকাণ্ড ফুলকাটা রেশমী রুমাল কিনিয়া ফেলিল। বার্বারা জিনিসটা পছন্দ করিয়াছে, সুতরাং নিকোলা সেটা না কিনিয়া থাকিতে পারিল না।

নিকোলার টাকার থলি ক্রমশই হাল্কা হইয়া পড়িতেছে। উপায় কি? বার্বারা কোনোদিন বুঝিয়া চলিতে অভ্যস্ত নয়। সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে বিদায়ের দিন বার্বারাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া সন্ধ্যার ঝোঁকে নিকোলা সিলার সন্ধানে চলিয়া গেল।

শহরের মলিন দরিদ্র পল্লীতে সন্ধ্যার ঘোর সকলের আগেই ঘনাইয়া উঠিয়াছে। গ্রীষ্মাতিশয্যে মুটে-মজুরের দল গায়ের জামা কাঁধে ফেলিয়া চলিয়াছে। কোনো কোনো কারখানায় হাতুড়ির শব্দ এখনো বন্ধ হয় নাই।

আজ সিলাদের পাড়ার সমস্ত অলিগলি ঘুরিয়াও নিকোলা সিলাকে দেখিতে পাইল না। সে ফুটপাথে উঠিল, রাস্তায় নামিল,—অনেকক্ষণ ধরিয়া এদিক-ওদিক করিল। সিলার দেখা নাই। একটা মেয়ে দুধের বালতি হাতে লইয়া যাইতে যাইতে নিকোলাকে এইরূপ ঘুরিতে দেখিয়া হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিকোলা আর দাঁড়াইল না। তাহার মনে হইল, সবাই উহাকে লক্ষ্য করিতেছে,—হয়তো সকলে ভাবিতেছে, লোকটা না-জানি কি মতলবে প্রায়ই এমন করিয়া এখানে ঘুরঘুর করে।

দূরে 'পানি-চক্কী'র আবর্তনে ঝরনার জল ছড়াইয়া পড়িতেছে। একখানা গাড়ি ঘড়ঘড় শব্দে গন্তব্যস্থানে ছুটিয়া চলিয়াছে। খানিক দূর গিয়া মাল খালাসের জন্য গাড়িখানা দাঁড়াইল। প্রকাণ্ড বোঝা,—এক ঝাঁকানিতে একেবারে রাস্তায়। মালটা ভীর্গ্যাং সাহেবের কারখানা সংলগ্ন বাগানের ফটকে খালাস করা হইল। বাগানের ভিতরে একটা লোক মোটা নলে করিয়া জল ছিটাইতেছে, আর কতকগুলা মেয়ে ঘাস নিড়াইতেছে, আগাছা তুলিয়া সাফ করিতেছে, নূতন চারা রোপণ করিতেছে। খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া লাড্‌ভিগ ভীর্গ্যাং উহাদের সঙ্গে হাস্যালাপে একেবারে মশগুল! মেয়েদের মাঝখানে শ্রীমতী হল্‌ম্যান দণ্ডায়মান।···সিলাও আছে। লাড্‌ভিগ উহাকে লক্ষ্য করিয়া হাসি তামাশা করিতেছে। সিলাও হাসিতেছে···কিন্তু হল্‌ম্যান-গৃহিণীর ভয়ে জবাব দিতে পারিতেছে না।

নিকোলার হৃৎপিণ্ডটা কে যেন হঠাৎ এক গাছা দস্তুর সাঁড়াশি দিয়া সজোরে চাপিয়া ধরিল। সে যে একদিন লাড্‌ভিগকে প্রহার দিবার সুযোগ পাইয়াছিল, সেই কথাটাই আজ সকলের আগে তাহার মনে জাগিতেছিল। নিকোলার বুক যেন কিসে চাপিয়া ধরিতেছিল। সে উহাদের উপর নজর রাখিবার জন্য একটু তফাতে গিয়া একটা গাছের আড়ালে বসিয়া পড়িল।

'সিলা হাসিলে কি সুন্দর দেখায়'—নিকোলা বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতেছিল, আর ভাবিতেছিল তার সমস্ত দুঃখের কারণ লাড্‌ভিগ ভীর্গ্যাঙের কথা।

বসিয়া বসিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। নিকোলা লোকের আনাগোনা দেখিতেছে। হাবার মতো, হাঁদার মতো সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে। হঠাৎ তাহার চেহারা ভীষণ হইয়া উঠিল। ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লাড্‌ভিগ ভীর্গ্যাং একেবারে নিকোলার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। যতক্ষণ উহাকে দেখা গেল, রুদ্ধ-আক্রোশে নিকোলা ততক্ষণই শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুর মতো তাহার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আবার সেই নৈরাশ্য, দরিদ্রের সেই চিরসংকোচ, সেই চিরদাস্য, ধনীর সঙ্গে নির্ধনের প্রতিযোগিতায় সেই চিরন্তন নিষ্পেষণ···নিকোলা চক্ষু মুদ্রিত করিল; সে প্রাণপণ বলে আত্মসংবরণ করিল।

যখন সে চোখ খুলিল, তখন শ্রীমতী হল্‌ম্যান ঘরে ফিরিতেছে,—সঙ্গে সিলা।

খানিক দূরে দু'জনে দুই পথ অবলম্বন করিল। হল্‌ম্যান-গৃহিণী বাড়ির দিকে গেলেন, সিলা চলিল গোয়ালা-বাড়ি।

দুধ লইয়া ফিরিবার সময় হঠাৎ নিকোলার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ায় সিলা চমকিয়া উঠিল।

"কি সিলা? আজকাল আমায় দেখেও যে চমকাও দেখছি?"

সিলা ঠাট্টা করিয়া বলিল, "যে ভীষণ তোমার চেহারা!"

"তুমি না বলেছিলে আমায় বিয়ে করবে? কেমন, বলনি?"

"হঠাৎ সে কথা কেন? সে তো ঢের কালের কথা।"

"আমি আর একবার কথাটা শুনতে চাই, আর একবার শোনবার দরকার হয়েছে, তাই বলছি। পতর মেরে কাঠ জুড়তে হলে, দু'দিক থেকেই পরখ করে দেখা দরকার যে, সে পতর টেঁকসই কিনা···কোথাও ফাটা-চটা আছে কিনা। কলের কাজে ঢুকে পর্যন্ত তোমার মাথা নানান্ দিকে ঘোরে কিনা, তাই বলছি।"

"বাস্ রে বাস্, আমার জন্যে তুমি আজকাল যে বেজায় ভাবতে শুরু করেছ দেখছি। কিন্তু দেখ, সত্যি কথা বলতে কি, আমি এখন নিজেও একটু একটু ভাবতে শিখেছি,—বড় হইছি কিনা। নিজের ভালমন্দ একটু একটু বুঝতে শিখেছি। তুমি ঠাউরে রেখেছ চিরদিন আমি সেই খুকীটি আছি। কি আশ্চর্য! দেখ, এখন আমি চল্লুম, আমার আজ ঢের কাজ। বাড়িতে গিয়ে দুটো খেয়েই আবার কারখানার বাগানে এসে কপি কড়াইশুঁটির ক্ষেতগুলো সাফ করে ফেলতে হবে। ক্রিস্টোফা আসবে, জোসেফা আসবে, আরো তিন-চারজন আসবে। এ ফসলের আমরা ভাগ পাব, তা জানো?"

নিকোলা এতক্ষণ মনে মনে হিসাব করিতেছিল; মায়ের জন্য যাহা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা বাদে এখন তাহার হাতে আছে মোট সাতাশ ডলার। এর তিনগুণ না জমিলে ঘর-বসতের জিনিসপত্র কিনিতেও কুলাইবে না। সিলাকে এই রকম কুসঙ্গে আর এক মুহূর্তও থাকিতে দেওয়া নয়; এজন্য সে দিনরাত খাটিতেও প্রস্তুত।

প্রকাশ্যে সে বলিল, "দেখ সিলা, দু'জনেই যদি এখন থেকে একটু চারিদিকে সমঝে চলি, তাহলে, চাই কি বছরখানেকের মধ্যেই আমরা নিজস্ব ঘরকন্না পেতে, পায়ের উপর পা দিয়ে, অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারি। তবে, জোর করে কিছুই বলতে পারিনে ; মনে করি এক, হয় আর।" নিকোলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

সিলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি কি ভাবছি তা' জান ? বিয়ে না হলে তোমার বুদ্ধিও খুলবে না, বলও বাড়বে না, ফুরতিও ফিরবে না। এখন তুমি এমনি হয়েছ যে, যেদিন তোমার সঙ্গে কথা কই সেদিন সমস্ত দিনরাত মনটা কেমন যেন দমে থাকে। খুব ভালবাসার মানুষ যা হোক!" সিলা কতকটা ছলভরে জুতার গোড়ালির উপর ভর দিয়া এক পাক ঘুরিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রুতপদে দূরে চলিয়া গেল।

নিকোলা বার্বারার আগমনের কথা সিলাকে জানাইবার জন্যই আজ আসিয়াছিল, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, সিলাকে কাছে পাইয়া সে কথা একদম তাহার মনেই ছিল না। যাক্, এবার যেদিন দেখা হইবে, ও খবরটা সেই দিন দিলেই চলিবে। সে দিনেরও বড় বিলম্ব নাই। আকাশ ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে।

মাসখানেক পরে একজন পাড়াগেঁয়ে গাড়োয়ান একটা প্রকাণ্ড পেঁটরা নিকোলার দরজায় আনিয়া হাজির করিল। পেঁটরাটি বার্বারার। গাড়োয়ানের মুখে নিকোলা শুনিল, দুই চারিদিনের মধ্যে স্বয়ং বার্বারাও আসিতেছেন।

মাতাঠাকুরানীর মতলব নিকোলা ঠিক ঠাওরাইতে পারিল না। আবার চাকরির চেষ্টা ? ভগবান জানেন।

ইহার পর একদিন সন্ধ্যাবেলা নিকোলা দোকান হইতে ফিরিয়া দেখিল, উহার ঘরের ভিতর এক কাঠের বাক্স আর ঠিক তার পাশেই এক জোড়া ফিতাওয়ালা জেনানা বুট। মাতাঠাকুরানী তবে আসিয়াছেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে মাখন, পনির, রুটি প্রভৃতি সওদা করিয়া বার্বারা সশরীরে উপস্থিত হইল। উহার মোটঘাট এবং মোটা দেহে নিকোলার স্বল্পায়তন ঘরটি একেবারে ভরাট হইয়া গেল। স্থূলতাবশতঃ বার্বারা এখন

অল্পেই হাঁপায়, উহার অস্থিময় চিবুকের নীচে এখন আবার আর একটা মাংসময় চিবুক গজাইয়াছে।

যৌবনে যে মুখ গোলাপ ফুলের মতো সুন্দর মনে হইত, এখন সেটা একটা প্রকাণ্ড চর্বণের যন্ত্র মাত্র।

নিকোলা বিছানার উপর বসিয়াছিল; বার্বারা সিন্দুকের উপর বসিয়া খাইতে খাইতে অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল। তাহার বক্তব্য মোটের উপর এই—

বার্ষিক আঠারো ডলার বন্দোবস্তে যে চাষীর ঘরে বার্বারা চাকরি লইয়াছিল, সে এমনি কৃপণ যে, নিজেও পেটে খায় না লোকজনদেরও পেট ভরিয়া খাইতে দেয় না। কাজেই বার্বারাকে গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া এটা-ওটা কিনিয়া খাইতে হইত। কৌঁসুলী সাহেবের বাড়ি চাকরি করা অবধি এমনি অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, মন্দ জিনিস মুখে তুলিতে গেলে চোখে জল আসে। বড়লোকের ছেলে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়া শেষে কিনা বার্বারার এই দুর্দশা! লাড্‌ভিগ-লিজির দুধ-মা'র ভাগ্যে কিনা এই বকশিশ! শহরে বড় বড় ঘরে সুখ্যাতি লাভ করিয়া শেষে কিনা ধান ভানিয়া দিন কাটানো!

বার্বারা প্রথম প্রথম ভাবিয়াছিল, কৌঁসুলী সাহেব আবার ডাকিবেন। বার্বারারই ভুল। বড়লোককে মনে করাইয়া দিতে হয়, নহিলে নিজে হইতে তাঁহারা বড় একটা কিছুই করে না। আর নিকোলা বাঁচিয়া থাক;—শহরে বার্বারার এখন আর সহায়ের ভাবনা নাই। বার্বারা শহরে একখানি ছোট-খাটো দোকান করিবার মতলব করিয়াছে। কৌঁসুলী সাহেবকে এ কথা সে আজ নিবেদন করিয়া আসিয়াছে।

গোড়াতে কৌঁসুলী সাহেব বার্বারাকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, ভাল করিয়া কথার জবাব পর্যন্ত দেন নাই। কিন্তু তাহাতে কি? বার্বারা উহার মেজাজ বুঝে, সে নানা রকম মন-যোগানো কথা কহিয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া ফেলিতে জানে।

"লাড্‌ভিগ দাদাবাবু কেমন আছেন? লিজি দিদিবাবু কেমন আছেন?—জিজ্ঞেস করতে পারি কি? এতদিনে না জানি তাঁরা কত বড়সড় হয়েছেন;

কেমন মোটাসোটা হয়েছেন। এখন বোধ হয় আর আমাকে দেখলে চিনতে পারবেন না। না পারবারই তো কথা। কতদিন দেখাশুনো নেই।"

"হ্যাঁ বড়সড় হয়েছে, কিন্তু মোটাসোটা হয়নি। নৌকোর লগির মতন পাতলা—ছিপছিপে। তুই বোধ হয় এখনো দু'হাতে দু'জনের কোমর ধরে তুলতে পারিস। আচ্ছা বার্বারা, তুই কি খেয়ে এত মোটা হলি বল্ দেখি? যে চাষার কাছে ছিলি তার মরাইটা-সুদ্ধ গিলে ফেলেছিস নাকি? তার বোধ হয় ক্ষেত-খামার সব গেছে?"

"আজ্ঞে, হুজুর! কৌঁসুলী সাহেবের বাড়ি থাকতে তো আর জাবনা খাওয়া অভ্যাস করিনি, যে চাষার খোরাকিতে মোটা হব! আর চাষাই কি কম লোক? সে খুব চালাক, নিজের গণ্ডা খুব বোঝে; আমি আবার তার ক্ষেত-খামার খাব। কষ্ট পেতে আমিই পেইছি। অর্ধেক দিন গাঁটের পয়সা খরচ করে খেতে হয়েছে!"

ইহার পর লাড্‌ভিগ-লিজির স্নেহের কথা তুলিয়া বার্বারা কান্না জুড়িয়া দিয়াছিল। এই সময়ে কৌঁসুলী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর সেই লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটা?—সেটা কোথায়?"

"কে? নিকোলা? সে এখন এই শহরেই আছে। সে এখন মিস্ত্রীর কাজে পাকা হয়ে উঠেছে।"

ইহার পর বার্বারা দোকান করিবার মতলবটাও কৌঁসুলী সাহেবের কাছে খুলিয়া বলে। কৌঁসুলী সাহেব উহার কথায় খুশী হইয়া বাজার-পাড়ায় বিনা ভাড়ায় এক বৎসরের জন্য তাহাকে দুইটা ঘর দিতে রাজী হইয়াছেন।

নিকোলা ও বার্বারা সামনাসামনি বসিয়া আছে। দু'জনের মধ্যে চেহারার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। তফাতের মধ্যে, অদৃষ্ট একজনকে কর্মে ব্যাপৃত রাখিয়া দৃঢ়সন্নদ্ধ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, আর একজনকে অগাধ আলস্যের আরকে ডুবাইয়া মেরুদণ্ডহীন মাংসপিণ্ডে পরিণত করিয়াছে।

বার্বারা কেমন করিয়া ব্যবসা জমাইবে, নিকোলাকে তাহা বিস্তারিত বলিল। ভীর্গ্যাংদের দৌলতে শহরের যত বড় ঘরে তাহার যাতায়াত। সকলকে সে খরিদ্দার পাকড়াইবে। একবার জমিয়া গেলে, তখন আর ভাবিতে হইবে না। বাজারে একবার সুনাম হইলে অনেক মাল ধারেও পাওয়া

যাইবে। তখন বকেয়া চুকাও, আর মাল বেচ আর মুনাফা কর ; নগদ টাকা বাহির করিয়া মাল খরিদের আর কোনো হাঙ্গামাই থাকিবে না।

সম্প্রতি কিছু নগদ টাকার দরকার। বার্বারার যাহা আছে তাহাতে কুলাইবে না। এখন এক নিকোলাই ভরসা, সে যদি কিছু দেয়! টাকা নগদে থাকাও যা, আর পাঁচটা মালে থাকাও তাই। উহাতে নিকোলার লোকসানের কোনো ভয়ই নাই। পাই পয়সাটি পর্যন্ত ঠিক সমান—পুরা থাকিবে। এখন আছে পকেটে, তখন থাকিবে প্যাকেটে,—তফাতের মধ্যে এই।

"আচ্ছা, সস্তায় একখানা টেবিল কোথায় পাওয়া যায় বল দেখি? আর খানকয়েক চেয়ার? দোকান কর্ত্তে হলে এগুলো তো আগে কেনা দরকার। নাঃ, ও সব ধারেও পাওয়া যেতে পারে। এখন কিছু নগদ হাতে না হলে দোকান খুলি কি করে বল দেখি? নগদেরি দরকার আগে। দোকানটা জম্‌লে, তুমিও আমার কাছে এসে থাকবে ; কি বল নিকোলা! এখন তোমায় হোটেলে খাবার কিনে খেতে হয়, তাতে ঢের বেশী পড়ে যায় ; আমি রাঁধব বাড়ব, তাতে অনেক পয়সা বেঁচে যাবে। সেকথাও ভেবে দেখ।"

বার্বারার বাক্যে স্বর্ণ বর্ষিতেছিল। নিকোলা কিন্তু কোনো মতেই মায়ের সঙ্গে স্বর মিলাইতে পারিতেছিল না। সে মনে মনে খুবই ইতস্ততঃ করিতেছিল এবং ঘন ঘন পা দুলাইতেছিল। দোকানের ভবিষ্যৎ হয়তো খুবই আশঙ্কাজনক। আর সে বিষয় হয়তো বার্বারা নিকোলার অপেক্ষা অনেক বেশী বোঝে,—তাহার উপর সে কৌঁস্থলী সাহেবের কাছেও এ সম্বন্ধে অনেকটা আশা-ভরসা পাইয়াছে। কিন্তু বার্বারা যে হঠাৎ আজ নিকোলার সর্বস্বের উপর দাবী করিতে আসিয়াছে, এ দাবী কি ন্যায্য? যাহাকে সে স্তন্যে এবং স্নেহে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহার কাছে সে কি এতটা আশা করিতে পারে? নিকোলার মন বলিল, উহার চেয়ে এখন আর একজনের দাবী অনেক বেশী ; সে সিলা। বার্বারার কথায় পুরাপুরি রাজী হওয়া নিকোলার পক্ষে এখন অসম্ভব।

বার্বারা বকিয়াই চলিয়াছে ; সে যে দেওয়ালে ঠেস্ দিতে গিয়া গজালে ধাক্কা পাইয়াছে—সে কথা সে এতক্ষণেও বুঝিতে পারে নাই।

নিকোলা অনেকক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল।

শেষে মুখ না তুলিয়াই বলিতে আরম্ভ করিল, "তা দেখ মা, আমার টাকা তোমায় দেব এ আর এমন বেশী কথা কি ? তবে, ওটা কিন্তু আমার বছরের শেষে ফিরে পাওয়া চাই। তার কারণ, যে ঐ সময়ে আমি বিয়ে করব বলে স্থির করেছি। ঐ যে হল্‌ম্যান-ছুতার,—তার মেয়ে সিলা,—তারি সঙ্গে বিয়ে ;—আমি কথা দিয়েছি। হল্‌ম্যান মরবার পরেই এ বিষয়ে আমাদের সব ঠিকঠাক হয়ে আছে। এর আর নড়চড় হবে না। আর ঐ জন্মেই খেটেখুটে কিছু পয়সা হাতে করেছি ; এখন এ সমস্ত ভেস্তে দিলে আমার উপর অন্যায় করা হবে।"

নিকোলা তীক্ষ্ণচক্ষে একবার মাতার দিকে চাহিল। বার্বারা বুঝিল যে, এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছেলেটির মন এখন একেবারেই তাহার হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। এমনটা যে ঘটিতে পারে সে কথা মোটে তাহার খেয়ালেই আসে নাই।

বেচারা নিকোলা মুখে যাহাই বলুক, মায়ের মনস্তুষ্টির জন্য বিদায়ের ঠিক পূর্বে তাহার কষ্টসঞ্চিত ডলারগুলি বার্বারার হাতেই সমর্পণ করিল।

শহরের গলিঘুঁজিতে এক শ্রেণীর দোকান আছে,—যাহারা ঠিক পাইকারও নয়, অথচ ঠিক ছুটা দোকানদারও নয়। উহারা মহাজনের দেনা হপ্তায় হপ্তায় না মিটাইয়া মাসে মাসে মিটায় ; এবং নিজের পাওনাগণ্ডা খরিদ্দারের কাছে হাতে হাতে আদায় না করিয়া সপ্তাহান্তে 'বিলে' আদায় করে। বার্বারা হইল এই শ্রেণীর দোকানী। সে মার্কিন মুলুকের লোকেদের মতো রাতারাতি দোকানদার হইয়া উঠিল। এক সপ্তাহের মধ্যে বার্বারা দোকান সাজাইয়া ফেলিল। পেঁজা তুলা, টোনের স্থতা ; রঙিন ফিতা, চুরুটের পাইপ ; ছুরি, কলম, দেশলাই, নস্য ; পাঁউরুটি, লজেঞ্জেস্‌ প্রভৃতি নানা রকম জিনিসে ঘর ভরিল। মোমজামায় ঢাকা একটা প্রকাণ্ড কেরোসিনের বাক্স হইল টেবিল ; আর একটা ছোটো বাক্স হইল চেয়ার। টাকাকড়ি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা প্রায় সিন্দুকেই থাকিত, খুচরা থাকিত একটা ডালাওয়ালা ফুটা চুরুটের বাক্সে।

দোকান খুলিবার ঝঞ্ঝাটের মধ্যেই বার্বারা শ্রীমতী হল্‌ম্যানের সঙ্গে পুরানো পরিচয় ঝালাইয়া লইল ; কিন্তু সিলা সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করিল না।

হল্‌ম্যান-গৃহিণীর বর্তমান বাসা বার্বারার দোকান হইতে বেশী দূরে নয়।

একদিন সে রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে নূতন দোকানের সামনে বার্বারাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। বার্বারাও ছাড়বার পাত্র নয়; চা তৈয়ারী; পুরানো বন্ধুকে নূতন দোকানে চা না খাওয়াইয়া সে কিছুতেই অমনি অমনি যাইতে দিবে না।

দোকানে ঢুকিয়া হল্‌ম্যান-গৃহিণী নাক সিঁটকাইল, দোকানের সাজ-সরঞ্জাম সম্বন্ধে তাহার অনেক বক্তব্য ছিল, কিন্তু চাপিয়া গেল। চা খাইতে খাইতে সে নিজের দুঃখ-কাহিনী জুড়িয়া দিল। হল্‌ম্যানের মৃত্যুর পর হইতে সে যে স্ত্রীলোক হইয়া কেমন করিয়া সংসার মাথায় করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা।

"ওকি! এরি মধ্যে পেয়ালা সরিয়ে রাখছ যে? আর এক পেয়ালা নাও!"

এক পেয়ালা, দুই পেয়ালা, তিন পেয়ালা, চা উড়িয়া গেল, হল্‌ম্যান-গৃহিণীর কিন্তু নাকী-সুর ঘুচিল না, স্ফূর্তির লক্ষণও দেখা গেল না। সে যতক্ষণ চা খাইতেছিল এবং ওজন করিয়া কথা কহিতেছিল, ততক্ষণ তাহার মাছের মতো নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটা বার্বারার আসবাবপত্রের উপর ঘুরিতেছিল। শেষে ভবিষ্যতে সে স্বয়ং বার্বারার দোকান হইতেই জিনিসপত্র খরিদ করিবে, এইরূপ একটা আশ্বাস দিয়া হল্‌ম্যান-গৃহিণী গম্ভীর চালে চলিয়া গেল।

কি একটা জিনিসের প্রয়োজনে সিলা বার্বারার দোকানে ঢুকিয়াছে, এমন সময় লাড্‌ভিগ আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। বার্বারা ভারী খুশী; তবে তো লাড্‌ভিগ দুধ-মাকে ভোলে নাই! বড়লোকের ছেলে বলিয়া তো কোনো দেমাক নাই, তা থাকিলে কি এই দরিদ্রপল্লীর ক্ষুদ্র দোকানের অপরিচ্ছন্ন পথ সে মাড়াইত?

লাড্‌ভিগ কিন্তু আসিয়াই সিলার সঙ্গে হাসি-তামাশা শুরু করিয়া দিল। সিলা তাহার দরকারী জিনিসটা বার্বারার হাত হইতে একরকম টানিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল।

ভদ্রলোকের ছেলে লাড্‌ভিগের প্রতি সিলার এই অদ্ভুত ব্যবহারের কথা সেই রাত্রেই নিকোলার কানে পৌছিল। বার্বারা বলিল, "লাড্‌ভিগ এমন

কিছুই বলেনি যাতে অমন করে কানে আঙুল দিয়ে পালাতে হয়। মেয়ে যেন সরমের ডালি! ছুটে পালানো হ'ল। ভদ্রঘরের মেয়ে অমন অবস্থায় মাথা হেঁট করে থাকে; জবাব না দিলেই হ'ল। পালাবার কি দরকার? ও সব ঢং কি আর আমরা বুঝিনি? ও একরকব বাচ্ খেলানো, পুরুষমানুষ-গুলোকে নিয়ে মাছের মতোন খেলিয়ে বেড়ানো আর কি! আর তাও বলি, ঐ খাটো-জামা-পরা ডিগডিগে, ভাজা চিংড়ির মতো কোলকুঁজো মেয়েটা—ওকি নিকোলার মতোন ছেলের যুগ্যি? না আছে শিক্ষা, না জানে সহবত। লাড্‌ভিগ না হয়ে যদি আর কেউ হ'ত তো আমি নিজে তাকে মেয়েটার পিছনে লেলিয়ে দিতুম।—ভাল কথা, নিকোলা, আজ যখন লাড্‌ভিগ দোকানে এল, তখন একবার ভাবলুম যে, যে পনেরো ডলারের কথা তোমায় সেদিন বলেছিলুম, সেটা ওর কাছে চেয়ে দেখি, শেষে সিলার কাণ্ড দেখে সব গুলিয়ে গেল। যখন মনে পড়ল তখন লাড্‌ভিগ বেরিয়ে চলে গেছে!"

"ওর কাছে? না-না মা! সে হবে না; তুমি দু'দিন সবুর কর, আমিই যোগাড় করে দিচ্ছি; আমি যতক্ষণ পারি ওর কাছে চেয়ো না। দরকার কি?"

"এমন নইলে পেটের ছেলে।" বার্বারার পান্‌সে চোখে জল আসিল। "দেখ নিকোলা, কিছু ভাল চা আর কেক তোমার জন্যে রেখেছি; আজ প্যাকেট খুলেছিলুম, বিক্রি হয়ে কিছুটা পড়ে আছে, সেইটে তোমার জন্যে রেখেছি।"

"না, মা, চা তো আমার রয়েছে; আর কি হবে? বিক্রির জিনিস বিলিয়ে দিতে নেই।" বলিতে বলিতে নিকোলা বাহির হইয়া গেল।

খানিক পরে রাস্তায় সিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ। সিলার আজ হাসি ধরে না।

"পালিয়ে এলুম; ওর দিকে একবার তাকিয়েও দেখিনি। তুমি কি বল? ওর কাছে খানিক দাঁড়ানো উচিত ছিল, না? অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে, না?" সিলা আবার হাসিতে লাগিল।

নিকোলার গাম্ভীর্য উড়িয়া গেল, সে হাসিয়া ফেলিল।

ফিরিবার সময় লাড্‌ভিগের সঙ্গে নিকোলার চোখাচোখি হইল। নিকোলার মন এবং সর্বশরীর কঠিন হইয়া উঠিল। সে আত্মসংবরণ করিয়া কোনো মতে পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিল।

আজ সিলার স্ফূর্তি নিকোলার চোখে ভাল লাগিয়াও যেন ভাল লাগে নাই। আজকাল যখনি সে দেখা করিতে যায়, তখনি সিলার মুখে লাড্‌ভিগের কথাই শোনে। লাড্‌ভিগ কি বলিল, লাড্‌ভিগ কি পোশাক পরিল, ক্রমাগত এই সমস্ত কথা। উহাদের বাগান সাফ করা আর ফুরায় না।

রাত পর্যন্ত ক্রিস্টোফা জোসেফার মতো হতভাগা মেয়েদের সঙ্গে বাগান সাফ! তবে ভালর মধ্যে এই যে, এ সব খবর এখনো পর্যন্ত সে স্বয়ং সিলার মুখেই পাইতেছে। এখনো আশা আছে, এখনো উদ্ধারের উপায় আছে। আজকাল কারখানায় কাজ করিতে করিতে মনের ভিতর এই প্রসঙ্গ উঠিলে নিকোলা কেমন এক রকম হইয়া যায়। উহার মনে হয় কে যেন একটা প্রকাণ্ড ইস্ক্রুপের প্যাঁচ কষিয়া উহাদের দু'জনকে কৌশলে তফাত করিয়া ফেলিতেছে।

গরীবের উপর এ কী জুলুম? আপনার বলিতে তাহার আছে তো অতি অল্পই,—সেটুকুও সে নিশ্চিন্ত মনে ভোগ করিতে পাইবে না? নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পাইবে না? সিলার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য,—তাহাকে ধর্মপত্নী করিবার জন্য, নিকোলা প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে; গৃহস্থালীর ভিত্তি পত্তন করিতে সে বিন্দু বিন্দু করিয়া শরীরের সমস্ত রক্ত দান করিতে প্রস্তুত। আর,—আর একজন, যাহার টাকার অভাব নাই, বিবাহের ইচ্ছা থাকিলে, যে, যে কোনো ভদ্রঘরের সুন্দরী মেয়েকে পাইতে পারে সে—পশু, পশু! পশুর অধম, নরহন্তা; সুখের হন্তারক!

এইরূপ দুশ্চিন্তায় নিকোলার দিন কাটিতে লাগিল।

আজকাল সে বর্ষার অন্ধকারকে বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়াছে। বর্ষার কল্যাণে তাহার সিলার সন্ধানে শহর প্রদক্ষিণ বন্ধ হইয়াছে। ইহার পর শীত পড়িবে, বরফ পড়া শুরু হইবে; ব্যস্! নিশ্চিন্ত।

নিকোলা একদিন হিসাব করিয়া দেখিল, নাগাদ নূতন খাতা, তাহার হাতে প্রায় পঁচাত্তর ডলার জমিবে। ইহার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ,—(আর তের) মোট আটান্ন ডলার উহার মায়ের হাতে। শেষবারে টাকা লইবার সময় বার্বারা বলিয়াছে, "কোনো ভয় নেই, দোকানে খুব বিক্রি, বেশ দু'পয়সা আসছে।"

ইহার মধ্যে নিকোলা একদিন ঘর ঠিক করিতে বাহির হইয়াছিল। এক রকম ঠিক করিয়াই আসিয়াছে। ঘরের সঙ্গে আলাদা রান্নাঘরও পাওয়া যাইবে। ভাড়াও বেশী নয়। সব ঠিক। এইবার একদিন হল্‌ম্যান-গৃহিণীর কাছে কথাটা পাড়িতে হইবে। নগদ পঁচাত্তর ডলার, হীগবার্গের সার্টিফিকেট, তাহার উপর বাঁধা রোজগার,—হল্‌ম্যান-গৃহিণী ভিজিবেই ভিজিবে।

বড়দিন ও ছোটদিনের মাঝখানের সপ্তাহে, একদিন নিকোলা মাকে গিয়া বলিল, "ফেব্রুয়ারি মাসে আমার টাকাটা আমায় যোগাড় করে দিতে হবে। টাকাটা পেলে তবে হল্‌ম্যান-গিন্নীর কাছে কথাটা পাড়ব, মনে করেছি।"

বার্বারা চা তৈয়ার করিতেছিল, হঠাৎ উহার মাথাটা কেমন গোলমাল হইয়া গেল। সে বলিল, "তাই তো, তাই তো, আজ হিসেবনিকেশ করতে করতে প্রায় ক্ষেপে যাবার মতো অবস্থা হয়েছে। যাক, চা তৈরী হয়েছে, কেক আছে—তোমার জন্যে রেখেছি, ওগুলো আগে খাও; তারপরে ওসব কথা হবে। বড়দিন—বছরকার দিন, এ তো আর বছরে দু'বার হবে না। আজকের দিন যার যেমন সাধ্য—ভালমন্দ খেতে হয়। যে সংসারে মানুষ হইছি, সেখানে এ রীতির কখ্‌খনো নড়চড় হতে দেখিনি।—তাই তো নিকোলা! এরি মধ্যে তুমি টাকা ফেরত চাইছ! এই বড়দিনের আগেই আমাকে চিনির মহাজনের দেনা শোধ করতে হয়েছে, আমি ভেবেছিলুম ও দেনাটা জুন মাস নাগাদ দিতে হবে, কিন্তু যখন তাগিদ এসে পড়ল তখন শোধ না করে আর পেরে উঠলুম না।—তা তোমার কোনো ভয় নেই; বল না কেন, এখনি টুপি মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়লে টাকার যোগাড় করে আসতে পারি। এমন কি এক বাড়ি ছেড়ে দ্বিতীয় বাড়িতেও পা দিতে হবে না।—খাও, নিকোলা, খাও; বড়দিন বছরকার দিন। টাকার কথা ভাবছ? কোনো ভাবনা নেই। তোমার মা যখন বলেছে—তখন তোমার মোটেই ভাববার দরকার নেই। লাড্‌ভিগ ভারী ভাল ছেলে। আর সেদিন আমায় দেখে টুপি খুলে যখন 'গুড্ মর্নিং' করলে, তখন আমার যে কি আনন্দ হ'ল তা' আর বলতে পারিনি। লাড্‌ভিগ বলে—পয়সার অভাবে বার্বারা কষ্ট পাবে—এ আমি দেখতে পারব না। আমি যদি গিয়ে বলি আমার টাকার দরকার,—আমার ছেলের বিয়ে, তাহলে সে না দিয়ে থাকতে পারবে না। ওকি নিকোলা

অমন করে রইলে কেন? আমি তো বলছি—টাকা তুমি ঠিক সময়ে পাবে। ওকি! ওকি! অমন করে আমার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে রইলে যে?

নিকোলা নিরুত্তর; সে অনেকক্ষণ একেবারে চুপচাপ বসিয়া রহিল শেষে বিরক্ত হইয়া বার্বারা বলিয়া উঠিল—

"ছোটদিনের পরেই দিয়ে দেব, বাপু! এমন জান্‌লে আমি মরে গেলেও তোমার কাছে টাকা চাইতে যেতাম না।"

"না, মা। এখন আমায় টাকা দেবার দরকার নেই; যখন পার দিও। আমি তোমায় এজন্যে আর পীড়াপীড়ি করতে চাই নে। কিন্তু যদি শুনি তুমি লাড্‌ভিগ ভীর্গ্যাণ্ডের কাছে টাকার জন্যে হাত পেতেছ, তবে সেই মুহূর্তে আমাদের সম্বন্ধ পর্যন্ত চুকে যাবে। ইহজন্মের মতো চুকে যাবে। যাক, বিয়ের আয়োজন খুব এগিয়ে দিলে যা হোক! ভাল!"

নিকোলা দরজা খুলিয়া একেবারে রাস্তার বাহির হইয়া পড়িল।

নবম পরিচ্ছেদ

বিবাহের প্রস্তাব

নিকোলার টাকার তাগাদায় অসন্তুষ্ট হইয়া বার্বারা মনে মনে সিলাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিল। ঐ মেয়েটাই তো উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে, নিকোলার মন ভাঙাইয়া লইয়াছে। নহিলে বার্বাবার আজ ভাবনা কিসের? নিকোলার রোজগারের টাকা যদি বার্বারার হাতে পড়িত, তাহা হইলে আর বেচারাকে হিসাবনিকাশের এত ভাবনা ভাবিতে হইত না। তাহা ছাড়া, জিনিস ফুরাইয়া যাইতেছে অথচ পুঁজির টাকা ঠিকমত ভজিতেছে না; ইহাতে সে আরো ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

অনেক পাড়াগেঁয়ে লোক পল্লীগ্রামের ধরনে খাইখরচাটা একরকম হিসাবের মধ্যেই ধরে না। বার্বারাও এই দলের। নিজের সুবিপুল শরীর রক্ষার খাতে দোকানের যে সমস্ত জিনিস খরচ হইতেছে, তাহা সে খর্তব্যের মধ্যে গণ্য করিত না, সুতরাং প্যাকেটগুলি তো খালি হইলই, অধিকন্তু পকেটও পুরিল না। ইহার উপর আবার সন্ধ্যাবেলায় চা-বিস্কুট বিতরণ ছিল। এটাকে সে কতকটা ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনের অঙ্গ বলিয়াই মনে করিত। একগুণ দিলে

একশো গুণ আদায় হইবে, চায়ের মৌতাতে নূতন নূতন খরিদ্দার জুটিবে, এমনি তাহার আশা।

সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই বার্বারার দোকান-ঘর পাড়ার আধা-বয়সী মেয়েদের পরচর্চার আড্ডা হইয়া উঠিল।

বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। কনকনে শীত। বেড়ার খুঁটির মাথায় মাথায় বরফের টুপি। ঝুরো বরফে পথ-ঘাট সমাচ্ছন্ন।

বৈকালের দিকে, চা ধ্বংস করিতে এবং আগুন পোহাইতে একে একে অনেকগুলি প্রৌঢ়া বার্বারার দোকানে আসিয়া জমায়েত হইল।

জোঁকওয়ালী তারাল্‌সেন-গৃহিণী আজিকার সন্ধ্যাসভায় প্রধান বক্তা। বর্তমান সকল ব্যবসায়েরই যে অবনতি ঘটিতেছে, ইহাই তাহার প্রতিপাদ্য।

বিকেন-গৃহিণী (ওরফে ঢেঙা-গিন্নী) কিন্তু উহার মতে ঠিক সায় দিতে পারিল না। সে বলিল, "আর দিদি সেকালেই বা এমন কি ভাল ছিল? আমিও তো আজকের লোক নই, সেকালের কথা আমার কাছে তো আর ছাপা নেই। এই দেখ না, এখনকার কালে কেরোসিন তেল সস্তা হয়ে গরীব লোকের কত সুবিধে হয়েছে, রাতকে দিন করে ফেলেছে। আগেকার কালে লোকে আগুন পোহাবার সময়ে যেটুকু আলো পেত,তাতেই একটু-আধটু সুতো কাটত, রাত্রে অন্য কাজ কববার জো ছিল না। ছেলেগুলো তো বেলা তিনটে থেকে বিছানায় পড়ে পড়ে ক্রমাগত হাই তুলত আর এপাশ-ওপাশ করত। এখন কেরোসিন হয়ে রাত আর দিন সমান হয়ে গেছে। লোকের রোজগারের রাস্তা বেড়ে গেছে।"

"হুঁ! বেড়েছে বইকি! সঙ্গে সঙ্গে জুয়াখেলা, মদ গেলা, রাত্তির বেড়ানোও বেড়েছে।"

"সে তো আর কেরোসিনের দোষ নয়, সে দোষ গ্যাসের। অবিশ্যি গ্যাসের অনেক গুণও আছে, গ্যাসের জোরেই তো কল চলছে, কত লোকের অন্ন দিচ্ছে।"

"হ্যা, বদমায়েশীও শেখাচ্ছে।"

ঢেঙা-গিন্নী জবাব দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ অ্যানি গ্রেভ্‌কে দোকানে ঢুকিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

অ্যানি গ্রেভ্ পাদরী সাহেবের কাছে কর্ম করে, তাহার সামনে কাহারো বেফাঁস কথা কহিবার জো নাই।

ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! অ্যানির চা খাইতে কোনো আপত্তি নাই। আজ আবার তাহার উপর অনেক খাটুনি হইয়াছে। শহরের একজন প্রসিদ্ধ বড়লোকের আজ কবর। শহরের যত বড়লোক আজ সমাধিস্থানে আসিয়াছেন।

"জীয়ন্তে, মানুষ মানুষ চিন্তে পারে না, ম'লে পরে তার মর্যাদা বোঝা যায়। যে গরীবের হয়ে দু'কথা বলে, জীয়ন্তে তার ঢাক ঘাড়ে নেবার ঢের লোক জোটে, কিন্তু ম'লে"—ঢেঙা-গিন্নী চায়ের পেয়ালায় আবার চুমুক দিল। এই অবসরে তারাল্‌সেন-গৃহিণী অন্য কথা পাড়িয়া বিকেন-গৃহিণী ওরফে ঢেঙা-গিন্নীর কথা চাপা দিল। সে বলিল, "গরীবই বল আর বড়লোকই বল, আজকাল সকল ঘরের ছেলেমেয়েই এক এক ধিঙ্গি। কাল সন্ধ্যাবেলা গুটি পাঁচ-ছয় জোঁকের যোগাড় করে ঘরে ফিরছি,—বাজারের কাছে ওষুধের দোকানের সামনে এসে ভাবলুম,—এতখানি যখন বাটপাড়ের হাত এড়িয়ে আসা গেছে, তখন আর ভয় নেই, নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌছব। হঠাৎ কতকগুলো বুড়ো বুড়ো মেয়ে এসে পিছন থেকে এমনি জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে ভয়ে আমার হাত থেকে জোঁকের শিশিটা ছিট্‌কে পড়ে গেল। আমি তাই সামলে গেলুম, অন্য লোক হলে আঁতকে অজ্ঞান হয়ে যেত। ভাগ্যিস্ চাঁদের আলো ছিল, তাই সেগুলোকে আবার কুড়ুতে পারলুম! নইলে সব মেহনত মাটি হ'ত।....কে আবার? ঐ জোসেফা, ক্রিস্টোফা আর আমাদের হল্‌ম্যান-গিন্নীর ধিঙ্গি মেয়ে সিলা। ওর মা ভাবে আমার মেয়ে বুঝি ভারী ভাল, অন্ধকারে তার যে আর এক মূর্তি হয়, সে খবর তো আর রাখে না!"

বার্বারা শেষের কথাগুলি মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিল। সিলার সম্বন্ধে দশে কি বলে, নিকোলাকে তাহা শুনাইয়া দেওয়া চাইই চাই।

"জোঁকের কথা যা তুমি বল্লে, সেটাতে অবিশ্যি মেয়েদের একটু দোষ আছে; তা' আমি অস্বীকার করিনে। তবে কি জান, ছেলেমানুষ—এখন

ওদের রক্ত গরম, এ বয়সে অমন একটু-আধটু হয়েই থাকে। তা'ছাড়া ওরা যদি আমোদ না করবে তো করবে কে? বুড়োরা?"

ঢেঙা-গিন্নীর প্রতিবাদে জোঁকওয়ালী বেজায় চটিয়া উঠিল।

"গেরস্তর মেয়ের পক্ষে রাস্তায় মাতামাতি করে বেড়ানো—এও বুঝি একটা নূতন ফ্যাশান! তা' হবে! আমরা বুড়ো-হুড়ো মানুষ, নূতন ফ্যাশানের মর্ম বুঝিনে।...বলি, হাঁসের পালে মাঝে মাঝে যে শেয়াল ঢোকে, সে খবর কি রাখ?"

"বেশ, বেশ, তাই যদি হয়, তাহলে শেয়ালের উপরেই ঝাল ঝাড়া উচিত; হাঁসের উপর রাগ করে কি হবে? ওই যে ভাড়াই-ওলার ছোকরা বাবু, ওই যে ভেড়া-বাজারের বাজার-সরকার, ওই যে কৌসুলী সাহেবের ছেলে ল্যাড্‌ভিগ, ওদের উপর ঝাল ঝাড়তে পার তবে বলি হাঁ।"

ঠিক এই সময়ে বার্বারা খরিদ্দারকে জিনিস দেখাইতেছিল, হঠাৎ ল্যাড্‌ভিগের নাম শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"ল্যাড্‌ভিগ? ল্যাড্‌ভিগের সম্বন্ধে আমার সামনে কেউ কিছু বলতে পাবে না। অমন ছেলে আর আছে? আমি এক নাগাড়ে চৌদ্দ বছর তাকে হাতে করে মানুষ করেছি; ওর সম্বন্ধে আমি যা জানি তার চেয়ে বেশী কেউ জানে না। ল্যাড্‌ভিগ আমার কি 'ন্যাওটো'ই ছিল। সে সব কথা"—

খরিদ্দার সাবানের জন্য তাগিদ না দিলে বার্বারা আরও খানিকটা ল্যাড্‌ভিগের গুণবর্ণনা করিতে পারিত। কিন্তু কি করিবে খরিদ্দার বেজার হইতেছে; অগত্যা বেচারা মুখ বন্ধ করিয়া সাবানের বাক্স খুলিতে গেল।

জোঁকওয়ালী আবার মেয়েদের লইয়া পড়িল। সন্ধ্যা হইলে কলের মেয়েগুলো যে আরসোলার মতো দরজায় দরজায় মুখ বাড়াইতে থাকে, ইহা সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

অ্যানি গ্রেভ উহার সঙ্গে যোগ দিয়া একধার হইতে সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিল। কোনো কোনো মেয়ের সম্বন্ধে উহারা স্পষ্ট নাম না করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যাহা না-বলিবার তাহাই বলিল। কাহারো সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত হইল; আবার কাহারো নামে নাম ধরিয়াই অসংকোচে কুৎসার কালি লেপন করিতে লাগিল।

বার্বারা আগাগোড়া কান খাড়া করিয়া আছে। সিলার সম্বন্ধে ইহারা কি বলে সেই দিকেই উহার লক্ষ্য। কারণ, সে সমস্ত কথা নিকোলাকে জানাইতে হইবে। আগে থাকিতে সাবধান করিয়া দেওয়া চাই তো!

নিকোলার কাছে, অল্পবয়সী কলের মেয়েদের চরিত্র কীর্তন করিতে গিয়া বার্বারা কোনোদিনই স্পষ্ট করিরা সিলার নাম করে নাই; ততটুকু বুদ্ধি উহার ছিল। নিকোলা এমন না ঠাওরায় যে বার্বারা সিলার নামে উহার কাছে লাগাইতে আসিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত কথা যে ক্রমেই নিকোলার পক্ষে মর্মান্তিক হইয়া উঠিতেছে, ইহা বার্বরা বেশ বুঝিতে পারিত। ইহাই তো সে চায়।

ঢেঙা-গিন্নী, জোঁকওয়ালী প্রভৃতি চলিয়া গেল, সেই রাত্রেই বার্বারা নিকোলাকে তাহাদের সমস্ত মন্তব্য বিবৃত করিয়া বলিল। নিকোলা মুখ ভার করিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল।

চাঁদের আলোয় দলে দলে কিশোরবয়স্ক ছেলেমেয়েরা আনন্দে হল্লা করিতে করিতে চলিয়াছে। মাঝে মাঝে শহরের ভদ্রলোকেদেরও দর্শন পাওয়া যাইতেছে। একজন ছোকরা একটা ঠেলাগাড়ি ঠেলিয়া আনিতেছে। একগাড়ি মেয়ে।

নিকোলা মায়ের কথায় কোনো প্রতিবাদ না করিয়া উঠিয়া গিয়া জানালায় দাঁড়াইল; বার্বারা সেলাই করিতে লাগিল।

নিকোলা দেখিল জানালার নীচে ক্রিস্টোফা ও জোসেফা। নিশ্চয় কাহারো জন্য অপেক্ষা করিতেছে।—বোধ হয় সিলার জন্য। উহাদের উভয়ের মধ্যে কে যে হল্‌ম্যান-গৃহিণীর কাছে সাহস করিয়া সিলাকে আজিকার মতো ছুটি দিবার কথা পাড়িবে, এই লইয়া তর্ক চলিতেছিল।

এই সময়ে আর একটা দল উচ্চহাস্যে পথ মুখরিত করিয়া নিকোলার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

বার্বারা সেলাই বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিল—

"ইশ! কী কলরব! যতক্ষণ জোচ্ছনা ততক্ষণ আর নিস্তার নেই। এ সব ক্রমে হ'ল কি?"

নিকোলার সর্বাঙ্গ আগুন হইয়া উঠিল। সিলা যদি এই সমস্ত দলে মেশে, তবে সে আর ইহজন্মে হাতুড়ি ধরিবে না।

ঐ যে সিলা—গলির মোড়ে ; বোধ হয় বন্ধুদের খুঁজিতেছে।

নিকোলা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

"এই যে! সিলা নাকি?"

"এই যে! নিকোলা! ক্রিস্টোফাকে এদিকে দেখেছ? জোসেফাকে?—দেখনি? ভারী একটা কথা ছিল!…আচ্ছা, কেমন করে এলুম বল দেখি? আমাদের সেই বেরালটাকে ধরতে এসেছি। আমিই সেটাকে তাড়িয়ে বার করেছিলুম। তারপর উঠানে চট্ করে একটা কাঠের টব চাপা দিয়ে রেখে এসেছি। মা তা' দেখতে পায়নি। এখন 'ম্যাও' 'ম্যাও' না করলে বাঁচি।"

সিলা সশঙ্কভাবে আর একবার চতুর্দিকে চাহিল।

"বারবার করে বল্লে,—আমার জন্যে অপেক্ষা করবেই অথচ—"

"অথচ, চলে গেল—সোজা।"

"না, না, বোধ হয় তারা এখনো আসেনি, এলে অপেক্ষা করতই। কিন্তু আমি আর বেশীক্ষণ বাইরে থাকলে এখনি মা এসে হাজির হবে। আমি চল্লুম।…নিক! তুমি যদি একটু দাঁড়াও এইখানে; তারা এলে বোলো আজ আমি কোনো মতেই বেরুতে পারব না। কাল মা যাবে আন্টনিদের কাপড় ইস্ত্রি করতে, রাত্রে ফিরবে না। আমিও দেব দৌড়। তুমি কিন্তু একটু এখানটা ঘুরে, তাদের সঙ্গে দেখা করে, সব কথা ভাল করে বোলো; নইলে তারা আমায় ভারী দুষবে!"

"বেশ সিলা, বাঃ! তুমি এখন একেবারে স্বাধীন হতে চাও। তোমাকে ওরা নিজের দলে না টেনে ছাড়লে না দেখছি। কিন্তু যাদের ইজ্জতের ভয় আছে, তারা যে কেমন করে ওদের সঙ্গে মেশে এ আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনে।"

"ইজ্জত? যাদের ইজ্জত আছে তারা বুঝি কেবল দোলাই মুড়ি দিয়ে ঠুঁটো কাঠের পুতুলের মতো ঠুকঠুক করে বেড়ায়? হাসেও না? কাঁদেও না? নাচেও না? দেখ, আড়ষ্ট হয়ে ভয়ে ভয়ে গণ্ডির ভিতর চিমটের মতো পা ফেলে চলতে, আমি কখ্‌খনো শিখব না, এতে তুমি যাই বল আর যাই কও। আড়ষ্ট হয়েই যদি জীবন কেটে গেল তবে বেঁচে সুখ কি? ম'লেই তো মঙ্গল।"

নিকোলা মাথা নাড়িয়া বলিল, "যা বলছ, সব ঠিক,—যদি রাস্তার অত পাজী জানোয়ারের উৎপাত না থাকত! কি জান, তারাও শিকার চায়; কাজেই গরীব মানুষের নানাদিকে চোখ রাখতে হয়, সকল দিক বাঁচিয়ে চলতে হয়। দেখ সিলা এ উদ্বেগ আর সহ্য হয় না। এখন তোমার যদি মত থাকে তো বল, আজ—এখনি তোমার মা'র কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাবটা করে ফেলি।"

আকস্মিক আতঙ্কে সিলা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "পাগল! তুমি ক্ষেপেছ! না, না, না; মাকে তুমি জান না? তুমি কি আগাগোড়া সকল কথাই ভুলে গেলে? ও কথা বলবার ঢের সময় আছে, আরো কিছু যাক, তখন বোলো। ঢের সময় আছে।"

"ঢের সময় আছে? না সিলা, আমার মনে হচ্ছে, আর একটুও দেরি করা উচিত নয়। ও আমি জোর করে মন বেঁধে, চটপট বলে ফেলতে চাই

"তারপর? বাড়িতে আমার কি দুর্দশা হবে তা' বল দেখি? আর এ পোশাকে এমন সময়ে তুমি মা'র কাছে কি করে যাবে? সে কিছুতেই হবে না।"

"ভয় কি, মিস্টার নিকোলা, ভয় কি? আমার সুবোধ মেয়ে অসহায় বিধবা মায়ের সুনাম কেমন করে রক্ষা করছেন, সেটা না হয় নিজের চোখেই দেখলুম, তাতেই বা ক্ষতি কি?"

তাই তো! এ যে হল্ম্যান-গৃহিণীর আওয়াজ। সে বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই। সে কখন যে নিঃশব্দে আসিয়া একেবারে জাহাজের মাস্তুলের মতো সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা কেহই টের পায় নাই।

"যখন কর্তা মারা গেলেন, ভাবলুম এর চেয়ে বুঝি আর কষ্টের বিষয় কিছু নেই। আজ আমার সে ভুল ঘুচ্‌ল। আমার মেয়ে!—সিলা—আমায় না ব'লে এই অন্ধকারে বাড়ির বার হয়ে বরফের মাঝখানে বেটাছেলের সঙ্গে কথা!…সিলা! চলে এস বলছি, চলে এস; এখুনি চলে এস বলছি এস!"

সিলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ক্রোধে, ঘৃণায়, অবজ্ঞায়, তাচ্ছিল্যে, ক্ষোভে হল্ম্যান-গৃহিণীর কণ্ঠস্বর বিকট হইয়া উঠিয়াছে।

নিকোলা কিন্তু এই চটোপুটিতে পূর্বের মতো আর ভয় পাইল না। সে বলিল—

"দেখুন, আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ঠিক ইচ্ছা ছিল না। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। চলুন, আপনার বাড়ি গিয়েই সব বলব।"

"যা বলতে হয় তা এইখানেই বোধ হয় বলা যেতে পারে, এইখানে দাঁড়িয়েই বলা যেতে পারে।···মিলা, এস এই দিকে।"

"হ্যাঁ, এইখানেই বলা যেতে পারে, তবে সমস্ত পরিষ্কার করে বলতে হবে সেই জন্যেই বলছিলুম।"

হল্যান্ড-গৃহিণী পথের মোড় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং তাহাদের মিলার উপর তর্জন করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ সহ্য করিয়া থাকিবার আতিশয্যে নৈরাশ্যের দুঃসাহসে মিলা অবশেষে একরূপ চোখ বুজিয়াই নিকোলার পার্শ্বে আসিয়া উহার হাতখানি দুই হাতে ধরিয়া পা দৃঢ় করিয়া দাঁড়াইল।

"হ্যাঁ, ম্যাডাম, যা দেখছেন ঠিক এই। আমাদের ছেলেবেলা থেকে পরস্পরের প্রতি ঠিক এই ভাব। আজকে আপনার কাছে আমি এই কথাই জানাতে যাচ্ছিলুম। আপনি এখন মত করলেই হয়। আমি পাকা মিস্ত্রী হয়েছি, ভাল ভাল সার্টিফিকেট পেয়েছি, তা'ছাড়া আমি কোনো নেশা করিনে। এ সমস্ত কথা মনে ক'রে আপনাকে বিবেচনা করতে হবে—"

অবসন্ন মিলা আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, সে নিকোলাকে ও শ্রীমতী হল্যান্ডকে ঠেলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে একেবারে সোজা বাড়ির দিকে চলিল। পিছনে পিছনে হল্যান্ড-গৃহিণীও চলিল, এবং নিকোলাও চলিল।

মিলা ঘরে ঢুকিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। নিকোলা বসিল না। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গাম্ভীর্যের অবতার হল্যান্ড-গৃহিণীর কাছে ভবিষ্যৎ জীবনের আশা-ভরসার কথা উৎসাহের সহিত বিবৃত করিতে লাগিল।

অনাথা বিধবার একমাত্র অবলম্বন মিলাকে কাড়িয়া লইয়া নিকোলা যে ভয়ংকর অন্যায় কার্য করিতেছে, এই কথাটাই হল্যান্ড-গৃহিণী খুব জোরালো করিয়া বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া থামিয়া গেল। সহসা উহার

চোখ খুলিয়া গেল। সে ভাবিল, নিকোলা যাহা বলিতেছে তাহা সত্যই বটে, সে যদি বড় কারিগরই হয়, তবে তাহাকে জামাই করিয়া লইলে ভবিষ্যতের আর ভাবনা থাকে না। তাহা হইলে নিকোলার ঘরেই তো আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে।

এই কথাটা ফস্ করিয়া মাথায় আসায় ভিতরে ভিতরে মনটা নরম হইলেও, বাহিরে সে বড় একটা নরম ভাব দেখাইল না। ইহার পরেও সে রীতিমতো দরদস্তর করিতে ছাড়িল না। সিলার বিবাহের সম্বন্ধে তাহার যে অনেক বড় আশা ছিল, এমন কথাও বলিল।

সে যাহাই হউক, ন্যূনপক্ষে অন্ততঃ একশত ডলার না দেখাইতে পারিলে নিকোলার যে কোনো আশা-ভরসাই নাই, এ কথা সে স্পষ্টই বলিয়া দিল। হল্‌ম্যানের বিবাহের পূর্বে হল্‌ম্যানও ঠিক অতগুলি ডলারের মালিক ছিল। তবেই না সে হল্‌ম্যানের গৃহিণী হইতে রাজী হয়। এ যতদিন যোগাড় না হয়, ততদিন সিলার সঙ্গে দেখাশুনা বন্ধ।

একশত ডলার!—যাক! নিকোলা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

বার্বারাকে সে এই সুখবরটা না দিয়া থাকিতে পারিল না। সিলাদের বাড়ি হইতে বিদায় লইয়া সে একেবারে বার্বারার দরজায় গিয়া হাজির হইল এবং কড়া নাড়িয়া তাহাকে জাগাইয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

বার্বারা কথাটা যে কি ভাবে লইল তাহা ঠিক বোঝা গেল না; সে নিজেও নিজের মন বুঝিতে পারিল বলিয়া মনে হয় না। অনেকক্ষণ বিছানায় এ পাশ ও পাশ করিয়া সে হঠাৎ লেপ ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। তাই তো! এবার তো সে নিকোলার সংসারে 'গিন্নীবান্নী' হইয়া থাকিতে পারে। কি আশ্চর্য! এ কথাটা এতক্ষণ তাহার মাথায় প্রবেশ করে নাই!

কুক্ষণে সে দোকান করিতে গিয়াছিল। দোকানই এখন তাহাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। হায়! বার্বারা যে নিজেই দোকানটা গ্রাস করিতেছে, এ কথাটা তাহাকে কেহ বুঝাইয়া দেয় নাই। এখন দোকানপাট তুলিয়া দিয়া সময় থাকিতে সে সাবধান হইবে। সিলা ছেলেমানুষ, সংসারের কিছুই জানে না। বার্বারা না থাকিলে কিছুতেই সে পাকা গৃহিণী হইতে পারিবে না। আর নিকোলার কথাও বলি, মাকে ভরণপোষণ করা তো সন্তানের কর্তব্যই।

পরবর্তী রবিবারে হল্‌ম্যান-গৃহিণী অভ্যাসমত বার্বারার দোকানে চা খাইতে আসিল। বিবাহ সম্বন্ধে কিন্তু দু'জনের মধ্যে কেহই কোনো উচ্চবাচ্য করিল না। অনেকক্ষণ পরে কথায় কথায় নিকোলার কথা উঠিলে বার্বারা বলিল, "ছেলেকে ছেড়ে অনেক দিন তফাত হয়ে রয়েছি। এবার ভেবেছি বোন্, এই শীতটা বাদে মায়ে-বেটায় ঐ সামনের ঘরটাতে উঠে গিয়ে নতুন সংসার গুছিয়ে নেব।"

হঠাৎ হল্‌ম্যান-গৃহিণীর মুখ অন্ধকার হইয়া গেল, সে আর চা গিলিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি শুধু শুষ্ক 'ধন্যবাদ' দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। এই ঘটনার পর দু'জনের মধ্যে ভিতরে ভিতরে বেশ একটু মন কষাকষি চলিল, বাহিরে অবশ্য তাহার কোনো লক্ষণ দেখা যাইত না। এমন কি ইহাতে হল্‌ম্যান-গৃহিণীর চায়ের স্পৃহাটা একটুও কমিল না এবং যাতায়াতও বন্ধ হইল না, বরং বাড়িয়াই উঠিল। কেবল যে কথাটা উহাদের উভয়েরই ঠোঁটের আগায় সর্বদাই আসিয়া উপস্থিত হইত, সেই কথাটাই চাপা রহিয়া গেল।

নিকোলা ও সিলার ভাবী গৃহস্থালীতে শূন্য গৃহিণীর পদ লইয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে কে যে জয়ী হইবে তাহা বলা দুষ্কর। দু'জনেই পাকা খেলোয়াড়ের মতো 'বড়ে'র চাল চালিতে লাগিল।

এক বিষয়ে উহাদের দুইজনেরই মতের ভারী ঐক্য ছিল। উহাদের উভয়েরই মনোগত কথাটা এই যে, "নিজে যদি এই সংসারের কর্ত্রী হইতে না পাই, তবে অন্ততঃ প্রতিপক্ষকেও কর্ত্রী হইতে দিব না।"

এমনি করিয়া দুই ভাবী বৈবাহিকা পরস্পরের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন এবং পরস্পরের সমস্ত সংকল্প পণ্ড করিবার পন্থা খুঁজিতেছিলেন। অথচ নিকোলা কিংবা সিলা এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিতেছিল না।

দশম পরিচ্ছেদ

উন্নতির দশা

মায়ের চোখে ধূলা দিয়া সিলা যে এতদিন পর্যন্ত নিকোলার সঙ্গে ভাব রাখিতে পারিয়াছে, ইহাতে হল্‌ম্যান-গৃহিণী মনে মনে ভারী বিস্মিত হইয়া

গেল। এখন হইতে সে সিলার গতিবিধির উপর আরো কড়া নজর রাখিতে শুরু করিল। নিকোলার তো প্রবেশ নিষেধ।

সমর্থা মেয়ে নিষ্কর্মা থাকিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। এখন হইতে সিলাকে দস্তুরমতো খাটাইতে হইবে; কাজেকর্মে থাকিলে বাহিরের কথা মনে থাকিবে না। শুধু দুধ আনা, মোজা সেলাই নয়,—কাজের মতো কাজ, হাড়ভাঙা খাটুনি।

নিকোলা দেখিল, সম্বন্ধ এক রকম স্থির হইয়া গেল বটে, কিন্তু দেখাশুনার ভারী অসুবিধা হইল। না হোক দেখা সাক্ষাৎ,—সম্বন্ধ তো স্থির,—নিকোলা তাহাতেই খুশী। এখন পুরুষবাচ্চার মতো খাটিয়া-খুটিয়া একশত ডলার জমাইতে পারিলেই হয়। ভাবিতে ভাবিতে নিকোলার হাতে হাতুড়িটা যেন কলের বেগে চলিতে লাগিল।

হল্‌ম্যান-গৃহিণীর অতি-সতর্কতায় নিকোলা সন্তুষ্ট হইতে না পারুক, কতকটা নিশ্চিন্ত যে হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। ক্রিস্টোফা জোসেফাদের কুসংসর্গ হইতে বেচারী সিলা এবারের মতো রক্ষা পাইল। সন্ধ্যাবেলার মাতামাতি একেবারে বন্ধ। কারখানা হইতে ফিরিবার সময় হঠাৎ একদিন বার্বারার দোকান হইতে ল্যাড্‌ভিগকে বাহির হইতে দেখিয়া নিকোলা চমকিয়া উঠিল।

"এই সে! না?" বার্বারার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া কথা কয়টা বলিয়াই,—যেন ঠিক নিকোলাকে চিনিতে পারিতেছে না,—এই ভাবে উহার দিকে অর্ধ-মুদিত চক্ষে চাহিতে চাহিতে, ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ল্যাড্‌ভিগ চলিয়া গেল।

"মা! ও এখানে কি করতে এসেছিল?"

"কই? কিছু না?"

"তুমি টাকা ধার চেয়েছ? ঠিক করে বল।"

"না গো না,—এক পয়সাও চাইনি। টাকার খুব দরকার, তবুও চাইনি।"

"ও বলছিল কি?"

"কি আবার বলবে, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, দোকান থেকে চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে গেল।...এতে বোধ হয় তোমার অপমান করা হয়নি! আর, ওকে

ঢুকতে মানা করে কারো যে বেশী সম্মান বৃদ্ধি হবে তাও তো মনে হচ্ছে না।" বার্বারা মনে মনে ক্রমশঃ গরম হইয়া উঠিতেছিল।

"না মা, আমি ওকে ঢুক্‌তে মানা করতে পারিনে। কিন্তু মনে রেখো যে, যদি শুনতে পাই তুমি ওর কাছে টাকা ধার করেছ, তাহলে আর মুখ দেখাদেখি থাকবে না।"

"পাগল! পাগল! এত অল্পে তুমি রেগে ওঠ, নিকোলা!...ওর কাছে কেন টাকা চাইব? তুমি যখন একবার মানা করে দিয়েছ, তখন চাইবার দরকার? বলিতে বলিতে হঠাৎ পিছন ফিরিয়া বার্বারা তাহার মুঠা হইতে কি একটা জিনিস বুকের কাপড়ে লুকাইয়া ফেলিল।

"ও আমার বিষয় কী বলছিল?"

"কই না!"

"বলছিল বইকি, মা!"

"তোমার কথা?...ও!...হ্যাঁ, হ্যাঁ; আমিই বলছিলুম যে, হল্‌ম্যান-গিন্নীর কথামতো তুমি এখন উঠে-পড়ে টাকা জমাতে শুরু করেছ, আর আজ-কাল খুব খাটছ; তাইতে তোমার কথা উঠলো।"

"সিলার কথাও হ'ল।"

"উঁ—হুঁ। ও সে আগেই শুনেছে;—এ পাড়ায় তো আর গেজেটের অভাব নেই, সে কথা ও আগেই শুনেছে।"

"তুমি বললেও ক্ষতি ছিল না। সিলা যে এখন বাগ্‌দত্তা হয়ে আছে, সে কথা ওর জেনে থাকা উচিত।"

"আমিও তাই বলিছি,...ও কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করলে বলে বোধ হ'ল না।"

"তাই নাকি? বটে!" নিকোলা জানালার ধারে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ল্যাড্‌ভিগের এখন মতলবটা কি?

নিকোলার ভাবনার অন্ত ছিল না। এদিকে তো এই; ওদিকে আবার যে কারখানায় এখন সে কাজ করে, সেখানে বাইসম্যানের কর্মখালি হইবার সম্ভাবনা হওয়ায় ভারী একটা গোলমাল চলিতেছিল। মনিব-গৃহিণী অনেকবার নিকোলাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া বলেন নাই। কারণ

পুরানো বাইসম্যানের বিদায় লইতেও দেরি আছে, সে গ্রীষ্মের পর ভিন্ন যাইবে না। কারখানায় ইহারি মধ্যে গোলমাল উঠিয়াছে—"বল কি? আমাদের ওলফ্ বাইসম্যান হবে না?···আচ্ছা না হোক, ওকে ঠেলে যে বাইসম্যান হতে চায়, তাকে কিন্তু একলাই কারখানা চালাতে হবে, আমরা কেউ তার তাঁবেদার হয়ে থাকব না। ওলফের সঙ্গে সঙ্গে সব বেরিয়ে চলে যাব।" এই রকমের কথা আজকাল নিকোলা প্রায়ই শুনিতে পায়। নিকোলার উপর সকলেই চটা,—নিকোলা মদ খায় না, কামাই করে না, কাজে ফাঁকি দেয় না, উহাদের দলে ভিড়ে না—ইহা কি কম অপরাধ!

নূতন কারখানায় নিকোলা একটিও সঙ্গী পায় নাই,—বন্ধু তো দূরের কথা। সুতরাং এত লোক থাকিতে হঠাৎ সে বাইসম্যান হইবার সম্ভাবনা হওয়ায় খুশী তো কেহ হইলই না, উপরন্তু উহার জীবনের পুরাতন কাহিনী লইয়া খুব একটা ঘোঁট চলিতে লাগিল। চোর অপবাদে কবে সে পুলিশের হাতে পড়িয়াছিল, সে কথাটা হইতে আরম্ভ করিয়া ছেলেবেলায় কবে সে বান্-হাউসে তেরপল মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিল সে কথাটা পর্যন্ত,—কোনো কথাই উহাদের আলোচনা হইতে বাদ পড়িল না।

এই সমস্ত অপমানসূচক পুরাতন কাহিনীর পুনঃপুনঃ আন্দোলনে নিকোলা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। লোকে তাহার জীবনের পূর্বকাহিনী ভুলিয়া যাক,—এই ছিল নিকোলার অন্তরের কামনা, কিন্তু লোকে তাহা ভুলিত না। এই সমস্ত আলোচনা ক্রমশঃ নিকোলার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তবুও অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া দিনের পর দিন সে কারখানায় কাজ করিতে লাগিল, মনিব-গৃহিণীর কাছে হাজিরা দেওয়াও বন্ধ হইল না।

শেষে একদিন অনেক্ষণ ধরিয়া চশমা সাফ করিয়া গলা খাঁকার দিয়া অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মনিব-গৃহিণী বলিলেন, "দেখ বাপু, তুমি বেশ কাজের লোক, তা আমি জানি। কিন্তু অনেকে বলে, ওলফ্ বড় ভাল লোক; খুব বিশ্বাসী। আর দেখ, আমি এখন বুড়ো হয়ে পড়েছি, একজন বিশ্বাসী লোকেরই বিশেষ দরকার,—না, না, তুমি যে বিশ্বাসী নও, এমন কথা আমি বলছিনে,—আচ্ছা, আজ যাও, ভেবে দেখি,—ভাল করে চারিদিক ভেবে দেখি।"

যে আশায় নির্ভর করিয়া হল্‌ম্যান-গৃহিণীর কাছে নিকোলা বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে, মনিব-গৃহিণীর এই জবাবে তাহা একরূপ ধূলিসাৎ হইয়াই গেল।

তার পরদিন নিকোলা কারখানায় যাইতেই সবাই গা-টেপাটিপি করিয়া হাসিতে লাগিল। নিকোলা বুঝিল, মনিব-গৃহিণী যে একরকম ঝাড়িয়া জবাব দিয়াছেন, সে খবর উহারা রাখে। সে যাহাই হোক, নিকোলা অত সহজে দাবী ছাড়িতেছে না। অত সহজে সে দমিবার পাত্র নয়।

ওলফ্‌ এমনি ভাব দেখাইল, যেন কিছু হয় নাই। সে অতীব ভদ্রভাবে নিকোলার কাজের সাহায্য করিতে গেল।

নিকোলা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কাজের সময় আমি কাউকে দালালি করতে ডাকিনি; আমি নিজেও কারু কাজের উপর খোদকারি ফলাই নে। যে ভাল চায় সে সরে যাক, নইলে পিটুনির চোটে তার পিটখানা এখুনি রাঙা লোহার মতো গরম হয়ে উঠবে।"

সবাই নিস্তব্ধ, কেহ জবাব করিতে সাহস করিল না।

টিফিনের সময়ে কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল। নিকোলা ওলফ্‌কে মারিবে বলিয়া শাসাইয়াছে,—সবাই সাক্ষী! হাতুড়ি দিয়া লোকটা শুধু লোহাই পিটে না, হাড়ও গুঁড়াইতে পারে! লোকটা কি! মানুষ?

নিকোলা উহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। ওস্তাদ হীগবার্গ পর্যন্ত কখনো নিকোলার কোনো খুঁত পায় নাই। কুছ্‌পরোয়া নেহি;—নিকোলা বাইসম্যানির আশায় একরূপ জলাঞ্জলি দিয়াই দৈনিক কাজকর্ম করিতে লাগিল।

নিকোলা হীগবার্গকে মধ্যস্থ মানিবে; ওস্তাদ যাহাকে পছন্দ করে সেই বাইসম্যান হোক। শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবই সে মনিব-গৃহিণীর কাছে করিবে।

এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে দুই মাস কাটিয়া গেল।

মনিব-ঠাকুরানীর মতলব কি? আর তো বাইসম্যান না হইলে কারখানা চলে না। যাহাকে হোক বাহাল করুন!

ইহারও পরে একদিন সকালে এক চিরকুটে নূতন বাইসম্যানের নাম লিখিয়া মনিব-ঠাকুরানী একজন লোকের মারফত কারখানায় পাঠাইয়া দিলেন।

গ্রীষ্মকালের সুদীর্ঘ দিনের অবসানে সন্ধ্যা নামিতেছে। হল্‌ম্যান-গৃহিণীর বাসাবাড়ির ছোট ছোট জানালাগুলি আগাগোড়া সব খোলা। জানালা দিয়া যাহাদের দেখা যাইতেছে, তাহাদের সকলেরই পোশাক অল্পবিস্তর পাতলা, অল্পবিস্তর ঢিলাঢালা। নিশ্বাসের মতো মৃদু বাতাসে দড়ির উপরকার কাপড়গুলা মাঝে মাঝে অল্প দুলিয়া উঠিতেছে।

নীচেকার তলায় একটা জানালার পাশে, জলের কল খুলিয়া দিয়া জামার আস্তিন গুটাইয়া একটি ছিপছিপে মেয়ে এক টব কাপড় জামা কাচিতেছে। মাঝে মাঝে তাহার মুখও দেখা যাইতেছে। মেয়েটি হঠাৎ চমকিয়া কাপড় কাচা বন্ধ করিল।

বিজয়গর্বে টুপিটা একেবারে মাথার পিছনের দিকে ঠেলিয়া দিয়া নিকোলা হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

"দুনিয়া বেশ জায়গা, সিলা! বেশ জায়গা; মানিয়ে নিতে পারলেই হয়। মুরুব্বি যদি নাই থাকে, তবে নিজেই নিজের মুরুব্বি হয়ে পড়তে হয়। নিজেই নিজের মুরুব্বি!"

"আচ্ছা নিকোলা, মা যে বাড়ি নেই তা কি করে জানলে তুমি?

"হুঁঃ! আমি যা জানিনি এমন কিছু আছে নাকি!···তবে শোনো, আমার মা'র মুখে শুনতে পেলুম যে, তোমার মা আজ বাড়ি নেই; আণ্টনিদের বাড়ি কাপড় ইস্ত্রি করতে গেছে। বাস্!···তাই তো! সন্ধ্যা হয়ে এল;··· দেখ সিলা, তুমি হয়তো শুনে খুশী হবে,—আমি বাইসম্যান হয়েছি। আজ সকালে মনিব-ঠাকরুন আমাকেই বহাল করেছেন। তার মানে মাসিক আরো দশ ডলার ক'রে বেশী পাওয়া যাবে আর কি!"

"বাইসম্যান? সত্যি? অ্যাঁ! বল কি?···সত্যি!" সিলা কাপড়ের টব ফেলিয়া নিকোলার কাছে সরিয়া আসিল।

"এস, এস, তোমার মুখ চোখ ধুয়ে দিই, যে কালিঝুলি মেখেছ! ওর ভিতর থেকে বাইসম্যানকে আমি চিনে উঠতে পারছি নে!···সত্যি? সত্যি

বাইসম্যান হয়েছ ?···তাহলে ওলফ্ হ'ল না।···আচ্ছা, অন্য মিস্ত্রীরা এখন আর তোমার মনিব-ঠাকরুনকে ভয় দেখাচ্ছে না? তোমার সম্বন্ধে পাঁচ কথা লাগাচ্ছে না ?"

"বোধ হয় হীগবার্গ সব ঠিক করে দিয়েছে। নইলে যে রকম লাগাতে শুরু করেছিল, তাতে কি আর হ'ত ?"

"সেই—যে থেকে ওলফের হাতের কাজ তোমাকে ফের ভেঙে গড়তে হুকুম হয়, সেই থেকে ওরা চটে আছে। তোমার এই উন্নতিতে হিংসেয় এইবার সব ফেটে মরবে আর কি। এখন আবার নতুন করে তোমায় কোনো ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা না করলে বাঁচি।"

"নাঃ! আর কোনো গোল হবে না। দুনিয়া খাসা জায়গা, যে কাজের লোক সেই কাজ পায়।···আজ সকালেই সইটই সব হয়ে গেছে ; বাঁচা গেছে। এইবার টাকাটা চটপট জমিয়ে ফেলতে পারব। আর দেরি হলে মুশকিলে পড়তে হ'ত। মা যে টাকাটা নিয়েছিল—সে—সে তো হয়ে গেছে। মা'র ব্যবসাতে বোধ হয় উল্‌টা দিকে লাভ হচ্ছে!

"হ্যাঁ! এতক্ষণে! দেখ দেখি,—মুখখানি যেন ঝকঝক করছে।"

"কারখানা থেকে সিধে তোমার কাছে চলে এসেছি—খবরটা দিতে। রাস্তায় মাকেও খবরটা দিয়ে এসেছি—বলে এসেছি,—আজ রাত্রের জন্যে দুটো ম্যাকারেল মাছ কিনতে যাচ্ছি। আজ আবার দু'নৌকা বোঝাই ম্যাকারেল এসেছে।"

সিলার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—খবরের মতো খবর বটে। সিলা ও নিকোলা উভয়েই শৈশব হইতে শহরে বাস করিতেছে। সুতরাং ম্যাকারেল আসার সঙ্গে তাহাদের অনেক স্মৃতি জড়িত ; বিশেষতঃ ছেলেবেলায় জেঠির ধারেই তাহাদের বাসা ছিল।

সিলা অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি গায়ের কাপড়খানা নিয়ে তোমার সঙ্গে যাব? যাই, কি বল? তুমি ওই মোড়ে গিয়ে দাঁড়াও, পাড়ার ভিতরটা আমাদের একসঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না ; দাঁড়িয়ো, বুঝলে ? আমি এলুম বলে ?"

সিলা উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছিল, সংযমের চেষ্টা অসম্ভব। তাহার উপর নিকোলার আজ মাহিনা বাড়িয়াছে! সে আজ বাইসম্যান!

সিলা তাড়াতাড়ি নীল ছিটের পোশাকটা পরিয়া গায়ের কাপড় জড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং নিকোলার পিছনে পিছনে চলিল।

অল্প দূরে গিয়াই উহারা একসঙ্গে চলিতে লাগিল। সিলার সেই আগেকার মতো স্ফূর্তি, নিকোলার সেই তন্ময় দৃষ্টি। কোলাহলের মধ্যে ধূলার ভিতর দিয়া উহারা চলিয়াছে, নিকোলা কিন্তু দেখিতেছে শুধু সিলাকে ;—হাস্যময়ী, লঘুহৃদয়া, কৃষ্ণনয়না সিলাকে।

ম্যাকারেলের আমদানীতে রাস্তায় ঘাটে আজ বেজায় ভিড়। পুলের উপরে কত লোক রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া মাছের নৌকা দেখিতেছে এবং মাঝে মাঝে পিছন হইতে ধাক্কা খাইয়া বিরক্তভাবে ঘাড় ফিরাইতেছে। আজ রাত্রে শহরসুদ্ধ লোক ম্যাকারেল খাইবে।

এই সূক্ষ্ম পুচ্ছ, বিদ্যুদ্‌গতি, সমুদ্রচারী, নীলহরিৎ ম্যাকারেল আজ দুই দিন যাবৎ বাজারের শোভাবর্ধন করিতেছে। একদিন পূর্বেও ইহার আমদানী এত অল্প ছিল যে, শহরের সকল বড়লোকের পাতে পড়িয়াছিল কিনা সন্দেহ। হঠাৎ 'হ্বাল' দ্বীপ হইতে উপর্যুপরি একেবারে দুই-তিন নৌকা আসিয়া পড়াতে বাজার একেবারে নামিয়া গিয়াছে। এখন প্রত্যেকটার দাম দুই পেন্স আড়াই পেন্স মাত্র। সুতরাং মুটে-মজুর সকলের ভাগ্যেই আজ ম্যাকারেল।

আজ শহরের প্রত্যেক হাঁড়িতে ম্যাকারেল, প্রত্যেক কটাহে ম্যাকারেল, প্রত্যেক কেটলিতে ম্যাকারেল। বন্দরে প্রত্যেক জাহাজে ম্যাকারেল, প্রত্যেক নৌকায় ম্যাকারেল, মাঝি-মাল্লাদের প্রত্যেক সানকিতে ম্যাকারেল। এই গরমের দিনে প্রত্যেকের হাতেই দুই-তিনটা মাছ। ভাজা ম্যাকারেলের গন্ধে আজ সারা শহরটার হাওয়া ভরপুর।

মাছওয়ালা বলে, "যে গরম, আজ বেচিতে না পারিলে কাল সব পচিয়া যাইবে।" 'জন্ম জন্ম গরম পড়ুক, গরীব লোক খাইয়া বাঁচুক।' খরিদ্দারের মুখে ঐ এক কথা।

নিকোলা ও সিলা একেবারে নৌকার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাছের দর করিতেছিল। সিলা এ বিষয়ে খুব পটু, ছেলেবেলা হইতে তাহার এ বিষয়ে বেশ একটু দক্ষতা আছে। মেছুনী তাহার হাতে যে মাছ দুইটা তুলিয়া

দিয়াছিল, শিলা সে ছুইটা নৌকার উপর ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "না বাছা, এ শুখিয়েপত্ত চিম্‌সে মাছ আমার চাইনে। ঐ তলা থেকে তুলে দাও দেখি,— হ্যাঁ, ঐ—ঐ ছুটো।"

শিলা টিপিয়া-টুপিয়া বেশ করিয়া দেখিল, মাছ ছুইটা নরম হইয়া যায় নাই।

নিকোলা দাম দিবার জন্ত পকেটে হাত দিয়াছে, এমন সময়ে তাচ্ছিল্যের ভাবে শিলা মাছ ছুইটা আবার নৌকার পাটায় ফেলিয়া দিল।

"এঃ! এ যে বাসি! চোখ ছুটো একেবারে কড়ির মতো হয়ে গেছে!"

"এই চমৎকার"—

"তুমি জান না নিকোলা, তুমি কিছু চেন না!—তা' দেখ বাছা, এ মাছ যদি আমাদের ঘাড়ে নিতান্তই চাপিয়ে দিতে চাও, তো ও দামে হবে না, ছ' এক পয়সা কমিয়ে নিতে হবে।"

শেষে ছুই পেন্স করিয়া চারি পেন্সেই মেছুনী রাজী হইল।

বার্বার দরজায় দাঁড়াইয়া নিকোলার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ সে দেখিল দূরে শিলা, তাহার পিছনে একজোড়া ম্যাকারেল হাতে নিকোলা।

বার্বারা শিলাকে মাছ চাখিবার নিমন্ত্রণ করিল। বার্বারা খাইতে ও খাওয়াইতে সমান মজবুত।

সেদিন সারাটা সন্ধ্যা বার্বারার তোলা উহুনে 'ছ্যাক' 'ছোঁক' শব্দে ম্যাকারেল ভাজা চলিতে লাগিল। তাহার গন্ধে ক্ষুধাটাও একেবারে তাজা হইয়া উঠিল।

বার্বারা মোটা মানুষ,—হাত তেমন চটপট চলে না,—হাতও নড়ে না। শিলা হাতে হাতে যোগাড় দেওয়াতে একরকম করিয়া সেদিনের রন্ধন-ব্যাপার চুকিল।

এইবার গরম গরম কড়া হইতে তুলিয়া পাউরুটি দিয়া ভাজা মাছ খাইবার পালা।

ঘর-দালানের তপ্ত দেওয়াল মৃদুমন্দ সন্ধ্যার হাওয়ায় ক্রমে জুড়াইয়া

আসিতেছে। যে তিনটি প্রাণী ঘরের মধ্যে ম্যাকারেল খাইতেছে, তাহাদের পক্ষে এ রাত্রি উৎসবের রাত্রি।

নিকোলা আজ বাইসম্যান, কারিগরের রাজা!

একাদশ পরিচ্ছেদ

আবার মুলতবী

আজকাল মায়ের ভয়ে বাড়িতে সিলার টুঁ শব্দ করিবার জো নাই; কারখানায় তবু বেচারা পাঁচজনের সঙ্গে কথা কহিয়া বাঁচে।

এখন সে ক্রিস্টোফা-জোসেফাদের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা বেড়াইতে পায় না। বেড়ানোর আমোদ অন্য রূপে মিটায়। সিলা উহাদের সান্ধ্য-কাহিনীর বর্ণনা শোনে। দুধের সাধ ঘোলেই মেটে।

ক্রিস্টোফার কী বর্ণনাশক্তি! সে তুচ্ছ জিনিসকেও বলিবার গুণে মনোরম করিয়া তোলে। নাচের কথা, ভোজের কথা, চড়ুইভাতির কথা, বড়লোকের ছেলেদের উদারতার কথা, সে এমন গুছাইয়া সাজাইয়া রংদার করিয়া বলিতে পারে—যে, মানুষের লোভ হয়। ক্রিস্টোফার বর্ণনার গুণে তুচ্ছ বিষয় রূপকথার মতো চমৎকার হইয়া ওঠে। সিলা বাড়ি গিয়াও মনে মনে ঐসব কথারই আলোচনা করে।

সম্প্রতি সিলার নিজের জীবনেও উপন্যাসের হাওয়া লাগিয়াছে; সে যখনই বার্বারার দোকানে কোনো জিনিসের প্রয়োজনে যায়, তখনই ল্যাড্‌ভিগ ভীর্গ্যাণ্ডের চুরুট ধরাইবার দরকার হয়; সেও সঙ্গে সঙ্গে বার্বারার দোকানে ঢোকে। এ কথা কিন্তু সিলা নিকোলাকে বলে নাই।

এই সেদিনও যখন উহাকে দেখিয়া সিলা তাড়াতাড়ি দোকান হইতে চলিয়া আসিতেছিল, তখন উহাকেই লক্ষ্য করিয়া ল্যাড্‌ভিগ বলে, "আমি কি এতই ভয়ংকর? ওগো কৃষ্ণনয়না সুন্দরী! আমায় দেখে তুমি পালাও কেন? হাঃ হাঃ হাঃ! কালো চোখ কি ঢেকে রাখবার জিনিস। হাঃ হাঃ হাঃ!"

ইদানীং সিলার এই সমস্ত কথা নিতান্ত মন্দ লাগিত না। ল্যাড্‌ভিগের 'পটুচাটুশতৈঃ' উহার মন একেবারে অনুকূল না হইলেও প্রতিকূলতার মাত্রা

যে ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ল্যাড্‌ভিগের আবির্ভাব এখন উহার চক্ষে অন্ধ-কারারুদ্ধ বন্দীর পক্ষে সূর্যালোকের মতো সুন্দর।

বাহিরের আচরণে কোনো বৈলক্ষণ্য লক্ষিত না হইলেও আকারে সিলা দিন দিন আরো যেন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার ডাগর চোখ ড্যাবডেবে হইয়া উঠিল। হল্‌ম্যান-গৃহিণীর কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। সিলা যে কলের খাটুনি খাটিয়াও বাড়ির প্রায় সমস্ত কাজের ভার নিজের স্কন্ধে লইয়াছে, ইহাতেই সে খুশী।

আজকাল কালেভদ্রে নিকোলার সঙ্গে দেখা হইলে, সিলা নিজের সুখহীন জীবনের কথা বলিতে বলিতে একেবারে বিমর্ষ হইয়া যায়। যে সব তুচ্ছ ব্যাপারে সকল মেয়েরই স্বাধীনতা আছে—শুধু তাহারই নাই—সেই সব কথা বলিতে বলিতে বেচারা কাঁদিয়া ফেলে। ছেলেবেলা হইতে উহাকে চোখ্‌-রাঙানীর চোটে দাবাইয়া রাখা হইয়াছে। এখন তো কলে কুলি, বাড়িতে চাকরানীর অধম।

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে সিলার চিন্তাস্রোত সহসা ভিন্ন পথেও চলিতে আরম্ভ করিত। নিজের ঘর-সংসার হইলে সে যে কত সুখী হইবে, নিকোলার সঙ্গে ছুটির দিনে কত জায়গায় বেড়াইবে, কত নাচিবে, কত গাহিবে তাহারই আলোচনায় একেবারে মাতিয়া উঠিত। উৎসাহে তাহার দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

আবার, একটু পরেই বেচারা কেমন যেন বিষণ্ণ, বিমর্ষ।

নিকোলা দেখিল, এখন ঘাড় গুঁজিয়া একমনে হাতুড়িপেটা ছাড়া সিলাকে উদ্ধার করিবার অন্য উপায় নাই। খাটিয়া-খুটিয়া সামনের শীতের শেষ নাগাদ সে একশত ডলার জমাইতে পারিবে। হায়! তাহার পূর্বে সিলার মলিন মুখে হাসি ফুটিবে না।

জর্জিনা বলিয়া একটি মেয়ে সিলাদের পাশের বাড়িতে থাকে। সে জুতার সাজ সেলাই করে। হল্‌ম্যান-গৃহিণীর মতে মেয়েটি ভারী শিষ্ট, শান্ত। সুতরাং সিলা উহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার হুকুম পাইল। এমন কি একটা রবিবার উহার সঙ্গে শহরে বেড়াইতে যাইবারও হুকুম হইয়া গেল। সিলার

আর আনন্দের সীমা নাই। খাঁচার পাখী যেমন করিয়া মুক্তির দিনের পথ চাহিয়া থাকে, সিলা সেইরূপ ঔৎসুক্যে রবিবারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রবিবার আসিল। সেদিন সিলার মনে হইতে লাগিল, 'স্থপ্‌' রন্ধন বুঝি আর শেষ হইবে না। তাহার পর আবার জর্জিনার জন্য অপেক্ষা। উহার আর সাজগোজ ফুরায় না।

শেষে পোস্ট আফিসের পুলিন্দার মতো আঁটা-সাঁটা অবস্থায়, চুলে চর্বি লেপিয়া জর্জিনা বাহির হইল। সিলা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উহার হাতের ভিতর হাত গলাইয়া দিয়া বুনো ঘোড়ার মতো লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া পড়িল। উহারা আজ শহরে চলিয়াছে। কী আমোদ! কী আমোদ!

সময়ে পৌঁছিতে না পারিলে কোম্পানী বাগানের 'ব্যাণ্ড্‌' শুনিতে পাইবে না বলিয়া, সিলা জর্জিনাকে একরকম টানিতে টানিতে যথাসাধ্য বেগে চলিতেছিল।

পথে এবং পার্কে লোকের মেলা। বড়লোকের মেয়েরা ভাল ভাল পোশাক পরিয়া বেড়াইতে আসিয়াছে। গোলাপী ফিতা! শুভ্র ওড়না! সুন্দর টুপি! তাই দেখিতেই সিলা ও জর্জিনার অর্ধেক সময় কাটিয়া গেল।

রবিবার পবিত্র বার এবং বিশেষ করিয়া ভজনার দিন বলিয়া প্রত্যেক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাই আজ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। সিলার এই দৃশ্য ভারী অদ্ভুত মনে হইতেছিল। আজ ছুটির দিন, ছুটির দিনে এত গাম্ভীর্য তাহার চক্ষে ভারী বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। শেষে দুইজনে মিলিয়া বাগানের বাহির হইয়া কেল্লার চতুর্দিকে একচক্র ঘুরিয়া আসিল। কেল্লার সান্ত্রী হাঁকিল, 'Relieve guard!' অপরাহ্ণের ক্লান্ত হাওয়ায় মনে হইল লোকটা উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিতেছে। দূরে নিস্পন্দ রৌদ্রে নদীর উপর দিয়া নৌকা চলিতেছিল।

এখানেও দ্রষ্টব্য বিশেষ কিছুই না পাইয়া উহারা জেটির দিকে চলিল। সেখানেও সেই রবিবাসরীয় নিস্তব্ধতা।

বাজারে কয়েকটা নিষ্কর্মা লোক পরস্পরের ঘড়ি লইয়া অতি সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। উহারা পরস্পরে ঘড়ি বদল করিবে। এ এক খেলা!

অদৃষ্ট পরীক্ষার খেলা বদলাইবার আগে তাই ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতেছে।

গির্জার ঘণ্টা বাজিতেছে, সান্ধ্য-উপাসনার আর বিলম্ব নাই।

ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত হইয়া উহারা বাড়ি ফেরাই মনস্থ করিল। হঠাৎ একটা মোড় ফিরিয়া, কেল্লার খেয়াঘাটে জাহাজের আনাগোনা ও লোকের ভিড় দেখিয়া সিলা বলিল, "চল জাহাজে করে ওপার থেকে বেড়িয়ে আসি, পথে পথে আর ধুলো খেতে পারিনে।" জর্জিনা বলিল, "না, ভারী লোকের ভিড়, আর বেলাও গিয়েছে। দেরি হলে তোমার মা আবার রাগ করবেন।"

"এই বুঝি তোমার বেড়ানো? বেড়িয়ে খুশী হয়েছ? চল না দিব্যি জাহাজের সামনের দিকে বসে একটু হাওয়া খেয়ে আসা যাক। চল, চল।"

জর্জিনা অগত্যা স্বীকার হইল।

ওপারে যে জায়গাটায় জাহাজ লাগে, সেটা একটা দ্বীপের মতো। জাহাজ হইতে নামিয়া সিলা ও জর্জিনা দেখিল, সামনে একটা জায়গায় মেলা বসিয়াছে, নানা রকম তামাশা চলিতেছে। একটা তাঁবুর ভিতরে নাচের তালে বাজনা বাজিতেছে। ভিতরে হাসির শব্দ, গল্পের গুঞ্জন। বাজনা শুনিয়া সিলা সেইখানে দাঁড়াইতেছিল, কিন্তু জর্জিনা উহাকে দাঁড়াইতে দিল না। সে বলিল, "ছি, কোনো গেরস্তর মেয়ে ওখানে দাঁড়ায় না, চলে এস।"

সিলা অনিচ্ছাসত্ত্বেও জর্জিনার পিছনে পিছনে চলিল। কিন্তু উহার মন পড়িয়া রহিল ঐ তাঁবুর প্রান্তে! নাচের তালে বাজনা বাজিতেছিল, আর সেই তালে তালে সিলার সর্বাঙ্গে রক্তধারাও আনন্দে নৃত্য করিতেছিল।

খানিক দূরে গিয়া—তখনো উহারা তাঁবুর সীমা ছাড়াইয়া যায় নাই—সংগীত-মুগ্ধ সিলা পুনর্বার তাঁবুর বেড়ার পাশে দাঁড়াইয়া উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। এবারে জর্জিনা একেবারে রাগিয়া উঠিল। সে বলিল, "থাক তুমি একলা; আমি চল্লুম এখুনি। নিজের মানসম্ভ্রমের জ্ঞান নেই? তোমার না থাকে আমার তো আছে, আমি এখানে দাঁড়াতে পারব না।"

তফাতে দাঁড়াইয়া একটু বাজনা শুনিলে কি করিয়া যে মানের হানি হয় বা

রঙ চটিয়া যায়, সিলা তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। আর যদি কিছুই দেখিবে না, শুনিবে নাকো, তবে বেড়াইতে আসিবারই বা দরকার কি ছিল? আর এতক্ষণ তো ঘুরিয়া বেড়ানো হইল, ভদ্র রকমের আমোদের তো সন্ধান পাওয়া গেল না!

জর্জিনা যখন কিছুতেই বাগ মানিল না, তখন বাধ্য হইয়া সিলা জাহাজেই ফিরিল।

যখন বাড়ি ফিরিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পায়ে ফোস্কা, গায়ে মাথায় ধূলা, শরীর অবসন্ন, মন অতৃপ্ত।

মায়ের কাছে ভ্রমণের বিবরণ বলিতে বলিতে চেয়ারের উপরেই সিলা ঢুলিয়া পড়িল। তাঁবুর ভিতরকার বাজনার তাল এখনো তাহার মাথার ভিতরে ঘুরিতেছে! সে স্বপ্নে দেখিল, যেন সে এক নাচের মজলিসে নিমন্ত্রিত।

শরতের শেষে, যাহারা পয়সা খরচের ভয়ে বাড়িতে আগুন পোহায় না, তাহারা সন্ধ্যাবেলায় বার্বারার দোকানে আসিয়া জোটে। গল্পগুজবও হয়, বিনি পয়সায় চা খাওয়ারও মানা নাই।

আজকাল কিন্তু বার্বারার মেজাজ ঠিক আগেকার মতো মোলায়েম নাই। মাঝে মাঝে সে চটিতে শুরু করিয়াছে। তাহার চা-বিতরণের মধ্যেও কার্পণ্যের চিহ্ন দেখা দিয়াছে। আজকাল সে কোনো দিন কৃপণ, কোনো দিন দাতা। ইহার অবশ্য নিগূঢ় কারণ আছে। চিনির মহাজন, ময়দার মহাজন, চাওয়ালা, তেলওয়ালা সবাই আবার তাগিদ দিয়াছে। ফুটা বাক্সের যে অবস্থা তাহাতে তো একজন মহাজনেরও দেনা শোধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

সময় দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়, কাল বাদে পরশু মহাজনের লোক আসিবে। উপায়? সে দুই এক জায়গায় ধারের চেষ্টা করিল, সেদিকেও সুবিধা হইল না। তাই তো! উপায়? দোকানপাট শেষে গুটাইতে হইবে না তো!

নিকোলাকে বার্বারা সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "উপায়?"

নিকোলা যে ইহার কোনো সদুপায় ঠাওরাইতে পারিয়াছে, তাহা তো তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হয় না!

বার্বারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে সব মালপত্র আদালতে উঠিয়ে নিয়ে নীলাম করবে, আর কি! শেষে আটত্রিশ ডলারের জন্যে—এত পয়সা খরচ, এতদিনের পরিশ্রম—সব জলে যাবে!"

ইহার পরে বার্বারা যে কী বলিবে, তাহা নিকোলার পক্ষে আন্দাজ করা শক্ত নয়। সে বুঝিল যে, এখন সে একটু সহানুভূতি দেখাইলেই বার্বারা আবার তাহারই ঘাড় ভাঙিয়া টাকা আদায় করিবে। অথচ, বার্বারার যে রকম হিসাবের জ্ঞান, ব্যবসায় বুদ্ধি, তাহাতে বারংবার টাকা ঢালিলেও দোকানের যে কোনোকালে উন্নতি হইবে সে আশাও দুরাশা। ওদিকে নিকোলা এত কষ্ট করিয়া যে উদ্দেশ্যে টাকা জমাইয়াছে, সে উদ্দেশ্যও বিফল হইতে দেওয়া যায় না। আরও দিন পিছাইলে, সিলাকে কষ্টের মধ্যে শান্ত করিয়া রাখা মুশকিল হইবে।

নিকোলা নীরবে চিমনির আগুনের দিকে চাহিয়া রহিল। কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

নিকোলা কোনো জবাব দিল না দেখিয়া বার্বারা কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভেবেছিলুম, ছেলে রোজগার করতে শিখলে,—আমার দুঃখু ঘুচবে; আর কিছু না হ'ক অন্ততঃ সময়ে-অসময়ে আর পরের দরজায় হাত পাততে হবে না।"

"তুমি তো জান মা, কেন দিতে পাচ্ছিনে, তুমি তো সব জান। আর তা'ছাড়া তোমার ও দোকানে কোনো দিন সুবিধা হবে বলে তো আমার বোধ হয় না। তার চেয়ে সময় থাকতে ছেড়ে দেওয়াই বোধহয় ভাল। দোকানে এ পর্যন্ত কি এক পয়সা লাভ হয়েছে?"

বার্বারা চটিয়া গেল। সে বলিল, "তা কি করতে হবে? বুড়ো গরু ব'লে কসাইয়ের হাতে দেব নাকি? আমি দোকান তুলে দিয়ে দেউলে হব আর লোকে টিটকারি দেবে এই যদি তোমার মনের কথা হয়,—তো সেইটেই না হয় খুলে বলে ফেল।...তুমি এ বেশ জেন যে, তুমি টাকা না দিলেও আমার দোকান বন্ধ হবে না, আর আমিও দেউলে হব না। বেঁচে থাক ল্যাড্‌ভিগ—

টাকার ভাবনা কি? একবার মুখের কথা খসালে হয়।…আর, বারবার যে তোমার জন্যে আমি দুঃখু সইব একথা তুমি মনেও ভেব না। একবার তোমার জন্যে আমি কৌঁসুলী সাহেবের বাড়ির অমন সুখের চাকরি হারিয়েছি; আবার?…অবাক হয়ে গেলে যে? ল্যাড্‌ভিগকে মারপিট করে, আমার চাকরির দফা নিশ্চিন্তি করে, এখন একেবারে হাবা হ'লেন। নইলে আমার চাকরি কি যেত?—আজ একটা বিপদে পড়েছি তাই টাকা চেয়েছি, তাও ধার চেয়েছি; তবুও দিতে পারলেন না, ওঁর আরেক জনের জন্যে টাকার দরকার।…শুধু তাই? ল্যাড্‌ভিগ আমার ছেলের মতো—তার কাছে টাকা ধার নেব, তাও তুমি নিতে দেবে না। এ যে তোমার কি একগুঁয়েমি তা বুঝতে পারিনে।…আর আমি তোমার মান-অপমানের ভাবনা ভেবে চলছিনে; সে ভাবতে গেলে আমার চলবে না।…তোমার কাছে সাহায্য চাইলুম, তুমি সাহায্য করতে পারলে না; ভাল, যে পারে তার কাছেই যাব। দোকান বন্ধ হওয়া মানে ডান হাত বন্ধ হওয়া; সে তো আর মুখের কথা নয়,…কাজেই বাধ্য হয়ে যেতে হবে।…ভাগ্যিস্, এ হাঙ্গামাটা এই হপ্তায় ঘাড়ে এসে পড়েছে, নইলে সামনের হপ্তায় শুনছি ল্যাড্‌ভিগ আবার কোথায় হাওয়া খেতে যাবে। সে সময়ে এমনিধারা বিপদে পড়লেই হয়েছিল আর কি!"

নিকোলার ঠোঁট কাঁপিতেছিল, সে জামার আস্তিন দিয়া ইহার মধ্যে দুই-তিনবার কপালের ঘাম মুছিয়াছে। বার্বারা থামিলে, সে ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিল—

"পাবে, পাবে; টাকা আমিই দেবো।"

হায়! বিবাহের মামলা আবার মুলতবী! ক্ষোভে নিকোলার চোখ দিয়া জল আসিতেছিল।

নিকোলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বার্বারার কথা আজ তাহার বুকে বাজিয়াছে। নিকোলাই যে বার্বারার সকল দুঃখের মূল এ কথাতে সে 'হতভম্ব' হইয়া গিয়াছে।

এই তো, বিবাহের সম্ভাবনা তিন মাসের মতো পিছাইয়া গেল। আবার যদি বার্বারা টাকা চায়? নিকোলা হতাশ হইয়া পড়িল।

হপ্তার শেষে রোজগারের টাকা বাক্সে রাখিতে রাখিতে উহার কেবল মনে

হইতেছিল,—"মিথ্যা সঞ্চয় ; যে কোনো দিন খুশী, বার্বারা ইহা নিঃশেষে গ্রাস করিতে পারে। অবশ্য সে অধিকার তাহার আছে, একদিন নিকোলাও বার্বারার রোজগারের টাকায় জীবন ধারণ করিয়াছে।···তবু!···তবু আর কি?

তারপর, বার্বারা নিকোলার মাতা, অথচ পিতৃনামের গৌরবে গর্ব অনুভব করিবার অবসরটুকুও সে নিকোলাকে দিতে পারে নাই, এজন্য সেই তো জগতের চক্ষে অপরাধী ; নিকোলাকে সে স্তন্য পর্যন্ত দেয় নাই। এখন সেই কিনা তাহার উপার্জনের টাকা দাবী করিতেছে। সেই তাহার জীবনের সুখ, হৃদয়ের শান্তি গ্রাস করিতে বসিয়াছে।

নিকোলা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জীবন এখন তিক্ত।

সে কি সিলার আশা ছাড়িয়া দিবে? অসম্ভব, নিকোলার একখানা হাড় থাকিতে তো নয়।

মানবজন্ম যখন লাভ করিয়াছে, তখন মানুষের মতো মাথা তুলিয়াই সে চলিবে। এজন্য যদি দেহ হইতে মাথাটা বিচ্যুত হইয়া পড়ে, তাহাতেও নিকোলা প্রস্তুত।

বার্বারার দোকানের জন্য সে আর এক পয়সাও খরচ করিবে না। বার্বারা খাইতে না পায় নিকোলার কাছে আসুক, বার্বারার ভরণপোষণের ভার নিকোলার। কিন্তু দোকানের জন্য আর এক পয়সাও না।

ভবিষ্যতের বিষয়ে এইরূপ একটা নিষ্পত্তি করিয়া নিকোলার মাথা অনেকটা খোলসা হইয়া গেল।

এবার বিবাহ বন্ধ হইল বটে, কিন্তু আর এমনটা ঘটিতে দেওয়া হইবে না। কারণ, সে নিকোলা, শহরের একটা কারখানার সেরা কারিগর—সর্দার ; তাহার যে কথা, সেই কাজ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উৎসবে ব্যসন

শীত প্রায় ফুরাইল। ফেব্রুয়ারির মেলা শুরু হইয়াছে। ঢাক বাজিতেছে, বাজিকর চেঁচাইতেছে, লটারির চাকা ঘুরিতেছে। অবিশ্রান্ত লোকের চলাচলে রাস্তার বরফ গুঁড়া হইয়া দোবারা চিনির মতো হইয়া

পড়িয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত নৃত্যগীত, তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত আমোদের আন্বেষণ।

আমোদের ঢেউ মজুর-পাড়া পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে; সমস্ত শহরটা এখন উৎসবময়।

মাপের গেলাসে মাপিয়া যাহারা আমোদ করিতে চায় এবং লোকনিন্দার ভয়ে মেলায় যাইতে সাহস করে না, তাহাদের অব্যক্ত ঔৎসুক্যের সীমা পরিসীমা নাই। আর যাহারা নিন্দার ভয় করে না, কাহারো তোয়াক্কা রাখে না, তাহারা দলে দলে ফুর্তি করিয়া মেলার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

মেলায় বলনাচের ব্যবস্থা আছে, খাবারের দোকান আছে, রঙিন লণ্ঠনের আলো আছে, প্রলুব্ধ করিবার হাজারো জিনিস সেখানে বর্তমান।

মেলা বসিবার দ্বিতীয় দিনেই ক্রিস্টোফা আসিয়া হাজির। ভারী সুখবর! একজন লোক উহাকে এবং সিলাকে বিনা পয়সায় মেলা দেখাইবে বলিয়াছে। তাহার নাম কিন্তু ক্রিস্টোফা কিছুতেই ফাঁস করিবে না। সে টিকিটেরও দাম দিবে, আবার কেকেরও দাম দিবে। ভারী মজা!

সিলা এপর্যন্ত কখনো মেলা দেখে নাই। বাহির হইতে ভিড়ের সঙ্গে মিলিয়া উঁকিঝুঁকি মারিয়াছে মাত্র। এমন সুযোগ ছাড়িয়া দিতেও উহার মন সরিতেছে না, আবার যাইতেও সাহসে কুলায় না।

সিলা বাড়ি আসিয়া মায়ের মুখে শুনিল, আণ্টনিরা মেলা উপলক্ষে একখানা ঘর ভাড়া লইয়াছে, দোকান খুলিবে। সেখানে কেনা-বেচার ভার সিলার মায়েরই উপর। অবশ্য আণ্টনিরা উহাকে এজন্য পয়সা দিবে। সুতরাং মেলার কয়দিন রাত্রে সিলাকে একলাই বাড়ি আগলাইয়া থাকিতে হইবে।

আনন্দে সিলার মন নৃত্য করিয়া উঠিল। এইবার তো সে ইচ্ছা করিলেই ক্রিস্টোফার সঙ্গে যাইতে পারে।

সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে এতটা সুবিধা পাইয়া তাহার মনে কেমন যেন আশঙ্কা হইতেছিল।

সেইদিন বৈকালে সিলা যখন লোকের বাড়ি হইতে ময়লা কাপড় লইয়া ঘরে ফিরিতেছে, সেই সময়ে কে একজন পুরুষমানুষ উহার গা-ঘেঁষিয়া চলিয়া গেল। সিলা চমকিয়া ফিরিয়া দেখে—ল্যাড্‌ভিগ! তবে সে ফিরিয়াছে!

সিলা আর উহার দিকে চাহিতে পারিল না, লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু একবার যেটুকু দেখিয়া লইয়াছে, তাহাতেই সিলা অনুভব করিয়াছে যে ল্যাড্‌ভিগের দৃষ্টি উহারি উপর নিবদ্ধ এবং উহাকেই লক্ষ্য করিয়া সে মৃদুমন্দ হাসিতেছিল।

সেই দামী চুরুটের মোলায়েম গন্ধ! সেই ক্রিস্টোফাবর্ণিত উপন্যাসের নায়কের মতো দামী পোশাকের খুশখাশ শব্দ! সিলা মোটেই ভুল করে নাই। এতক্ষণে! টিকিটের টাকা এবং কেকের পয়সা যে কে দিবে এতক্ষণে তাহা বোঝা গেল।

ত্রস্ত পাখীর মতো উহার স্পন্দিত হৃদয় উহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল।

বাড়ি আসিয়া সে আরশিতে নিজের মুখ দেখিল। সত্যই কি উহার কালো চোখ এত সুন্দর?

পরের দিন, নিকোলা সিলার জন্য একটি আয়নাদার সেলাইয়ের বাক্স কিনিয়া উহারি সন্ধানে সন্ধ্যার ঝোঁকে বাহির হইয়া পড়িল। তখন সবে গ্যাস জ্বালা হইতেছে।

বাক্সের কলখানি তাহার নিজের তৈরী। বাক্সের ভিতরে সরু সূতা, মোটা সূতা, ছুঁচের কৌটা, কাঁচি, আঙুল-ত্রাণ। নিকোলা বাক্সের উপর দুইখানি কেক রাখিয়া বেশ করিয়া রুমালের মধ্যে জড়াইয়া এমনি করিয়া বাঁধিয়া লইল যে, হঠাৎ দেখিলে কারিগরদের হাতিয়ারের থলি বলিয়াই ভ্রম হয়।

সিলার ঘরের কানাচে নিকোলা আজ কতবারই ঘুরিল। ঘরে আলো নাই, কাহারো সাড়াশব্দ নাই; ব্যাপার কি?

বেচারা সেলাইয়ের বাক্সটি হাতে করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। সিলার দেখা নাই।

গলিতে একটা মাত্র গ্যাস্‌পোস্ট। সেইখানটাতেই একটু আলো, বাকীটা একরূপ অন্ধকার।

এইবার গলিতে কে আসিতেছে! নিশ্চয় সিলা। নিকোলা তাড়াতাড়ি তাহার দিকেই চলিল।

না, না, এ যে জেকবিনা! নিকোলা উহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হল্‌ম্যান-গিন্নী কি আজ ঘরে নেই?"

"না, মেলায় গেছে।" কথাটা শুনিয়া নিকোলা নির্জনে সিলার দেখা পাইবে ভাবিয়া মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল

নিকোলা যে সিলার সন্ধানেই আসিয়াছে জেকবিনা তাহা জানিত। সে মেলায় যাইবার টিকিট পায় নাই, সেজন্য সে সিলার সৌভাগ্যে একটু ঈর্ষান্বিতও হইয়াছিল; সুতরাং সে নিকোলাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, "বেড়ালও বাড়িছাড়া হয়েছে, ইঁদুরেরও কাঁদুনি শুরু হয়েছে। সিলাও কি আর ঘরে আছে। সে গেছে মেলায় আমোদ করতে।"

"সিলা? সিলা মেলায়!"

"কেন যাবে না? তার এখন ভাবনা কি? তার টিকিটের পয়সা দেবার মানুষ হয়েছে?"

"কে বলে এমন কথা?"

"এই আমি গো আমি; আমি ক্রিস্টোফাকে আর তাকে স্বচক্ষে যেতে দেখেছি।...আর তাছাড়া ক্রিস্টোফা আমায় নিজেই বলেছে, যে ওদের দু'জনকে মেলায় নিয়ে যাবে সে ইচ্ছে করলে দশজনকেও নিয়ে যেতে পারে। তবে, বোধ হচ্ছে, ওরা মেলায় যাবে না, গির্জায় যাবে।" জেকবিনা রঙ্গচ্ছলে চোখ মট্‌কাইল।

"কী বাজে বক্‌ছ? সাবধানে কথাবার্তা কইতে শেখনি?"

"হাঃ হাঃ! লোকটি তোমার নিতান্ত অচেনা নয়; বলতে গেলে আপনার জন। আমরা তোমার মায়ের মুখেই শুনেছি। মাস কয়েক আগে সে তোমার মায়ের হয়ে চিনির মহাজনের দেনা শোধ করেছে।"

নিকোলা আর শুনিতে পারিল না। বার্বারা উহারও রক্ত শোষণ করিয়াছে, আবার উহাকে লুকাইয়া ল্যাড্‌ভিগের কাছেও হাত পাতিয়াছে! বার্বারা, তবে, আর নিকোলার মা নয়। সে কোনো দিন নিকোলাকে ভালবাসে না, সে যাহাকে স্নেহ করে সে—ল্যাড্‌ভিগ।

"ল্যাড্‌ভিগ ভীর্গ্যাং! সেই হতভাগা আমার মাকে পর করে দিয়েছে, আবার সিলাকেও পর করে দিতে চায়?"

নিকোলা আর দাঁড়াইতে পারিল না। সে বাক্স হাতে করিয়া মেলার দিকে ছুটিল।

যাইতে যাইতে সে একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল ;—ভাবিল, "ক্রিস্টোফা হয় তো মুখফোঁড় জেকবিনার সঙ্গে বেড়াতে চায় না, তাই তাকে রাগাবার জন্যে ঐ কথা বলে গেছে। হিঃ হিঃ হিঃ—এ নিশ্চয় সিলার মতলব।...আমি যে ওদের মতলব ধরে ফেলেছি, এ কথা কিন্তু সিলাকে বলতে হচ্ছে। দেখা হলেই বলব।"

নিকোলার মাথাটা অল্পক্ষণের জন্য যেন অনেকটা পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল। তারপর আবার সে ভাবিল—

"আচ্ছা একবার ঘুরেই আসা যাক ; হয়তো ওরা মেলার ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে থেকে আলো দেখছে।...দেখেই আসা যাক।"

নিকোলা মেলার পথেই চলিল।

লোকে লোকারণ্য—বাঁশী বাজিতেছে, ঢাক বাজিতেছে, আমোদের সীমা নাই।

হঠাৎ নিকোলার মন আবার কেমন দমিয়া গেল।

প্রবল বাতাসে এক এক দিকের লণ্ঠনগুলি এক একবার করিয়া স্তিমিত হইতেছে, আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

নিকোলা ভিড়ের ভিতর অতিকষ্টে একখানি চেনা মুখের সন্ধান করিতেছিল। নাঃ, ভিড়ের মধ্যে সে নিশ্চয়ই নাই। তবে কি নিকোলা ভিতরটাও খুঁজিয়া দেখিবে? নিশ্চয়!

নিকোলা ঠেলিতে ঠেলিতে একেবারে ফটকের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছে।

"ঐ! ঐ মেয়েটি! না, ও যে ক্রিস্টোফা ;—সিলা কই?"

"ওহে কর্তা! তুমি কি নাচ-তামাশা দেখবার টিকিট নেবে? না, শুধু মেলায় বেড়াবার টিকিট নেবে?"

নিকোলা হিসাব করিয়া দেখিল, তাহার পকেটে যে পয়সা আছে, তাহাতে দুই রকম হইবে না ; অগত্যা সে শুধু মেলায় ঢুকিবার টিকিটই লইল।

মেলায় ঢুকিয়া নিকোলা দেখিল, একদিকে একটা কলের নাগরদোলা,

লোকে পরিপূর্ণ। আর একদিকে একটা তাঁবুর ভিতর হইতে বামাকণ্ঠের স্বর ভাসিয়া আসিতেছে, মধ্যে মধ্যে প্রবল করতালি ও বাহবা। নিকোলা সমস্ত বাগান ঘুরিল ; কোথায় বা সিলা আর কোথায় বা ক্রিস্টোফা ! মাঝে মাঝে দুই একজন শীতার্ত লোক, ফানুসের পাশে পোকার মতো, সংগীতমুখর তাঁবুগুলার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের পকেটের অবস্থা বোধ হয় নিকোলার মতো।

সহসা নিকোলার সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিবার উপক্রম করিল। সে নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তবু, দ্বিধা সত্ত্বেও, এক এক পা করিয়া সে একটা জানালার রুদ্ধ শাসির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে আলো জ্বলিতেছে, নৃত্য চলিতেছে। কিন্তু ভালো করিয়া দেখা যাইতেছে না ; শাসির ভিতর-পিঠ ঘামিয়া ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে।

এই সময় শাসির একটা জায়গায় ঘাম গড়াইয়া পড়িল।

"ঐ যে ক্রিস্টোফা ! সিলা কোথায় ?···আঃ ! জিজ্ঞাসা করা যায় কি করে ?"

এইবার নিকোলা একজন পুরুষমানুষের ওভারকোট-পরা মূর্তি দেখিতে পাইল ; তাহার হাতে ছড়ি, মাথায় হালফ্যাশানের টুপি, মুখে চুরুট। এ যে ল্যাড্‌ভিগ ! ও কথা কয় কাহার সঙ্গে ! ঐ যা ! সরিয়া গেল ! বোধ হয় নাচিতেছে। কিন্তু কাহার সঙ্গে ?·· কাহার সঙ্গে ?

শাসির ঘাম এইবার দুই তিন জায়গায় গড়াইয়া পড়িল। ল্যাড্‌ভিগের বুকে মুখ রাখিয়া উহার সঙ্গে ও কে ও —কে নাচে ?

ব্যস্ ! নিকোলা যথেষ্ট দেখিয়াছে। পরমুহূর্তেই প্রচণ্ডবেগে সে একেবারে নৃত্যশালার দরজায় গিয়া হাজির।

দরজা মুহুর্মুহুঃ খুলিতেছে এবং মুহুর্মুহুঃ বন্ধ হইতেছে। লোকের আনাগোনা অবিশ্রান্ত।

নিকোলা সকলকে ঠেলিয়া একেবারে গার্ডের সম্মুখে। গার্ড বলিল, "টিকিট ?" নিকোলা উত্তর দিল না।

"টিকিট কই ? টিকিট ? নিকোলা জোর করিয়া দরজার ফাঁকে মাথা

গলাইতে গেল। একজন পাহারাওয়ালা উহাকে বাধা দিতে যাইতেছিল, সহসা উহার ভয়ংকর চাহনি দেখিয়া পিছাইয়া পড়িল।

দরজার ফাঁক দিয়া নিকোলা আবার সিলাকে দেখিল। ল্যাড্‌ভিগের সঙ্গে সে বাহিরের দিকেই আসিতেছে।

ল্যাড্‌ভিগ অভ্যস্ত অহংকারে সোজা হইয়া তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইতেছে। লোকটা এমনি করিয়া সিলার মাথা খাইতে বসিয়াছে, অথচ দেখিলে মনে হয় যেন সকল মলিনতার উর্ধ্বে।

সহসা একটা কলরব উঠিল, "নিকাল দেও! নিকাল দেও!"

নিকোলা এবার ঠিক ঢুকিত, কিন্তু পুলিশের লোক এবং নাচঘরের লোক একত্র মিলিয়া উহাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল। একজন পাহারাওয়ালা উহাকে ধরিয়া রহিল। ঠিক এই সময়ে সিলা ও ল্যাড্‌ভিগ বাহির হইয়া চায়ের দোকানের দিকে যাইতেছিল।

এক ঝট্‌কায় পাহারাওয়ালার হাত ছাড়াইয়া নিকোলা একেবারে উহাদের ঘাড়ে গিয়া পড়িল।

সিলা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল; নিকোলা উহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া একেবারে ল্যাড্‌ভিগের সম্মুখে মুখোমুখী করিয়া দাঁড়াইল।

ল্যাড্‌ভিগের মুখ একেবারে পাংশু; সহসা পাঠ্যাবস্থার পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনিতে পারিয়া অবজ্ঞায় তাহার মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল।

"এই পাজী! বদমায়েশ! গুণ্ডা!" বলিয়া ল্যাড্‌ভিগ শপাং করিয়া নিকোলার মুখে এক-ঘা চাবুক মারিয়া বসিল। নিকোলাও অমনি, এমনি জোরে উহার বুকে এক ঘুষি দিল যে, মাংস কাটিয়া জামার বোতাম গায়ে বসিয়া গেল।

ঠিক এই সময়ে একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক পাগলের মতো ছুটিয়া আসিয়া উহাদের মাঝখানে পড়িল। ভিড় জমিয়া গেল।

"কামারের কুকুর! পাক্‌ড়ো, উস্‌কো পাক্‌ড়ো! পুলিশ! পুলিশ!"

পুলিশ আসিয়া নিকোলাকে ধরিল। ল্যাড্‌ভিগও নিজেকে নিরাপদ বিবেচনা করিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "যাও, এইবার হাজতে গিয়ে পচ; তুমি না

হলেও সিলার বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে চলবে, আর, তার মেলায় ফুর্তি করবারও কোনো বাধা হবে না।"

ল্যাড্‌ভিগের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে পুনর্বার পুলিশের হাত ছিনাইয়া নিকোলা বিদ্যুতের বেগে ছুটিয়া গিয়া একহাতে ল্যাভ্‌ভিগের জামা ধরিল এবং "এ জীবনে আর তোকে ও কথা মুখে আন্‌তে হবে না"—বলিয়া আর এক হাতে সজোরে সেই সেলাইয়ের বাক্সটা উহার মাথার উপর আছড়াইয়া ফেলিল।

ল্যাড্‌ভিগ ঘুরিয়া বরফের উপর পড়িয়া গেল।

"খুন্! খুন্!" বলিয়া বহুলোক একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল। কেহ বলিল, "ডাক্তারকে খবর দাও। এখানে কোথাও ডাক্তার নেই?"

ওদিকে তিনটা তাঁবুতে নাচের তালে বাজনা বাজিতেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মূর্ছিত ল্যাড্‌ভিগকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল এবং নিকোলার হাতে হাতকড়ি পড়িল।

ইহার পর যখন উহাকে হাজতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল, তখন সেই অল্পবয়স্কা মেয়েটি আসিয়া উহাকে দুই হাতে বেষ্টন করিয়া ধরিল। অনেকে টিটকারি দিল; ছেলের দল হোহো করিয়া চেঁচাইতে শুরু করিল।

সিলা কারো কথায় কর্ণপাত না করিয়া কোনো দিকে দৃকপাত না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তোমরা ওকে নিয়ে যেয়ো না গো, ওকে তোমরা নিয়ে যেয়ো না।···নিকোলা, নিকোলা, তুমি ওদের বুঝিয়ে দাও—এ দোষ আমার—এ আমার অপরাধ। এর জন্য তোমায় কেন হাজতে নিয়ে যাচ্ছে?"

সিলা কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই অবসরে হাজতের গাড়ি ছাড়িয়া দিল। পিছনে পিছনে সিলাও চলিল। তাহার গায়ের কাপড় কোথায় পড়িয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই।

গাড়ি থানায় ঢুকিল, নিকোলা বন্দী হইল; সিলা স্বচক্ষে সমস্ত দেখিল; আটক করিতে পারিল না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, সিলা সেই থানার দরজায় ধরনা দিয়া আছে। কনস্টেবল কতবার চলিয়া যাইতে বলিয়াছে, সে শোনে নাই।

শেষে বসিয়া বসিয়া হতাশ হইয়া সে উঠিল, উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল ; কোন্ দিকে যে যাইতেছে তাহার ঠিকানা নাই। মাঝে মাঝে দাঁড়াইতেছে, আবার চলিতেছে।

ঝরনার উপরকার পুলের উপর আসিয়া সিলা থমকিয়া দাঁড়াইল। কী অন্ধকার! কী গর্জন! পুলের উপর সিলা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, এই অন্ধতমসাবৃত গর্জনের সঙ্গে সে যেন কোন্ গভীর সূত্রে সংবদ্ধ।

সমস্ত রাত সে অবসন্নভাবে পড়িয়া রহিল, তাহার বুকে যেন পাষাণের ভার, নিকোলার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

নিকোলার হাতে যে হাতকড়ি পড়িয়াছে, একথা কিছুতেই তাহার মন হইতে সরিল না। তাহার চোখের সামনে সেই হাতকড়ি! সিলার মনে হইল, তাহার মাথা খারাপ হইতে বসিয়াছে ; সে বুঝি পাগল হইবে। আবার সে ভাবিল নিকোলা বোধ হয় এখন সিলার নাম কানে শুনিলেও বিরক্ত হয় ; ছি ছি সিলা কী কুকাজই করিয়াছে। সে শুধু নিজের আমোদের কথাই ভাবিয়াছে—আর যে লোকটা তাহার সুখের জন্য, তাহাকে সৎপথে রাখিবার জন্য, দিনরাত পরিশ্রম করিয়াছে, হাতুড়ি পিটিয়াছে, সমস্ত আমোদ বর্জন করিয়া, সুখের সংসার পাতিবার আশায়, একটি একটি করিয়া পয়সা জমাইয়াছে, হায়! তাহার সুখদুঃখের কথা সিলা একবারও ভাবে নাই। যাহার জন্য সে এত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, সেই সিলার দুর্বুদ্ধির দোষে নিকোলা আজ হাজতে।

ভাবিতে ভাবিতে সকাল হইয়া গেল, সিলা সেই পুলের ধারেই বসিয়া রহিল। এখনো তাহার মাথার মধ্যে গতরাত্রের দুর্ঘটনার ছবি ক্রমাগত ঘুরিতেছে। দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িল ; আবার বেলা পড়িয়া আসিল। শেষে, গ্যাস জ্বালিতে দেখিয়া সিলার চমক ভাঙিল। সে উঠিয়া বরাবর থানার দিকে চলিল। থানায় পৌঁছিয়া প্রথমতঃ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে উহার সাহস হইল না। ক্রমে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল। তখন সে সাহসে ভর করিয়া ইন্সপেক্টরের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

"কি চাও?"

"নিকোলার খবর।"

"নিকোলা? কোন্ নিকোলা?"

"সেই কাল রাত্রে যে এসেছে।"

"সেই খুনের আসামীটা? তাকে কেন? তুমি তার কে হও? বোন্?"

"না।"

"ও!...তা' তার খবর আর কি শুনবে? তার জীবনের আশা নেই; কাল যাকে সে খায়েল করেছে তার দফা নিকেশ হয়ে গেছে, আজ বেলা দুপরের সময় সে মারা গেছে; আসামীকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।"

সিলা থানা হইতে বাহির হইয়া, কেমন করিয়া কখন যে পুলের উপর হাজির হইল, তাহা উহার খেয়াল ছিল না। বরফ পড়িতেছে তবুও বেচারীর হুঁশ নাই।

এই তো—এই তো তাহার বিশ্রামের স্থান।

নিকোলার হাতে হাতকড়ি, সে না জানি কতই কাঁদিতেছে, কতই ডাকিতেছে; সিলা আর তাহার কাছে মুখ দেখাইতে পারিবে না। এ জীবনে আর নয়।

সিলার চোখে এখন অন্ধকার, কানে শুধু প্রপাতের আহ্বান।

পরদিন সকালে দেখা গেল, পুলের নীচে নদীর ধারে বরফের ভিতর হইতে স্ত্রী-পরিচ্ছদের একটা টুকরা দেখা যাইতেছে। অভাগিনী সিলা! সে স্রোতের জলেও বিস্মৃতিলাভ করিতে পারে নাই, কিনারায় কঠিন বরফের উপর পড়িয়া উহার মাথার খুলি একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে।

ডাক্তারের পরীক্ষায় সাব্যস্ত হইল মাথার আঘাতই ল্যাড্‌ভিগ ভীর্গ্যাণ্ডের মৃত্যুর কারণ। মাথার খুলি ভাঙিয়া মস্তিষ্কের ভিতর হাড়ের কুচি ঢুকিয়া গিয়াছে।

মকর্দমার দিন নিকোলাকে আদালতে হাজির করা হইল। সে ইহার

মধ্যেই মিলার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছে। এখন আর তাহার জীবনে স্পৃহা নাই।
হাকিম যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তুমি ওকে খুন করলে?" নিকোলা
বলিল, "ইচ্ছা করেই খুন করেছি, ইচ্ছা করেই প্রাণে মেরেছি। যদি ওর একটা
প্রাণ না হয়ে সাতটা প্রাণ হ'ত, তাহলেও ওকে বাঁচতে দিতুম না।"

নিকোলার এইরকম ঠোঁটকাটা জবাবে হাকিমসুদ্ধ উহার প্রতি বিরূপ হইয়া
বসিলেন।

বাপের নাম জিজ্ঞাসা করায় নিকোলা বলিল, "বাপের খবর জানিনে,
সে সৌভাগ্য এ জীবনে হয়নি; মায়ের নাম বার্বারা। লোকে বলে সেই
আমার মা। যে হতভাগা আমার ইহজীবনের সমস্ত সুখ হরণ করেছে,
পূর্বে সেই আমার মাতৃস্নেহেও বঞ্চিত করেছিল।" এই সময়ে ভিড়ের ভিতরে
একজন স্থূলকায়া প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পুলিশের সাক্ষ্যে ইহাও প্রকাশ হইল যে, বর্তমান আসামী একবার একটি
বালিকার নিকট হইতে টাকা ভুলাইয়া লইবার অপরাধে অভিযুক্ত হয়, পরে
প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করে। এতদ্ভিন্ন পাঠ্যাবস্থায় ল্যাডিসের সঙ্গে মারামারি
এবং অল্পদিন পূর্বে কারখানার মিস্ত্রী গুস্তাভ্‌কে হাতুড়ি দেখাইয়া শাসানোর
কথাও চাপা রহিল না।

হাকিমের রায়ে নিকোলার যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা হইল।
"স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে এইরূপ খুন চাপা কতকটা স্বাভাবিক বিধায় ফাঁসির
হুকুম দেওয়া গেল না।"

দীর্ঘ মেয়াদের কয়েদীদিগকে যে পথ দিয়া কয়েদখানায় লইয়া যাওয়া
হইতেছিল, তাহারি অদূরে সৈন্যেরা চাঁদমারিতে লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিতেছিল।

কয়েদখানার দেওয়ালে একটা প্রকাণ্ড ছিদ্রপথে কয়েদীরা একে একে
প্রবেশ করিতেছে। যে লোকটা সকলের পিছনে ছিল, সে শিকলে টান
পড়িলেও একবার দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস
ফেলিল।

দূরে পাইনের বন সবুজ হইয়া উঠিয়াছে, প্রপাতের জল যেন আনন্দে
উছলিয়া পড়িতেছে। কয়েদীটা মূঢ়ের মতো চাহিয়া আছে।

"তুই এখন পালাতে পারলে বাঁচিস্, না? কি বলিস্ নিকোলা?"

"মানুষের স্বভাবই তাই।"

"বেশ তো, ভাল মানুষের মতো থাক, চাই কি এক-আধ বছর মাফ হতেও পারে। আর ক'টা বছর বই তো নয়,—দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

নিকোলা অসহিষ্ণুর মতো উগ্রভাবে মাথা নাড়িল এবং বলিল, "উঁহু! একবার বেরুলে কি হবে? আবার ফিরে আসতে হবে। আমার আজন্ম এই রকম। আমি দেখছি, হয় জগৎটাকে কয়েদ করে রাখতে হবে, না হয় আমায় আটকাতে হবে। ভেবে দেখলুম, ওটা একজনের উপর দিয়েই যাওয়া ভাল; দুনিয়া সুখে থাক,—কয়েদের ভোগটা আমিই ভুগি।"

নিকোলা আর দাঁড়াইল না; উহার হাতের বেড়ি, পায়ের শিকল গতির চাঞ্চল্যে পুনর্বার মুখর হইয়া উঠিল; শিকল বাজিতে লাগিল ঝম্ ঝম্ ঝম্।

নাট্য
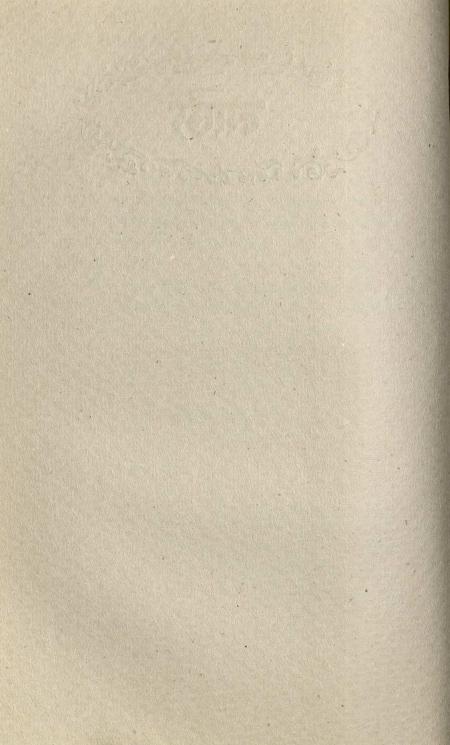
উৎসর্গ

যিনি
বাঙালীর দৈনিক জীবনে সত্য ও সুন্দরের উচ্চ আদর্শ
প্রতিষ্ঠাকল্পে চিরদিন সচেষ্ট,
মহাকবি মাইকেল মধুসূদন যাঁহাকে কবিতায়
অভিনন্দিত করিয়াছেন,
যাঁহার গৌরব-মণ্ডিত নামের অনুকরণে বর্তমান লেখকের
নামকরণ হইয়াছিল,
সেই বহুমানাস্পদ মনীষী
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহোদয়ের করকমলে
আন্তরিক শ্রদ্ধার স্রক্‌চন্দন স্বরূপ এই সামান্য গ্রন্থ
সসম্ভ্রমে অর্পিত হইল।

বাজে নটেশের নৃত্যের তালে
রঙ্গমল্লী বীণা,
তানে সুরে মুহু পল্লবি' উঠে
রাগিণী বিশ্বলীনা !
জীবন-রঙ্গ ! শত তরঙ্গ
চির-ভঙ্গিমাময়,
স্ফুরি' নীহারিকা ফুটায় তারকা
অপরূপ অভিনয় !
অসীমের নীড়ে সুপ্ত পরান
স্বপন-রভসে দোলে,
হৃদয়-কুহরে অনাদি ডমরু
'ডিমি-ডিমি-ডিমি' বোলে !
রাঙা অনুরাগ—গেরুয়া বিরাগ—
খেলে নিতি নব খেলা,
করুণ-মধুর রুদ্র দারুণ
দুঃখ-সুখের মেলা।
ত্রিভুবন-জোড়া রঙ্গ-পীঠিকা
ত্রিকাল মিলনী গাথা,
উদয়-প্রলয়-নিলয় রঙ্গে
রঙ্গমল্লী গাঁথা।
চলেছে নৃত্য চির-বিচিত্র
অভিনব-অভিরাম,—
মহাসাগরের নাগ-উপবীত
নিমেষে পুষ্পদাম !
মোহন বাঁশীর রন্ধ্র ভেদিয়া
উদাসীন শিঙা বাজে,
জনম মরণ চরণে দলিয়া
নাচে রে নটেশ নাচে !

আয়ুষ্মতী

পাত্র ও পাত্রী

পুরঞ্জয়	...	বৈশালীর প্রবীণ যোদ্ধা
আর্যধন	...	সম্ভ্রান্ত বংশীয় সমৃদ্ধ যুবক
সুবর্চস্	...	বৈশালীর বর্ধিষ্ণু ভদ্রলোক
জ্যেষ্ঠক	...	জনৈক বৃদ্ধ
আয়ুষ্মতী	...	পুরঞ্জয়ের কন্যা ও আর্যধনের বাগ্‌দত্তা পত্নী
ঋষিদাসী	...	আর্যধনের মাতা
বাক্‌সিদ্ধা	...	মন্দির-পালিকা

নাগরিকগণ, সৈনিকগণ ইত্যাদি।

[পটোৎক্ষেপণের অব্যবহিত পূর্বে যবনিকার অন্তরালে কোলাহল]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুরঞ্জয়ের বাটীর সম্মুখস্থ পথ, অদূরে দেবীমন্দির

(জ্যেষ্ঠক, সুবর্চস্ ও নাগরিকগণ)

সুবর্চস্ ॥ পুরঞ্জয়! পুরঞ্জয়! নেমে এস, নেমে এস ত্বরা,
এ বিপদে, এ দুর্দিনে আমাদের হও হে সহায়;
থেক না দুয়ার রুধি' মনে পুষি পুরানো আগুন;
দেখ চেয়ে ধর্না দিয়ে আছি সবে দুয়ারে তোমার।
এস তুমি বাহিরিয়া, পুরঞ্জয়! পূর্বের মতোন
আমাদের সেনাপতি হয়ে, লয়ে চল যুদ্ধে সবে।
পুরদ্বারে—ইন্দ্রকীলে স্পর্ধিত লিচ্ছবি দেছে হানা;
'তুমি সাজিয়াছ যুদ্ধে—জনরবে শুনি এ বারতা
শত্রু হবে হতবুদ্ধি, মিত্রেরা লভিবে নব বল।
কর্ণপাত কর কাকুতিতে হে প্রবীণ! বীরাগ্রণী!
থেক না বিরাগ-ভরে দূরে সরি' পরের মতোন,

তুমি একা শক্তি ধর এ শত্রু দমনে। ওগো বীর,
রক্ষা কর অগ্নি সাগ্নিকের, রক্ষা কর বাস্তুভিটা!
লও এ যুদ্ধের ভার, হও তুমি নেতা আমাদের ;
পুরঞ্জয়! সদাশয় পুরঞ্জয়! রাখ—কথা রাখ।

নাগরিকগণ ॥ কথা রাখ পুরঞ্জয়! রাখ আজ বৈশালীর মান।

(ধীরে ধীরে গৃহাভ্যন্তর হইতে গৃহ-সম্মুখস্থ সোপানশ্রেণীতে পুরঞ্জয়ের অবতরণ)

পুরঞ্জয় ॥ কেন এই গণ্ডগোল? আমারে কিসের প্রয়োজন?

নাগরিকগণ ॥ রক্ষা কর আমাসবে লিচ্ছবির আক্রমণে, বীর!

পুরঞ্জয় ॥ তোমরা বৈশালীবাসী,—তোমাদের এ মহানগরী
এই বাহু পঞ্চযুদ্ধে রক্ষা করিয়াছে শত্রু হতে ;—
বারংবার পঞ্চযুদ্ধে তোমা সবে করেছি উদ্ধার ;
এই.তার পুরস্কার! আমারে রেখেছ অনাদরে,
অশ্বথ-শিকড়ে দীর্ণ পাষাণের জীর্ণ এই স্তূপে,—
অভাবের রাহুগ্রাসে ঘেরা ; পড়ে আছি এক প্রান্তে
দারিদ্র্যে পীড়িত ; পরিত্যক্ত, অবজ্ঞাত ; পঙ্গু যেন
মৃত্যু-প্রতীক্ষায়! তারপর—সহসা পড়েছে মনে
পুরঞ্জয়ে আজ! হেতু? লিচ্ছবি দিয়েছে হানা দ্বারে।
বিস্মৃত বর্জিত যেই সৌভাগ্যের সুখময় দিনে
বিপদের দিনে হায় আসা কেন তাহার দুয়ারে?
ফিরে যাও ; ফিরে যাও ; রাখ দেশ পার যে উপায়ে।
আর নয় ; পুরঞ্জয় তোমাদের কেহ নয় আর।
কল্য, পুনঃ, কন্যা মম আয়ুষ্মতী হবে পরিণীতা
আর্য আর্যধন সহ ; গৃহ মোর যাবে শূন্য হয়ে ;
আজ আমি তারে ছেড়ে কোনোখানে যাব না বাহিরে ;
কোনোমতে হব না বাহির ; ধ্বংস হয়ে যায় যাক্ পুরী!

জ্যেষ্ঠক ॥ বহুযুদ্ধে বহুবার দাঁড়ায়ে তোমার পাশে আমি
যুঝিয়াছি, পুরঞ্জয়! স্মরণ কি আছে মোরে?

পুরঞ্জয় ॥ আছে।

জ্যেষ্ঠক ॥ স্মর তবে একবার তোমার সে মৃত প্রেয়সীরে,—
বৈশালীরে বাসিত সে ভাল ; জন্ম তার এইখানে,
এইখানে তব সনে পরিণয় তার, পুরঞ্জয় ;
সে যদি থাকিত বেঁচে আজ, তবে সে কি অনুরোধ
করিত না তব পাশে, জনমভূমির রক্ষা হেতু ?
প্রিয় তার ছিল এই পুরী, এই সব অলি-গলি
গৃহ-অভিমুখী, আর এই সব চির-পরিচিত
উর্ধ্বী-সমন্বিত অট্টালিকা গিরি সম উর্ধ্বগামী,—
এদেশ বাসিত ভাল প্রেয়সী তোমার, পুরঞ্জয় !
তারে স্মরি',—আমাদের বাঁচাইতে নহে—তারে স্মরি'
যুদ্ধে চল ; ওই শোন জয়ধ্বনি করিছে লিচ্ছবি।

(তোরণের বাহিরে জয়ধ্বনি)

নাগরিকগণ ॥ পুরঞ্জয় ! পুরঞ্জয় ! আর দেরি নয় পুরঞ্জয়।

পুরঞ্জয় ॥ তাই হোক ; আজিকার যুদ্ধ নহে বৈশালীর তরে,
তারে স্মরি' অস্ত্র ধরি—অস্থি যার এ নগরী ধরে।

(নাগরিকগণ আনন্দধ্বনি করিল)

পুরঞ্জয় ॥ কিন্তু রহ, আগে আমি জিজ্ঞাসিয়ে আসি গে দেবীরে,—
কে লভিবে সিদ্ধি আজ শূল-শেল-শল্যের সংঘাতে ?

(মন্দিরের রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে নতজানু হইয়া করজোড়ে)

হে দেবী ! চলেছি যুদ্ধে, বৈশালীরে রক্ষিতে বাসনা,
শত্রু-আক্রমণ হতে ; চেষ্টা মম হবে কি সফল ?
জানাও তা ইঙ্গিতে আভাসে কৃপা করি মোরে দেবী ;
অথবা আসন্ন আজি বৈশালীর দুর্ভাগ্যের নিশা !

দ্বার খুলিয়া বাক্‌সিদ্ধা বাহির হইলেন)

বাক্‌সিদ্ধা ॥ স্বর্গ-মর্ত্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবী কহে, "শোন পুরঞ্জয়,
যুদ্ধে যাত্রা কর যদি, অবশ্য তোমার হবে জয় ;
বৈশালীর রক্ষা বীর ! করিবে তোমারি তরবার—

(হর্ষধ্বনি)

কিন্তু যবে জয় লভি ফিরিবে ভবনে আপনার

তখন প্রথম যারে দেখিবে আপন গৃহদ্বারে,—
হোক্ পশু হোক্ নর,—বলি দিতে হবে জেন' তারে।

পুরঞ্জয় ॥ নাহিক পশ্চাৎপদ তায়।

(বাহিরে বিপক্ষের জয়ধ্বনি)

বর্ম আন, বর্ম আন।

(একজন ভিতর হইতে বর্ম আনিয়া পুরঞ্জয়কে পরাইয়া দিল)

(শিরস্ত্রাণ হস্তে আয়ুষ্মতীর প্রবেশ)

পুরঞ্জয় ॥ বৎসে! বৎসে মোর! একমাত্র সন্তান আমার তুমি;
সাবধানে থেক গৃহে; চলিলাম লিচ্ছবি দমনে।
এস বৎসে, চুমা দাও। (শিরশ্চুম্বন)
এইবার চল বন্ধু সবে,
এইবার বৈশালীর টলমল প্রাকারের দিকে—
চলিল এ পুরঞ্জয়,—কে যাবে হে? সঙ্গে কে কে যাবে?

[আয়ুষ্মতী ব্যতীত সকলের বেগে প্রস্থান

(আর্যধনের প্রবেশ)

আর্যধন ॥ আয়ুষ্মতী!

আয়ুষ্মতী ॥ আর্যধন!

আর্যধন ॥ কিসের এ কোলাহল আজি?
তোমাদের এই নিরালয়ে?

আয়ুষ্মতী ॥ নগরের যত লোক
এসেছিল পিতারে সাধিতে,—বলে, নিয়ে সৈন্যভার
লিচ্ছবির ব্যূহ ভেদি' ছিন্নভিন্ন করিতে তাদের।

আর্যধন ॥ গিয়েছেন চলে তিনি?

আয়ুষ্মতী ॥ গিয়েছেন মুহূর্তেক আগে
যুদ্ধের উৎসাহে মাতি'।

আর্যধন ॥ আর আমি? আছি দূরে সরে
অবহেলি রণাহ্বান; বিরূপ নগরবাসী তাই
মোর 'পরে; অকৃতজ্ঞ বৈশালীর আচরণে যবে

রুষিলেন আর্য পুরঞ্জয়, পক্ষ তাঁর, লয়েছিনু
আমি ; সে অবধি—একি ! মা যে মোর !

(অন্তরালে গমন)

আয়ুষ্মতী ॥ আমারো মা !

(লোকজনসহ ঋষিদাসীর প্রবেশ)

ঋষিদাসী ॥ বৎসে !
সাজাইয়া ঘর দ্বার, গুছাইয়া বিবিধ তৈজস,
কাঞ্চন ভাজন যত একে একে করি পরিষ্কার
রাখিয়াছি ঠাঁয়ে ঠাঁয়ে ; আছে সব তোর প্রতীক্ষায় ;
রেখেছি স্ফটিক পাত্রে কুলুঙ্গিতে ফুলের স্তবক,—
কোণে, সোপানের বাঁকে, ঠাঁই ঠাহরিয়া মনে মনে,
ধীরে ধীরে বহুদিন ধরে তুলেছি সুন্দর করি ;
ঘুরিতে ফিরিতে অতর্কিতে পুষ্পগন্ধে খুশী হবে
মন তোর। পশমের অঙ্গরাখা, শাড়ি রেশমের
রাখিয়াছি রৌদ্রে দিয়ে, সিন্দুকের গুপ্ত অন্ধকারে
হাসিতেছে মণিমুক্তা—সঞ্চিত সে যুগ-যুগান্তের।
যাবে তুমি মা আমার ! পরিচিত আপনার ঘরে ;
অচেনার মতো সেথা পড়িবে না গোলক-ধাঁধায়।
আমি আর ক'টা দিন যাব তীর্থে চলে—

আয়ুষ্মতী ॥ (হাতে হাত লইয়া) সে হবে না।

ঋষিদাসী ॥ ভাল, বাছা, তোরি কথা থাক ;—তোরি কথা থাক তবে।
গৃহিণী ! গৃহের লক্ষ্মী ! আমি শুধু ভাবি, আয়ুষ্মতী,—
মা'র মন,—আমি ভাবি 'আয়ুষ্মতী—অল্পবয়সী সে
যত্ন সে কি পারিবে করিতে মোর পুত্রে মোর মতো ?'
জানি আমি কিশোর হৃদয়—ভালবাসা সুগভীর
তার, তবু,—সে কি ঠিক আমার এ স্নেহের মতোন ?—
বহু মানসিকে গড়া ? বহু দৈব আশ্বাসের বাসা ?—
বিশ্বাসের স্বর্গবায়ু ? দীর্ঘশ্বাস-সঞ্জীবিত আশা ?—

অকল্যাণ-আশঙ্কায় চিরকাল আঁখিজল ফেলা ?—
দুশ্চিন্তায় স্পন্দমান ?—অসম্ভব। তবু জানি মনে
আমি কিছু নহি চিরদিন ; তোমা সম শান্তশীলা
বধূ, ঘরে আনে পুত্র, এ আমার আজন্মের সাধ।

আয়ুষ্মতী ॥ মা আমার ! মা আমার ! মাতৃহীনা মা পেয়েছে ফিরে।

ঋষিদাসী ॥ বৎসে ! তুমি নাহি জান, বৃদ্ধ হৃদয়ের কী দুর্দশা ;
পরিশ্রান্ত, অবসন্ন ; নূতনে আপন করি' নিতে
কত যে আয়াস তার ! পুরাতনে প্রাণপণ বলে
আঁকড়িয়া ধরে থাকে ; ভুলেছিনু সন্তানেরে লয়ে
এতদিন ; তাহারেও দিতে হবে নূতনেরে সঁপে,—
সময় এসেছে ; আ—আ ! নূতনে ও পুরাতনে, হায়,
দ্বন্দ্ব যদি বেধে যায়, নূতনেরি হবে জয়, জানি।
পোড়া চোখে আসে জল, মনে কিছু কর না মা, তুমি,
বুড়া বয়সের এই ধারা ; তবে আসি ; কাল তবে—

[শিরশ্চুম্বন ও প্রস্থান

আর্যধন ॥ একি ! বিবর্ণ যে মুখ ! মা তোমারে বলেছেন কিছু ?

আয়ুষ্মতী ॥ কই ? কিছু না—কিছু না ; বিবর্ণ হয়েছে নাকি মুখ ?
তবে সে পিতার কথা ভেবে ; যুদ্ধের এ আবাহনে
কান যদি না দিতেন তিনি, বড় ভাল হ'ত তবে,
বিশেষতঃ আজ রাত্রে, দুর্ঘটনা ঘটে যদি কোনো,—
দূর হোক দুর্ভাবনা, ওকথা ভাবিতে নাই আজ ;
আজিকার এই রাত্রি কাটাইব দোঁহে মিলি মোরা
কালিকার কথা ভাবি, অরুণ-উদয়-প্রতীক্ষায়,
গভীর রহস্যে-ঘেরা সংমিলিত দুটি জীবনের
ভবিষ্যের কথা ভাবি স্বপ্নে স্বপ্নে পোহাব রজনী।

আর্যধন ॥ অনাগত দিবসের প্রাণময় কিরণ-স্পন্দন !
—এখনি সে আরম্ভ হয়েছে !

আয়ুষ্মতী ॥ পূর্বাকাশে মেঘস্তর
উঠিল গোলাপী হয়ে—এরি মধ্যে !—আমাদের লাগি !
আর্যধন ॥ দিন এসে চলে যাবে ; তারপর, আসিবে চন্দ্রমা
সন্ধ্যাতারা সঙ্গে লয়ে !
আয়ুষ্মতী ॥ তারপর ধীরে ধীরে ধীরে
আবার সে চন্দ্রতারা মিলাইবে দিনের আলোকে !
দেখ, মনে হয়, যেন, আজ রাত্রে পৃথিবী আকাশ
স্তব্ধ হয়ে রবে ক্ষণকাল পবিত্র-গম্ভীর এই
দুটি হৃদয়ের সম্মিলন-সন্ধিক্ষণে ; মত্ত বায়ু
হবে স্থির ; ঘরে ঘরে শয্যাতলে জাগিয়া শিশুরা
জিজ্ঞাসিবে জননীরে—কেন হেন স্তব্ধতা চৌদিকে ?
আর্যধন ॥ নৌবৎও ধ্বনিবে নভে ; শুনিবে সে, কান আছে যার।
আয়ুষ্মতী ॥ আর মৃদু মধুস্বর—যত সে তরুণ দেবতার !
আর্যধন ॥ চন্দ্রালোকে আত্মায় আত্মায় বিবাহ নন্দন-বনে !
আয়ুষ্মতী ॥ আর যত মৃত প্রেমিকের জলে স্থলে জাগরণ !
আর, আমি না উঠিতে জেগে, দেবতারা একে একে
এসে, মোর শয্যাপাশে, মৌনে রেখে যাবে আশীর্বাদী !—
অপূর্ব, উজ্জ্বল, মনোহর ! মোরা আজ বড় সুখী ;
কত লোক এজগতে দুঃখে দিন করিছে যাপন,
মোরা দোঁহে তবু সুখী ! একি গো অন্যায় ?
আর্যধন ॥ কি অন্যায় ?
আতিশয্য আনন্দের—অন্যায় কি আছে তায় ?
আয়ুষ্মতী ॥ বল
মোরে, প্রিয় ! যেইক্ষণে মনে মনে মনটি তোমার
ফেলিল স্বীকার করে ভাল সে বেসেছে একজনে,—
সেইক্ষণ—সেকি রাত্রি ?—সেকি দিন ?
আর্যধন ॥ কেমনে বর্ণিব ?
দিন সে—কিবা সে রাত্রি ; মনে হয়, যেন সেইক্ষণে

অরুণ উদয় হ'ল—সেইক্ষণে শুকতার মাঝে
নক্ষত্রেরও হ'ল আবির্ভাব ; উজ্জ্বল-জাজ্বল, শুভ্র।
মাতৃ-গর্ভ-শয্যা-তলে হ'ল যবে জীবন-সঞ্চার
অস্ফুট দু'আঁখি দিয়ে তোমারেই খুঁজেছি সেদিন ;
ভূমিষ্ঠ হইয়া, হায়, কেঁদেছিনু তোমারি লাগিয়া ;
তোমারি লাগিয়া বুঝি, বাঁচিবার ছিল প্রয়োজন ;
তারপর দিনে দিনে, বাড়িয়াছি, বাসিয়াছি ভাল—
শিয়রে-সোনার-কাঠি গল্পের সে রাজকন্যাটিরে,
আজ যেন মনে হয় রয়েছে সে তোমাতে বিলীন,
তোমারি দু'আঁখি দিয়ে সেই কন্যা দেখিছে আমায় !

আয়ুষ্মতী ॥ ভাল তবে বাসিতে সে রাজকন্যাটিরে ; মোরে নয় !

আর্যধন ॥ লক্ষ কাহিনীর মাঝে তুমি ছিলে লক্ষ রূপ ধরে।

আয়ুষ্মতী ॥ আমার এ ক্ষুদ্র হিয়াখানি—আশ্চর্য এ ! নিতি নিতি
প্রকাশের—বিকাশের—পুলকের কি এক বারতা
পাশে আসি এর মাঝে সূর্য-অস্ত-কালে—প্রতিদিন ;
লক্ষ্য করিয়াছি আমি ;—সে এক আশ্চর্য অনুভূতি !
সে যেন গো চকোরের চন্দ্রলোক-যাত্রা দুর্নিবার
স্বর্গের তোরণ দিয়া, আনন্দে রোমাঞ্চ সারা দেহে !
হায়,—পিতা যদি—আজ—

আর্যধন ॥ আজিকার দিনে আয়ুষ্মতী
দূর কর দুর্ভাবনা তুমি।

আয়ুষ্মতী ॥ নিরাপদে—ফিরে যদি—

(মন্দির-সোপানে গিয়া করজোড়ে)

দেবি ! দেবি ! শক্তিরূপা দেবি ! নমি তোরে ভক্তি ভরে ;
লিচ্ছবির যুদ্ধ হতে নিরাপদে ফিরাও পিতারে।
হেথা মোরা দুটি প্রাণী ভাসি আজ যে আনন্দ-স্রোতে
সে স্রোত বারেক আসে মানবের মর্ত্য এ জীবনে।
আমাদের দু'জনের কালি শুভ বিবাহের দিন

আকস্মিক দুর্ঘটনা যেন দেবি! বিঘ্ন না ঘটায়;
সহসা না দেয় ভেঙে ভঙ্গুর এ সুখের স্বপন
আমাদের। যাই ঘরে, ভিক্ষা মোর জানায়ে তোমায়।
বিজয়ী পিতার মম প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায়
রব বসি' উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব। তারপর তূর্যধ্বনি
নৈশ নিস্তব্ধতা বিঁধি জয়বার্তা জানাবে যখন
আমিও সবার সাথে বাহিরিব পিতারে ভেটিতে
পিতৃ-গর্বে গরবিনী, বিজয়িনী জয়ের গৌরবে।
প্রিয়তম! আসি তবে, যাই গৃহে আজিকার মতো।

আর্যধন ॥ আজিকার মত; এস।

[আয়ুষ্মতীর প্রস্থান

(অস্তসূর্যের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া)

হে দেবতা! জ্যোতি অস্তমান্!
আশীর্বাদ কর তুমি আমারে ও আমার প্রিয়ারে
অস্তাচলচূড়া হতে। কাল পুনঃ ভাস্বর প্রভাতে
সুবর্ণে রঞ্জিবে যবে তরঙ্গিত উদয়-সাগর,
আমাদের দু'জনের পরে বরষিয়ো রশ্মিচ্ছটা
মৌন মহিমায়, অপরূপ;—লাবণ্যের লাজাঞ্জলি।
কিংবা যুগলের শিরে বুলাইয়ো পবিত্র ও কর।

(নেপথ্যে দূরে জয়ধ্বনি)

কিসের এ কোলাহল?

(নাগরিকের প্রবেশ)

নাগরিক ॥ জিত! জিত! আমাদের জিত!
ওই দেখ! শস্ত্রপাণি স্কন্ধারূঢ় জয়ী পুরঞ্জয়!
জয়গর্বে উদ্ভাসিত! ছত্রভঙ্গ পলায় লিচ্ছবি!

(অদূরে জয়ধ্বনি)

আর্যধন ॥ যাই এবে অন্তরালে আমি; দেখিব অপূর্ব দৃশ্য,—
পিতা ও কন্যায় ভেট,—বিজয়ান্তে আনন্দ-মিলন।

(অন্তরালে গমন)

(নানা শ্রেণীর সৈনিক ও নাগরিক আনন্দে কোলাহল করিতে করিতে দলে দলে দ্রুতবেগে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইল। শেষে কয়েকজন নাগরিকের স্কন্ধারূঢ় হইয়া উদ্যত তরবারি হস্তে পুরঞ্জয়ের প্রবেশ। ঠিক এই সময়ে গৃহাভ্যন্তর হইতে শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে সহচরী পরিবেষ্টিতা আয়ুষ্মতী প্রবেশ করিলেন।)

পুরঞ্জয় ॥ তুই !—তুই !

জনৈক লোক ॥ মূর্ছা পায় পুরঞ্জয়,—দেখ, দেখ, ধর।

দ্বিতীয় লোক ॥ কোথাও লেগেছে চোট্,—যুদ্ধকালে হয়নি খেয়াল,
এখন করেছে কাবু।

তৃতীয় লোক ॥ ভিড় ছাড়—তফাত—তফাত।

(আর্যধনের প্রবেশ ; আর্যধন ও আয়ুষ্মতী পুরঞ্জয়কে ধরিয়া রহিলেন)

পুরঞ্জয় ॥ (সামলাইয়া) সর্বনাশ হয়ে গেল, ফিরে যাও, ঘরে যাও সবে ;
যে কাজ করিতে হবে—নিজ হাতে আমায় এখন—
নির্জনে সে হবে ভাল ; যাও বন্ধুগণ। আয়ুষ্মতী !
তুমি থাক, আর্যধন ! আর তুমি থাক, এইখানে ;
এখন যা কাজ,—তাহা আমাদের তিনটিকে নিয়ে।

(ভিড় ঠেলিয়া পুরঞ্জয়ের কাছে আসিয়া)

সুবর্চস্ ॥ চলিয়া যাবার আগে, জেনে যেতে চায় এরা সবে,—
চোট্ তো লাগেনি কোথা' ?

পুরঞ্জয় ॥ লাগেনিক'—বাহিরে সে চোট্।

সুবর্চস্ ॥ বিদায় এখন তবে ; তব তরে বিজয়-মুকুট
ল'য়ে সবে ফিরিব আবার ; এখন বিদায় হই।

[আয়ুষ্মতী, আর্যধন ও পুরঞ্জয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান

পুরঞ্জয় ॥ আর্যধন ! আয়ুষ্মতী ! যে দারুণ—যে বিষম কথা
বাধ্য হয়ে হইবে বলিতে, সংক্ষেপে সে বলি, শোনো :
যুদ্ধযাত্রাকালে যবে দেবীরে সুধানু ফলাফল,—
কহিলেন দেবী মোরে দৈব-ভাষে, "শোনো পুরঞ্জয় !
লিচ্ছবির সহ রণে নিশ্চয় তোমার হবে জয় ;
বৈশালীরে রক্ষা আজি করিবে তোমারি তরবার,
কিন্তু যবে জয় লভি' ফিরিবে আলয়ে আপনার,—

তখন প্রথম যারে দেখিবে সম্মুখে নিজ দ্বারে,—
হোক পশু, হোক নর,—বলি দিতে হবে, জেন তারে।"
—তুই বাছা—তুই আয়ুষ্মতী—সর্বাগ্রে ভেটিলি মোরে
আজ।—দেবী! দেবী! দেবী! এই তবে তোমার আদেশ
সন্তানে সে বলি দিবে শত্রু হতে রক্ষিল যে দেশ।

আর্যধন ॥ হবে না সে বৈশালীতে; যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি,—
দেহে মোর আছে প্রাণ,—শিরায় শোণিত,—হবে না সে।
দেবদেবী মানিনেকো, দৈববাণী—গ্রাহ্য সে করিনে
দেবতা অন্যায় যদি বলে; কি বিধানে, কি বিচারে
কোন্ অধিকারে, সাধিবে এ কাজ আর্য? কহ তুমি;
করেছ স্বদেশ রক্ষা, তাই ব'লে সন্তানে বধিবে?
সে নির্দোষ—কী করেছে? কোন্ দোষে মৃত্যুদণ্ড তার?
তার প্রাণ বলি দিবে? বৈশালীর লাগি'? এত দাম
বৈশালীর? ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম রক্তবিন্দু তার
ঢের বেশী মূল্যবান জগতের শ্রেষ্ঠ রাজ্য হতে।
অদ্ভুত পূজারী তুমি,—বলি-পশু আপন সন্তান!

পুরঞ্জয় ॥ রক্ষা কর—বন্ধ কর প্রগল্ভ প্রলাপ!

আর্যধন ॥ ভেবে দেখ,
ওরে বধি' বধিবে দু'জনে; ম'রে গেলে আয়ুষ্মতী
তারপর বেঁচে থাকা—প্রাণহীন জড়ের জগতে—
ভেবেছ সম্ভব তুমি—মোর পক্ষে? আর্য পুরঞ্জয়!
আমি যাব; সেই শোকে মা আমার মরিবে অকালে
বধূবরণের লাগি' সাজায় বরণডালা যেই
নিশ্চিন্ত-আনন্দে আজি উৎসব-মগন গৃহমাঝে।
আর তুমি? এ বয়সে কোথা হায় লভিবে সান্ত্বনা?
কাল প্রাতে অসি, বর্ম, ধনুঃশর হবে না দোসর,
সুধাবে না কোনো কথা শূন্যগর্ভ সাঁজোয়া তোমার!
তবু তুমি দিবে বলি! দিবে বলি ভবিষ্যের আশা,

চূর্ণ করি দু'জনের হৃদয়ের স্বপন-সাধনা ?
ছিন্ন করি দুটি জীবনের মিলনের স্বর্ণ-ডোর ?
মুছে দিবে আনন্দের লিপি দুঃখভাগী দোসরের ?
ভেবে রেখেছিনু মনে যেই পাণি করিব গ্রহণ
আপনার পাণিপুটে, শিথিল সে হইবে না কভু,—
যতদিন মৃত্যু তারে না করে শিথিল। আর তুমি
শিথিল করিয়া তারে দিতে চাও গ্রহণের ক্ষণে ?
ধেয়ানে যা গড়েছিনু বহু নিশি জাগি'—ভেঙে দিবে ?
আমি বলিতেছি, আর্য, গ্রাহ্য তুমি করো না দেবতা ;
শূন্যগর্ভ দেবলোক—বিচারের আশা নাই হোথা ;
আর যদি, বৃদ্ধ ! তুমি দেবতার না দেখ অন্যায়
তোমার অন্যায় কাজে আজ তবে আমি দিব বাধা ;
সন্তান-হত্যার পাপে লিপ্ত তুমি হইবার আগে
শুভার্থী তোমার আমি, নিজ হাতে বধিব তোমারে।

পুরঞ্জয় ॥ বৎস ! কাজ কি সহজ কিছু হ'ল—কথাতে তোমার ?
সহজে এ দেবঋণ শোধিবার না দেখি উপায় ;
লব্ধ জয়—প্রতিশ্রুত মূল্য দিতে হবে সে এখন।
মর্ত্য নর—কী বুঝিবে দেবতার আমোঘ বিধান ?—
যে বিধানে সূর্য চলে—অপথে পবন পায় পথ !
তবু—তবু—নাহি জানি—কোন্ প্রাণে—যে রক্ত আমারি রক্ত—
নিজ হাতে, সেই রক্তপাত—কেমনে করিব আমি ?
রুক্ষস্বরে যেই দিনই কিছু আমি বলেছি বাছারে
সেই দিনই পারিনি ঘুমাতে রাতে,—সেই আয়ুষ্মতী ;
মাতৃহীন সন্তান আমার, মায়ের স্মিরিতি মেয়ে !
আমার সে মৃতপ্রিয়া রেখে গেছে বহু চিহ্ন তার
ওর মাঝে—বহু স্মৃতি ; সেই হাসি, সেই কণ্ঠস্বর।
সেই ধারা ! সেই সে ধরন !—পুরাতন—পরিচিত।
ওরে যদি করি বধ দুই নারী হত তবে হবে ;

পবিত্র ! পবিত্র তুই মায়ের-আভাসে-ভরা মেয়ে।
তোর মৃত্যু ! হায় বৎসে ! সে যে তোর মায়েরও মরণ ;
মূর্তি ধরে আজো যে রয়েছে তোর মাঝে, সেই নারী !
সংমিলিত আমাদের জীবনের ধারা, থেমে যাবে
এতদূরে এসে—জগতের আদিকাল হতে ! হায় !
আর আমি ? এর পরে শূন্য গৃহে কী পাব আশ্বাস ?
সন্ধ্যা-অন্ধকারে যবে বর্ষাধারা ঝরিবে ঝর্ঝর,
কী সান্ত্বনা রহিবে তখন ? বাঁচায়েছি বৈশালীরে ?
সন্তান খোয়ায়ে লাভ স্বদেশীর প্রশংসা-গুঞ্জন ?
যশের মুকুট পরা—সন্তানের রক্তসিক্ত হাতে ?
তার চেয়ে, মৃত্যু ! তুমি, বেঁধ বাণে এই মুমূর্ষুরে !
দেবী ! দেবী ! বিজয়ের মূল্য যদি হয় নরবলি
বিজয়ী সে দিক্ নিজ প্রাণ, আজ্ঞা কর, আজ্ঞা কর।
বৃদ্ধের এ রক্তধারা—পাংশু বলে গ্রাহ্য কি হবে না ?
কিংবা চাহ তপ্ত রক্তধারা—রক্তজবা সম লাল ?
বল, দেবী দয়া করি, উত্তরের আছি প্রতীক্ষায়।

(মন্দিরের দ্বার পূর্ববৎ রুদ্ধ রহিল)

পুরঞ্জয় ॥ নির্বাক ! নির্বাক দেবী !
আয়ুষ্মতী ॥ আমার বক্তব্য আছে পিতা !
পুরঞ্জয় ॥ বল বৎসে !
আয়ুষ্মতী ॥ প্রথম শুনিনু যবে দারুণ ও কথা,—
শুনিনু তোমারি মুখে, নারিনু বুঝিতে যেন ঠিক,
বজ্রাহত রহিনু দাঁড়ায়ে ! ক্রমে বুঝিলাম সব
ধীরে ধীরে সব কথা পরিষ্কার হয়ে যেন এল ;
বুঝিলাম, শত্রু হতে রক্ষা তুমি করেছ স্বদেশ,—
বলি দিতে হবে তাই একমাত্র সন্তান তোমারি।
ভাবিলাম মনে মনে, "মরিব কেমন করে আমি ?
পিতা মোর কেমনে বা কাটিবেন মোরে নিজ হাতে ?

যেই হাতে একদিন শূন্যে মোরে করিয়া উৎক্ষেপ
ধরেছেন সকৌতুকে খেলাচ্ছলে অবলীলাক্রমে।
আমি, হায়, একমাত্র সন্তান তাঁহার ; ভাই নাই,
নাই বোন ; শিশুকালে মাতৃহীনা, তাঁহারি যতনে
উঠেছি বাড়িয়া দিনে দিনে, একমাত্র সঙ্গী তাঁর
আমি এ নির্জন গৃহে, সঙ্গীহীন জীবনের সাথী।
আমি না থাকিলে কাছে কে শুনাবে প্রতিদিন, পিতা !
দেবতার বন্দনা সন্ধ্যায়, কে সুধাবে শুদ্ধ সাঁঝে
মায়ের যত সে কথা, যায় কথা কহি' তুমি আজো
লঘু করে নাও নিজ মন, নয়নের জলে তিতি ;—
ব্যক্ত করি গুপ্ত শোক। এ বৃদ্ধ বয়সে হায় পিতা,
অযত্ন তোমার যদি হয়, মরেও পাব না শান্তি
তবে। হায়, তাই ভাবি তোমার ভাবনা সব আগে।
তারপর,—মনে মনে যে পেতেছে সোনার সংসার,—
রাত্রি জেগে বসে আছে সোনালী মেঘের প্রতীক্ষায়
পূর্বদিক পানে চেয়ে, সহসা যে আশাহত আজ,—
ভাবিলাম তার কথা। কিন্তু, কাজ নাই সে কথায়,
সে কথা লুকানো থাক হৃদয়ের তপ্ত দুটি নীড়ে।
প্রিয়তম ! সে স্বপন নিতান্তই ব্যর্থ যদি হয়,—
তাই হোক ; সে কথা তুলো না তবে আর, ভোলা ভালো
এখন সে সুন্দর স্বপন। ভাবি আমি, এর পর
কেমনে কী ভাবে তুমি, হায়, জগতে কাটাবে কাল
ভগ্ন এ হৃদয় লয়ে ; পাতিতে কি পারিবে সংসার ?
দুটি জীবনের সূত্র—এমনি সে গিয়েছে জড়ায়ে
এক সাথে, দিনে, দিনে !—এখন সে একটি ছিঁড়িলে
আরটিও হয় তো ছিঁড়িবে ; তাই ভাবি, তাই ভাবি।
আর ভাবি মরে-যাওয়া সে কী ভয়ংকর—কী কঠিন !
আমি যদি হইতাম সদ্যোজাত ক্ষুদ্র এক শিশু

আলোকে ক্ষণেক হেসে পরক্ষণে যেতাম মরিয়া,
এত সুকঠিন তবে হ'ত না মরণ ; কিংবা যদি
বৃদ্ধকালে হ'ত মৃত্যু—উপবন শ্মশান যখন ;—
নীরবে যেতাম চলে তারালোকে, বিনা অশ্রুপাতে।
কিন্তু হায়! শিরায় শিরায় যবে আনন্দ-স্পন্দন
মনে মনে পৃথিবীর নানা সুখ সম্ভোগের সাধ
এ কিশোর কালে হায়, নূতনের নেশা নিয়ে চোখে
আচম্বিতে চ'লে যাওয়া! আলোকের আলয় ফেলিয়া
ছায়া হয়ে শূন্যে ফেরা,—কাকলি-কূজন-হীন দেশে!
শ্মশান-অশথ-ছায়ে ভেসে ফেরা বৈতরণী-জলে
জীর্ণ পর্ণ সম, হায়! শোনা শুধু মৃতের নিশ্বাস!
মরণ আসন্ন মোর! ওগো প্রিয়! ওগো প্রিয়তম!
আর তো সরম নাই তোমারে জানাতে এ সময়
হৃদয়ের সব সাধ ; ইচ্ছা ছিল ওই তব বুকে
নিজেরে সঁপিয়া দিতে, পরশের পরম রভসে
ডুবে যেতে ধীরে ধীরে, হরষের নিবিড় নিশীথে।
সন্তানের ছিল সাধ আশৈশব মনের গোপনে,
ছিল সাধ স'পিতে তা' সবে একে একে অঙ্কে তব,
ছিল সাধ স্তন্য দিতে ভাবী বীর অদম্ভ শিশুরে,
ভেবেছিনু ভাবী কোনো কবি পুষ্ট হবে স্তন্যে মোর।
কিছুই হ'ল না হায়! যেতে হ'ল অকালে চলিয়া ;
অনাঘ্রাত পুষ্পসম অকলঙ্ক অম্লান জীবন,
অকালে সে ডুবে যাবে মরণের মৌন অন্ধকারে।
সব কথা ভাবিয়াছি, মুহূর্তে জেগেছে প্রাণে সব ;
তবু, তবু মনে হয়, দূর হতে এসেছে আহ্বান,—
কানে কানে কহিছে কে! কে আমারে ডাকে যেন 'আয়!'
মন্দ্র মৃদু দৃঢ় সেই স্বর! এ যেন স্বর্গের ডাক!
পিতার মমতা-পাশ, পতিপ্রেম, সন্তানের সাধ,

সকলের চেয়ে বড়,—সব চেয়ে বড় এ আহ্বান !
মনে হয় বিচার-বিতর্ক-ভোলা এই সে আহ্বানে
পঙ্গু করে পর্বত লঙ্ঘন, আঁখি মুদি নত করি
শির ! বুঝি এ আহ্বান জগতের তপস্বী আত্মার
উর্দ্ধবাহু, উর্দ্ধমুখ ! এ আহ্বান সতীর চিতার,
জগতের দুর্গমচারীর সংমিলিত এ আহ্বান,—
মৃত্যুতে অমর যারা,—সেই সব বীরের এ ডাক !
পারিব মরিতে আমি, এ পাত্র করিব আমি পান।
চোখে মোর নাই জল, প্রাণে নাই ভয়ের স্পন্দন,
বন্ধ হয়ে যাবে,—তবু হৃৎপিণ্ড দোলে শান্ত তালে !
মনে হয়—যেন কারা শূন্যে মোরে নিতে চায় তুলে,
কে কুমারী বেড়িয়াছে কণ্ঠ মোর নিজ ভুজপাশে,
কে কিশোরী পাণ্ডু হাসি হাসে মোর পানে চেয়ে চেয়ে !
এমন মরণ হয় কার ?—হেন গৌরবের মৃত্যু ?
ছাথ্ তোরা বৈশালীর লোক ! বৈশালী সে রক্ষা হ'ল,
আমি মরিলাম ; মোরে বলি দিয়ে—মুক্ত হ'ল দেশ !
দুঃখ কিছু নাই পিতা, আশীর্বাদ নিয়েছি যেমন—
শির পেতে চিরদিন, তেমনি নেব এ অস্ত্রাঘাত।
ব্যথা, ওগো ! সহিতে রহিলে তুমি, পিতা ; আমার এ
ক্ষণিক বেদনা,—তার সনে তুলনায়। স্মর পিতা
স্মর আজি, আছে যত সন্তানবলির অবদান
পুরাণে ও ইতিহাসে, জীবনের মহাক্ষণে যারা
কর্তব্যের নির্দেশেতে সন্তানে বধিল নিজ হাতে।
চল গৃহে, গৃহ-বেদিকায়। যোদ্ধা তুমি পিতা মোর,
তুমি জান কোথায় হানিলে অস্ত্র মরিব সহজে,
এইখানে, নয় ? দেখো, দুইবার না হয় হানিতে।
গৌরবের এ মরণ, তুচ্ছ বাঁচা এর তুলনায় !

(পুরঞ্জয় ও আয়ুষ্মতী সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন)

আর্যধন ॥ আয়ুষ্মতী!

আয়ুষ্মতী ॥ হায় বন্ধু! আর তুমি ডেক না পিছনে,
মরণেরে চলেছি বরিতে।

[প্রস্থান

(রঙ্গমঞ্চ অল্পে অল্পে অন্ধকার হইয়া আসিল। সমস্ত নিস্তব্ধ)

আর্যধন ॥ কেঁদে কি উঠিল কেহ?—
করিল চিৎকার সে কি?—না, না, সে তো কাঁদিবার নয়;
এখনো নিস্তব্ধ সব, নিজ অস্ত্রে মৃত্যু মোর স্থির।

[প্রস্থান

(জয়ধ্বনি করিতে করিতে নাগরিকগণের প্রবেশ; বিজয়-মুকুট হস্তে সুবর্চসের প্রবেশ)

নাগরিকগণ ॥ জয় জয় পুরঞ্জয়! বৈশালীর শ্রেষ্ঠ বীর জয়!

(ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া পুরঞ্জয় গৃহ-সোপানে আসিয়া দাঁড়াইলেন; হাতে ও বস্ত্রে রক্তচিহ্ন)

পুরঞ্জয় ॥ বন্ধুগণ! আমি আজ তোমাদের জয়োল্লাস মাঝে
বাজাব না বিসংবাদী স্বর,—নিজের শোকের কথা
কয়ে; সাম্রাজ্যের আনন্দের দিনে ক্ষুদ্র সংসারের
দুঃখকথা,—দমন করিতে চাই আপনার মনে;
শুধু এই রক্তসিক্ত কর করিয়া উদ্যত ঊর্ধ্বে
জানাব একটি কথা! দেবতার অলঙ্ঘ্য আদেশ
হয়েছিল মোর 'পরে,—জয়ী হলে লিচ্ছবীর রণে
ফিরে এসে নিজগৃহে যাহারে দেখিব সব আগে
বলি তারে হবে দিতে আপনার হাতে দেবোদ্দেশে।
ভেটিলাম যারে, হায়, সে আমার আপন সন্তান।
অলঙ্ঘ্য দেবের আজ্ঞা; তাই তারে এই মাত্র আমি
বলি দিছি দেবোদ্দেশে, কাটিয়াছি একটি আঘাতে।
মনে হয়, পায়নি অধিক ব্যথা আয়ুষ্মতী মোর।
এই যে রক্তের লেখা হাতে, উত্তরীয়ে,—এ আমার
কন্যার বুকের রক্ত,—একমাত্র সন্তানের লোহ।
পুত্র নাই, পত্নী পরলোকে, সংসারে নাহিক কেহ;
নিঃসঙ্গ নির্ভর-হারা দুই হাতে তবু লব আমি

জয়ের মুকুটখানি ; জয়ী আমি,—পরিব সে শিরে।
তারপর একদিন শিথিল-শীতল হাত হতে
খসি' সে পড়িবে ভূমে, স্মৃতিশেষ হবে মোর নাম ;
সেই অনাগত কালে মনে রেখো, হে বৈশালীবাসী !
আমি রক্ষা করেছিনু তোমাদের প্রিয় বাস্তভূমি
সমৃদ্ধ এ বৈশালী পুরীরে। আর মনে রেখ, হায়,
বিনা দুঃখে হয়নি সে কাজ, হয়নি সে বিনা শোকে।

(নিঃশব্দে ক্রমশঃ ভিড় সরিয়া গেল, মন্দিরের দ্বার খুলিয়া বাক্‌সিদ্ধা প্রবেশ করিলেন। পুরঞ্জয় ও বাক্‌সিদ্ধা পরস্পরের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল)

সবুজ সমাধি

পাত্র ও পাত্রী

ইয়ন্ত	...	চীনসম্রাট
হান্‌চীন্‌ খাঁ	...	তাতার সর্দার
মৌংস্থ	...	চীনসম্রাটের একজন অমাত্য
শাওকীন	...	কৃষক কন্যা ; পরে রানী

মুখ্য অমাত্য, তাতার দূত, প্রতিহারী প্রভৃতি।

প্রস্তাবনা

হান্‌চীন্‌ খাঁ॥ শীতের বাতাস এসেছে আজিকে
কাঁপায়ে ঘাসের বন,—
পশ্‌মী আমার শিবিরের মাঝে
পশিছে অনুক্ষণ।
নিশীথ চাঁদেরে বিরহী সিপাহী
শোনায় ব্যাকুল বাঁশী,
কুৎসিত যত কুটীরের 'পরে
জোছনার ম্লান হাসি।
আমি সর্দার, হুকুমে আমার
শিঙা বাঁকাইয়া ধরি,
লাখ লোক ছোটে যুদ্ধ করিতে
মরণ তুচ্ছ করি।

আমি হূনবংশের হান্‌চীন্‌ খাঁ; এই বেলে মাটির মুলুকের প্রাচীন বাসিন্দা; উত্তর-খণ্ডের আমি একলা মালিক। শিকার আমাদের ব্যবসা, যুদ্ধ আমাদের নিত্যকর্ম। চীনসম্রাট উন্‌কং আমাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিল; উইকং আমাদের ভয়ে সন্ধির প্রার্থী হয়েছিল। চীনে হূনে শেষবার যে যুদ্ধটা হয়ে গেছে সেই যুদ্ধে হার মেনে চীনসম্রাট আমার পূর্বপুরুষকে কন্যাদান করে বিবাদ মিটিয়েছিল। এমন কতবার হয়েছে।

সম্প্রতি গৃহবিবাদে আমাদের কিছু কাবু হতে হয়েছিল; যা হোক শেষে সকলে আমাকেই সর্দার বলে মেনে নিয়েছে। আমার হাতে এখন লাখো লোক। এবার রাজবংশের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হবার ইচ্ছায় দক্ষিণে আসা গেছে। সম্রাটের কাছে কন্যা প্রার্থনা করে কাল এক দূত পাঠিইছি। বলতে পারিনে তিনি আমাদের প্রাচীন দাবী রাখবেন কিনা। আমার লোকেরা সব শিকারে বেরিয়েছে। কিছু জুটে গেলেই মঙ্গল; আমরা তাতারের লোক,—খেতও নেই, খামারও নেই; যা করে তীর ধনুক।

[প্রস্থান

(মৌংস্থর প্রবেশ)

মৌংস্থ॥ কলিজা শিকারী বাজের মতোন
চিলের মতোন চক্ষু যার,—
নষ্টামি, লোভ, তোষামোদ আর
ছেঁদো কথা যার গলার হার,—
প্রভুর চোখে যে ধূলা দিতে পারে
অধীনের পারে টিপিতে গলা,—
আজীবন তার কত যে সুবিধা
এক মুখে তাহা যায় না বলা।

এই মৌংস্থ যে সম্রাটের অমাত্য হয়েছেন সে তো এমনি করেই। চাটু অস্ত্র এমনি পটুতার সঙ্গে প্রয়োগ করে আসা হয়েছে যে, সম্রাট এখন আর আমাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করতে চান না। আমি নইলে তাঁর আমোদই হয় না। আমার কথায় ওঠেন-বসেন। এখন এ রাজ্যে এমন কে আছে যে মৌস্থংকে দেখে মাথা না নোয়ায়?—কে না খাতির করে? ভয়েই হোক আর ভক্তিতেই হোক মৌংস্থর সমাদর এখন সর্বত্র।—কি বললে?—কেমন করে এমন হ'ল? মন্ত্র আছে, মন্ত্র আছে।

বৃদ্ধ, বিজ্ঞ, বিদ্যাবানের
নীতি উপদেশ করিয়া হেলা,
আমার কথায় বসায়েছে রাজা
প্রাসাদে রমণীরূপের মেলা।

ইশ! এই যে মহারাজ!

(নারী ও নপুংসক বেষ্টিত সম্রাটের প্রবেশ)

সম্রাট॥ সাত পুরুষের রাজ্য আমার
রাজ্যে আমার সাত শ' জেলা;
সবারি সঙ্গে সন্ধি আমার
জীবন কেবলি সুখের মেলা।

শোক নেই, উদ্বেগ নেই, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই; সাত পুরুষ কেন—দশ পুরুষ এমনি চলে আসছে। আমার পূর্বপুরুষ মহাত্মা কৌৎ যে দিন এই রাজ্য অধিকার করেন, সেই দিন থেকে চতুঃসীমান্তের কোথাও কোনো গোলমাল নেই, আট দিক একেবারে ঠাণ্ডা। এতে আমার নিজের বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নেই; আমার রাজভক্ত রাজপুরুষদের কল্যাণেই শান্তি সুরক্ষিত হচ্ছে। প্রাসাদে কিন্তু আর প্রবেশ করতে ইচ্ছা হয় না; পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পরে অন্তঃপুরিকারা স্থানভ্রষ্ট হওয়ায় অন্তঃপুর একেবারে শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। আর এই একঘেয়ে জীবন ভাল লাগে না।

মৌংস্থ॥ দেবপুত্র! আপনি এ কিরূপ আজ্ঞা করছেন? গরীব চাষাও ইচ্ছামত পত্নী গ্রহণ করতে পারে, আর আপনি—যিনি অষ্টদিকপালের মধ্যে একজন, সাক্ষাৎ দেবতার অংশ, সমস্ত পৃথিবী আপনার অধীন,—আপনি পারবেন না? অধীনের নিবেদন—রাজ্যের দিকে দিকে বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে জাতি-কুল-নির্বিচারে, পনের থেকে কুড়ি বছরের যেখানে যত সুন্দরী আছে সকলকে রাজানুগ্রহের ছায়ায় আনা হোক; অন্তঃপুর আবার আনন্দের পুরী হয়ে উঠুক।

সম্রাট॥ ঠিক ঠাউরেছ, মৌংস্থ, ঠিক ঠাউরেছ। নির্বাচনের ভার তোমার উপরেই অর্পিত হ'ল; হুকুমনামা আজই লিখে দেওয়া যাচ্ছে। দেখ, পাকা জহুরীর মতোন, বেশ তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করবে, উপযুক্ত রত্নের সন্ধান পেলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে তার একখানি প্রতিরূপ পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। কর্মে গুণপণা দেখাতে পারলে, চাই কি তোমাকে, পুরস্কৃত করবার অবসরও আমাদের দিতে পার।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মৌংস্থ ॥ সোনাদানা যেটা হাতে এসে পড়ে
নিজের ঘরেই ভরি,
পাতকের স্রোত বহাই রাজ্যে
আইন আমি না ডরি।

শাস্ত্রে বলেছে 'সঞ্চয়ী নাবসীদতি', টাকা কোনো রকমে একবার হাতে এসে পড়লে আর তারে হাতছাড়া করতে আছে?—মরে গেলে লোকে নিন্দা করবে? ইতিহাসে মন্দ বলবে?—তার ভয় আমি রাখিনে। রাজার হুকুম মতো, বাছা বাছা নিরানব্বইটি সুন্দরী, রাজ্য খুঁজে আবিষ্কার করা গেছে। যারই কন্যাকে রাজার জন্যে নির্বাচন করে সম্মানিত করেছি সেই আমাকে সাধ্যমতো অর্থ দিয়ে খুশী করেছে। এই সুযোগে যে ধন সমাগম হয়েছে—তা নেহাত মন্দ নয়। কিন্তু এই পাড়াগেঁয়ে চাষাটার কাছ থেকে কিছুই বার করতে পারা গেল না! মেয়ে সুন্দরী!—আরে তাতে কি? চীন সাম্রাজ্যে ওর জোড়া নেই! বলি, তা বললে তো আর আমার পেট ভরবে না। আমায় এক শ' ভরি সোনা দাও,—সম্রাটের কাছে যেমন করে রূপবর্ণনা করতে হয় তা করছি। গরীব? দিতে পারবে না? নিজেই মেয়েকে নিয়ে রাজবাড়িতে হাজির হবে? যাও, গিয়ে একবার দেখ। আমিও বিনা মতলবে পথ চলিনে। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) আমিও মেয়েটার একখানা ছবি বিকৃত করে সম্রাটের কাছে সদরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুলির দু-এক টানে এমনি মূর্তি বদলে দেব যে ব্যস্,—প্রাসাদে গিয়ে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকলেও সম্রাট ওর দিকে ফিরেও চাইবেন না। দেখি চাষার মেয়ে কেমন রাজরানী হয়। হুঁঃ! যে নিজের কোট বজায় রাখতে না পারে সে আবার মানুষ? [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চীনের রাজপ্রাসাদ—রাত্রি

(শাওকীন ও পরিচারিকা)

শাওকীন ॥ রয়েছি রাজার প্রাসাদে,—পেয়েছি ঠাঁই,
রাজ দরশন তবু মিলিল না হায়!

সেতারটি বিনা সাথী হেথা কেহ নাই,
এমন রাত্রি একাকী কাটিয়া যায়।

মা'র মুখে শুনেছিলুম আমার যেদিন জন্ম হয়, সেই দিন মা স্বপ্নে দেখেছিলেন, যেন জ্যোৎস্না এসে তাঁর বুকে নেমেছে; খানিক পরেই সে জ্যোৎস্না আর বুকে রইল না, ধুলোর উপর গড়িয়ে পড়ল। আমি গরীবের মেয়ে রাজার প্রাসাদে উঠিছি, হয়তো স্বপ্নের সেই জ্যোৎস্নার মতো আবার ঐ ধুলোতেই আমায় নামতে হবে। তার আগে যদি একবার তাঁকে দেখতে পেতুম। বাবা আমার টাকার মানুষ নন, রাজার লোককে টাকা দিতে পারেন নি, তাই সে কুৎসিত ব'লে আমায় রাজার কাছে বর্ণনা করেছে; আমার ছবিখানা পর্যন্ত বিগড়ে দিয়েছে; গোড়াতেই রাজার মন ভাঙিয়ে নিয়েছে। রাজা যখন এদিকে আসেন লোকে আমায় সাবধান করে দিয়ে যায়, আমায় সরে যেতে বলে। আমার রাজা,—শুধু কুচক্রীর চক্রে প'ড়ে,—আমার পানে এ পর্যন্ত একবার ফিরেও চাইলেন না। আমি কী দুর্ভাগা,—কী দুর্ভাগা! সময় আর কাটতে চায় না। এই নিস্তব্ধ রাত, এই জ্যোৎস্না,—কেউ নেই। ভাগ্যে সেতারটি সঙ্গে এনেছিলুম; এখন এই আমার বন্ধু, এই আমার দোসর।

[সেতার বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান

(সম্রাটের সঙ্গে কাপড়ের লণ্ঠন হস্তে প্রতিহারীর প্রবেশ)

সম্রাট ॥ প্রায় শতাধিক কিশোরীকে প্রাসাদে আনা হয়েছে, কিন্তু কই? তেমনতর সুন্দরী একজনও দেখা গেল না। আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এমন একজনও নেই। নাঃ, বিরক্ত হয়ে গেছি,—সমস্ত ব্যাপারটার উপর বিরক্ত হয়ে যাওয়া গেছে। (নেপথ্যে সেতারের আওয়াজ) ওকি? কোনো নবাগত সুন্দরী সেতার বাজাচ্ছেন নাকি?

প্রতিহারী ॥ ঠিকই অনুমান করা হয়েছে। আমি এখনি ওঁকে মহারাজের আগমন সংবাদ দিয়ে আসছি।

সম্রাট ॥ উঁহু, দাঁড়াও; স্বর্ণ-তোরণের প্রতিহারী, তুমি খোঁজ নিয়ে এস দেখি উনি আমাদের প্রাসাদের কোন্ মহলে বাস করেন? নাঃ, থাক, ওঁকে এইখানেই আসতে বল।

প্রতিহারী॥ (শব্দের অভিমুখে) ওগো! কোন্ ঠাকুরানী সেতার বাজাচ্ছেন? সম্রাট আগত, তাঁকে বিধিপূর্বক অভিবাদন করতে আজ্ঞা হোক।

('কাউ-তাউ' করিতে করিতে শাওকীনের প্রবেশ)

সম্রাট॥ স্বর্ণ-তোরণের প্রতিহারী! তোমার মলমলের লণ্ঠনটা ভাল জ্বলছে না; একটু এই দিকে নিয়ে এস দেখি!

শাওকীন॥ দাসী যদি একটু আগে জানতে পারত মহারাজ আসবেন, তবে তার এটুকু বিলম্বও ঘটত না; দাসীর অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জনা করুন।

সম্রাট॥ নিখুঁত!—চমৎকার!—অপূর্ব সুন্দরী! এমন সৌন্দর্য এতদিন কোন্ অন্ধকারে কেমন করে লুকিয়েছিল?

শাওকীন॥ দাসীর নাম শাওকীন; চিংতু শহরের কাছে আমাদের বাড়ি। আমার পিতা দরিদ্র, কিছু পৈতৃক জমি আছে, তাই চাষে লাগিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। আমি গরীব গৃহস্থের মেয়ে, রাজপ্রাসাদের শিষ্টাচার কিছুই জানিনি।

সম্রাট॥ আশ্চর্য! এই অসাধারণ সৌন্দর্যরাশি এত কাছে রয়েছে অথচ আমরা টের পাইনি, আমাদের চোখেই পড়েনি?—এ তো ভারী আশ্চর্য!

শাওকীন॥ অমাত্য মৌংসু আমাকে পছন্দ করে আমার ছবি আঁকিয়ে নিয়েছিলেন; সেই সঙ্গে তিনি আমার পিতাকে বলেছিলেন, "তোমার মেয়েকে রাজরানী ক'রে দিচ্ছি, তার জন্যে আমাকে এক শ' ভরি সোনা দিতে হবে।" বাবা গরীব মানুষ,—দিতে পারলেন না। অমাত্য সেই জন্য রাগ করে, সম্রাটের কাছে পাঠাবার জন্যে আমার যে ছবি আঁকিয়েছিলেন, সেই ছবিতে, আমার চোখের নীচে একটা বিশ্রী কাটা দাগ এঁকে দিলেন।

সম্রাট॥ স্বর্ণ-তোরণের প্রহরী! এঁর ছবিখানি আমার চোখের সামনে ধর, দেখি।

(প্রতিহারী অনেকগুলি ছবির ভিতর হইতে বাছিয়া একখানি বাহির করিল)

ইশ, এমন সুন্দর মূর্তি এমনি করে দাগী করেছে,—শরৎ শেষের নির্মল ধারা একেবারে ঘোলা করে এঁকেছে! (প্রতিহারীর প্রতি) স্বর্ণ-তোরণের প্রতিহারী! কোতোয়ালকে জানাও যে আমি অমাত্য মৌংসুর ছিন্নমুণ্ড দেখতে ইচ্ছা করিছি।

শাওকীন॥ দেবপুত্র! আমার পিতা গরীব—

সম্রাট॥ ভবিষ্যতে তাকে কোনো খাজনাই দিতে হবে না; আজ থেকে সে রাজার শ্বশুর! শাওকীন! আজ থেকে তুমি রানী।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হান্‌চীন্ খাঁ॥ চীনসম্রাট কন্যাদানে সম্মত হলেন না; দূত ফিরে এসেছে; রাজকন্যার বয়স অল্প, হুঁঃ, ও একটা ছল মাত্র। ইচ্ছা থাকলে সম্রাট অন্ততঃ তাঁর নির্বাচিত সুন্দরীদের ভিতর থেকে একজন কাউকে পাঠাতে পারতেন। তা পাঠালেও আমাদের সম্মানের হানি হ'ত না। না, লোক পাঠিয়ে দূতকে ফিরিয়ে আনা যাক; যুদ্ধই করতে হ'ল দেখছি। এতদিনকার সন্ধিটা ভঙ্গ করতেও মন উঠছে না। ব্যাপার কোন্ দিকে গড়ায় দেখা যাক; হালটা ভাল করে বুঝেই চালটা চালতে হবে।

[প্রস্থান

(মৌংস্থর প্রবেশ)

মৌংস্থ॥ সম্রাটের জন্যে সুন্দরী বাছতে গিয়ে বেশ গুছিয়ে নেওয়া গিইছিল; প্রাণের দায়ে সব ফেলে আসতে হ'ল। ভাগ্যিস টাকা জমাতে শিখেছিলুম, টাকার জোরেই রাজরোষ থেকে মাথা বাঁচিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি, কিন্তু এ মাথা এখন রাখি কোথায়?—শাওকীনটা সব ফাঁস করে দিয়েছে, সব মাটি, সব মাটি। আচ্ছা, শাওকীন, দেখা যাবে, শেষে কে হারে আর কে জেতে।—ওঃ কি হাঁটাই হেঁটেছি, কতদূর যে এসে পড়িছি তাও ঠিক বুঝতে পারছিনে। এই যে—মেলাই ঘোড়া, মেলাই লোক! তাতারদের তাঁবু নাকি? হুঁ, তাই বটে।

(পরিক্রমণপূর্বক নেপথ্যের দিকে চাহিয়া)

ওহে ঘাঁটিদার! তোমাদের সর্দার হান্‌চীন্ খাঁকে বল, যে চীনসম্রাটের একজন অমাত্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

(হান্‌চীন্ খাঁর প্রবেশ)

হান্‌চীন্॥ এই দিকে এস; তুমি কে?

মৌংস্থ॥ আমি চীনসম্রাটের একজন অমাত্য, আমার নাম মৌংস্থ।

দেখুন, সম্রাটের পশ্চিম প্রাসাদে সম্প্রতি একজন পরমা সুন্দরী কিশোরীকে এনে রাখা হয়েছে তার নাম শাওকীন। আপনার দূত যখন আমাদের সম্রাটের কাছে আপনার ন্যায্য প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন এবং সম্রাট রাজকুমারীর বয়সের অল্পতার অছিলায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তখন আমি এই শাওকীনকে আপনার কাছে পাঠাবার কথা সম্রাটকে বলেছিলুম! কিন্তু সম্রাট রাজী হলেন না, দেখলুম ওদিকটাতে তাঁর নিজের একটু দরদ জন্মেছে। আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়ে বলেছিলুম, বলেছিলুম যে তুচ্ছ একজন স্ত্রীলোকের জন্যে, অশান্তি আনবেন না, তাতার সর্দারকে চটাবেন না, যুদ্ধ বাধাবেন না। তাতে তিনি উল্‌টে ভয়ানক রেগে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। আমি তো পালিয়ে কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে এসেছি; আসবার সময় তাড়াতাড়িতে নজর দেবার মতো কিছুই আনতে পারিনি, কেবল শাওকীনের এই ছবিখানি আপনার জন্যে, জামার ভিতরে লুকিয়ে অতি সাবধানে নিয়ে এসেছি। (চিত্র প্রদর্শন)

হান্‌চীন্॥ চমৎকার—চমৎকার! এমন রূপ মানুষের হয়? এমন রূপসী পৃথিবীতে জন্মায়? একে পেলে আমি রাজকন্যাকেও চাইনি। এখনি পত্র লিখে দূত পাঠাচ্ছি। আপনার সম্রাট রাজী হন ভাল; নইলে বাধ্য হয়ে আমার সন্ধি ভঙ্গ করতে হবে। রসদ ফুরিয়ে এসেছে,—আসুক, আমার সৈন্যেরা শিকারলব্ধ মাংসের উপর নির্ভর করে অভিযান করতে পারবে। তারপর একবার সীমান্তটা পার হয়ে লোকালয়ের কাছাকাছি গিয়ে পড়তে পারলে রসদ জুটিয়ে নেওয়া শক্ত হবে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সম্রাটের প্রাসাদ

(শাওকীন ও পরিচারিকা)

শাওকীন॥ যতদিন দুর্ভাগা ছিলুম ততদিন সবাই দয়ার চক্ষে দেখত। সম্রাটের সুনজরে পড়ে পর্যন্ত সকলেই মনে মনে আমার প্রতি বিরক্ত। সম্রাট আমায় ভালবাসেন, আমায় কাছে কাছে রাখেন, অন্তঃপুরের বাইরে যেতে চান না, রাজকার্য দেখেন না,—সে কি আমার দোষ! আমি কি বারণ করি। দেখ দেখি আজ তো আমিই উদ্যোগ করে, মিনতি করে

রাজসভায় পাঠিয়ে দিলুম, নইলে কি যেতেন? কিন্তু পাঠালে কি হয়, হয়তো এখনি ফিরবেন। (আরশির সম্মুখে আসিয়া আপনাকে দেখিতে দেখিতে) না প্রায় ঠিকই আছে। (বেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত)

(সম্রাটের প্রবেশ)

সম্রাট। পশ্চিম প্রাসাদে শাওকীনকে দেখে অবধি যেন মাতাল হয়ে থাকা গেছে, দিনগুলো সব খেয়ালের ঝোঁকে কেটে যাচ্ছে। কতদিন যে দরবারে যাওয়া হয়নি তা মনেই নেই। আজ, তার উপর, দরবারের শেষ পর্যন্ত হাজির থাকতে গিয়ে একেবারে বিরক্ত হয়ে যাওয়া গেছে। আর অপেক্ষা করতে পারা গেল না, দেরি সইল না; সভার পোশাকেই একবার ওকে দেখে যাওয়া যাক। ঐ যে; কাছে যাওয়া হবে না, এইখান থেকে লুকিয়ে দেখা যাক।

(ধীরে ধীরে ক্রমশঃ শাওকীনের পিছনে আসিয়া)

(স্বগতঃ) বাঃ! গোল আরশিখানির ভিতরে প্রতিবিম্ব পড়েছে, মনে হচ্ছে যেন চাঁদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রমণ্ডলে বিরাজ করছে। (স্তব্ধভাবে নিরীক্ষণ)

(প্রধান অমাত্যের প্রবেশ)

প্রধান॥ মন্ত্রীর কাজ মন্ত্রণা দেওয়া
ফেলে রেখে পাশা দাবা,
মন্ত্রীর কাজ দরবারে বসি'
দেশের ভাবনা ভাবা।
এখন এদের আনাগোনা হায়
কেবলি প্রমোদ বনে,
রাজ্য ও রাজা—কাহারো কথাই
পড়েনাকো আর মনে।

এদিকে হঠাৎ হান্‌চীন্ খাঁর দূত এসে হাজির! হান্‌চীন্ খাঁ রাজকুমারীর বদলে শাওকীন দেবীর পাণিগ্রহণ করতে চায়; সহজে সুবিধা না হলে যুদ্ধ করবে। কাজেই বাধ্য হয়ে এক রকম মহারাজের পিছনে পিছনেই, আমাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হ'ল। (সম্রাটকে দেখিয়া) মহারাজের কাছে নিবেদন এই যে, উত্তরবাসী বিদেশীদের সর্দার হান্‌চীন্ খাঁ, পলায়মান মৌংসুর কাছে

শাওকীন দেবীর চিত্র দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন, এবং বিবাহের প্রস্তাব করে মহারাজের কাছে দূত পাঠিয়েছেন। মহারাজ যদি শাওকীন দেবীকে তাঁর হাতে অর্পণ করতে সম্মত না হন তো তিনি যুদ্ধ করবেন—চীনসাম্রাজ্য ছারখার করবেন, লিখছেন।

সম্রাট॥ চীনসাম্রাজ্য ছারখার করবেন?—লিখেছেন? বটে! সৈন্য সামন্ত রয়েছে কি জন্যে? তারা রক্ষা করবে না? সবাই তাতারের ভয়ে আড়ষ্ট? কারো ক্ষমতা নেই? কেউ এই অসভ্য বর্বরগুলোকে দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারবে না! এই অপমান দাঁড়িয়ে দেখবে? রাজপত্নীর লাঞ্ছনা অনায়াসে সহ্য করবে? আশ্রিত স্ত্রীলোককে শত্রুর হাতে সঁপে দিয়ে কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকবে?

প্রধান॥ মহারাজ মার্জনা করবেন, অধীনকে রাজকার্যের অনুরোধে বাধ্য হয়ে বাচালতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। মহারাজের এই অতি প্রেমের কাহিনী দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে; সবাই জানতে পেরেছে আপনি অঙ্কলক্ষ্মীর প্রেমে রাজলক্ষ্মীকে অবহেলা করতে আরম্ভ করেছেন। আপনি রাজকার্য দেখেন না বলে রাজপুরুষেরাও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে, রাজ্যময় বিশৃঙ্খলা। কাজেই বিদেশী বর্বরেরা সাহস পেয়ে গেছে, ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করছে। এখন, এ অবস্থায়, শাওকীন দেবীর মায়া ত্যাগ করা ভিন্ন আর-কি উপায় আছে? আমাদের সৈন্য সুশিক্ষিত নয়, উপযুক্ত সেনাপতির অভাবও অনেক দিন মহারাজকে জানিয়েছি। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাতারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আর, তার উপরে, তাতারেরা একবার লুটপাট আরম্ভ করলে দুর্দশার আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না। অন্ততঃ প্রজাদের মুখ চেয়েও শাওকীন দেবীকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। তাতার দূত রাজদর্শনের জন্যে বাইরে প্রতীক্ষা করছে।

সম্রাট॥ আসতে আদেশ কর।

(দূতের প্রবেশ)

দূত॥ তাতার সর্দার হান্‌চীন্ খাঁ মাননীয় চীনসম্রাটকে এই কথাগুলি জ্ঞাপন করবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন। প্রথম কথা, এই যে, চীনসম্রাট

তাতারদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ; সেই সন্ধির শর্ত অনুসারে, তাতার সর্দার চীন রাজবংশের কোনো সুন্দরী মহিলার পাণিগ্রহণের প্রার্থী হয়ে চীনসম্রাটের কাছে প্রস্তাব করে পাঠালে, সম্রাট ঐ প্রস্তাবে সম্মত হতে বাধ্য। দ্বিতীয় কথা এই যে, এইরূপ প্রস্তাব নিয়ে তাতার সর্দারের পক্ষ থেকে দু'বার দু'জন দূত এসে নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে, চীনসম্রাট কন্যাদানে সম্মত হননি। এই ঘটনার পর চীনসম্রাটের ভূতপূর্ব অমাত্য মৌংসু তাতার সর্দার হান্‌চীন্ খাঁকে শাওকীন নাম্নী রাজান্তঃপুরবাসিনী কোনো সুন্দরী মহিলার একখানি আলেখ্য দেখিয়েছেন। তৃতীয় কথা এই যে, তাতার সর্দার এই সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়ে তৃতীয়বার দরবারে দূত পাঠিয়েছেন। এখন সম্রাট যদি প্রাচীন সদ্ভাব রক্ষা করতে চান, তবে শাওকীন দেবীকে তাতার শিবিরে পাঠিয়ে দিতে দ্বিধা করবেন না। সম্রাট যদি এ প্রস্তাবে সম্মত না থাকেন, তবে হান্‌চীন্ খাঁ তাঁর সংগত দাবী বজায় করবার জন্যে চীনরাজ্য আক্রমণ করতে বাধ্য হবেন। ভাগ্যনির্ণয় অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রেই হবে। মহারাজ ধীরভাবে চারিদিক বিবেচনা করে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলে আমরা বাধিত হব।

সম্রাট॥ দূতকে এখন বিশ্রাম-গৃহে নিয়ে যাওয়া হোক।

[দূতের প্রস্থান

অমাত্য প্রধান! সেনাপতিকে খবর দিন, সান্ধিবিগ্রহিককে খবর দিন; সবাই একত্র হয়ে, পরামর্শ করে এমন একটা পন্থা স্থির করে ফেলা হোক, যাতে তাতার সৈন্যের তর্জনও নিরস্ত হয়, শাওকীন দেবীকেও না বর্বরের হাতে সঁপে দিতে হয়।—ভেবে দেখুন, ভেবে দেখুন।—হ'ল না? পারলেন না?—আমি সহজেই লোকের প্রার্থনা পূর্ণ করে এসেছি, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কারো প্রতি কখনো কঠোর ব্যাভার করিনি,—তার ফলে সকলেই কি আমার ইচ্ছার বিরোধী হয়ে উঠল? যখন আমার পিতামহী সম্রাজ্ঞী লুহাও বেঁচেছিলেন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কইতে পারে এমন দুঃসাহসী একজনও ছিল না; তাঁর মুখের কথাই ছিল আইন।—ভবিষ্যতে দেখছি সাম্রাজ্যের ভার এতগুলো পুরুষমানুষের হাতে না রেখে একজন মাত্র স্ত্রীলোকের হাতে রাখলেই সমস্ত সুশৃঙ্খল হয়ে উঠবে।

শাওকীন॥ মহারাজের স্নেহের প্রতিদান নেই; তাঁর অনুগ্রহের প্রতিদান—তাও নেই। তবে তাঁর মঙ্গলের জন্যে, তাঁর প্রজাদের কল্যাণের জন্যে দাসী মৃত্যুমুখে যেতেও প্রস্তুত। কিন্তু—এই অনুরাগ—এ আমি কেমন করে ভুলব!

সম্রাট॥ তোমায় কি বল্‌ব? আমিই যে ভুলতে পারব তা জোর করে বলতে পারিনে।

প্রধান॥ অধীনের নিবেদন, পৈতৃক রাজ্য যাতে পরহস্তে না গিয়ে, পুত্র পৌত্রের ভোগে আসে সেই পন্থাই অবলম্বনীয়। দেবীকে অবিলম্বে তাতার শিবিরে পাঠিয়ে দেবার আয়োজন করাই সুযুক্তি।

সম্রাট॥ তবে তাই হোক। দূতের হাতে সঁপে দাও।—আমরা সঙ্গে সঙ্গে যাব,—শাওকীনকে একদিনের পথ এগিয়ে দিয়ে আসব;—পাহ্লিং সেতুর এ পারে শেষ বিদায় নিয়ে ফিরব।

প্রধান॥ সর্বনাশ! এতে যে সম্রাটের মর্যাদার হানি হবে; এমন কি, এর জন্যে এই বর্বর তাতারগুলো পর্যন্ত টিটকারি দিয়ে হাসবে।

সম্রাট॥ হাসুক। আমরা আমাদের অমাত্যের সকল অনুরোধই আজ রেখেছি, অমাত্য কি আমাদের এই অনুরোধটাও রাখবেন না?—যে যাই বলুক, আমরা শাওকীনকে একটা দিনের পথ এগিয়ে দিয়ে আসব—বিদায় নিয়ে আসব। তারপর শূন্য প্রাসাদে ফিরে আমরণ বিশ্বাসঘাতক মোংসুর ব্যাভার স্মরণ করতে থাকব।

প্রধান॥ আমাদের মজ্জাগত এই অক্ষমতার জন্যে নিজেদের ধিক্কার দিতে দিতে, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে, কেবল লোকক্ষয় ধনক্ষয় নিবারণ করবার জন্যে, মহারাজকে আশ্রিতবর্জনের মন্ত্রণা দিতে হ'ল! উপায় নেই,—তার উপর এই স্ত্রীজাতির জন্যে—বিশেষতঃ রূপবতী রমণীর জন্যে জগতে এ পর্যন্ত অনেক যুদ্ধ হয়ে গেছে, অনেক রাজ্য ধ্বংস হয়েছে, অনেক জাতি উৎসন্ন গেছে।—সাহস হয় না—স্ত্রীলোকের জন্যে লোকক্ষয়ে প্রবৃত্ত হতে সাহস হয় না।

শাওকীন॥ রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে বর্বরের হাতে আত্মসমর্পণ করতে চলেছি। যুদ্ধ বাধলে কত লোকের সর্বনাশ হ'ত, কত নারী পতি-পুত্র হারাত, সে সর্বনাশের পথ আমি বন্ধ করতে যাচ্ছি।—তারা কি আমায় মনে করবে?—

তারা কি আমায় আশীর্বাদ করবে?—হয়তো করবে; তবু মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে।

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাহ্লিং সেতু

(শাওকীন, দূত ও অনুচরগণ)

শাওকীন॥ (স্বগতঃ) ওঃ! এই আমি,—মহারাজের কাছে মান পেয়েছিলুম, মর্যাদা পেয়েছিলুম, অনুগ্রহ পেয়েছিলুম, স্নেহ পেয়েছিলুম।—তাতার সর্দার লিখেছে, আমায় না পাঠালে রাজ্য ছারখার করবে; কি সর্বনাশের কথা! একজনের জন্যে রাজ্যের লোককে খুন-জখম করবে!—এই সব বর্বর—এদের কাছে আমায় যেতে হবে—এদের সঙ্গে থাকতে হবে—এদের খুশী করতে হবে! শুনেছি, এরা যে দেশের লোক সে দেশ ভারী ঠাণ্ডা, বরফ পড়ে; কেমন করে সে দেশে থাকব! ভগবান! যাকে রূপ দিয়েছ তার কপালে সুখ-শান্তি লিখতে একেবারে ভুলে গেছ!—কি করব?—নিরুপায়, নিরুপায়।

(সম্রাট ও অমাত্যগণের প্রবেশ)

সম্রাট॥ বিদায় নেবার সময় এসেছে—এই আমাদের শেষ দেখা। (অমাত্যদের প্রতি) পারলে না? শাওকীনকে বর্বরের হাত থেকে বাঁচাতে পারলে না? পত্নীবর্জন ভিন্ন রাজ্যরক্ষার কোনো উপায় ভেবে পেলে না?—অকর্মণ্য।

(ঘোড়া হইতে নামিয়া শাওকীনের হস্তধারণপূর্বক অশ্রুবিসর্জন
ও নাট্যের দ্বারা পরস্পরের দুঃখ-প্রকাশ)

দূত॥ দেবি! একটু ত্বরান্বিত হতে আজ্ঞা হোক; আকাশ অন্ধকার হয়ে এল, সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই।

শাওকীন॥ প্রভু! আর কবে আপনাকে দেখতে পাব! কেমন করে দেখতে পাব!—আজ যে রাজার রানী, কাল সে বর্বরের বাঁদী হবে। প্রাসাদের বেশ এইখেনেই ছেড়ে যেতে চাই, এই উজ্জ্বল সাজ চামড়ার তাঁবুতে একটুও মানাবে না।

দূত ॥ দেবি! আবার আপনাকে বিরক্ত করতে হ'ল—একটু ত্বরান্বিত হ'ন অত্যন্ত দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।

সম্রাট ॥ না, আর দেরি কিসের? শাওকীন! অনেক দূরে চলে যাচ্ছ, কিন্তু দেখ, আমাদের অনুরাগের এই পেলব স্মৃতি রোষের আগুনে যেন নীরস হয়ে না উঠে, অভিমানের স্পর্শে যেন মলিন হয়ে না যায়। আমার অক্ষমতা স্মরণ করে ক্ষমা কোরো,—মনে রেখো।

[শাওকীন ও দূতের প্রস্থান

আমায় লোকে বলে সম্রাট! চীনরাজ্যের ভাগ্যবিধাতা!

প্রধান ॥ মহারাজ! আশ্বস্ত হোন্, আশ্বস্ত হোন্!

সম্রাট ॥ চলে গেল—ভাসিয়ে দিতে হ'ল। এই জগদ্‌বিখ্যাত প্রাচীর, এই দুর্ধর্ষ দুর্গশ্রেণী, এই সহস্র সৈন্য সামন্ত—সব মিথ্যা! তাতারের নামে কম্পমান! এতগুলো পুরুষের বুদ্ধিবল এবং বাহুবলে রাজ্যরক্ষা হ'ল না, একটা আশ্রিত স্ত্রীলোককে বলি দিয়ে রাজ্যরক্ষা করতে হ'ল! বীরপুরুষেরা কাপুরুষের মতো বেঁচে রইলেন!

প্রধান ॥ মহারাজ প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করতে আজ্ঞা হোক। আপনি বিজ্ঞ, গতানুশোচনা যে নিষ্ফল সে কথা আপনার অজানা নেই। শাওকীন দেবীর কথা এখন বিস্মৃত হওয়াই শ্রেয়।

সম্রাট ॥ হৃদয় যদি লোহার হ'ত তাহলে বিস্মৃত হওয়া যেত, অমাত্য প্রধান; তাহলে ভোলা যেত। অজস্র চোখের জল—মুছে শেষ করতে পারছিনে।—আজ, প্রাসাদে ফিরে গিয়ে, তার পরিত্যক্ত ঘরখানিতে, হাজার রৌপ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে, তার ছবিখানিকে সামনে রেখে, তার কল্যাণে সারারাত আমি দেবার্চনা করব।

প্রধান ॥ এখন তবে প্রাসাদে ফিরে চলুন, দেবী এতক্ষণ বহুদূর চলে গেছেন।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

তাতার শিবির

(হান্‌চীন্ খাঁ, শাওকীন ও তাতারগণ)

হান্‌চীন্ ॥ চীনসম্রাট শর্তমত সুন্দরী শাওকীন দেবীকে আমার হাতে

সমর্পণ করেছেন। এঁকে আমি দেশে ফিরেই, সসম্মানে পত্নীত্বে বরণ করব। যাক, দুই দেশের প্রজাই অশান্তির হাত থেকে নিস্তার পেলে। (একজন তাতারের প্রতি) ওহে ছোকরা, সকলকে তাঁবু ওঠাবার হুকুম জানিয়ে দাও, আজই উত্তরে ফিরতে হবে।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

আমুর নদীর উপর নৌকা

(হান্‌চীন্ খাঁ ও শাওকীন)

শাওকীন ॥ এ কোন্ জায়গা ?

হান্‌চীন্ ॥ এই হ'ল দুই রাজ্যের সীমানা ; এই যে নদী, একে আমরা বলি কালনাগিনী। এর একূল চীনসম্রাটের অধীন, ওকূল তাতার সর্দারের আয়ত্ত।

শাওকীন ॥ তাতার সর্দার ! এইখানে, আমি আমার দক্ষিণের আত্মীয়দের উদ্দেশে এক অঞ্জলি ফুল ভাসিয়ে দিতে চাই। (ধারে গিয়া) আমার দেবতা, মধুর-উদার-প্রকৃতি চীনসম্রাট ! তোমার উদ্দেশে এ জীবনে আমার এই শেষ পুষ্পাঞ্জলি। (নদীতে পতন) পরলোকে তোমারি প্রতীক্ষা—(জলে অদৃশ্য হইয়া গেল)

হান্‌চীন্ ॥ (ধরিতে না পারিয়া) গেল—গেল ঘূর্ণিজলে পড়তে না পড়তে একেবারে তলিয়ে চলে গেল ! প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল—বিদেশী তাতারকে বিবাহ করবে না। আর উপায় নেই। নৌকা ভিড়াও, এই নদীর তীরে শাওকীনের স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে ; তার আগে দেশে ফিরব না। মন্দিরের নাম হবে সবুজ সমাধি। আর সে নেই ; চীনসম্রাটকে অকারণে উৎপীড়ন করা হ'ল। কুচক্রী, হতভাগা মৌংসুই এই অনর্থের মূল। (একজন তাতারের প্রতি) দেখ, মৌংসুকে এখনি বন্দী করে চীনসম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দাও, সেইখানেই ওর উচিত শাস্তি হবে। ওকে একদণ্ডও আর আমাদের মধ্যে রাখা হবে না। মৌংসুর মতো কুটিল লোককে যে আশ্রয় দেবে তার বিপদ পদে পদে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পশ্চিম প্রাসাদ

(চীনসম্রাট ও প্রতিহারী)

সম্রাট ॥ শাওকীনকে পরের হাতে তুলে দিয়ে পর্যন্ত আর দরবারে মুখ দেখাই নি। রাত্রির নিস্তব্ধতাও ভাল লাগে না, মন যেন আরো হতাশ হয়ে পড়ে। সান্ত্বনার মধ্যে তার এই ছবিখানি ; এইখানিকে সামনে রেখে, এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে রাত কেটে যায়। (প্রতিহারীর প্রতি) স্বর্ণ-তোরণের প্রতিহারী দেখ, দেখ, এদিকের ধূপটা একেবারে নিবে গেছে, আর একটা জেলে দাও দেখি। সে চোখের আড়াল হয়ে চলে গেছে, তাই বলে তাকে প্রাণের আড়াল করতে পারব না ; তার এই ছায়াখানিই এখন আমার জীবনের অবলম্বন। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে, অথচ ঘুম আসে না। দেখি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করে দেখি।

(শয়ন ও নিদ্রাকর্ষণ—স্বপ্নে শাওকীনের আবির্ভাব)

শাওকীন ॥ বর্বর তাতারেরা আমায় উত্তর দেশে নিয়ে যেতে চায় ; আমি তাদের তাঁবু থেকে লুকিয়ে চ'লে এসেছি। এই না মহারাজ ? রাজা আমার ! আমি আবার তোমার কাছে ফিরে এসিছি।

(স্বপ্নে একজন তাতার সিপাহীর আবির্ভাব)

সৈনিক ॥ একটু তন্দ্রা এসেছে কি অম্‌নি পালিয়েছে ! স্ত্রীলোকের এত সাহস ? আমিও ধড়মড়িয়ে উঠে তার পিছন পিছন ছুট্ ! ছুটতে ছুটতে একেবারে পশ্চিম প্রাসাদের দরজায় এসে পড়েছি—এই না সে ? হুঁ, খুব পালানো হয়েছে যে ! এখন চল।

(শাওকীনকে গ্রেপ্তার করিয়া অন্তর্ধান)

সম্রাট ॥ (জাগিয়া) যা, অদৃশ্য হয়ে গেল। দিনের বেলায় জেগে থাকতে, যাকে এত ডেকেও সাড়া পাইনি, স্বপ্নের কৃপায় তাকে পেয়েছিলুম, রাখতে পারলুম না,—স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়ে গেল। ওই !—বিরহী চক্রবাক্ চীৎকার করছে ; আমার এই বেদনার মর্ম শুধু ওই বনের পাখীই বুঝতে পেরেছে।—

চক্রবাকের মতোন দুর্ভাগ্য আর কারো নেই ;—উত্তরে ওর তাতার সিপাহীর তীরের ভয়, দক্ষিণে ফন্দিবাজদের জালে পড়বার ভয়। নাঃ, আবার ডাকতে শুরু করলে, এই পাখীগুলোর জ্বালায় মনটা আরো খারাপ হয়ে উঠল।

প্রতিহারী॥ মহারাজ, আপনি দেবতুল্য, আপনি শোকে মলিন হয়ে থাকেন এ আমাদের সহ্য হয় না।

সম্রাট॥ এ শোক দমন করবার ক্ষমতা—আমার নেই। আমাকে তোমরা সবাই মিলে কেন এই এক কথা বারংবার বল? তোমরা কি শোক দুঃখের মর্ম জান না?—ওই যে পাখীর আওয়াজ এখনি শুনলে, ও তো মুকুলভোজীর আনন্দ কলরব নয়।—শাওকীন আমার গৃহ শূন্য করে চলে গেছে।—হয়তো ঠিক এই মুহূর্তে বুনোপাখীর হাহাকার শুনে আমারি মতো সে আকুল হয়ে উঠেছে। স্বর্ণ-তোরণের প্রতিহারী! বলতে পার—সে এখন কোথায়? বলতে পার? জান?

(প্রধান অমাত্যের প্রবেশ)

প্রধান॥ মহারাজ, এইমাত্র তাতার সর্দারের দু'জন লোক মহারাজের ভূতপূর্ব অমাত্য মৌংস্থকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাজধানীতে এনে হাজির করেছে। তাতার সর্দার লিখেছেন,—এই বিশ্বাসঘাতকই সকল অনর্থের মূল; এ আপনার আজ্ঞা অমান্য করে পালিয়েছিল, সেইজন্যে আপনার হাতেই একে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। নইলে, সর্দারই একে সমুচিত শাস্তি দিতেন। তাতার সর্দার চীনসম্রাটের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে ইচ্ছুক, সম্রাটের অভিপ্রায় জানবার জন্যে দূত অপেক্ষা করছে। সর্দার এই চিঠিতে আর একটা সংবাদ দিয়েছেন—শাওকীন দেবী আর ইহলোকে নেই।

সম্রাট॥ (অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া) যাও, সকল অনর্থের মূল বিশ্বাস-ঘাতক মৌংস্থর মুণ্ড ছিন্ন করে অভাগিনী শাওকীন দেবীর অতৃপ্ত প্রেতাত্মার তৃপ্ত্যর্থে দান করগে।—আর, তাতার দূতের সম্মানার্থে সমারোহপূর্বক প্রাসাদে ভোজের আয়োজন করতে ভুল না, যাও।

[অমাত্যের প্রস্থান

চক্রবাকের ক্রন্দন শুনি কানে,
কত না স্বপন জেগে উঠেছিল প্রাণে!

সারারাত শুধু ভেবেছি তাহারি কথা,
সে যে বেঁচে নাই জানি নাই সে বারতা।
সবুজ সমাধি* আছে শুধু নদী তীরে,
সিক্ত তাতার চীনের অশ্রুনীরে।
যে পটুয়া তার সুন্দর ছবি করেছিল হায়, মাটি,
ছবির মূল্য দিবে সেই বটু নিজের মুণ্ড কাটি।

যবনিকা

* আমুর নদীর বালুকাময় তটের কেবল একটি মাত্র অংশ শষ্প-সমাচ্ছন্ন, এই অংশটিকে লোকে এখনও শাওকীন রানীর সবুজ সমাধি বলে।

দৃষ্টিহারা

পাত্র ও পাত্রী

মোহান্ত মহারাজ, তিনজন জন্মান্ধ, অন্ধ স্থবির, পঞ্চম অন্ধ, ষষ্ঠ অন্ধ, তিনজন জপ-পরায়ণা অন্ধ স্ত্রীলোক, অন্ধ স্থবিরা, অন্ধ তরুণী, উন্মাদগ্রস্ত অন্ধ স্ত্রীলোক।

প্রথম দৃশ্য

[ঊর্ধ্বে নক্ষত্র-প্রচুর ঐশ্বর্য-গম্ভীর আকাশ ; নিম্নে অনাদিকালের অরণ্য। বনের মধ্যে একজন স্থবির মোহান্ত উপবিষ্ট। মোহান্তের দেহ মৃতবৎ নিশ্চল ; অন্তঃসারশূন্য অতি প্রকাণ্ড এবং অতি প্রাচীন এক বটবৃক্ষের গায়ে মোহান্তের মাথাটি ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আনীল ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিযুক্ত ; মুখখানি এমনি পাংশুবর্ণ যে দেখিলে ভয় হয়। চক্ষু নিস্পন্দ, দৃষ্টি অর্থহীন ; সে দৃষ্টি যেন অনন্ত সত্বার পরিদৃশ্যমান অংশে আর আবদ্ধ নাই ; চক্ষে অসীম দুঃখের এবং অপ্রমেয় অশ্রুবর্ষণের রক্তচ্ছটা। সম্ভ্রমমণ্ডিত শুভ্র কেশগুলি সংলিপ্তভাবে গুচ্ছে গুচ্ছে তাঁহার শ্রান্ত ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে ; ক্ষীণ হাত দুইখানি ক্রোড়দেশে অঞ্জলিবদ্ধ। মোহান্তের দক্ষিণে, স্খলিত শিলায়, জীর্ণ পল্লবের স্তূপে, এবং হ্রস্ব-স্থূল-ক্ষয়গ্রস্ত বৃক্ষমূলে ছয়জন অন্ধ আসীন। বামে ছয়জন স্ত্রীলোক, ইহারাও অন্ধ। উভয় দলের মধ্যে একটা সমূলোৎপাটিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ এবং কয়েকখণ্ড গুরুভার প্রস্তর।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে তিনজন ক্রন্দনস্বরে অবিশ্রাম স্তোত্রপাঠ করিতেছে ; একজন অতিবৃদ্ধা ; একজন উন্মাদগ্রস্ত এবং চিরমৌন, তাহার কোলে একটি শিশু নিদ্রিত। একজন অপূর্ব সুন্দরী, ইহার কেশরাশি বন্যার মতো সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অনেকেই হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। অরণ্যভূমির অবিশ্রাম নানা বিচিত্র অস্ফুট শব্দের মাঝখানে থাকিয়াও ইহারা আর বিহ্বল হইয়া উঠে না। গগনস্পর্শী বনস্পতিদের ভূতলস্পর্শী পল্লব-ভূয়িষ্ঠ শ্যামায়মান শাখাগুলি অনাথ অন্ধদিগকে ছায়াদান করিতেছে। মোহান্তের অদূরে কয়েকটি মুমূর্ষু রজনীগন্ধার শীর্ণ মুকুল স্ফুরিত

হইয়া উঠিয়াছে। বন-পল্লবের ঘনঘটা স্থানে স্থানে জ্যোৎস্নাবিদ্ধ হইলেও অন্ধপুরী অসাধারণ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।]

প্রথম অন্ধ ॥ কই? এখনো এলেন না?

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ তুমি আমার ঘুমটা মাটি করে দিলে!

প্রথম অন্ধ ॥ আমিও এতক্ষণ ঘুমিয়েই ছিলাম।

তৃতীয় অন্ধ ॥ আমিও ঘুমিয়ে ছিলাম।

প্রথম অন্ধ ॥ এখনো আসছেন না?

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ কই? কোনো দিকে তো কারো পায়ের শব্দ পাইনি।

তৃতীয় অন্ধ ॥ আমাদের আশ্রমে ফিরবারও বোধ হয় সময় হয়ে এল।

প্রথম অন্ধ ॥ আমরা যে কোথায় রইছি,—সেইটে একবার জানতে পারলে হয়।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ উনি যাওয়ার পর থেকে, সব যেন ঠাণ্ডায় কালিয়ে উঠেছে।

প্রথম অন্ধ ॥ আমি জানতে চাই আমরা কোথায়।

অন্ধ স্থবির ॥ তোমরা কেউ বলতে পার?—আমরা এ কোথায় এলাম?

অন্ধ স্থবিরা ॥ অনেকক্ষণ ধরে হাঁটা হয়েছে; আশ্রম থেকে বোধ হচ্ছে ঢের দূরে এসে পড়িছি।

প্রথম অন্ধ ॥ আ-আ!···মেয়েরা আমাদের সামনে নাকি?

অন্ধ স্থবিরা ॥ হ্যাঁ, আমরা তোমাদের সমুখটিতেই বসে আছি।

প্রথম অন্ধ ॥ দাঁড়াও, আমি তোমার কাছে যাই; (উঠিয়া হাতড়াইতে লাগিল) তুমি কোন্‌খানে? কথা কও! তবে তো আন্দাজ পাব।

অন্ধ স্থবিরা ॥ এই যে, আমরা পাথরের উপর বসিছি।

প্রথম অন্ধ ॥ (অগ্রসর হইতে গিয়া হোঁচট লাগিয়া) আঃ! আমাদের মাঝখানে কি একটা রয়েছে—

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ যেখানটাতে থাকা গেছে সেইখানে থাকাই ভাল।

তৃতীয় অন্ধ ॥ তোমরা কোন্ দিকে বসেছ? আমাদের কাছে আসবে?

অন্ধ স্থবিরা ॥ আমাদের উঠতে ভয় হয়।

তৃতীয় অন্ধ ॥ কেন আমাদের এমন তফাত করে রেখে গেলেন?

প্রথম অন্ধ ॥ মেয়েদের দিক থেকে ঠাকুরের নাম শুনতে পাচ্ছি।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ হাঁা, তিন বুড়ীতে মিলে নাম জপ কচ্ছে।

প্রথম অন্ধ ॥ এ তোমার সন্ধ্যাআহ্নিকের সময় নয়।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ তোমরা নিজের নিজের ঘরে গিয়ে নাম জপ করলেই পার।

(বৃদ্ধারা প্রার্থনা করিতে লাগিল)

তৃতীয় অন্ধ ॥ হাঁাগা! আমি কার পাশে বসেছি? অঁ্যা?

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ বোধ হচ্ছে আমিই তোমার পাশে।

(দুইজনে হাতড়াইতে লাগিল)

তৃতীয় অন্ধ ॥ কই! পরস্পরকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারা যাচ্ছে না।

প্রথম অন্ধ ॥ তবু বেশী তফাতে নেই!

(ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে পঞ্চম অন্ধের গায়ে লাঠি লাগায় সে মৃদু আর্তনাদ করিল)

যে লোকটা কানে শুনতে পায় না সেই আমার পাশে বসেছে।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আমি সকল শুনিনে। এই তো আমরা ছ'জন ছিলাম।

প্রথম অন্ধ ॥ আমি যেন একটু একটু বুঝতে পাচ্ছি। আচ্ছা, মেয়েদের জিজ্ঞেস করা যাক···ব্যাপারখানা বুঝতে হবে তো। বুড়ীদের বিড়বিড় এখনো শুনতে পাচ্ছি। ওরা তিনজনে এক জায়গায় বসেছে বুঝি।

অন্ধ স্থবিরা ॥ এই যে আমার পাশে···একখানা মস্ত পাথরের চাঁইয়ের উপর বসে আছে।

প্রথম অন্ধ ॥ আমি ঝরাপাতার উপর বসে আছি।

তৃতীয় অন্ধ ॥ আর সেই অল্পবয়সী মেয়েটি?···সে কোথায়?

অন্ধ স্থবিরা ॥ সে?···ঐ যারা ঠাকুরদের নাম করছে তাদের পাশে।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ পাগলি আর তার ছেলে? তারা কোথায়?

অন্ধ তরুণী ॥ বাছা ঘুমিয়েছে; তারে জাগিয়ো না।

প্রথম অন্ধ ॥ উঃ! তুমি আমাদের কাছে থেকে কত দূরে গিয়ে বসেছ! আমি ভেবেছিলাম আমার সামনে আছ।

তৃতীয় অন্ধ ॥ যা জানা দরকার, তা অল্পবিস্তর আমরা সকলেই জানি। দেখ, মোহান্ত ঠাকুর যতক্ষণ না ফেরেন, সকলে মিলে, ততক্ষণ গল্পস্বল্প করা যাক্।

অন্ধ স্থবিরা ॥ তিনি আমাদের স্তব্ধ হয়ে, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে বলে গেছেন।

তৃতীয় অন্ধ॥ আমরা তো আর ঠাকুরবাড়িতে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনতে আসিনি।···

অন্ধ স্থবিরা॥ কি করতে যে আমরা এসিছি তা তুমিও জান না।

তৃতীয় অন্ধ॥ চুপ করে থাকলে আমার কেমন ভয় বোধ হয়।

দ্বিতীয় অন্ধ॥ বলি, বলতে পার?···ঠাকুর কোথায় গেলেন?

তৃতীয় অন্ধ॥ আমার মনে হচ্ছে, তিনি অনেকক্ষণ আমাদের একা ফেলে রেখেছেন।

প্রথম অন্ধ॥ ক্রমেই অপটু হয়ে পড়ছেন। বোধ হয়, কিছুদিন থেকে তিনি নিজেও আর চোখে তেমন দেখতে পান না। সে কথা তিনি নিজে কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করবেন না; ···পাছে আর কেউ এসে তাঁর স্থান অধিকার করে বসে···এই ভয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস···তিনি আর চোখে তেমন দেখতে পান না। আমাদের চালিয়ে বেড়াবার জন্যে নূতন কাউকে পেলে ভাল হয়; উনি আমাদের কথা এখন কানেই তোলেন না;···সংখ্যাতেও আমরা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছি,···তিনি আর পেরে ওঠেন না। আমাদের আশ্রমের এতগুলো লোকের মধ্যে, কেবল ওঁর আর ঐ তিনজন ভৈরবীর এখনো একটু দৃষ্টিশক্তি আছে; এ দিকে এঁরা ক'জনেই আমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়।···নিশ্চয় বৃদ্ধ আমাদের ভুল পথে এনে এখন আবার পথ খুঁজতে বেরিয়েছেন। এমন অসহায় অবস্থায় আমাদের ফেলে চলে যাওয়ার তাঁর কোনো অধিকার নেই।

অন্ধ স্থবির॥ তিনি বহুদূর চলে গেছেন; যাবার বেলা মেয়েদের বোধ হয় ঐ রকমই তিনি বলে গেলেন।···

প্রথম অন্ধ॥ তিনি বুঝি আজকাল শুধু মেয়েদের সঙ্গেই কথা কন? কেন? আমরা বুঝি কেউ নই? শেষকালে, অনুযোগ না করে আর চলবে না, দেখছি।

অন্ধ স্থবির॥ কার কাছে অনুযোগ করবে?

প্রথম অন্ধ॥ তাই তো! তা তো বলতে পারিনে; আচ্ছ দেখা যাবে··· দেখা যাবে;···ইনি গেলেন কোথায়? আমি মেয়েদের জিজ্ঞেস করছি।

অন্ধ স্থবিরা॥ সারা জীবন ঘুরে ঘুরে তিনি শ্রান্ত হয়েছেন। আমার মনে হয়, যেন, তিনি আমাদের মাঝখানে একবার এসে বসেছিলেন। আজ ক'দিন থেকে তাঁকে বড় বিষণ্ণ, বড় দুর্বল বলে বোধ হচ্ছে। ক্রমেই যেন নিরানন্দ হয়ে

অন্ধ স্থবিরা ॥ কান পেতে শোনো, ঐ মন্তরের মধ্যে থেকেই সমুদ্রের আভাস পাবে।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ হ্যাঁ, পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি, আমাদের কাছ থেকে খুব বেশী দূর বলেও বোধ হচ্ছে না।

অন্ধ স্থবিরা ॥ ঘুমিয়ে ছিল ; বোধ হয় জেগে উঠল।

প্রথম অন্ধ ॥ আমাদের এমন জায়গায় আনা তাঁর ভারী অন্যায় ; ও শব্দটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না।

অন্ধ স্থবিরা ॥ তোমরা তো জান…এ দ্বীপটি তেমন বড় নয় ; কাজেই, আশ্রমের বাইরে একবার এসে পড়লেই ওই শব্দ।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আমি কান দিই নে।

তৃতীয় অন্ধ ॥ আজকে যেন একেবারে নাকের গোড়ায় বলে মনে হচ্ছে ; এত কাছে ও আওয়াজ আমি ভালবাসি নে !

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আমিও না। তা' ছাড়া আমরা তো আশ্রম ছেড়ে আসতেই চাইনি।

তৃতীয় অন্ধ ॥ আমরা কোনো দিন এত দূর আসিনি। মিছেমিছি এত দূর হাঁটানো।

অন্ধ স্থবিরা ॥ আজকের সকালটা ভারী চমৎকার লেগেছিল।…যতক্ষণ রোদ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত, আমরা খোলা মাঠে রোদ পোহাতে পেলে, খুশী হব মনে করে, ঠাকুর আমাদের এখানে এনেছিলেন। এর পর সারাটা শীত আশ্রমের মধ্যে তো আবদ্ধ হয়ে থাকতেই হবে।

প্রথম অন্ধ ॥ আমার আশ্রমই ভাল।

অন্ধ স্থবিরা ॥ ঠাকুর বলেন, এই যে ছোট্ট দ্বীপটিতে আমরা বাস কচ্ছি, এর কথাও কিছু কিছু জানা ভাল। উনিও এর সকল ঠাঁই দেখেন নি। এখানে নাকি এক পাহাড় আছে…তার উপর কেউ কখনো ওঠেনি ! সেই পাহাড়ের কোণে এক তরাই আছে, সেখানে কেউ নাবতে চায় না ! এমন অনেক গুহা আছে, যার ভিতর আজ পর্যন্ত কেউ প্রবেশ করেনি। রোদের আশায় চিরটা কাল ছাদের উপর বসে থাকা ভাল দেখায় না, তাই, তিনি আজ আমাদের সাগরের তীরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এখন দেখছি একাই সেদিকে গিয়েছেন।

অন্ধ স্থবির ॥ ঠাকুরের কথাই ঠিক। বাঁচতে গেলে এ চাই।

প্রথম অন্ধ ॥ যাই বল, আশ্রমের বাইরে কিছু দেখবার নেই।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আমরা কি এখন রোদে বসে রয়েছি?

তৃতীয় অন্ধ ॥ এখনও রোদ রয়েছে?

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ আমার তো বোধ হয় না; আমার আন্দাজ হয় বেলা একেবারে গড়িয়ে গেছে।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ ক' প্রহর হ'ল?

অনেকে ॥ জানিনে,…কেউ জানে না।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আলো দেখা যাচ্ছে কি? (ষষ্ঠের প্রতি) কই? তুমি কোথায়? বল, তুমি তো তবু একটু দেখতে পাও, বল!

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ আমার বোধ হচ্ছে, ভারী অন্ধকার। যতক্ষণ রৌদ্র থাকে ততক্ষণ…এই ঠিক আমার চোখের পাতার কোলে একটা নীল রেখা দেখতে পাই; অনেকক্ষণ আগে দেখেছিলুম; এখন একেবারে অন্ধকার।

প্রথম অন্ধ ॥ আমি খিদে পেলেই বুঝতে পারি বেলা গেছে; খিদেও দেখছি পেয়েছে।

তৃতীয় অন্ধ ॥ আচ্ছা, ঘাড় তুলে একবার আকাশের দিকে তাকাও দেখি, হয়তো বুঝতে পারবে।

(তিনজন জন্মান্ধ ব্যতীত সকলেই আকাশের দিকে দৃষ্টিহীন চক্ষে চাহিল। জন্মান্ধেরা পূর্বের মতো নত মস্তকে মাটির দিকেই চাহিয়া রহিল)

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ আমরা খোলা জায়গায় আছি কিনা—তাও বোঝা যাচ্ছে না।

প্রথম অন্ধ ॥ কথা কইলেই যে রকম গমগম কচ্ছে তাতে মনে হয় আমরা একটা গুহার ভিতর বসে আছি।

অন্ধ স্থবির ॥ আমার মনে হয় সন্ধ্যা হয়েছে বলে ওরকম গমগম কচ্ছে।

অন্ধ তরুণী ॥ আমার বোধ হচ্ছে আমার দুটি হাত পরিপূর্ণ করে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে।

অন্ধ স্থবিরা ॥ আমার বোধ হচ্ছে নক্ষত্র উঠেছে, স্পষ্ট শুনছি।

অন্ধ তরুণী ॥ আমিও!

প্রথম অন্ধ ॥ কই? আমি তো কোনো শব্দ পাচ্ছিনে।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আমি কেবল আমাদের সকলের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি।

অন্ধ স্থবির ॥ আমার মনে হয় মেয়েদের কথাই ঠিক।

প্রথম অন্ধ ॥ আমি কখ্‌খনো নক্ষত্রের আওয়াজ শুনিনি।

দ্বিতীয় অন্ধ ও তৃতীয় অন্ধ ॥ আমিও না।

(একদল নিশাচর পাখী সহসা আকাশ হইতে নামিয়া পল্লবের স্তরে অদৃশ্য হইয়া গেল)

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ শুনছ? শুনছ? শোনো! শোনো! উপরে ওকি বল দেখি?…শুনতে পাচ্ছ?

অন্ধ স্থবির ॥ আকাশের নীচে দিয়ে অথচ আমাদের মাথার উপর দিয়ে কি যে চলে গেল।

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ আমাদের ঠিক উপরের দিকে কি যেন নড়ে বেড়াচ্ছে; হাত বাড়ালে কিন্তু নাগাল পাওয়া যাবে না।

প্রথম অন্ধ ॥ আমিও শব্দটার ভাব ঠাওরাতে পাচ্ছিনি; এখন ঠিকানায় পৌঁছতে পাল্লে বাঁচি।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আমরা এ কোথায়!

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ আমি দাঁড়িয়ে উঠছিলাম…মাথায় কাঁটাগাছ লাগল; চারিদিকেই কাঁটা…হাত পা মেল্‌তেও আর সাহস হচ্ছে না।

তৃতীয় অন্ধ ॥ আমরা এ কোথায়!

অন্ধ স্থবির ॥ জানবার জোটি নেই!

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ আশ্রম থেকে খুবই যে দূরে এসে পড়া গেছে তাতে আর ভুল নেই; কোনো আওয়াজই পাওয়া যাচ্ছে না।

তৃতীয় অন্ধ ॥ অনেকক্ষণ থেকে আমি ভিজে পাতার গন্ধ পাচ্ছি।

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ আমাদের মধ্যে কেউ কি দৃষ্টি থাকতে এ দ্বীপ দেখেনি? কেউ বলতে পারে না আমরা কোন্ জায়গায় এলাম?

অন্ধ স্থবিরা ॥ আমরা সবাই এখানে আসবার আগেই চোখ হারিয়েছি।

প্রথম অন্ধ ॥ আমি, দেখা যে কেমন, তাই জানিনি।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ মিছেমিছি উৎকণ্ঠা বাড়াবার দরকার নেই; মোহান্ত এখনি ফিরবেন; অপেক্ষা করা যাক্। ভবিষ্যতে তাঁর সঙ্গে আর ঘরের বার হচ্ছিনি।

অন্ধ স্থবির ॥ আমরা একলাও বেরুতে পারি নে।

প্রথম অন্ধ ॥ আমরা বেরুবই না ; না বেরুনই আমার ইচ্ছে।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ বেরুবার ইচ্ছেও তো আমাদের ছিল না ; বাইরে আসবার কথা কেউ তাঁকে বলতে যায়নি।

অন্ধ স্থবির ॥ আজ হ'ল পরবের দিন ; পরবের দিন হলেই তো আমরা বেরুই।

তৃতীয় অন্ধ ॥ আমি তখন ঘুমুচ্ছি ; তিনি ধাক্কা দিয়ে আমায় জাগিয়ে বললেন, "ওঠ, ওঠ, দেরি হয়ে যাচ্ছে, সূর্য উঠেছে' সূর্য জিনিসটা যে কী তা আমি জানতাম না ; আমি কখনো সূর্য দেখিনি।

অন্ধ স্থবিরা ॥ আমি সূর্য দেখেছি ; তখন আমার বয়স খুব অল্প।

অন্ধ স্থবির ॥ আমি দেখেছি ; সে যুগযুগান্তরের কথা, তখন আমি শিশু— বলতে গেলে মনেই নেই।

তৃতীয় অন্ধ ॥ সূর্য উঠলেই তিনি যে কেন আমাদের আশ্রমের বাইরে নিয়ে আসেন তা বুঝতে পারিনে। এতে করে কি আমাদের মধ্যে একজনেরও একবিন্দু জ্ঞানবৃদ্ধি হয়েছে ? আমি তো বুঝতেই পাচ্ছিনে,—এটা দিন দুপুর, না দুপুর রাত !

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ আমি দিন দুপুরে বেরুনোই পছন্দ করি। আমার মনে হয় যেন ভারী একটা উজ্জ্বলতার মাঝখানে এসে পড়েছি ; আর মনে হয়, যেন চোখ দুটো আবার তেমনি করে খুলে যাবে।

তৃতীয় অন্ধ ॥ আমি আশ্রমে বসে আগুন পোহানই পছন্দ করি। আজ সকালে মনের সাধে আগুন পোহানো গেছে।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আমরা রোদ পোহাব এইটেই যদি তাঁর ইচ্ছে ছিল, তা উঠানে আমাদের বসিয়ে দিলেই হ'ত ; দিব্যি ঘেরা জায়গা ; ছট্‌কে বেরিয়ে পড়বার ভয় নেই ; কবাট বন্ধ করে দিলে আর ভয়টা কিসের ? আমি তো সদাসর্বদা দুয়োর বন্ধ করেই বসে থাকি। তুমি যে বড় আমার কনুয়ে হাত দিলে ?

প্রথম অন্ধ ॥ আমি কেন হাত দিতে যাব ? আমি তোমায় নাগালই পাইনে।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ বলছি আমি···নিশ্চয় কেউ আমার কনুয়ে হাত দিয়েছে।

প্রথম অন্ধ ॥ আমরা কেউ না।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আমি আর এখানে থাকতে চাইনে।

অন্ধ স্থবিরা ॥ হে ভগবান! হে ঠাকুর! বলে দাও আমরা কোথায়।

প্রথম অন্ধ ॥ আমরা অনন্তকাল এমন অপেক্ষা করে থাকতে পারব না।

(দূরে ঘড়িতে বারটা বাজিল)

অন্ধ স্থবিরা ॥ ওঃ! আমরা আশ্রম থেকে কত দূরেই এসে পড়িছি!

অন্ধ স্থবির ॥ রাত দুপুর!

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ বেলা দুপুর! কেউ কি ঠিক সময় জান? বল।

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ বল্‌তে পারিনে। আমার মনে হচ্ছে আমরা কিসের ছায়াতে রইছি।

প্রথম অন্ধ ॥ আমি কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পাচ্ছিনে; ভারী ঘুমিয়ে পড়া গিইছিল।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আমার খিদে পেয়ে গেছে।

সকলে ॥ খিদেও পেয়েছে, তেষ্টাও পেয়েছে।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ এখানে কি খুব বেশীক্ষণ আসা গেছে?

অন্ধ স্থবিরা ॥ আমার মনে হয় যেন কত যুগই এখানে বসে আছি।

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ আমি···জায়গাটা···প্রায় ঠাউরে ফেলেছি।···

তৃতীয় অন্ধ ॥ যেদিকে প্রহর বাজল সেই দিকে গেলে হয়।

(নিশাচর পক্ষীরা আনন্দ-কাকলি করিয়া উঠিল)

প্রথম অন্ধ ॥ শুনছ? শুনছ?

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ ও আবার কি গো? আমরা তবে একলা নেই!

তৃতীয় অন্ধ ॥ আমার গোড়াতেই সন্দেহ হয়েছিল,···কেউ আড়িপেতে আমাদের কথাবার্তা শুনছে! ঠাকুর কি ফিরে এলেন

প্রথম অন্ধ ॥ কি জানি ও কি! ওই উপর দিকটায়।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ তোমরা কি বল হে? কিছু শুনলে? অমন চুপচাপ থাক কেন?

অন্ধ স্থবির ॥ আমরা এখনও শুনছি!

অন্ধ তরুণী ॥ আমি ডানার শব্দ পাচ্ছি।

অন্ধ স্থবিরা ॥ হে ঠাকুর! হে দয়াময়! বলে দাও আমরা কোথায়?

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ জায়গাটা প্রায় ঠাউরে ফেলেছি…আমাদের আশ্রম হচ্ছে মহানদের ওপারে; আমার বোধ হচ্ছে বুড়ো জাঙ্গালের উপর দিয়ে এপারে এসেছি। মোহান্ত আমাদের দ্বীপের উত্তর দিকটাতে এনে ফেলেছেন। এ জায়গাটা মহানদ থেকে বোধ হয় খুব বেশী দূর হবে না; সবাই একটু চুপ চাপ থাকলে স্রোতের শব্দও শোনা যেতে পারে। ঠাকুর যদি না ফেরেন তবে আমাদের ঐ নদের ধারেই যেতে হবে; ওখানে দিনরাত বড় বড় জাহাজ যাওয়া-আসা করে, মাঝিরা দেখতে পাবে…আমরা তীরে দাঁড়িয়ে আছি। আবার মনে হচ্ছে বাতি-ঘরের কোলে যে বন…এ সেই জায়গাটা; এ বনের নিগম আমার জানা নেই;…তোমরা কেউ আমার সঙ্গে আসবে?

প্রথম অন্ধ ॥ বস, বস; আর একটু দেখ, নদীর পথ আমরা কেউ জানিনে; তার উপর আশ্রমের চারিদিকেই জলাভূঁই; আর একটু দেখ, তিনি আসবেন—আসতে হবেই

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ আসবার সময় কোন্ কোন্ পথ দিয়ে আমরা এসেছিলাম, তা কারো মনে আছে? তখন কিন্তু মোহান্ত ঠাকুর বেশ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রথম অন্ধ ॥ আমি কানই দিইনি।

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ কেউ কান দেয়নি?

তৃতীয় অন্ধ ॥ এইবার থেকে তাঁর কথা শুনব।

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ আমাদের মধ্যে কারো কি এ দ্বীপে জন্ম হয়েছে?

অন্ধ স্থবির ॥ আমরা সবাই বিদেশী।

অন্ধ স্থবিরা ॥ আমরা সমুদ্রপারের লোক।

প্রথম অন্ধ ॥ আমি ভেবেছিলাম পার হবার সময়েই মারা পড়ব।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আমিও। আমরা দু'জন একসঙ্গে এসেছিলাম।

তৃতীয় অন্ধ ॥ আমরা তিনজনই এক গাঁয়ের লোক।

প্রথম অন্ধ ॥ লোকে বলে, আকাশ পরিষ্কার থাকলে সে দেশ এখান থেকেও দেখা যায়; ঐ উত্তরে।

তৃতীয় অন্ধ ॥ আমাদের জাহাজখানা হঠাৎ এই দ্বীপে এসে ঠেকে গেল ; কাজেই এইখেনেই নামতে হ'ল।

অন্ধ স্থবিরা ॥ আমি এসেছি আর এক দেশ থেকে।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ কোত্থেকে ?

অন্ধ স্থবিরা ॥ সে দেশের কথা বলতে যাওয়াই মুশকিল ;—মনেই পড়ে না, মুখে বলি ঐ পর্যন্ত।—কত দিন হয়ে গেছে। সেখানে ভারী শীত—এখানকার চাইতেও বেশী।

অন্ধ তরুণী ॥ আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।

প্রথম অন্ধ ॥ সে কোন্ দেশ ?

অন্ধ তরুণী ॥ তা বলতে পারিনে। কেমন করে বলব ? সে এখান থেকে অনে—ক দূর, সমুদ্র পার। ভারী মস্ত দেশ। ইঙ্গিতে বোঝাতে পারি, কিন্তু তোমরাও যে আমারি মতোন অন্ধ ! তোমরা তো সে ইঙ্গিত বুঝতে পারবে না।—আমি অনেক ঘুরেছি ; আমি সূর্য দেখেছি ; আগুন, জল, পাহাড়, চমৎকার চমৎকার ফুল, সুন্দর সুন্দর মুখ,—কত কি দেখেছি। এ দ্বীপে সেরকম কিচ্ছু নেই। এ দেশটা ভারী কনকনে, ভারী বিমর্ষ। আমি দৃষ্টি হারিয়ে সব হারিয়েছি। আগে আমি বাপ, মা, ভাই, বোন সকলকে দেখতে পেতাম। তখন আমি এত ছোট যে নিজের দেশের নামটাও জেনে নিতে পারিনি। সমুদ্রের কিনারায় খেলা করে বেড়াতাম। তবু, সে দেশ যে দেখেছি তা দিব্যি মনে রয়েছে। একদিন পাহাড়ের উপর থেকে বরফের রেখা দেখেছিলাম।—জীবনে কে যে দুর্ভাগা হবে তা আমি তখন থেকেই একটু একটু বুঝতে শিখেছি।

প্রথম অন্ধ ॥ অর্থাৎ ?

অন্ধ তরুণী ॥ আমি লোকের কণ্ঠস্বর শুনেই বলে দিতে পারি। আমি যখন কিছুই ভাবিনে তখনই আমার মনের সকল কথা পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে।

প্রথম অন্ধ ॥ আমার পুরানো কথা কিছু মনে নেই—আমি—

(দেশান্তরগামী কতকগুলি পাখী কলরব করিতে করিতে শাখা-পল্লবের মধ্য দিয়া উড়িয়া গেল)

অন্ধ স্থবির ॥ আবার যেন আকাশে কিসের আনাগোনা টের পাচ্ছি।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ এ দেশে তুমি কেন এলে ?

অন্ধ স্থবির॥ কাকে বলছ?

দ্বিতীয় অন্ধ॥ ওই মেয়েটিকে।

অন্ধ তরুণী॥ লোকের মুখে শুনতে পেলাম, এই দেশের মোহান্ত ঠাকুর অন্ধকে দৃষ্টিদান করতে পারেন। উনিও আমায় বলেছেন যে, আবার আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে পাব। একবার চোখের জালিটা কাটলে হয়,—আর এখানে থাকছিনে।

প্রথম অন্ধ॥ আমরাও এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।

দ্বিতীয় অন্ধ॥ চিরকালই এইখানে থাকতে হবে।

তৃতীয় অন্ধ॥ মোহান্ত ঠাকুর যে বুড়ো হয়ে পড়েছেন…উনি আর আমাদের আরোগ্য করেছেন!…

অন্ধ তরুণী॥ আমার চোখের পাতায় পাতায় জুড়ে গেছে, কিন্তু, চোখের মণি যে বেশ উজ্জল আছে তা আমি অনুভবে বুঝতে পারি।

প্রথম অন্ধ॥ আমার চোখের পাতা খোলা।…

দ্বিতীয় অন্ধ॥ আমি চোখ চেয়ে ঘুমোই।

তৃতীয় অন্ধ॥ পোড়া চোখের কথায় আর কাজ নেই, দাদা।

দ্বিতীয় অন্ধ॥ তুমি এখানে বেশী দিন আসনি বোধ হচ্ছে।

অন্ধ স্থবির॥ একদিন সন্ধ্যাবেলায় ভগবানের নাম কচ্ছি, এমন সময় স্ত্রীলোকদের দিক থেকে একটা অপরিচিত স্বর শুনতে পেলাম; আওয়াজেই বুঝতে পেরেছিলাম যে তোমার বয়স অল্প; তোমাকে দেখতে সাধ হ'ল,… গলার আওয়াজ শুনে।…

প্রথম অন্ধ॥ আমি টের পাইনি।

দ্বিতীয় অন্ধ॥ মোহান্ত ঠাকুর তো আমাদের কিছুই জানতে দ্যান না।

ষষ্ঠ অন্ধ॥ লোকে বলে তুমি অপূর্ব সুন্দরী…যেন এ দেশের নও।

অন্ধ তরুণী॥ আমি নিজেকে কখনো দেখিনি।

অন্ধ স্থবিরা॥ আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাইনি। পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা চলছে; এক জায়গায় বাস কচ্ছি; এক সঙ্গে রইছি;…কিন্তু জানতে পেলাম না আমরা কেমন! দু'হাত দিয়ে স্পর্শ করে আন্দাজে আন্দাজে পরস্পরের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু চোখ যা দূর থেকে জানায়, হাত নিকটে থেকেও তার কাছে এগুতে পারে না।…

ষষ্ঠ অন্ধ॥ রৌদ্রে বসলে পর আমি তোমাদের ছায়ার মতোন দেখতে পাই।

অন্ধ স্থবির॥ যে আশ্রমটিতে এতকাল বাস কচ্ছি তাও কখনো চক্ষে দেখলাম না! হাতড়ে হাতড়ে দেওয়াল আর দরজার আন্দাজ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আশ্রম-গৃহের চেহারা যে কেমন তা মোটেই জানিনে।

অন্ধ স্থবিরা॥ শুনতে পাই ওটা এক প্রাচীন প্রাসাদ, ভারী অন্ধকার, ভারী জরাজীর্ণ, উপরতলায় মোহান্ত ঠাকুরের ঘর ছাড়া অন্য কোনো ঠাঁই থেকে মোটে আলোই দেখা যায় না।

প্রথম অন্ধ॥ যার 'আঁখ' নেই তার আলোতেও প্রয়োজন নেই।

ষষ্ঠ অন্ধ॥ আমি আশ্রমের দুয়োর-গোড়ায় ভেড়াগুলোর কাছে কাছে থাকি ; সন্ধ্যা হলে ভেড়াগুলো মোহান্তের ঘরে আলো দেখতে পেয়ে আশ্রমে ঢুকে পড়ে···আমিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাই। ভেড়াগুলোর একদিনের জন্যেও ভুল হয় না,—আমাকেও ভুগতে হয় না।

অন্ধ স্থবির॥ কত বৎসর ধরে এক সঙ্গে বাস কচ্ছি তবুও পরস্পরের মুখ দেখতে পেলাম না ; মনে হয়, যেন একলা রইছি,···ভালবাসতে গেলে দেখাটা আগে।···

অন্ধ স্থবিরা॥ স্বপ্নের অবস্থায় মনে হয় যেন আবার আমি দৃষ্টি ফিরে পেইছি।

অন্ধ স্থবির॥ আমি কেবল স্বপ্নেই দেখতে পাই

প্রথম অন্ধ॥ আমি সাধারণতঃ দুপুর রাতে স্বপ্ন দেখি।

দ্বিতীয় অন্ধ॥ হাত পা অসাড় হয়ে গেলে লোকে কি রকম স্বপ্ন দেখে?

(দুর্যোগের হাওয়ায় বিবশভাবে একরাশ পল্লব স্খলিত হইয়া পড়িল)

পঞ্চম অন্ধ॥ কে আমার গায়ে হাত দিলে?

প্রথম অন্ধ॥ কি যেন ঝরছে।

অন্ধ স্থবির॥ উপর থেকে পড়ছে,···কি পড়ছে তা বলা যায় না।

পঞ্চম অন্ধ॥ আমার হাত ছুঁলে কে? আমি ঘুমুচ্ছিলাম,···একটু ঘুমুতে দাও না বাপু।

অন্ধ স্থবির॥ কেউ তোমায় ছোঁয়নি।

পঞ্চম অন্ধ ॥ কে আমায় ছুঁলে? জোরে জবাব দাও, আমি কানে ভাল শুনতে পাইনে।

অন্ধ স্থবির ॥ নিজেরাই জানিনে তার আবার জবাব!

পঞ্চম অন্ধ ॥ আমাদের সতর্ক করে গেল?

প্রথম অন্ধ ॥ মিছে উত্তর দেওয়া, ও শুনতেই পায় না।

তৃতীয় অন্ধ ॥ যারা শুনতে পায় না তারা কী দুর্ভাগা।

অন্ধ স্থবির ॥ আর তো বসে থাকা যায় না।

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ এক জায়গায় আর ভাল লাগছে না।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আমার মনে হচ্ছে যেন আমরা ভারী তফাত তফাত রয়েছি; একটু কাছাকাছি বসা যাক্, ঠাণ্ডা পড়তে শুরু হয়েছে।

তৃতীয় অন্ধ ॥ আমায় দাঁড়াতে সাহস হচ্ছে না, যেখানে থাকা গেছে সেইখানে থাকাই ভাল।

অন্ধ স্থবির ॥ তা'ছাড়া আমাদের পরস্পরের মাঝখানে কত কি থাকতে পারে,...কিছুই তো বলা যায় না।

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ আমার বোধ হচ্ছে আমার হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে; দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়েই এই হয়েছে।

তৃতীয় অন্ধ ॥ বুঝেছি, তুমি আমার দিকটায় ঝুঁকে রয়েছ,...আমি শুনতে পাচ্ছি।

(উন্মাদগ্রস্ত অন্ধ স্ত্রীলোকটি দুই হাতে সজোরে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বারংবার নিস্পন্দ মোহান্তের দিকে ফিরিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে অস্ফুট স্বরে কাঁদিতে লাগিল)

প্রথম অন্ধ ॥ আমি আর এক রকম শব্দ পাচ্ছি।

অন্ধ স্থবিরা ॥ পাগলী বোধ হয় চোখ রগড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ ও সর্বদাই অমনি করে; আমি রোজ রাত্রে শুনি।

তৃতীয় অন্ধ ॥ ও বদ্ধপাগল; একদম কথাই কয় না।

অন্ধ স্থবিরা ॥ ছেলেটি কোলে হয়ে পর্যন্ত ও আর কথা কয় না; সর্বদাই কেমন যেন ভয়ে ভয়ে থাকে।

অন্ধ স্থবির ॥ তোমার 'ভয় ভয়' করে না?

প্রথম অন্ধ ॥ কাকে বলছ?

অন্ধ স্থবির ॥ বিশেষ করে কাউকেই নয় ; সকলকেই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

অন্ধ স্থবিরা ॥ হ্যাঁ, খুব···ভয় ভয় করে বইকি।

অন্ধ তরুণী ॥ অনেক দিন থেকে আমার এমনি ধারা ভয় করে।

প্রথম অন্ধ ॥ ও কথা জিজ্ঞেসা করলে যে ?

অন্ধ স্থবির ॥ কেন যে জিজ্ঞাসা করলাম তা ঠিক বলতে পারিনে,···একটা কি যেন বুঝতে পারা যাচ্ছে না···আমার মনে হ'ল কে যেন হঠাৎ কেঁদে উঠল।

প্রথম অন্ধ ॥ ভয় পেয়ে লাভ নেই, আমার বোধ হয় ও পাগলীর কাজ।

অন্ধ স্থবির ॥ উহুঁ, তা নয়, তা নয় ; আরো কি একটা কাণ্ড ঘটেছে, শুধু কান্নার শব্দে আমি ভয় পাইনি।

অন্ধ স্থবিরা ॥ ছেলেকে দুধ খাওয়াবার সময় হলেই ও অমনি রোজ কাঁদে।

প্রথম অন্ধ ॥ ওরকম করে কেবল ওই কাঁদে।

অন্ধ স্থবিরা ॥ শুনতে পাই, ও নাকি মাঝে মাঝে দেখতে পায়।

প্রথম অন্ধ ॥ চোখ থেকে যখন জল পড়ে তার কিন্তু শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না।

অন্ধ স্থবির ॥ যে দেখতে পায় তার কান্নাই কান্না।···

অন্ধ তরুণী ॥ আমি যেন ফুলের গন্ধ পাচ্ছি!···

প্রথম অন্ধ ॥ আমি কেবল ধুলোর গন্ধ পাচ্ছি।

অন্ধ তরুণী ॥ ফুল ফুটেছে, ফুল ফুটেছে, খুব কাছেই ফুটেছে।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আমি ধুলোর গন্ধ পাচ্ছি।

অন্ধ স্থবির ॥ পেইছি, ফুলের গন্ধ পেইছি ; এইবার যে বাতাসটা এল সেই বাতাসে পেইছি।

তৃতীয় অন্ধ ॥ কই ? আমি তো কেবল ধুলোর গন্ধই পাচ্ছি।

অন্ধ স্থবির ॥ আমার বোধ হয় মেয়েদের কথাই ঠিক।

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ কই ? কোন্ দিকে ? আমি গিয়ে তুলে আনছি।

অন্ধ তরুণী ॥ তোমার ডাইনে,—দাঁড়াও,—ওঠ !

(ষষ্ঠ অন্ধ সন্তর্পণে উঠিয়া, পদে পদে হোঁচট খাইতে খাইতে, রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ডগুলি মাড়াইয়া চলিল)

অন্ধ তরুণী ॥ থামো ! থামো ! তুমি সব মাড়িয়ে নষ্ট করলে, দেখেছি ; কচি ডাঁটাগুলো মচমচিয়ে ভেঙে থেঁতো হয়ে যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি।

প্রথম অন্ধ ॥ ফুল গেল তো বয়েই গেল ; এখন ফেরবার উপায় ঠাওরাও।

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ পিছু হট্‌তে সাহস হচ্ছে না।

অন্ধ তরুণী ॥ হট্‌তে হবে না, দাঁড়াও ! (দাঁড়াইয়া) ওঃ, মাটি কনকন কচ্ছে ! জমে যাবার যোগাড় !

(স্বচ্ছন্দগতিতে একেবারে কৃশপাণ্ডুর রজনীগন্ধার দিকে যাইতে গিয়া ভূতলশায়ী বৃক্ষে হোঁচট লাগিল)

এই ! এই দিকে !—আমি নাগাল পাচ্ছিনে,—তোমার খুব কাছে।

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ বোধ হয় আমি তাই তুলেছি !

(অবশিষ্ট পুষ্পদণ্ড হইতে কয়েকটি পুষ্প সংগ্রহ করিয়া তরুণীকে দিল। নিশাচর পাখীর দল উড়িয়া গেল)

অন্ধ তরুণী ॥ আমার বোধ হচ্ছে এ ফুল আমি আগে দেখেছিলাম ; নাম মনে পড়ছে না—এ ফুল ক'টা কেমন যেন রোগা-রোগা, বোঁটাগুলো রোঁয়ার মতো সরু ; চিনে ওঠা ভার ; বোধ হয় এ শ্মশানের ফুল।

(ফুলগুলি একে একে চুলে পরিতে লাগিল)

অন্ধ স্থবির ॥ আমি তোমার চুলের আওয়াজ পাচ্ছি ;…হাওয়ার মতন।

অন্ধ তরুণী ॥ চুলের নয়, ফুলের।

অন্ধ স্থবির ॥ তোমায় দেখবার জো নেই।…

অন্ধ তরুণী ॥ নিজেই নিজেকে দেখবার জো নেই ;…জমে গেলাম।

(এই সময়ে বনে বাতাস উঠিল এবং তীরের পাহাড়গুলির উপর সজোরে ঢেউ আছড়াইতে লাগিল)

প্রথম অন্ধ ॥ মেঘ ডাকছে।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ বোধ হয় ঝড় উঠল।

অন্ধ স্থবির ॥ আমার বোধ হচ্ছে ঢেউয়ের শব্দ।

তৃতীয় অন্ধ ॥ ঢেউয়ের শব্দ ? সাগরের শব্দ ? এ যে দু'পা আগে !—একেবারে আমাদের কাছেই ! আমি আমার চারিদিকেই ওই রকম শব্দ পাচ্ছি। ও নিশ্চয় আর কিছু।

তরুণী ॥ আমি যেন পায়ের গোড়ায় ঢেউয়ের শব্দ পাচ্ছি।

প্রথম অন্ধ ॥ আমার বোধ হয় বাতাসে ঝরা পাতা ঘুরছে।

অন্ধ স্থবির ॥ আমার বোধ হয় মেয়েদের কথাই ঠিক।

তৃতীয় অন্ধ ॥ এই দিকে আসছে!

প্রথম অন্ধ ॥ আচ্ছা, বাতাস কোথেকে আসে?

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ সাগর থেকে।

অন্ধ স্থবির ॥ বরাবরই সাগর থেকে আসে; সাগর আমাদের চতুর্দিক ঘিরে আছে; অন্য কোথাও থেকে তো আসবার জো নেই!

প্রথম অন্ধ ॥ ও সাগরের ভাবনা ভেবে আর কাজ নেই।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ না ভেবে চলে কই? ঘনিয়ে আসছে যে!

প্রথম অন্ধ ॥ ও যে সাগরই—তা তুমি নিশ্চয় করে বলতে পার না।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ ঢেউয়ের শব্দ এত কাছে, যে, জলে হাত ডুবানো যাবে বলে মনে হচ্ছে; আর এখানে থাকা নয়; এক মুহূর্তে আমাদের ঘিরে ফেলতে পারে।

অন্ধ স্থবির ॥ যাবে কোথায় বাপু?

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ তা জানিনে! যে দিকে হ'ক! ও জলের শব্দ আর শুনতে পারব না। চল! চল!

তৃতীয় অন্ধ ॥ আমি আর এক রকম শব্দ পাচ্ছি, ওই!

দূরে শুষ্কপত্রের উপর দ্রুত পদধ্বনি শোনা গেল)

প্রথম অন্ধ ॥ কি একটা এই দিকে আসছে।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ ঠাকুর আসছেন,—তিনিই ফিরে আসছেন।

তৃতীয় অন্ধ ॥ তিনিই আসছেন,—ছোট্ট ছেলের মতোন থুপুস থুপুস করে ছুটতে ছুটতে আসছেন।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আজকে আর কোনো কথা তোলা হবে না।

অন্ধ স্থবির ॥ ও তো মানুষের পায়ের শব্দ বলে মনে নিচ্ছে না।

(একটা প্রকাণ্ড কুকুর বনে প্রবেশ করিয়া উহাদের সম্মুখ দিয়া চলিল। সকলে নীরব)

প্রথম অন্ধ ॥ কে যায়? ওগো কে তুমি? অন্ধজনে দয়া কর! অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করে বসে আছি।

(কুকুরটা ফিরিয়া প্রথম অন্ধের দুই হাঁটুর উপর দুই থাবা রাখিয়া দাঁড়াইল)

আঃ! আঃ! আমার হাঁটুর উপর এ কী দিলে? এটা কী? জানোয়ার

নাকি ? কুকুর বুঝি ? ও-ও ! সেই কুকুরটা, অন্ধাশ্রমের কুকুরটা ! আয় ! এই দিকে আয় !—আমাদের নিয়ে যেতে এসেছে। আয় ! এ দিকে আয় !

সকলে ॥ এদিকে আয় ! এদিকে আয় !

প্রথম অন্ধ ॥ আমাদের নিয়ে যেতে এসেছে, পায়ের চিহ্ন ধরে এসেছে ! এমনি করে হাতখান্ চাটছে যেন একশো বছর আমায় দেখেনি। আহ্লাদের ডাকবার ভঙ্গী দেখ ! আহ্লাদে খুন ! শোনো একবার ! শোনো একবার !

সকলে ॥ আয় ! আয় ! আয় !

অন্ধ স্থবির ॥ ও বোধ হয় কারু আগে দৌড়ে এসে থাকবে।

প্রথম অন্ধ ॥ না—না, একলা ; আর কেউ থাকলে সাড়া পাওয়া যেত ; অন্য পাণ্ডায় আর দরকারও নেই, পাণ্ডাগিরিতে কুকুরের কাছে মানুষ-পাণ্ডাদেরও হার মানতে হয়। যেখানে যেতে চাও, ঠিক নিয়ে যাবে। ও আমাদের কথা শোনে।

অন্ধ স্থবিরা ॥ ওর সঙ্গে যেতে আমার কিন্তু সাহস হয় না।

অন্ধ তরুণী ॥ আমারও না।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আমরা স্ত্রীলোকের কথা কানে তুলছিনে।

তৃতীয় অন্ধ ॥ আমার বোধ হয় আকাশে কি একটা পরিবর্তন ঘটেছে, আর তেমন হাঁফ লাগছে না, বাতাসও বেশ পরিষ্কার বোধ হচ্ছে।

অন্ধ স্থবিরা ॥ ও ডাঙা-মুখো হাওয়া, সাগর থেকে আসছে।

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ বোধ হয় ফরসা হ'ল, সূর্য উঠবে।

অন্ধ স্থবির ॥ আমার মনে হচ্ছে, সব যেন আরো জুড়িয়ে যাচ্ছে ; একেবারে জমে যাবার জো।

প্রথম অন্ধ ॥ রাস্তা ঠিক ঠাওরাব। আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আহ্লাদে মেতে উঠেছে, আর ধরে রাখতে পাচ্ছিনে ; এস, এস, আমার পিছনে পিছনে সব এস। আমরা আশ্রমে ফিরছি···বাড়ি ফিরছি।

(কুকুরটা প্রথম অন্ধকে·টানিতে টানিতে মোহান্তের নিশ্চল দেহের নিকট গিয়া দাঁড়াইল)

সকলে ॥ কই তুমি ? কই হে ! কোন্ দিকে যাচ্ছ ? সাবধান !

প্রথম অন্ধ ॥ রও ! রও ! আসতে হবে না ! আমি ফিরছি,—কুকুরটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। একি ? এঃ ! এঃ ! কি-একটা ঠাণ্ডা মতোন হাতে ঠেকলো !

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ কি বলছ ? তোমার আওয়াজ আর কানে পৌছয় না যে।

প্রথম অন্ধ ॥ আমি···বোধ হচ্ছে আমি কার একখানা মুখের উপর হাত দিচ্ছি।

তৃতীয় অন্ধ ॥ বলছ কি ? ক্রমে তোমায় বুঝে ওঠাই যে মুশকিল হয়ে পড়ল দেখছি। তোমার হয়েছে কি ? তুমি কোন্ দিকে ? এরি মধ্যে এত তফাত হয়ে পড়লে নাকি ?

প্রথম অন্ধ ॥ ওঃ! ওঃ! ওঃ! আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি।—আমাদের মাঝখানে এ যে মরা মানুষ!

সকলে ॥ এখানে মরা মানুষ ?—তুমি কই ? তুমি কই ?

প্রথম অন্ধ ॥ সত্যি বলছি···মরা মানুষ! ওঃ! ওঃ! আমি মড়ার মুখে হাত দিইছি!···আমরা মড়ার কাছে বসে আছি। আমাদের মধ্যেই নিশ্চয় কেউ হঠাৎ মারা পড়েছে। আচ্ছা কথা কও, কে কে বেঁচে আছে দেখা যাক! তোমরা কই ? সাড়া দাও, সবাই মিলে সাড়া দাও।

(উন্মাদগ্রস্ত স্ত্রীলোকটি এবং বধির লোকটি ভিন্ন সকলে সাড়া দিল ;
বৃদ্ধা তিনজন নাম জপ বন্ধ করিল)

প্রথম অন্ধ ॥ আমি আর গলার আওয়াজে কাউকে চিনতে পাচ্ছিনে ; সবারি স্বর এক রকম ঠেকছে···সব কাঁপছে।

তৃতীয় অন্ধ ॥ দু'জনের সাড়া পাওয়া যায়নি,···তারা কোথায় ?

(লাঠি বাড়াইয়া দেখিতে গিয়া উহা পঞ্চম অন্ধের গায়ে লাগিল)

পঞ্চম অন্ধ ॥ আঃ! আমি ঘুমুচ্ছিলাম,···একটু ঘুমুতে দাও না, বাপু!

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ এও নয় ; তবে কে ? পাগলী ?

অন্ধ স্থবিরা ॥ পাগলী আমার পাশে, সে বেঁচে আছে,···আমি শুনতে পাচ্ছি।

প্রথম অন্ধ ॥ আমার বোধ হয়···আমার বোধ হয় এ মোহান্ত ঠাকুর··· দাঁড়িয়ে রয়েছেন! এস! এস!

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ দাঁড়িয়ে রয়েছেন ?

তৃতীয় অন্ধ ॥ তাহলে বেঁচে আছেন।

অন্ধ স্থবির ॥ কই তিনি ?

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ এস, দেখি গে, এস !···

(সকলে আন্দাজে মৃতের দিকে চলিল ; উন্মাদগ্রস্ত স্ত্রীলোকটি এবং অন্ধ-বধির পুরুষটি গেল না)

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ কই তিনি ? এইখানে ? ঠিক তিনিই তো ?

তৃতীয় অন্ধ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি চিনেছি।

প্রথম অন্ধ ॥ হে ঠাকুর ! হে দয়াময় ! আমাদের কী উপায় হবে !

অন্ধ স্থবিরা ॥ বাবাঠাকুর ! বাবাঠাকুর ! এ কি তুমি ? কি হ'ল ? কেমন করে এমন হ'ল ? বল, বল, সাড়া দাও।···আমরা যে সবাই মিলে তোমার কাছে এসেছি, ওঃ ! ওঃ ! ওঃ !

অন্ধ স্থবির ॥ একটু জলের যোগাড় দেখ, দেখি ! হয়তো এখনো বেঁচে আছেন।···

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আচ্ছা, বেয়ে-ছেয়ে দেখা যাক না···চাই কি, চেতন হলে আমাদের পথ দেখিয়ে আবার আশ্রমে নিয়ে যেতেও তো পারেন।

তৃতীয় অন্ধ ॥ বৃথা চেষ্টা ; বুকে কোনো শব্দই পাচ্ছিনি, সব ঠাণ্ডা।···

প্রথম অন্ধ ॥ মারা গেলেন···কিছু বলে যেতে পারলেন না।

তৃতীয় অন্ধ ॥ আমাদের আগে থেকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত ছিল।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ ওঃ ! কি বুড়োই হয়েছিলেন···এইবার নিয়ে তাঁর মুখে মোট দু'বার আমি হাত দিলাম।

তৃতীয় অন্ধ ॥ (শবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শ করিতে করিতে) আমাদের চেয়ে অনেক লম্বা ছিলেন।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ চোখ খোলা রয়েছে, হাত জোড় করে মরে রয়েছেন।

প্রথম অন্ধ ॥ মারা গেলেন,···শুধু শুধু মারা গেলেন।···

তৃতীয় অন্ধ॥ দাঁড়িয়ে নয় তো···পাথরের উপর বসে।···

অন্ধ স্থবির ॥ জগদীশ্বর ! বুঝতে পারিনি···সব কথা ভাল টেরও পাই নি,··· কতদিন থেকেই তো ভুগছিলেন···না জানি আজ কতই যন্ত্রণা হয়েছিল ! ওঃ ! ওঃ ! ওঃ ! একদিনেও জন্যেও জানতে দেননি ; হাত ধরলে ব্যথা পেতেন··· এখন মনে হচ্ছে, সব সময়ে মানুষ বুঝতে পারে না···মোটেই পারে না ; এস, কাছে এস, এইখানে বসে সকলে মিলে নাম শোনাও।

(স্ত্রীলোকেরা মৃতদেহ ঘিরিয়া হাহাকার করিতে লাগিল)

প্রথম অন্ধ ॥ আমি বসতে পারব না।····

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ কিসের উপর যে বসছি তার ঠিক নেই।···

তৃতীয় অন্ধ ॥ অসুখ হয়েছিল···তা আমাদের তো বলেন নি।···

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আজ এখানে আসবার সময় আস্তে আস্তে কি যেন বলছিলেন, বোধ হয়, ওই অল্পবয়সী মেয়েটির সঙ্গে কথা কইছিলেন; কি বলছিলেন গো?

প্রথম অন্ধ ॥ ও তা বলবে না।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ তুমিও আর আমাদের কথায় জবাব দেবে না? কই তুমি? কথা কও।

অন্ধ স্থবিরা ॥ তোমরা ঠাকুরকে বড় যন্ত্রণা দিয়েছ,···মেরে ফেলেছ,··· তোমরা তাঁর কথা শোননি, এগুতে চাওনি, তাঁর অমতে পথে বসে খেতে চেয়েছ, দিনরাত বিরক্ত করেছ, আমি কতবার তাঁর নিশ্বাস পড়তে শুনেছি, মনে যেন আর শক্তি ছিল না।

প্রথম অন্ধ ॥ তাঁর অসুখ ছিল? তুমি জানতে?

অন্ধ স্থবির ॥ আমরা কিছুই জানতে পারিনি, আমরা তাঁকে চক্ষেও দেখিনি! আমাদের এই নির্জীব, নিস্তেজ, নিঃসহায় চোখের সমুখ দিয়ে কী যে ঘটনা ঘটেছে, তা কি কোনো দিন আমরা জানতে পেরেছি? তিনিও কিছুই বলেন নি···এখন আর ফেরবার নয়। আমি তিনজনের মৃত্যু দেখলাম,···কিন্তু এমন দেখিনি···এবার আমাদের পালা।

প্রথম অন্ধ ॥ তাঁকে কষ্ট···আমি বাপু দিইনি,···আমি কখনো কিছু বলিনি।···

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আমিও না; ঠাকুর যা বলেছেন বিনা ওজরে তাই করছি।

তৃতীয় অন্ধ ॥ তিনি ঐ পাগলীটার জন্যে জল আনতে যাচ্ছিলেন···যেতে যেতে মারা গেছেন।

প্রথম অন্ধ ॥ এখন কি করা যায়? আমরা যাই কোথা?

তৃতীয় অন্ধ ॥ কুকুরটা কই?

প্রথম অন্ধ ॥ এই যে; ও ঠাকুরের মৃতদেহ ছেড়ে নড়তে চাইছে না।

তৃতীয় অন্ধ ॥ টেনে তফাত করে ফেল! তাড়িয়ে দাও! তাড়িয়ে দাও!

প্রথম অন্ধ ॥ ও মড়া ছেড়ে নড়ছে না।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আমরা মড়া কোলে করে কতক্ষণ বসে থাকব? এই অন্ধকারে এমনি করে মরব নাকি?

তৃতীয় অন্ধ ॥ ঘেঁষাঘেঁষি করে বস; সর না, নড় না; হাত ধর; সবাই মিলে এই পাথরখানার উপর বসা যাক্‌…কই আর সব কই? এইখানে এস!… এস! এস!

অন্ধ স্থবির ॥ তুমি কোন্‌খানে?

তৃতীয় অন্ধ ॥ এই যে, এই দিকে। আমরা সবাই এসেছি তো? আরো কাছে এস! তোমার হাত কই? ইশ…ভারী ঠাণ্ডা যে!

অন্ধ তরুণী ॥ ওঃ! তোমার হাতটা কী ঠাণ্ডা!

তৃতীয় অন্ধ ॥ তুমি কচ্ছ কি?

অন্ধ তরুণী ॥ আমি চোখ কচলাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল, বুঝি আবার দেখতে পাব।…

প্রথম অন্ধ ॥ কাঁদে কে?

অন্ধ স্থবিরা ॥ পাগলী ফোঁপাচ্ছে!

প্রথম অন্ধ ॥ অথচ কোনো খবরই সে রাখে না।

অন্ধ স্থবির ॥ এইখানেই আমাদের মৃত্যু আছে দেখছি।…

অন্ধ স্থবিরা ॥ কেউ-না-কেউ আসতেও পারে।…

অন্ধ স্থবির ॥ আর কে আসবে? কে আসা সম্ভব?

অন্ধ স্থবিরা ॥ তা কি জানি।…

প্রথম অন্ধ ॥ ভৈরবীরা এলেও আসতে পারেন—

অন্ধ স্থবির ॥ সন্ধ্যার পর তাঁরা তো আশ্রমের বার হ'ন না।

অন্ধ তরুণী ॥ তাঁরা মোটেই বেরোন না।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ হয়তো বাতি-ঘরের লোকজন আমাদের দেখতে পাবে।

অন্ধ স্থবির ॥ তারা নীচে নামে না।

তৃতীয় অন্ধ ॥ আমাদের সবাইকে দেখতে তো পেতে পারে।…

অন্ধ স্থবির ॥ সমুদ্রের দিকেই সর্বদা তাদের নজর।

তৃতীয় অন্ধ ॥ কি শীত!

অন্ধ স্থবিরা ॥ ঝরা পাতার মধ্যে মর্মর শব্দ শুনছ···আমার বোধ হয় সব জমে যাচ্ছে।

অন্ধ তরুণী ॥ ইশ! মাটি কি কঠিন!

তৃতীয় অন্ধ ॥ আমার বাঁ দিক থেকে একটা শব্দ পাচ্ছি···কিন্তু কিছুই ঠাওরাতে পাচ্ছিনে।

অন্ধ স্থবির ॥ ও সাগরের ঢেউ, পাহাড়ের উপর আছড়ে পড়ে গোঁ গোঁ করছে।

তৃতীয় অন্ধ ॥ আমি বলি—মেয়েরা।

অন্ধ স্থবির ॥ ঢেউয়ের ঘায়ে বরফ ভাঙার শব্দ পাচ্ছি।

প্রথম অন্ধ ॥ এত কাঁপছে কে হে? পাথরখানা-সুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলেছে যে? সঙ্গে সঙ্গে আমরাও দিব্যি দুলছি!

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ হাতের মুঠো আর খোলা যাচ্ছে না!

অন্ধ স্থবির ॥ একটা শব্দ পাচ্ছি,···কিন্তু কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে।

প্রথম অন্ধ ॥ কে এত কাঁপে হে? পাথরখানা-সুদ্ধ যে ঠকঠক করে নড়ছে।

অন্ধ স্থবির ॥ বোধ হচ্ছে মেয়েদের মধ্যে কেউ।

অন্ধ স্থবিরা ॥ বোধ হয় আমাদের পাগলী সব চেয়ে বেশী কাঁপছে।

তৃতীয় অন্ধ ॥ ওর ছেলের তো কোনো সাড়া পাচ্ছিনে।

অন্ধ স্থবিরা ॥ বোধ হয় স্তন্যপান কচ্ছে।

অন্ধ স্থবির ॥ আমরা যে কেমন ঠাঁয়ে রইছি, তা কেবল ওই ছেলেটিই দেখতে পায়।

প্রথম অন্ধ ॥ আমি উত্তুরে হাওয়ার শব্দ পাচ্ছি।

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ আমার বোধ হয় আর নক্ষত্র নেই।···এখনি বরফ পড়তে শুরু হবে।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ তবেই গিইছি।

তৃতীয় অন্ধ ॥ যদি আমাদের মধ্যে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে,···তাকে জাগিয়ে দেওয়া চাই।

অন্ধ স্থবির ॥ এখনি আমার গা ঘুম-ঘুম করছে।···

(উদ্দাম বাতাসে ঝরা পাতাগুলি ঘুরিতে লাগিল)

অন্ধ তরুণী ॥ পাতার মর্মর শব্দ শুনছ? আমার বোধ হচ্ছে কেউ আমাদের দিকেই আসছে।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ ও বাতাস ; ওই !

তৃতীয় অন্ধ ॥ আর কেউ আসছে না !

অন্ধ স্থবির ॥ ভারী শীতের দিন আসছে।···

অন্ধ তরুণী ॥ দূরে কার পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

প্রথম অন্ধ ॥ আমি শুকনো পাতার আওয়াজ পাচ্ছি।

অন্ধ তরুণী ॥ এখান থেকে অনেক দূরে কে যেন চলে বেড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় অন্ধ ॥ আমি কেবল বাতাসের সাড়া পাচ্ছি।

অন্ধ তরুণী ॥ আমি বলছি···নিশ্চয়ই কেউ আসছে।···

অন্ধ স্থবিরা ॥ খুব আস্তে আস্তে আসছে,···হুঁ আমিও শুনতে পাচ্ছি।

অন্ধ স্থবির ॥ আমার মনে নিচ্ছে,—মেয়েদের কথাই ঠিক !

(ফুলকি-বরফ ও পাপড়ি-বরফ ঝরিতে লাগিল)

প্রথম অন্ধ ॥ উঃ! আমার হাতের উপর···কনকনে ঠাণ্ডা···এ আবার কি পড়তে লাগল ?

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ বরফ পড়ছে।

প্রথম অন্ধ ॥ একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা যাক।

অন্ধ তরুণী ॥ ওই শোনো···পায়ের শব্দ !

অন্ধ স্থবিরা ॥ দোহাই ! একবার চুপ কর না বাপু !

অন্ধ তরুণী ॥ কাছে আসছে ! খুব কাছে আসছে, ওই !

(অন্ধকারে পাগলীর ছেলেটি কাঁদিতে আরম্ভ করিল)

অন্ধ স্থবির ॥ ছেলে কাঁদছে !

অন্ধ তরুণী ॥ ও দেখতে পায় ! দেখতে পায় ! কাঁদছে, নিশ্চয় কিছু দেখতে পেয়ে কাঁদছে।

(ছেলেটিকে পাগলীর কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া, যেদিকে পদশব্দের মতো শব্দ শোনা যাইতেছিল সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা সোদ্বেগে তাহাকে ঘিরিয়া চলিল)

আমি যাচ্ছি !···

অন্ধ স্থবির ॥ সাবধান !

অন্ধ তরুণী ॥ আঃ! ভারী কাঁদতে লাগল! কি? কি? কাঁদিস নে···ভয় কি? কোনো ভয় নেই, এই যে আমরা; ···কি দেখতে পাচ্ছিস? ভয় নেই! কেঁদ না! কি দেখতে পাচ্ছ?···বল, কি দেখতে পাচ্ছ?

অন্ধ স্থবিরা ॥ পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে, ওই শোনো! ওই!

অন্ধ স্থবির ॥ আমি ঝরা পাতার উপর যেন আঁচলের খসখস শব্দ পাচ্ছি।

ষষ্ঠ অন্ধ ॥ স্ত্রীলোক নাকি?

অন্ধ স্থবির ॥ পায়ের শব্দ তো?

প্রথম অন্ধ ॥ হয়তো সাগরের ঢেউ···শুকনো পাতার উপর পড়ে খড়খড় শব্দ কচ্ছে।

অন্ধ তরুণী ॥ না, না! পায়ের শব্দই! পায়ের শব্দই!

অন্ধ স্থবিরা ॥ এখনি জানা যাবে; কান পেতে থাক! কান পেতে থাক!

অন্ধ তরুণী ॥ শুনছি, শুনছি,···খুব কাছে বোধ হচ্ছে, পাশে বললেই হয়! ওই! ওই!···কি দেখছিস্···কি দেখতে পাচ্ছিস্?

অন্ধ স্থবিরা ॥ কোন্ দিকে তাকাচ্ছে?

অন্ধ তরুণী ॥ যেদিক থেকে পায়ের শব্দ শুনছি; সেই দিকটাতেই কেবল ঘাড় ফেরাচ্ছে! কেবল ঘাড় ফেরাচ্ছে! দেখ! দেখ! আমি ওর মুখখানা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলাম, ও আবার দেখবার জন্যে তখনি মাথা ঘুরিয়ে নিলে! ও দেখতে পায়! দেখতে পায়! নিশ্চয় একটা নতুন কি দেখেছে!

অন্ধ স্থবিরা ॥ উঁচু করে ধর, আমাদের চেয়ে উঁচু করে ধর, ভাল করে দেখুক।

অন্ধ তরুণী ॥ সরে যাও! সরে যাও!

(ছেলেটিকে অন্ধদের মাথার উপর যথাসাধ্য উচ্চে ধরিল)

পায়ের শব্দ···আমাদেরই মাঝখানটাতে এসে···মিলিয়ে গেল!···

অন্ধ স্থবির ॥ এই যে! এই যে! এই আমাদের মাঝখানে।

অন্ধ তরুণী ॥ কে তুমি? কে?

(কেহ সাড়া দিল না)

অন্ধ স্থবিরা ॥ দয়া কর গো! অন্ধজনে দয়া কর!

(নিস্তব্ধতার মধ্যে ছেলেটি ভয়ানক কাঁদিতে লাগিল)

যবনিকা

নিদিধ্যাসন

পাত্র ও পাত্রী

কর্তা, গৃহিণী, ভৃত্য

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

কর্তা ॥ ওহানা সান্ চিঠি লিখেছে, সে আমার আসার আশায় পথ চেয়ে থাকবে; আজ সন্ধ্যাবেলায় যেমন করে হোক দেখা করতে হবে। সেই ন'গাঁওয়ে চায়ের দোকানে আলাপ, বেচারী দেখছি আমায় ভুলতে পারেনি। সন্ধান নিয়ে নিয়ে এতদূর পর্যন্ত এসেছে; এসে এখন শহরতলিতে বাসা নিয়ে আছে। কিন্তু যাই-ই বা কি করে? আমার খেঁকশেয়ালীরূপিণী অর্ধাঙ্গিনীটির ভারী কড়া পাহারা; ঘাঁটি এড়িয়ে যাওয়া যায় কেমন করে? কী বলা যায় ওকে? কিছু একটা মতলব আঁটতে হ'ল দেখছি! হুঁ, আচ্ছা; একবার ডাকি এই দিকে। ওগো! ওগো! শুন্‌ছ? ওগো!

গৃহিণী ॥ (নেপথ্যে) কি ভাগ্যি! হঠাৎ আমায় যে বড় ডাকা হচ্ছে?

কর্তা ॥ হুঁ, একবার এই দিকে এস।

গৃহিণী ॥ (প্রবেশ করিয়া) হুজুরের যে হুকুম!

কর্তা ॥ দেখ, তোমায় ডাকছিলুম; কেন তা জান? এই—ক'দিন থেকে আমি ক্রমাগত দুঃস্বপ্ন দেখছি,—তাই—

গৃহিণী ॥ দুঃস্বপ্ন? হজমের গোলমাল হলেই অমন হয়; তা ও-সব তুমি রাত্তির-দিন অত ভেব না।

কর্তা ॥ যা বললে। বেশীর ভাগ স্বপ্ন হজমের গোল থেকেই জন্মায়; কিন্তু আমি যে রকম স্বপ্ন দেখি সে হজমীগুলিতে সারবার নয়; আমার ক্রমেই যেন মন-টন সব দমে যাচ্ছে। দিন কতক কোনো তীর্থে গিয়ে থাকব মনে করছি, দেবতাদের পুজো-টুজো দিয়ে দেখা যাক!

গৃহিণী ॥ তা কোথায় যাবে?

কর্তা ॥ প্রথমে ভেবেছি, শহরে যত দেবতার স্থান, সাধুর আস্তানা আছে—

সব জায়গায় পুজো দিয়ে, তারপর দেশে যত মঠ-মন্দির আছে সমস্ত পায়ে হেঁটে প্রদক্ষিণ করে আসব।

গৃহিণী॥ না, না, না,—সে হবে না; বাড়ি ছেড়ে তোমার কোথাও থাকা-টাকা হবে না। পুজো-আচ্চা, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন—যা কর্তে হয় তা এই বাড়িতে বসেই করা ভাল।

কর্তা॥ বাড়িতে? হুঁঃ; বাড়িতে আবার হাঙ্গামা—

গৃহিণী॥ হাঙ্গামা কিসের? আমি সব ঠিক করে গুছিয়ে-গাছিয়ে দেব এখন; তুমি হাতে মাথায় ধুনী জ্বালাও!

কর্তা॥ কী বল আর কী কও! ও সব কি পুরুষমানুষের কর্ম? বিশেষ তো আমি!

গৃহিণী॥ বাড়ি ছেড়ে পুজো-ফুজোর কথা আমি কিছুতেই শুনব না। ও সব হবে-টবে না।

কর্তা॥ বেশ গো বেশ। আমারই কি ইচ্ছে—যে বাড়ি-ঘর-দোর ছেড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই, তুমিও হয়েছ তেম্নি অবুঝ, কি যে বল তার ঠিক নেই, একটা মতলব তো দিতে পারলে না। চুলোয় যাক্।...বাড়িতে? ঘরে ব'সে (চিন্তিতভাবে পরিক্রমণ) এই! হয়েছে—পাওয়া গেছে! মনে পড়েছে,—শ্রবণ—মনন—নিদিধ্যাসন!

গৃহিণী॥ নিদিধ্যাসন? সে আবার কি?

কর্তা॥ জান না? তা না জানবারই কথা, তুমি জানবে কি করে? একি এ কালের কথা? সেই—যে যুগে বোধিধর্ম ভারতবর্ষ থেকে ধর্মপ্রচার করতে জাপানে আসেন, এ সেই যুগের কথা। বোধিধর্ম নিদিধ্যাসন করতেন। এ কি ক'রে করে তা জান? ধ্যানকম্বলে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে মন্ত্র জপ করতে হয়। করতে করতে করতে যখন ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্ত চিন্তা মন থেকে মুছে যায়, তখনি মুক্তি; সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে যায় আর কি! ভারী কঠিন ক্রিয়া।

গৃহিণী॥ তা—ও করতে কতক্ষণ লাগে?

কর্তা॥ তা বলতে কি,—তা কারো কারো দু'তিন হপ্তা লাগে, কারো আবার বেশীও লাগতে পারে।

গৃহিণী॥ উঁহুঁ, সে হবে না, অত দিন কি—

কর্তা ॥ আচ্ছা, না হয়, তুমিই ব্যবস্থা দাও—

গৃহিণী ॥ ঘণ্টাখানেক—আমি বলি ঘণ্টাখানেক হলেই ঢের হ'ল, আচ্ছা সূর্যাস্ত পর্যন্ত না হয় চেষ্টা কোরো—কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকতে।

কর্তা ॥ আরে ছিঃ! নেহাত ছেলেমানুষের মত কথা বলছ তুমি! মন স্থির করতেই তো সূর্যাস্ত! বরং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত প্রকৃত নিদিধ্যাসনের সময়।

গৃহিণী ॥ সমস্ত দিন—সমস্ত রাত?

কর্তা ॥ হুঁ—উঁ।

গৃহিণী ॥ উঁহু, ও আমার মনের মতোন ব্যবস্থা হ'ল না; তা—তা—আচ্ছা,—তাই সই, যখন তোমার নেহাত ইচ্ছে হয়েছে, তাই হোক, একদিন একরাত।

কর্তা ॥ সত্যি বল্‌ছ?

গৃহিণী ॥ সত্যি।

কর্তা ॥ ওঃ! সে হলে তো ভালই, সে হলে তো ভালই হয়। কিন্তু দেখ, আমি যেখানে নিদিধ্যাসনে বস্‌ব, সে ঘরে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ। শাস্ত্রে লিখছে তাহলে সব নষ্ট হবে। উঁকিঝুঁকিও দিয়ো না, যদি দাও, পাপের ঝুঁকি তোমার উপর। আগে থাকতে সাবধান করে দিচ্ছি, বুঝলে?

গৃহিণী ॥ বেশ, আমি আসব না গো, আসব না; হ'ল তো?

কর্তা ॥ রাগ কোরো না, ভালোয় ভালোয় আমার মনস্কাম পূর্ণ হয়ে গেলে, তখন আর আসতে কোনো বাধা নেই।

গৃহিণী ॥ তাই হবে। (গমনোদ্যত)

কর্তা ॥ দেখ!—

গৃহিণী ॥ আবার কি?

কর্তা ॥ যা বললুম, মনে থাকে যেন, এ ঘরে যেন এসে পড় না। শাস্ত্রে বলে—'হাউচাউ যার রান্না ঘরে, ধ্যান করবে সে কেমন করে?' আর যাই করো—এদিকে কিন্তু এস-টেস না।

গৃহিণী ॥ ভয় নেই গো ভয় নেই, আমি এ ঘরের ছাওয়াও মাড়াব না।

কর্তা ॥ তবে শেষ হওয়া পর্যন্ত—

গৃহিণী ॥ শেষ হয়ে গেলে—কিন্তু ডেকো আমায়।

কর্তা ॥ হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়।

[স্ত্রীর প্রস্থান

হা—হা—হা, মেয়েগুলো নেহাত খাজা, সত্যি ভাবলে নিদিধ্যাসন—হা—হা—হা! কম্বল মুড়ি দিয়ে নিদিধ্যাসন? হা—হা—হা! ওরে ছোকরা—ওই!

ভৃত্য ॥ (নেপথ্যে) আজ্ঞে!

কর্তা ॥ আছিস্ ওখানে!

ভৃত্য ॥ আছি আজ্ঞে।

(প্রবেশ)

কর্তা ॥ এই যে হাজির 'আজ্ঞে'।

ভৃত্য ॥ হুজুরের মেজাজটা আজ ফুরতি ফুরতি মালুম হচ্ছে—

কর্তা ॥ আজ্ঞে; ফুরতির কারণ আছে, আজ্ঞে; আজ ওহানা সানের সঙ্গে দেখা করতে যাব, তা তো তুই জানিস্; কিন্তু তোর মাঠাকরুন বোধ হয় ব্যাপারটার আঁচ পেয়েছে। তাকে ভোলাবার এক ফিকিরও করিছি। তাকে বলিছি যে আজ সমস্ত দিনরাত কম্বল মুড়ি দিয়ে ধ্যান করব।

ভৃত্য ॥ জবর ফিকির—

কর্তা ॥ আজ্ঞে; এখন তোকে একটি কাজ করতে হবে। পারবি কিনা, বল্?

ভৃত্য ॥ বলুন এগিয়ে—

কর্তা ॥ বলি, শোন্; কথাটা হচ্ছে এই যে, তোকে আমার বদলে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকতে হবে,—আমি ফিরে আসা পর্যন্ত; বুঝিছিস তো? যদিও তোর মাঠাকরুনকে এ ঘরে ঢুকতে বারণ করিছি, তবু, কি জানি? যদিই ঢোকে,—সাবধানের মার নেই—কি বলিস্?

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে, তার আর কি? কম্বল মুড়ি দেওয়াটা আর বেশী কথা কি? তবে, যদি ঠাকরুনের কাছে ধরা পড়ি, তো পরানটা যাবে, তাই বলছিলুম কি—

কর্তা ॥ বলছিলুম টলছিলুম নয়। এ তোকে করতেই হবে; প্রাণ যাবে কি?

আমি থাকতে প্রাণ যাবে কি রকম ? আমি যখন রইছি তখন তোর ভয় কি ?

ভৃত্য ॥ তা আপুনি যখন বল্‌ছ তখন ভয় নেই।—তা—তা—এবারটা আমায় মাপ কর।

কর্তা ॥ না, না, সে হবে না ; এ তোকে করতেই হবে ; আমি যখন বলছি তখন তোর মাথার একগাছা চুল ছোঁয় কার সাধ্য।

ভৃত্য ॥ মাফ করুন, কর্তা মাফ করুন।

কর্তা ॥ আরে গেল যা ! গিন্নীর ভয়ই ভয়, কর্তাটা কেউ নয়—না ? এত বড় স্পর্ধা তোর—তুই আমার হুকুম অমান্য করিস !

ভৃত্য ॥ (জিভ কাটিয়া) বাপ রে !

কর্তা ॥ আমার উপর টেক্কা !

ভৃত্য ॥ না হুজুর না, আপুনি যা বল, সব শুনব।

কর্তা ॥ সত্যি বলছিস তো—ঠিক ?—অ্যাঁ ?

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে।

কর্তা ॥ হীঃ—হীঃ, আমি তোকে ভয় দেখাচ্ছিলুম ; তবে থাকিস, বুঝ্‌লি !

ভৃত্য ॥ হুজুরের যে হুকুম হয়।

কর্তা ॥ বোস এইখানে, আমি নিজেই তোর নিদিধ্যাসনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। নড়িস নে।

ভৃত্য ॥ যেআজ্ঞে।

কর্তা ॥ এমনি করে বোস—এই।

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে পায়ে হাত দিয়োনি।

কর্তা ॥ দেখ্, এই কম্বলটা এইবার বেশ করে মুড়ি দিয়ে নে। একটু কষ্ট হবে—তা আর কি করবি বল্।

ভৃত্য ॥ যে আজ্ঞে।

কর্তা ॥ এই—এই। কিন্তু খবরদার ! তোর মাঠাকরুন যদি কম্বল খুলতে বলে—খবরদার খুলিস নে—বুঝিছিস তো ?

ভৃত্য ॥ সে আমাকে শিখুতে হবে নেই। আপুনি ভয় করবেন নাই।

কর্তা ॥ আমি শীগ্‌গিরই ফিরব, বেশী দেরি হবে না।

ভৃত্য ॥ দয়া করে একটুকু শীগ্‌গিরি এস যেন হুজুর।

কর্তা ॥ যাক্ বাঁচা গেল, এইবার বেরিয়ে পড়া যাক্, ওহানা হয়তো আমার বিলম্ব দেখে এতক্ষণ অস্থির হয়ে উঠেছে। [প্রস্থান

(জানালায় গৃহিণীর প্রবেশ)

গৃহিণী ॥ উঁহু, আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, আমায় অতবার করে এ ঘরে আসতে মানা করলে কেন? ধ্যান ভঙ্গ হবে? তা একবার বারণ করলেই তো হ'ত ;···উকিঝুঁকি দিয়ে দেখতেও মানা করলে,···আমার ভারী সন্দেহ হচ্ছে (দরজার কাছে আসিয়া উঁকি দিয়া) এ কি? নাঃ, ভারী কষ্টের ব্রত, একেবারে আগাগোড়া মুড়ি! আমি হলে হাঁপিয়ে মরতুম। (অগ্রসর হইয়া) ওগো দেখ, দেখ, তুমি আমায় আসতে বারণ করেছিলে,—কিন্তু আমি থাকতে পারলুম না; কম্বলের ভিতর কষ্ট হচ্ছে? অ্যাঁ? কষ্ট হচ্ছে? একবার একটু চা খেয়ে নিলে হ'ত না?···হ্যাঁ গা! একটু চা? নিয়ে আসব? (কম্বলের ভিতর হইতে অসম্মতিসূচক শিরশ্চালন) বুঝিছি, বুঝিছি, তুমি রাগ করেছ—রাগ করবারই কথা; তুমি অত করে বারণ করলে তবু এসিছি, আমার ঘাট হয়েছে, তুমি আমায় এবারের মতো মাফ কর; আমার কথা রাখ, ওই কম্বলটা একটু ফাঁক করে দাও, মুখে-মাথায় হাওয়া লাগুক—তোমার কষ্ট হচ্ছে (পুনর্বার কম্বলের ভিতর হইতে অসম্মতিসূচক শিরশ্চালন) না, না! 'না' বললে হবে না; তোমার মুড়ি দেওয়া দেখে আমার হাঁপ ধরছে ও তোমায় খুলতেই হবে; শুনছ? ওগো! হাঁপ ধরবে, খুলে ফেল; খোলো খোলো (কম্বল ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে ভৃত্য বাহির হইয়া পড়িল) এ কি! তুই! তুই হতভাগা! তোর বাবু কোথায় গেল? বল! বল! বলবি নে? বলবি নে?

ভৃত্য ॥ তা তো আমি বলতে পারলাম নেই।

গৃহিণী ॥ রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে,—সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে; নিশ্চয় সেই পোড়ারমুখীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া হয়েছে। (ভৃত্যের প্রতি) তুই জানিস নে? আমার সঙ্গে চালাকি? বলবি নে? বলবি নে? বল শীগ্‌গির, নইলে তোকে আস্ত রাখব না, এই বলে দিলুম।

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে, আমি—আমার কি অপরাধ? তা আপুনি যখন সুধুচ্চেন—তখন আর ঢাকঢাক গুড়গুড় করে কি করব? বাবু মশায় ওহানা ঠাকরুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই গেছেন।

গৃহিণী ॥ কি বল্‌লি? ওহানা ঠাকরুন? ওহানা কুকুর—বল্—ওহানা কুকুর। দেখা করতে গেছে?—গেছে? অ্যাঁ?

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে।

গৃহিণী ॥ রাগে আমার চোখ দিয়ে—জল আসছে, আমার কান্না পাচ্ছে (ক্রন্দন)।

ভৃত্য ॥ তা তো হতেই পারে; কান্না তো পেতেই পারে।

গৃহিণী ॥ (চোখ মুছিয়া) থাম তুই, তোকেও ঘা-কতক দিতুম, যদি সব কথা খুলে না বলতিস। এবারের মতোন মাফ করলুম। এখন ওঠ!

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে, আপুনি হলেন মুনিব আপনার কাছে তঞ্চক?

গৃহিণী ॥ আচ্ছা, আচ্ছা, এখন বল্—ঠিক করে বল্, এ কম্বলের ভেতর তুই কেন বসেছিলি?

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে বাবুর হুকুম, আমায় বাবু বল্‌লে, "তুই এমনি করে আসন-পিঁড়ি হয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাক", আমি গোড়ায় রাজী হই নেই, শেষে বাবু ভয় দেখাতে নিম্‌রাজী গোছ হয়ে—থাকতে হ'ল।

গৃহিণী ॥ তা তোর আর দোষ কি? দেখ, এখন তোকে আমার একটি কাজ করতে হবে; কেমন পারবি তো?

ভৃত্য ॥ তা আর পারব নেই?

গৃহিণী ॥ তবে নে, এই কম্বলটা নিয়ে আমার আপাদমস্তক ঢেকে দে; তোর বাবু যেমন করে তোকে ঢেকে দিয়েছিল ঠিক তেমনি; বুঝলি তো?

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে আপুনি মা-বাপ, তোমার কথা কি আমি ঠেলতে পারি? তবে, বাবু মশায় যদি জানতে পারে, তবে আমাকে টেরটা পাইয়ে দেবে।

গৃহিণী ॥ না, না; কিচ্ছু বলবে না; আচ্ছা, বলে তো আমি তার দায়ী; এখন নে।

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে এবারটা আমায় ছাড়ান্ দিলে গরীব বেঁচে যাই।

গৃহিণী ॥ বলছি তোর কোনো ভয় নেই, তবু ভ্যান ভ্যান করবি? বাবু যদি তোর গায়ে হাত দেয় তো আমি তাকে দেখে নেব।

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে, তা হলেই হ'ল, আপুনি যখন মধ্যস্থ হচ্ছ তখন আর ভয়টা কিসের?

গৃহিণী ॥ তা আর বলতে, এখন নে দিকিন।

ভৃত্য ॥ এগিয়ে—বস আপুনি।

গৃহিণী ॥ (তথাকরণ) বসিছি।

ভৃত্য ॥ আপনার কষ্ট হবে কিন্তন্—

গৃহিণী ॥ তা হোক। কিন্তু দেখ এমন ক'রে ঢাকা দিয়ে দিবি যেন বুঝতে না পারে।

ভৃত্য ॥ ইশ! সাধ্যি! আমি মড়া-ঢাকার মতোন করে ঢেকে দেব; দেখ না, আপুনি।

গৃহিণী ॥ হয়েছে, এখন যা তুই···জিরু গে।

ভৃত্য ॥ যে আজ্ঞে। (প্রস্থানোদ্যত)

গৃহিণী ॥ ওরে দাঁড়া, দাঁড়া, সব ফাঁস করে দিসনি যেন, বুঝিছিস তো?

ভৃত্য ॥ তা আর বল্‌তে।

গৃহিণী ॥ আমি শুনছিলুম যে তোর নাকি একখানা রেশমী চাদরের শখ হয়েছে? সত্যি? তা তার আর ভাবনা কি? আমি তোকে দেব, বুঝিছিস? আমার নিজের তৈরী একটা পয়সা রাখবার রেশমী গেঁজেও সেই সঙ্গে দেব এখন।

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে আপুনি মা-বাপ—

গৃহিণী ॥ এখন যা পালা।

ভৃত্য ॥ যে আজ্ঞে।

কর্তা ॥ (নেপথ্যে গান)

ভোরের পাখী ডাকবে ভোরে,—
তোমার বা কি? আমার বা কি?
চোখে দেখেই ফিরব, ওরে।
ভোরের আমি খোঁজ কি রাখি?
ঝাউয়ের বনে উঠছে হাওয়া,
পড়ছে মনে তার সে আঁখি!
জড়িয়ে গেছে মলিন ছায়া
আলোর লেখা নাইক বাকী।

(প্রবেশ করিয়া)

ছুনিয়ার গতিক্ই এই ; গোপন প্রেমের ধারাই এম্‌নি ; কিন্তু তা বলে কি ভুলতে পারা যায় ; তাকে যতই দেখছি মনটা ততই যেন তার উপর বসে যাচ্ছে।

আহা, ভুলতে নারি ভুলতে নারি
ফাগুন ফুলের ফুল্‌কি,
কপালে তার নতুন বাহার
ফুলের মতোন উল্‌কি !

আরে ছ্যা ছ্যা, এ করছি কি ? পাগলের মতোন নিজের মনেই বকছি যে ! বাঃ ! আর ওদিকে চাকর ছোঁড়াটা কম্বলের ভিতর হাঁপিয়ে মারা যাচ্ছে। ওরে ! ওরে ! ও ছোকরা ! আমি এসেছি ! আমি এসেছি ! তোর ভারী কষ্ট হয়েছে…তা কি করব বল্…আঃ বসা যাক (উপবেশন)। ওরে ! কম্বলটা এইবার খুলে ফেল না, আর নিদিধ্যাসনের দরকার কি ?…লজ্জা হচ্ছে বুঝি, আমার সামনে ধ্যান ভাঙ্‌তে লজ্জা হচ্ছে…হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !…তা থাক একটু জিরিয়ে নিই ততক্ষণ। ততক্ষণ ওহানা সানের সব কথাবার্তা তোকে বলি শোন ; শুনতে ইচ্ছে হয় তো বল্, অঁ্যা ? (কম্বলের ভিতর সম্মতিসূচক শিরশ্চালন) বেশ ! বেশ ! তবে বলি শোন। এখান থেকে বেরিয়ে তো এক রকম উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করা গেল ; তা সত্বেও পৌছুতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। মনে মনে ভাবছি ওহানা সান্ আমার বিলম্ব দেখে না জানি কতই উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠেছে। চীনাদের কবি লি-শং-য়িনের মতোন সে হয়তো বলছে—

"কথা দিয়েছিল, তবুও এল না
তৃতীয় প্রহর কাটিল জাগি ;
দেবদারু বনে পল্লব নড়ে
আমি ভাবি—মোর বন্ধু নাকি ?"

এই কথা ভাবতে ভাবতে চলিছি এমন সময় শুনতে পেলুম কে গুনগুন স্বরে গান গাইছে—

বাতির আলো মলিন হ'ল
বাইরে কাঁদে হাওয়ার বীণা,

পথ চেয়ে মন—ক্লান্ত—নয়ন,
বল্ গো সে আজ আসবে কিনা !

এ ওহানার গলা না হয়ে যায় না ; আমি আস্তে আস্তে শিকলটি নাড়লুম। অমনি ভিতর থেকে ওহানা বলে উঠল, 'কে গো ? কে ?' তখন বৃষ্টি পড়ছে, আমি বললুম, 'এই বৃষ্টিতে কে এসেছে বলে বোধ হয় ?' অম্‌নি পায়ের শব্দ, আর সঙ্গে সঙ্গে রিনিঝিন্ করে খিড়কির শিকলী খুলে ওহানা সান্ একেবারে আমার সামনে হাজির। সে আমাকে হাত ধরে খাতির করে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল ; আর বারে বারে বলতে লাগল, 'আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, শহুরে লোকের আদব-কায়দা জানিনে, মাপ করবেন।' তারপর সে তোর কথা জিগ্‌গেস্ করলে, বললে, 'তোমার সেই চাকর ছোকরাটিকে নিয়ে এলে না কেন ?' আমি তখন নিদিধ্যাসনের কথা খুলে বললুম,—তোকে যে বকল্‌মা দিয়ে এসেছি তাও বললুম, শুনে খুব হাসতে লাগল। তারপর আবার ওহানা তোর জন্যে দুঃখ করতে লাগল, বললে, 'আহা ! বেচারা আমাদের জন্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে এতক্ষণ না জানি কত কষ্টই ভোগ করছে ; ছোকরা তোমার ভারী বাধ্য ; তার যাতে ভাল হয় সেদিকে কিন্তু তুমি দৃষ্টি রেখ। ওর এই সব কথাবার্তা শুনে আমি তো একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলুম, ভাবতে লাগলুম, ওহানা সানের হৃদয় কী মধুর ! সামান্য একজন চাকরের দুঃখে সে দুঃখিত ; আর আমার খেঁকশেয়ালীরূপিণী গৃহিণী ?—কেবল খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করতেই আছেন। (কম্বলের ভিতর বিষম চঞ্চলতা) তারপর বুঝলি, দু'জনে মিলে দস্তুরমতো জলযোগ করে একটু বিশ্রাম করা গেল, কত গল্প-গুজব হ'ল, কত হাসি কত আমোদ। হঠাৎ মঠে-মন্দিরে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা বেজে উঠল, আমিও বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। ওহানা কি আমায় ছাড়তে চায় ? শেষে অনেক মিনতি করে বলায়, সে কবিতায় বলে উঠল—

ভেবেছিনু হায় কত কি তোমায়
বলিব আমি,
স্বপনে জানিনি এত অল্পেতে
ফুরাবে যামী ;

বিদায়ের ক্ষণ সহসা এসেছে,—
ভেসেছে আঁখি,
যত বলিবার ছিল—আধা তার
রয়েছে বাকী!

আমারও চলে আসতে মন সরছিল না; কিন্তু মঠে-মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠেছে, সুতরাং আর বিলম্ব করলে সময়ে ফিরতে পারব না ভেবে, কাজে কাজেই আমায় উঠতে হ'ল; তখন ওহানা বললে, 'মঠ-মন্দিরের নিঃসংসারী নির্দয় মোহান্তগুলো ঘণ্টা বাজিয়ে আমার হৃদয়ের সুখ-শান্তির আজ হন্তারক হ'ল।' তখন তার চোখ ছলছল করছে। কিন্তু কি করব? তবুও চলে আসতে হ'ল।

চলে এলাম শিথিল করে বাহুর বাঁধনখানি,
বাহুলতার কোমল বাঁধন তার;
চলে এলাম, চলে এলাম কপালে কর হানি'
সজল দু'চোখ মুছে বারংবার!
সজল চোখে আমার পানে রইল চেয়ে রানী,—
দেখতে আমায় পেলে যতক্ষণ;
পথের বাঁকে হারিয়ে শেষে গেল ছবিখানি,—
বাঁকা চাঁদের আলোয় অদর্শন।

(নীরবে অশ্রু বিসর্জন) এমনি করে নিষ্ঠুরের মতোন চলে এলাম, আসতে হ'ল—(পুনর্বার অশ্রু মোচন) আ-আ! ওরে তুই এখনও কম্বল মুড়ি দিয়ে রইছিস—দেখ আমি তা ভুলে গিছলুম—কথায় কথায় ভুলে গিছলুম, খুলে ফেল—খুলে ফেল,—আহা তোর কষ্ট হচ্ছে, কম্বলখানা খুলে ফেল,—ও কি? তুই বসে বসে ঘুমুচ্ছিস্ নাকি? আচ্ছা, আমিই খুলে দিচ্ছি; আরে! ছাড় কম্বল! আরে—এ আবার তোর কি খেয়াল? খোল কম্বল!

(টানাটানি করিতে কম্বল খুলিয়া পড়িল এবং চণ্ডীমূর্তি গৃহিণী লাফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন)

গৃহিণী॥ আমার খুন চেপেছে! আমার খুন চেপেছে! এই তোমার নিদিধ্যাসন! এই তোমার ধর্মকর্ম! আমার চোখে ধুলো দিয়ে ওহানার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া!

কর্তা। আরে না, আরে না, আমি ধ্যান করছিলুম—সত্যি বলছি—সত্যি।

গৃহিণী। কী! আবার মিছে কথা! আমাকে বোকা বানাতে চাও। আমি কিছু জানিনে? এই তোমার নিদিধ্যাসন? আমায় আবার খেঁক-শেয়ালী বলা? আমি খ্যাঁক-খ্যাঁক ক'রে কামড়াই? আমায় ফাঁকি দিয়ে—ওকি? যাও কোথায়—যাও কোথায়? (পশ্চাদ্ধাবন)

কর্তা। আরে না—আরে না। তোমায় আমি কিছু বলিনি, আমি মাফ চাইছি, মাফ চাইছি।

গৃহিণী। ফের মিছে কথা? বলনি খেঁকশেয়ালী? ফের মিছে কথা?—চালাকি? যাওয়া হয়েছিল কোথায়—যাওয়া হয়েছিল কোথায়?

কর্তা। তোমার কাছে আমি কি মিছে কথা কইছি? তোমার কাছে কি লুকুচ্ছি? শহরের যত মঠে-মন্দিরে, পুজো—পুজো—পুজো—

গৃহিণী।—হঁ, পুজো—পুজো—এই যে পুজো দেখাচ্ছি।

কর্তা। মাফ কর,—আমি মাফ চাইছি—আমি মাফ চাইছি—

গৃহিণী। (ঝাঁটা লইয়া) এই যে মাপকাঠি—মাফ চাওয়াচ্ছি—

[কর্তার পলায়ন

পালিয়ে গেল—হাড়জ্বালানে পালিয়ে গেল! ওগো ধর! ধর! ধর! পালাবে কি? পালাবে কোথায়? আমার রাগটা মাঠে মারা যাবে? ধর! ধর!

যবনিকা
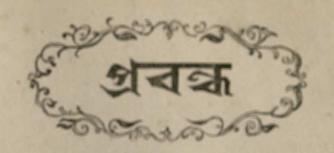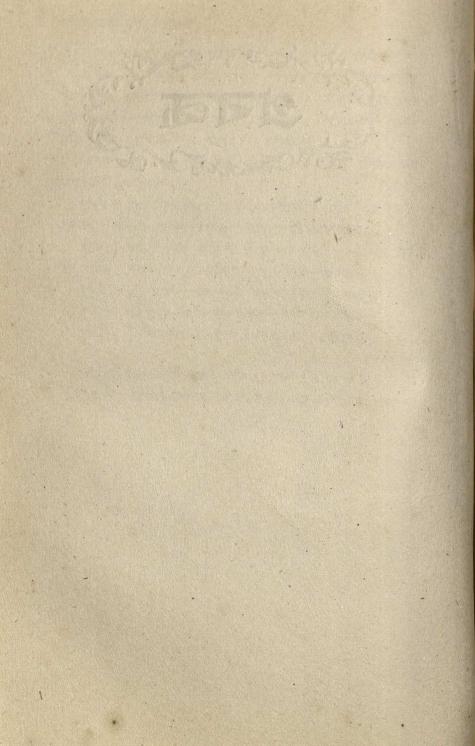
চীনের ধূপ

উৎসর্গ

কবি

বন্ধু

ভাবসঙ্গী

সতীশচন্দ্র রায়ের

স্মৃতির উদ্দেশে

'চীনের ধূপ'

অর্পিত

হইল।

রবীন্দ্রনাথসহ সত্যেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সাহিত্যিকবর্গ

সম্মুখে দক্ষিণ হইতে—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। মধ্যে রবীন্দ্রনাথ।
পশ্চাতে দক্ষিণ হইতে—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

*
* *
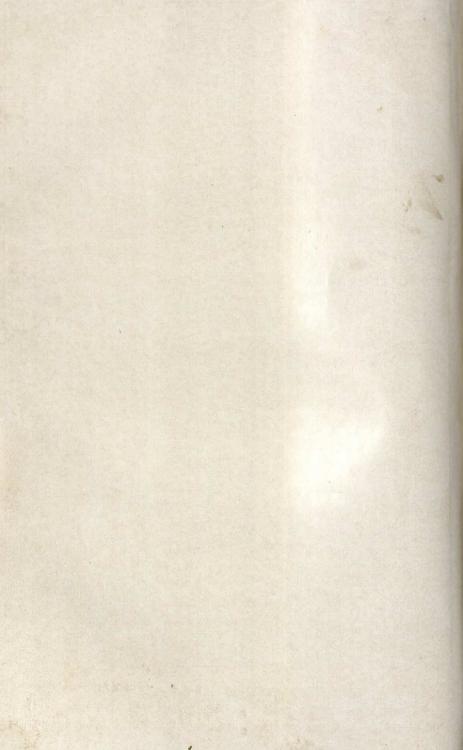
বিশ্বে মহামানবের মানস-সুন্দরী
উদ্বোধিত, প্রতিষ্ঠিত সিংহাসন 'পরে,
দিগ্‌গজেরা তীর্থজলে অভিষেক করি'
দিকে দিকে মন্দ্রধ্বনি করে হর্ষভরে।

সর্বভূমে-বরণীয় সার্বভৌমগণ
সমস্বরে শান্তিপাঠ করে অবিশ্রাম,
উদ্ভাসিছে জ্বালাহীন উজ্জ্বল শোভন
লাবণ্যের স্মিত-লেখা স্নিগ্ধ অভিরাম।

পরিস্নাতা চিত্তলক্ষ্মী রত প্রসাধনে,
করিছে 'চীনের ধূপে' কেশের সংস্কার ;
আরব আতর তার মাথায় চরণে,
ইরান পরায় গলে গোলাপের হার।

সুরূপা য়ুরোপা তারে অঞ্জন যোগায়,—
ভারত সে অনবদ্য লীলাপদ্মখানি ;
বিশ্বরাজ-সমাগম-আসন্ন-আশায়
বিশ্বে মহামানবের সাজে চিত্তরানী।

* *
*

চীনের উপনিষৎ

[বৌদ্ধধর্ম ভিন্ন চীনদেশে আরো দুইটি বিশিষ্ট ধর্মমত প্রচলিত আছে; একটি আচার্য কং বা কংফুশিয়োর সহজজ্ঞান-প্রণোদিত 'সমূহবাদ' (Communism), আর একটি লৌৎস্ ঋষির প্রবর্তিত 'তও'-বাদ (Taoism) বা ব্রহ্মবাদ। চীন বলিতে আমরা জুতাওয়ালা চীনাম্যানকে বুঝি। সুতরাং সেদেশে যে ঋষির আবির্ভাব সম্ভব ইহা সহজে আমাদের ধারণা হয় না। কিন্তু কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুল; ধারণাও পরিবর্তনশীল!

লৌৎস্কে আমরা ঋষি নামেই অভিহিত করিব, কারণ তাঁহার চরিত্রে ঋষিত্বের উপাদান যথেষ্ট ছিল, এবং তাঁহার রচনায়, অনুবাদ সত্ত্বেও ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ স্পষ্ট পাওয়া যায়। ৬০৪ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে লৌৎস্ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শৈশব হইতেই ভারী গম্ভীর ছিলেন, সেইজন্য লোকে ইহাকে 'লৌৎস্' অর্থাৎ 'শুক্ল-কেশ শিশু' বলিত। কথিত আছে, ইনি লেখাপড়া শেষ করিয়া ভারতবর্ষ পার্থিয়া প্রভৃতি দেশ পর্যটনে প্রবৃত্ত হন এবং পিথাগোরসের মতো ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যায় দীক্ষিত হন। লৌৎস্ 'তও'য়ের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উপনিষদের ব্রহ্ম-স্বরূপ কথনের অনুরূপ। শোনা যায়, 'ওং'কার সম্বন্ধে এদেশে যেমন নানা মুনির নানা মত, 'তও' শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া চীনদেশেও ঠিক তেমনি। কেহ বলেন 'তও' মানে ধর্ম, কেহ বলেন পন্থা, কেহ বলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বীজ। আমাদের মনে হয়, 'অমিদো ফুহ' যেমন অমিতাভ বুদ্ধের রূপান্তর 'তও' তেমনি তৎশব্দের রূপান্তর। তৎ ব্রহ্ম। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র। তবে এরূপ অনুমান করিবার দুইটি কারণ আছে, প্রথম, লৌৎসুর ভারত পরিভ্রমণ এবং ভারতীয় ভাব ও চিন্তার সহিত ঘনিষ্ঠতা, দ্বিতীয়, তাঁহার মত ও রচনার সঙ্গে উপনিষদের রচনা ও মতের অসাধারণ সাদৃশ্য। তদ্ভিন্ন, ভারতবর্ষের প্রভাব যে তাঁহার উপর অত্যধিক ছিল তাহার অন্য প্রমাণও আছে; 'তও'বিদ্ পণ্ডিতেরা এখনও ভারতবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মতো মস্তক মুণ্ডন করে, টিকিও রাখে। এ টিকি চীনাম্যানের দীর্ঘ বেণী নহে।

লোৎসু-রচিত গ্রন্থের নাম 'তও-তে-চিং' অর্থাৎ 'তৎ-পথ-উপনিষৎ'। 'Ideals of the East' বা 'প্রাচ্য আদর্শ' নামক গ্রন্থের রচয়িতা মনস্বী ওকাকুরা বলেন, "লোৎসু যদি পূর্ব হইতে 'তও' প্রচারের দ্বারা চীন জাতির মানসিক ক্ষেত্র নিড়াইয়া, ঢেলা ভাঙিয়া, তৈয়ার করিয়া না রাখিতেন, তবে কংফুশিয়োর মতের আওতায় ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা এবং ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে কখনই শিকড় গাড়িবার অবসর পাইত না।"

সুতরাং, দেখা যাইতেছে, প্রাচীন সভ্যতার দুইটি প্রধান কেন্দ্র ভারতবর্ষ ও চীনদেশকে ভাবের ধারায় সম্মিলিত করার জন্ত এবং এশিয়াকে অভেদ প্রমাণ করার জন্ত আমরা বুদ্ধদেবের মতো লোৎসু ঋষির কাছেও ঋণী।]

'তও'

সনাতন 'তও' বাক্যের দ্বারা বর্ণিত হইবার নয়; তাহার যে নামটি জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণ করা যায় সেটি তাহার চিরন্তন নাম নহে।

যখন সে নামহীন তখন সে স্বর্গ ও মর্ত্যের আদিকরণ; যখন নামবিশিষ্ট তখন সে সর্বভূতের সবিতা। যে আপনাকে জয় করিয়াছে সেই ইহার তত্ত্ব জানে; যে কামনার দ্বারা কলুষিত সে কেবল বাহিরের নির্মোকটি দেখিতে পায়। আত্মা ও জড় পদার্থ,—নামে ভিন্ন বটে, মূলে কিন্তু এক। এই ঐক্য একটি অপূর্ব রহস্য, ইহা তত্ত্ববিদ্যার তোরণস্বরূপ।

'তও' দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত, সেইজন্ত তাহার নাম নিরঞ্জন; সে শ্রবণ-শক্তিরও অতীত, সেইজন্ত তাহার আর একটি নাম মৌনসত্তা; স্পর্শশক্তিও তাহার নাগাল পায় না, সেইজন্ত তাহাকে নিরাকার বলে। এই তিনটি গুণ বুদ্ধির অতীত এবং অভিন্নাত্মক।

'তও' নিরাকারের আকার, অনির্নীতের শব্দময় আভাস। স্বর্গমর্ত্যের সৃষ্টি-ব্যাপারেরও পূর্ব হইতে একটি সত্তা বিরাজমান রহিয়াছে; সে অব্যক্ত অথচ আত্মনিষ্ঠ; অপরিস্ফুট অথচ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। তাহার নাম আমার জ্ঞানের অতীত, কেবল বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিবার জন্ত আমি তাহাকে 'তও' নামে অভিহিত করিয়া থাকি; এবং তাহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া 'ভূমা' বলিয়া নিরস্ত হইতে বাধ্য হই।

'তও' মহৎ, স্বর্গ মহৎ, পৃথিবী মহৎ, রাজাও মহৎ। বিশ্বভুবনে চারিটি শক্তি কার্য করিতেছে, রাজা তাহার অন্যতম। মানুষ রাজার কাছে বিধান লয়, রাজা পৃথিবীর কাছে, পৃথিবী স্বর্গের কাছে এবং স্বর্গ 'তও'য়ের কাছে বিধান গ্রহণ করিয়া থাকে। 'তও'য়ের বিধান, কিন্তু তাহার স্ব-ভাবের বিধান; 'তও' স্বয়ংসিদ্ধ।

'তও' যখন সংসারে শৃঙ্খলার সৃষ্টি করে তখন তাহাকে নামাঙ্কিত করা যায়; নামবিশিষ্ট হইলে মানুষ তাহাকে অবলম্বন করিবার সুবিধা পায়; এবং একবার অবলম্বন করিতে পারিলে বিনাশ ও বিঘ্নের ভয় থাকে না।

'তও' সর্বব্যাপী, সবাই তাহাকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে, 'তও' কাহাকেও বর্জন করে না।

'তও' মহৎকার্য সম্পন্ন করে, কিন্তু গৌরবের প্রত্যাশা রাখে না; সে সর্বজীবকে পালন করে, অথচ কর্তৃত্বের তাব—প্রকাশ পর্যন্ত হইতে দেয় না।

'তও'কে যে ধারণ করে জগৎ তাহার দ্বারস্থ।

'তও' পিছাইয়া থাকিতেই ভালবাসে; অক্ষমতাই তাহার বহির্লক্ষণ।

'তও' না যুঝিয়া জয় করিতে জানে, না ডাকিয়া কাছে টানিতে জানে এবং না চাহিয়াও নিখিল জীবের সাড়া পায়।

'তও'য়ের গতি শিথিল, ক্রিয়া মন্থর, কিন্তু ব্যবস্থা চমৎকার।

'তও' যে জাল বুনিয়াছে, সে প্রকাণ্ড; তাহার রন্ধ্রগুলিও সামান্য নয়, তবু সে রন্ধ্রের ভিতর দিয়া একটা ধূলিকণাও গলিয়া পড়ে না।

'তও'য়ের রীতি ধনুকের গুণাকর্ষণের মতো; সে উন্নতকে অবনত এবং অবনতকে উন্নত করে।

'তও' ধনাঢ্যের অতি-প্রাচুর্যের অংশ লইয়া স্বল্পবিত্তকে দান করে। মানুষের রীতি ওরূপ নয়। মানুষ স্বল্পবিত্তের ধন হরণ করিয়া নিজের অতি-বাহুল্যকে ক্রমাগত ভারাক্রান্ত করিতেই ব্যস্ত। আপনার প্রয়োজনাতিরিক্ত অতি-প্রচুর ধনৈশ্বর্যের অংশ অপরকে দান করিতে পারে, এমন মানুষ এ জগতে কে আছে? যে 'তও'কে পাইয়াছে সেই।

'তও'য়ের পন্থা

সকলেই কর্ম করে এবং কর্মাবসানে শমতা প্রাপ্ত হয়। বিকাশের পূর্ণতা ঘটিলেই আদিম দশায় প্রত্যাবর্তন অনিবার্য হইয়া উঠে, আদিম অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়াকেই নিয়তির সম্পূর্ণতা বলে; নিয়তির পরিপূরণ বিশ্রামের নামান্তর। ইহা একটি চিরন্তন বিধান। যে এ বিধান জানিয়াছে সে মনীষী; যে জানে নাই সে দুর্ভাগ্য। এই সত্যের সহিত পরিচয়সাধন হইলে মানুষ উদার-চরিত হয়; উদার-চরিত হইলে ন্যায়দর্শী হয়; ন্যায়দর্শী হইলে রাজগুণে ভূষিত হয়; রাজগুণে মণ্ডিত হইলে দেবোপম হয়; দেবোপম হইলে 'তও'য়ের অধিকারী হয়। 'তও'য়ের অধিকারী অমরতা লাভ করে, তাহার শরীর ধ্বংস হইলেও সে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

যে 'তও'য়ের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া কর্ম করে সে 'তও'য়ের সঙ্গে এক হইয়া যায়।

* * *

'তও'য়ের জ্যোতিতে যাহার হৃদয় উদ্ভাসিত তাহাকে মোহাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়। 'তও'য়ের দিকে যে অগ্রসর হইতেছে সে পিছনে হটিতেছে বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। 'তও'য়ের পথে যে স্বচ্ছন্দ-গতিতে চলিয়াছে, বাহিরের লোক তাহাকে হোঁচট খাইতেই দেখে।

জগতের লোক যদি 'তও'য়ের পন্থা অনুসরণ করে তবে যুদ্ধের ঘোড়া চাষের কাজেই লাগিয়া যাইবে; 'তও'কে যদি অবহেলা করে তবে চাষের গরু যুদ্ধের রসদ বহিয়া মরিবে।

'তও'য়ের রাজপথ চমৎকার, কিন্তু লোকে গলিঘুঁজিই ভালবাসে।

যেখানে প্রাসাদ ও অট্টালিকা সংখ্যায় ও শোভায় অতুলনীয় সেখানে শস্যক্ষেত্রে আগাছার ভাগই বেশী দেখিবে, এবং গোলা ও মরাই দেখিবে শূন্য।

ভোজনবিলাস এবং শয়নবিলাস 'তও'পন্থীর পক্ষে অশোভন। স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদ এবং রত্নমণ্ডিত তরবারি ব্যবহারকে আমি প্রকাশ্য দস্যুতা বলিয়া মনে করি; ইহা কখনই 'তও'য়ের অনুমোদিত নহে। ঐশ্বর্যমত্ততা 'তও'-বিদের একান্ত পরিহার্য।

জিহ্বাকে সংযত কর ; বাহ্যাড়ম্বর কমাইয়া দাও ; নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে সামঞ্জস্যের শৃঙ্খলা স্থাপন কর ; ইহাকেই 'তও'য়ের পন্থা অবলম্বন করা বলে। যে এরূপ করিতে পারে সে অনুগ্রহ ও নির্যাতন, সম্মান ও অপমান, লাভ ও ক্ষতি কিছুতেই বিচলিত হয় না ; এরূপ পুরুষকে লোকে পুরুষোত্তম বলে।

কর্মবিরতিই 'তও'-বেত্তার একমাত্র কর্ম ; সে শিক্ষা দেয় কিন্তু বাক্যব্যয় করে না।

ঘোলাজল কে নির্মল করিবে ? স্থির থাকিতে দাও,—থিতাইতে দাও, ক্রমে আপনিই সে পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। অক্ষয় শান্তি কেমন করিয়া লাভ করিবে ? অপেক্ষা কর, ধৈর্য ধর, শান্তি আসিবেই।

কথা কমাইয়া দাও, কাজ আপনিই ঠিক হইবে।

ঝড় এক বেলার বেশী টিঁকে না, বাদল বড় জোর একটা দিন ; এই তো তোমার প্রকৃতির নিয়ম ; প্রকৃতির উৎসাহই যদি এত স্বল্পায়ু হয়, তবে মানুষের উৎসাহ কতক্ষণ ?

রিক্ততায় পূর্ণতা লাভ কর ; নিবৃত্ত হও ; নিবৃত্ত হও। 'তও' চিরদিনই নিষ্ক্রিয়, তবুও তাহার কোনো কর্মই অসম্পূর্ণ থাকে না।

পৃথিবীতে সকলের চেয়ে যে কোমল সে কঠিনতমকে লঙ্ঘন করিয়া চলে ; যাহার কোনো মূর্তি নাই সে ছিদ্র না পাইলেও প্রবেশ করিতে পারে ; কর্মবিরতির ইহাই তাৎপর্য।

কর্মচাঞ্চল্য শীত নিবারণ করে ; কিন্তু তাপহরণ করে নিশ্চলতা ; পবিত্রতা এবং নির্মল স্থৈর্যই মানবজাতির সনাতন ধর্ম।

কর্মবিরতি অভ্যাস কর ; কিছুই-না-করার মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখ।

মুখ বন্ধ কর ; ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাও ; জীবন যতই দীর্ঘ হউক, কষ্ট পাইবে না। বাগ্মিতা অবলম্বন কর ; নিজের স্বার্থ সাত কাহন করিয়া তোলো ; আমরণ শান্তির আস্বাদ স্বপ্নেও জানিতে পারিবে না।

নিষ্কাম হইবার কামনা কর ; দুর্লভের লোভ আপনা হইতেই ক্ষয় পাইবে। না-শেখাটাই ভাল করিয়া শিখিয়া লও ; তবেই সেই ধন পাইবে,—যাহা মানব-সাধারণ আজ খোয়াইতে বসিয়াছে।

সকলকেই স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিবার অবসর দাও ; ঘাঁটাইয়ো না।

পিছাইয়া থাক, সমুখের আসন তোমাকেই দেওয়া হইবে ; ঠেলিয়া অগ্রসর হও, গলাধাক্কা খাইবে।

মাথা যে নোয়াইতে জানে সে কখনো মাথা খোয়ায় না। যে, একবার নত হইয়াছে, সেই ঋজুভাবে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইতে পাইবে ; যে রিক্ত সেই পূর্ণ হইবে ; যে জীর্ণ-শীর্ণ সেই নব সৌন্দর্য লাভ করিবে। যে স্বল্পবিত্ত সেই সাফল্যের অধিকারী ; যাহার অনেক আছে সে বিপথে যাওয়াই সম্ভব।

মিতব্যয়ী হও, প্রার্থীজনকে বিমুখ করিতে হইবে না ; ধীর হও, সাহসিকতা হঠকারিতায় পর্যবসিত হইবে না ; পিছাইয়া থাক, নেতৃত্ব করিতে পারিবে।

ধীরতা আক্রমণকারীকে জয়মাল্যে বিভূষিত করে, এবং আক্রান্তকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করে।

দেবতারা যাহাকে রক্ষা করিবেন, তাহাকে তাঁহারা ধীরতায় মণ্ডিত করিয়া মর্ত্যালোকে প্রেরণ করিয়া থাকেন।

হেঁয়ালি

মাটি দিয়া কলস গড়িতে হয়, কিন্তু কলসের সার্থকতা উহার ঐ শূন্য গর্ভটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাড়ি করিতে হইলে বাতায়ন রাখিতে হয় ; ঐ ফাঁকা জায়গাগুলাই বাড়িকে বাসের যোগ্য করে। বস্তুর বাস্তবতা খুবই ভাল, কিন্তু উহার ভিতরের অবস্তুই উহাকে সফলতা দান করে।

মানুষ যখন জন্মায়, তখন ভারী কোমল, ভারী দুর্বল ; কিন্তু যখন মরে তখন অত্যন্ত শক্ত এবং একেবারে দুর্নমনীয়! অঙ্কুর ভঙ্গুর ; কিন্তু মরা গাছ ঘাতসহ এবং সুকঠিন! সুতরাং কাঠিন্য এবং দুর্নমনীয়তা মৃত্যুর লক্ষণ ; কোমলতা এবং দুর্বলতা জীবনের সহচর

জলের মতো গড়াইয়া-পড়া অশরণ জিনিস জগতে নাই, অথচ লোহার মতো শক্ত জিনিসকে আক্রমণ করিতে সে অদ্বিতীয়!

যে কথা সকলের চেয়ে সত্য তাহা হেঁয়ালি বলিয়া ভুল হয়।

বিবিধ উক্তি

মানুষ কেহই বর্জনীয় নয় ; জিনিস কিছুই ত্যাজ্য নয় ; ইহাকেই বলে শুদ্ধ বুদ্ধি ; ইহারই নাম সম্যক্ দৃষ্টি ।

অনাড়ম্বর প্রারম্ভ যাহার দৃষ্টি এড়ায় না সে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছে ; দুর্বলতাকে স্বীকার করিয়াও যে নিজের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে সেই প্রকৃত শক্তিমান ।

ভাল কথা কহিয়া, মানুষের হাটে, সুখ্যাতি অর্জন করিতে পারা যায়, কিন্তু ভাল কাজ করিলে অপরিচিতের মধ্যেও সুহৃদ্‌লাভ ঘটে ।

ভাল মানুষের কাছে আমি ভাল মানুষ ; যে ভাল নয়, তার কাছেও আমি ভাল,—তাহাকে ভালর দিকে টানিবার জন্য ।

যে গাছ দুই হাতে আঁকড়িয়া পাওয়া যায় না সে একটি নিতান্ত সূক্ষ্ম অঙ্কুরের পরিণতি ; সপ্ততল হর্ম্য একটা ক্ষুদ্র মৃৎ-স্তূপের উপর নির্ভর করিয়া আছে ; হাজার ক্রোশব্যাপী পর্যটনের প্রারম্ভ একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপে ।

সংসারে যে সব কর্ম কঠিন, তাহা সময়ে সহজসাধ্য ছিল ; যাহা বড় তাহা ছোট ছিলই ; কঠিন কাজ সহজ থাকিতেই আরম্ভ করিয়া দাও ; বড় কাজ ছোট থাকিতেই আয়ত্ত করিয়া ফেল ; যিনি মনীষী, যিনি 'তও'কে জানেন, তিনি কখনো 'বিরাট' ব্যাপারে হাত দেন না, অথচ মহৎ ফলের তিনিই অধিকারী ।

বেশী কথা বলিলে, বলিবার কথা ফুরাইয়া যায়, মধ্যপথ অবলম্বন করাই শ্রেয় ।

চীনের নীতি-সংহিতা

[লৌৎসু ঋষির আবির্ভাবের ৫৩ বৎসর পরে চীন দেশে আর একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম কংফুশিয়ো ; অর্থাৎ আচার্য কং ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাকে প্রাচ্যভূমির কোন্ত্ বলিয়া থাকেন। সাদৃশ্যও কতকটা আছে। কংফুশিয়ো ও কোন্ত্ উভয়েই বাল্যকাল হইতে স্ব-স্ব সমাজের সংস্কারসাধনের জন্য দৃঢ়সংকল্প ; উভয়েই বিচারসাপেক্ষ, যুক্তিযুক্ত, নির্মল জ্ঞানের

পক্ষপাতী; উভয়েই ধর্মকে নীতিবিজ্ঞানের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসী। কংফুশিয়ো চল্লিশ কোটি চীনাম্যানকে একটি সুবৃহৎ পরিবারে পরিণত করিয়াছেন; কোম্ত্ বিশ্বমানবের সুদূর কল্পনাকে সম্ভাবনার অভিমুখে টানিয়া আনিয়াছেন। বুদ্ধ, খ্রীস্ট এবং মহম্মদের পরেই, মতের উদারতা ও সার্বজনীনতার জন্য, কংফুশিয়ো এবং কোম্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আচার্য কং পণ্ডিত, দার্শনিক, নীতিকুশল, নবধর্মের প্রতিষ্ঠাতা; কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের মতোন ইনি চীনদেশের প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারকর্তা।

কংফুশিয়োর ধর্মে স্বর্গের ভরসা বা নরকের ভয় নাই। তিনি আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও অতিপ্রাকৃতকে বড় একটা আমল দিতেন না। তিনি বলিতেন—অন্যায় করিলে ইহজীবনেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, যে ব্যক্তি পাপের ভোগ ভুগিবার পূর্বেই মরিয়া যায় সে তাহার পাপের বোঝা পুত্র বা পৌত্রের ঘাড়ে চাপায় মাত্র। এখনকার বিজ্ঞান-শাস্ত্রও কতক পরিমাণে এ কথার সমর্থন করে। কংফুশিয়োর ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রধানতঃ জ্ঞানমূলক বলিয়া, তাহা নৈতিক আদর্শ হইতে স্খলিত হইতে পারে নাই এবং ঐ একই কারণে চীন দেশের শিক্ষিত সমাজে অদ্যাবধি ইহার এত প্রতিপত্তি। সমাজের বৃহৎ জীবনের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের ঐক্যতানসাধন, পিতৃপূজারূপ প্রাচীনপদ্ধতির অনুবর্তন এবং ন্যায়ধর্মের সম্যক সংরক্ষণ, ইহাই আচার্য কংয়ের ত্রিপিটক।

আজ পর্যন্ত চীন সাম্রাজ্যের প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক পাঠশালায় কংফুশিয়োর নামাঙ্কিত এক-একখানি প্রস্তরফলক যত্নের সহিত সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে এবং প্রত্যহ শিক্ষাকার্যের আরম্ভে এবং অবসানে শিক্ষক ও ছাত্রেরা মিলিয়া ঐ অক্ষরময় স্মরণ-চিহ্নের সম্মুখে মহাপুরুষ কংফুশিয়োর উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। লোকবাহুল্যে চীনদেশ একটা প্রকাণ্ড মধুচক্রের মতোন হইলেও এবং পুলিশ-পাহারার বিশেষ রকম বন্দোবস্ত না থাকিলেও, সে দেশে যে অপরাধের সংখ্যা য়ুরোপের তুলনায় অত্যল্প তাহার একমাত্র কারণ তত্রত্য জনসমাজে কংফুশিয়োর নীতিশিক্ষার যুগব্যাপী বিস্তার। চীন দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কু-হাং-মিং এইরূপ মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন।

কোম্ত্ যেমন ফরাসী বিপ্লবের ধ্বংসাবশেষের উপর মহামানব-ধর্মের ভিত্তি

স্থাপন করেন, কংফুশিয়ো তেমনি অন্তর্বিরোধে 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত' চীনদেশকে মহাচীনে পরিণত করিবার উপায় আবিষ্কার করেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি কাহারো দ্বারস্থ না হইয়া এবং বিশেষ কোনো আড়ম্বর না দেখাইয়া, কেবল চরিত্র ও উপদেশের গুণে জন কয়েক মানুষের মতোন মানুষ তৈয়ার করিয়া তোলেন।

কংফুশিয়ো বলিতেন, "নৈতিক জীবনের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা এবং পিতা মাতাকে মানিয়া চলা, মানবজীবনে ইহাই কেবল শিক্ষণীয়; যে নিজের পিতা মাতাকে মানিতে শিখিয়াছে সে সাম্রাজ্য-রূপ বৃহৎ পরিবারের পিতৃস্থানীয় রাজাকেও মানিবে এবং যে নৈতিক জীবনের মর্ম বুঝিয়াছে সে কখনো বিচারাসনে বসিয়া লোভে বা মোহে ন্যায়ধর্মের মর্যাদাহানি করিবে না।" এইরূপ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া কংফুশিয়োর শিষ্যেরা গুরুর উপদেশ অনুসারে একে একে রাজার অধীনে শাসনকার্যের ভার গ্রহণ করেন এবং ক্রমশঃ সমদর্শী বিচারে এবং চরিত্রের মহত্ত্বে বিচারাসনের গৌরববৃদ্ধি ও স্বদেশের প্রভূত মঙ্গল-সাধন করিতে সমর্থ হন।

কংফুশিয়ো একেবারে গোড়া বাঁধিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি তরুণ মনের উপর বিতর্কের বাটালি চালাইয়া শিষ্যদিগকে মনের মতোন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; "পচা কাঠে নক্সা চলে না" ইহা তাঁহার একটি অমূল্য উপদেশ।

সংস্কার যুক্তির দ্বারা পুনঃশোধিত করিয়া, পবিত্র পারিবারিক আদর্শ সাম্রাজ্য-তন্ত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া তিনি বহু সর্দারের সর্দারী হইতে চীন দেশকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন; নিষ্কলঙ্ক জীবন ও অলোকসামান্য চরিত্রকে তিনি অবয়ব দান করিয়াছেন; ঐক্যের নিগূঢ় সূত্রে তিনি অনেককে বাঁধিয়াছেন;—চল্লিশ কোটি চীনাম্যান আড়াই হাজার বৎসরেও সে কথা ভুলিতে পারে নাই।

রামানুজের সঙ্গে শংকরের যে সম্বন্ধ, ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের যে সম্বন্ধ, বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে অদ্বৈতবাদের যে সম্বন্ধ, লৌৎস্থর সঙ্গে কংফুশিয়োর সম্বন্ধ অনেকটা সেইরূপ। ইহা ওকাকুরার কথা।

কংফুশিয়ো মনীষী, মহাপুরুষ, সমগ্র মানবজাতির গৌরবের সামগ্রী।

ভারতবর্ষ এবং চীন সাম্রাজ্যের মধ্যে হিমালয়ের ব্যবধান থাকিলেও চীনবাসী বুদ্ধবাণী শিরোধার্য করিয়াছে ; আশা করি শিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট কংফুশিয়োর অমৃত উপদেশ অনাদৃত হইবে না।]

ধর্মনীতির মধ্য-পন্থা

ঈশ্বরের বিধান আমাদের অস্তিত্বের বিধান ; এই অস্তিত্বের বিধান যখন অবাধে কার্য করে তখন তাহাকে নৈতিক বিধান বলে। শৃঙ্খলাবদ্ধ নৈতিক বিধান ধর্মের নামান্তর।

যে বিধানের অব্যাহত প্রভাবের সমক্ষে মুহূর্তের জন্যও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের সম্ভাবনা নাই, তাহাই নৈতিক বিধান। যে আইনে ফাঁকি চলে তাহা নৈতিক বিধান হইতেই পারে না।

হর্ষ, শোক, ক্রোধ অথবা ঐরূপ কোনো উদ্‌বেজনা যতক্ষণ না জাগিয়া উঠে ততক্ষণই আমরা স্বস্থ। এই স্বাভাবিক অবস্থাই আমাদের নৈতিক সত্তা।

চিত্তবৃত্তির প্রত্যেকটিই যখন সম্যক্ পরিণতি লাভ করে তখনই নৈতিক শৃঙ্খলা স্থাপনের উপযুক্ত সময়।

নৈতিক সত্তার কেন্দ্রস্থ সূত্রটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া, সেই সূত্র অবলম্বন পূর্বক, সুশৃঙ্খল বিশ্ব-ব্যাপারের সঙ্গে যোগ-যুক্ত হওয়াই মানুষের মহত্তম পরিণতি।

প্রকৃত নৈতিক জীবন কেন যে দুর্লভ তাহা বুঝিয়াছি ; যিনি পণ্ডিত তিনি নৈতিক জীবনকে এত বড় করিয়া দেখান, যে সাধারণের পক্ষে দৈনিক কর্মময় জীবনের সঙ্গে তাহাকে আর খাপ্ খাওয়ানো সম্ভব বলিয়া মনে হয় না ; যে অজ্ঞ সে নৈতিক জীবন সম্বন্ধে বড় একটা খবরই রাখে না ; সুতরাং সে উহার সম্বন্ধে একরূপ উদাসীন। কেহ ডিঙাইয়া বড় হইতে যায়, কেহ নাগালই পায় না।

গুণের অভাবকেই দোষ বলে ; দোষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ভালোর অভাবই মন্দ ; ভালোই আছে, মন্দের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। অস্তি ও নাস্তির মাঝখানে যে পথ তাহাই মধ্যপন্থা, তাহাই অবলম্বনীয়।

অনেকে ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে বুদ্ধির অগম্য নিগূঢ় অর্থ খুঁজিতে

ব্যস্ত হন, এবং নানারূপ উৎকট বা অসাধারণ আচরণের দ্বারা লোকের নিকট বিশিষ্ট হইয়া উঠেন ; আমি এ পন্থা গ্রহণীয় মনে করি না।

অনেকে নৈতিক জীবন অবলম্বন করিয়াও মধ্যপথের বিপরীত আচরণ করেন ; আমি উহা শ্রেয় মনে করি না।

যাঁহারা প্রকৃত ধার্মিক তাঁহারা স্বপ্নেও বিশ্ব-শৃঙ্খলার বাহিরে গিয়া পড়েন না। জগৎ তাঁহাদের জানে না, লোকে তাঁহাদের চেনে না। মানুষের মধ্যে ইঁহারাই দেবতা।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অতি প্রকাণ্ড হইলেও মানুষের নৈতিক সত্তা উহার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারে না ; নৈতিক আদর্শ এতই সুমহৎ, যে, নিখিল জগতেও তাহার স্থান সংকুলান হয় না ; মানুষের মন ভিন্ন কোনো বস্তুই তাহাকে ধারণ করিতে পারে না

নৈতিক বিধান বাস্তব-জীবনের বাহিরের জিনিস নহে ; যদি বাস্তব-জীবন হইতে উহাকে তফাত করিতে চাও, তবে আর উহাকে নৈতিক বিধান বলিয়ো না।

অন্যের যেরূপ ব্যবহারে নিজে বিরক্ত হও, অন্যের প্রতি সেরূপ ব্যবহার ভুলিয়াও করিতে নাই।

প্রকৃত সদ্ব্যক্তি বাহিরের সঙ্গে নিজেকে সহজেই মিলাইয়া লইতে পারেন ; তিনি অবস্থার অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না। আরামের মধ্যে তিনি আমীর, অভাবের মধ্যে তিনি ফকির, বর্বরের দেশে তিনি সহৃদয়, বিপদের দিনে তিনি বীর।

অভ্যুদয়ে তিনি অধীনের উপর অযথা কর্তৃত্ব প্রকাশ করেন না, দশা-বিপর্যয়ে প্রসাদভিখারী হন না ; তিনি নিজের আচরণ চারুতর করেন এবং কিছুরই প্রত্যাশা রাখেন না ; তিনি ভগবানের কাছে অনুযোগ করেন না এবং মানুষের নিন্দা করিতেও কুণ্ঠিত হন।

নৈতিক জীবন অবলম্বন তীর্থযাত্রার মতোন, একেবারে নিকটের ঘাটেই নৌকা প্রস্তুত ; ইহা পর্বতারোহণের মতোনও বটে, একেবারে নীচেকার ধাপ হইতেই ইহার আরম্ভ।

মানুষ চরিত্রের উপযুক্ত সম্মান লাভ করে, তাহার উপযুক্ত সম্পদ লাভ

করে, পরমায়ুও পায় সেই অনুপাতে। বিধাতা জীবন দিয়াছেন সকলকেই ; কিন্তু পরমায়ুর অল্পাধিক্য, সম্ভবত, গুণানুসারেই হইয়া থাকে। যে গাছ জীবনাশক্তিতে পূর্ণ, স্বয়ং বিধাতা তাহার রক্ষক ; আর যে গাছ পতনোন্মুখ তাহাকে তিনিই উৎপাটিত করিয়া ধ্বংসকার্যের সহায়তা করেন।

চরিত্রবান পুরুষের করণীয় চারিটি কর্মের একটিও আমি সম্যকরূপে করিয়া উঠিতে পারি নাই ; (১) আমি পুত্রের কাছে যেরূপ ব্যবহার আশা করিয়া থাকি আমার পিতার প্রতি সেরূপ ব্যবহার আমি করি নাই ; (২) আমি আমার অধীনস্থ কর্মচারীর কাছে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি আমার সম্রাটের প্রতি সেরূপ ব্যবহার আমি করি নাই ; (৩) আমার কনিষ্ঠের নিকট যেরূপ ব্যবহার আমি আকাঙ্ক্ষা করি আমার জ্যেষ্ঠের প্রতি ঠিক সেরূপ ব্যবহার করিতে আমি সমর্থ হই নাই ; (৪) বন্ধুদের কাছে আমি যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি, বন্ধুদের প্রতিও ঠিক সে ব্যবহার আমি করিতে পারি নাই।

কর্তব্যসাধনে বা কথাবার্তায় যখনি নিজের ত্রুটি দেখিতে পাইবে, স্বীকার করিও ; উন্নতির পথে আবর্জনা জমিতে দিয়ো না।

অখণ্ড সত্য যাহার করায়ত্ত সে আপনার নিগূঢ় সত্তার তলস্পর্শ করিয়াছে ; যে আপনাকে ঠিক তলাইয়া বুঝিয়াছে সে অপরকেও বুঝিতে সমর্থ ; যে অপরের মর্ম জানে প্রকৃতির রহস্য তাহার অবিদিত নাই ; যে প্রকৃতির রহস্য জানে সে সৃষ্টি-রহস্যের তত্ত্বও জানিয়াছে ; যে সৃষ্টি-রহস্যের তলস্পর্শ করিয়াছে সে সৃষ্টিকর্তার অখণ্ড শক্তির সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে।

অখণ্ড সত্যের ক্ষয় নাই ; ক্ষয় নাই বলিয়া তাহা অনন্ত ; অন্তহীন বলিয়া স্বয়ংসিদ্ধ ; স্বয়ংসিদ্ধ সুতরাং স্বয়ম্ভু ; স্বয়ম্ভু অতএব অনাদি ; অনাদি সুতরাং গহন এবং গভীর ; গভীর বলিয়াই বুদ্ধির অতীত অথচ চেতনায় স্পন্দিত। গভীর বলিয়াই নিখিল সৃষ্টিকে সে গর্ভে ধারণ করিতে পারিয়াছে ; চেতনায় স্পন্দিত বলিয়াই সমস্ত প্রাণীকে সে বুকে করিয়া আছে। বিশালতায় সে ধরিত্রীর মতোন ; উচ্চতায় সে আকাশের মতোন ; সে অনাদি, অনন্ত অসীম,—নিত্যতার মূর্তি। সে নিজেকেই প্রকাশ করে, অথচ প্রমাণের অতীত থাকিয়া যায়।

বিবিধ উক্তি

মানবজাতির উন্নতির জন্য আড়ম্বরের সঙ্গে যে-সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহার মূল্য যৎসামান্য।

যে নির্বোধ অথচ অন্যের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে, দরিদ্র অথচ প্রভুত্ব ফলাইতে চায়, বর্তমানের রাজ্যে বাস করে অথচ অতীত যুগের পৌরাণিক আচারের অনুষ্ঠান করিতে যায়, তাহার দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

চিত্তচেষ্টাশূন্য শাস্ত্রাধ্যয়ন বিড়ম্বনা ; শাস্ত্রচর্চাহীন চিত্তচেষ্টা ভয়ংকর।

ধনোপার্জনই যদি মানুষের শ্লাঘার সামগ্রী হইত, তবে আমি গাড়ির গাড়োয়ান হইয়াও টাকা রোজগার করিতাম ; যখন দেখিলাম তাহা নয়, তখন, যাহা ভালো বুঝিয়াছি, তাহাতেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছি।

একাগ্রতা ও ধ্যানের জন্য সমস্ত দিন অনাহারে এবং সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় আমি কাটাইয়াছি ; কিন্তু ফল পাই নাই ; তাহার চেয়ে, গ্রন্থাধ্যয়ন ভালো।

ধর্ম বনবাসী হইতে পারে না ; তাহাকে বেষ্টন করিয়া নূতন নূতন পল্লীর সৃষ্টি হইবেই।

সংযমের মাত্রাধিক্য অল্প লোকেই দেখা যায়।

প্রত্যেক লোকের দোষের সমষ্টি তাহার চরিত্রগত গুণসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করে ; প্রত্যেকের দোষের ভিতরেই তাহার গুণেরও পরিচয় আছে।

প্রাচীনেরা যাহা মনে আসে তাহাই উচ্চারণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন ; পাছে কথা ও কাজের সামঞ্জস্য না থাকে ইহাই তাঁহাদের ভয়ের একমাত্র কারণ ছিল।

অমিতব্যয় অবিনয়ের জন্মদাতা ; ব্যয়কুণ্ঠা কার্পণ্যের জনক।

সেনাব্যূহের মধ্য হইতে সেনাপতিকে হরণ করাও বরং সম্ভব, কিন্তু নিঃস্বজনেরও সংকল্প হরণ করা একেবারেই অসম্ভব।

অসদ্ব্যবহারের প্রতিদান যদি সদ্ব্যবহার হয়, তবে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান কিরূপ হইবে? যে হিতকারী তাহারই হিতসাধন কর্তব্য ; অন্যায়কারীর প্রতি কেবল ন্যায়সংগত ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট।

যে স্বভাবত অনুদার তাহার আনুষ্ঠানিক নিষ্ঠাতেই বা ফল কি? নাম-সংকীর্তনেই বা ফল কি?

যে প্রকৃত ভদ্রলোক সে কখনো কলহপ্রিয় বা উদ্ধত হয় না ; প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব বল-পরীক্ষার সময়ে যেরূপ উত্তেজিত হয়, অন্য সময়ে কখনো সেরূপ হইতে দেখা যায় না ; অথচ, মল্লযুদ্ধের আরম্ভ অভিবাদনে, সমাপ্তি কর-চুম্বনে। যে ভদ্র সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও ভদ্র।

যদি ভুল করিয়াই থাক, তবে তাহার সংশোধন করিতে লজ্জা বোধ করিও না।

দুষ্টলোকে যাহার অখ্যাতি রটায় এবং সজ্জনে যাহার যশোকীর্তন করে সেই ভাগ্যবান ; ভালোমন্দ নির্বিশেষে সর্বলোকেরই প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা চরিত্রের পক্ষে হানিকর।

জ্ঞানার্থী সমুদ্রে আনন্দলাভ করে, ধর্মার্থী পর্বতপ্রবাসে সুখী হয় ; কারণ, জ্ঞানার্থী চঞ্চল, ধর্মার্থী প্রশান্ত।

সারবত্তা যদি সৌন্দর্যকে ছাড়াইয়া উঠে তবে সেই সারবত্তা সংকীর্ণ গ্রাম্যতার নামান্তর ; বাহিরের অলংকার যদি সারবত্তাকে ছাপাইয়া যায় তবে তাহা চাকচিক্যময় বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। উভয়ের পরিমাণ-সাম্যই বাঞ্ছনীয়।

ধর্মনীতিজ্ঞ ব্যক্তি নিজে খাঁটি হইতে গিয়া অনেককে খাঁটি করিয়া তোলেন ; নিজের চেষ্টায় আলো জ্বালিয়া আরো পাঁচজনের অন্ধকার নাশ করেন ; 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু'—ইহাই ধর্মনীতির প্রথম সূত্র।

আমি দেবতার মতোন মানুষ কখনো দেখি নাই, একজন মানুষের মতোন মানুষ দেখিলেই খুশী হইয়া যাই ; আমি নিষ্কলঙ্ক ধার্মিক লোক দেখি নাই, একজন অকপট সহৃদয় লোক পাইলে বাঁচিয়া যাই।

শূন্য যেখানে পূর্ণতার ভান করে, নিঃস্ব যেখানে ঐশ্বর্যের ভান করে, অক্ষম যেখানে ক্ষমতার অহংকার করে, সেখানে আমার এ অভিলাষ আংশিকভাবে পূর্ণ হওয়াও কঠিন।

যে উত্তম সে গম্ভীর, অথচ গর্বিত নয় ; যে অধম সে গর্বিত, অথচ গম্ভীর নয়।

আত্মমর্যাদা হারাইও না, লোকে তোমায় শ্রদ্ধা করিবে ; উদার হও, হৃদয় জয়ের যোগ্যতা লাভ করিবে ; সত্যনিষ্ঠ হও, লোকে তোমায় বিশ্বাস করিবে ; প্রযত্নবান্ হও, মহৎ সিদ্ধি তুমিই লাভ করিবে ; পরের উপকার

কর, তোমার কথা লোকে ঋষিবাক্যের মতোন আনন্দের সহিত পালন করিবে।

কোন্ গাছটি যে চিরহরিৎ তাহার পরিচয় কেবল শীতকালেই পাওয়া যায়।

কাঁটা বনের প্রজাপতি

[লৌৎস্থ ঋষির প্রায় দুই শত বৎসর পরে চুয়াংস্থ জন্মগ্রহণ করেন। ইহাকে লৌৎস্থর মানস-পুত্র বলা যাইতে পারে। ইনি প্রতিভাবান অথচ আলাপ-বিমুখ, উৎসাহী অথচ উদাসীন, কূটতার্কিক অথচ কল্পনাকুশল, সংশয়াত্মা অথচ ব্রহ্মনিষ্ঠ। ইনি কংফুশিয়োর আচার-সর্বস্ব ধর্মনীতিসূত্রের "ভব্যতার গণ্ডী মাঝে শান্তি" না মানিয়া লৌৎস্থ-প্রবর্তিত 'তও'-বাদ বা ব্রহ্মবাদে দীক্ষিত হন। চুয়াংস্থর রচনাবলী সৌন্দর্য ও সরসতায় প্রাচীন চীন-সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

লৌৎস্থ যে সমস্ত ভাব অঙ্কুরিত করিয়া গিয়াছিলেন, চুয়াংস্থ উহাদিগকে ফলপুষ্পিত করেন। তাঁহার নিজের "নব নব উন্মেশালিনী বুদ্ধির" গভীরতাও নিতান্ত অল্প ছিল না। চীনের শ্রেষ্ঠ সমালোচকেরা বলেন, "চুয়াংস্থর রচনা সমুদ্রের মতো; হাজার ডুব দাও, সকল রত্ন নিঃশেষে আহরণ করিতে পারিবে না। অনেক রহস্য অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যাইবেই। উহার গভীরতার কেহ পরিমাণ করিতে পারে না। ব্যঞ্জনায় ও অব্যক্ত ভাবের সূচনায় চুয়াংস্থ অদ্বিতীয়; এবং এই দুইটি গুণই মনস্বীদিগের অননুকরণীয় রচনার প্রধান লক্ষণ।"

খ্রীস্টের যেমন সেণ্ট পল, বুদ্ধের যেমন বোধিধর্ম, সক্রেটিসের যেমন প্লেটো, ডারুইনের যেমন হাক্সলি, লৌৎস্থর তেমনি চুয়াংস্থ। গুরুর ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বেও শিষ্যের প্রতিভা একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে নাই।

চুয়াংস্থর দর্শন কাব্যের মতো মনোজ্ঞ; তাঁহার গদ্য, পদ্যের মতো শ্রুতিমধুর। তিনি তর্কসংকুল দার্শনিক জটিলতার মধ্যে লঘুগতিতে অবলীলাক্রমে বিহার করিতেন বলিয়া চীনদেশীয় রসজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে 'কাঁটা বনের চিত্রপতঙ্গ' বলিয়া থাকেন; তাঁহার গ্রন্থকে বলেন, "প্রজাপতির মৌন গুঞ্জন"।]

খেয়ালীর খেয়াল

একবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, আমি যেন একটি প্রজাপতি। খেয়ালের ঝোঁকে ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছি; ষোল আনাই প্রজাপতি! আমি যে মানুষ সে কথাটা আমার মনেই ছিল না। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল, দেখিলাম, আমি আমিই; যেখানকার মানুষ সেইখানেই পড়িয়া আছি।

আমি মানুষ স্বপ্নে পতঙ্গ হইয়াছিলাম না, আমি পতঙ্গ, স্বপ্নে মানুষ হইয়াছি? কে জানে! পতঙ্গ ও মানুষের মধ্যে অবশ্য তফাত আছে, সেই সীমাটুকু পার হওয়ার নামই জন্মান্তর।

কূপমণ্ডুকের কাছে সাগরের কথা তুলিও না; সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যাহার দিন কাটিয়াছে সে সাগরের মর্ম কি বুঝিবে? স্বল্পায়ু পতঙ্গের কাছে সনাতন সত্যের উল্লেখ করিয়ো না; সে ক্ষুদ্র প্রাণী, মহৎভাবের ধার ধারে না। পাঠশালার পণ্ডিতকে 'তও'য়ের তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিও না; কাক-ক্রান্তির ক্ষুদ্রতা যাহার হাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে স্বর্গ ও মর্ত্যের আদিম সত্তা, বিশ্বজগতের বিধানদাতা সনাতন 'তও'য়ের তত্ত্ব—ধারণায় আনিতে পারিবে না।

শরতের একটি তৃণমঞ্জরী পৃথিবীর মধ্যে বড় জিনিস; প্রকাণ্ড পর্বত তাহার তুলনায় তুচ্ছ। যে শিশু শৈশবে মরিয়াছে তাহার মতো বুড়া জগতে নাই। বিশ্বজগতের যেদিন জন্ম হইয়াছে আমার জন্মও সেই দিন; বিশ্বজগত আমার যমজ ভাই।

চতুঃসাগর—বিশ্বসংসারের তুলনায় সে কি গোষ্পদের মতো নহে? সাগর-বেষ্টিত চীনসাম্রাজ্য—সে কি শস্যভাণ্ডারের মধ্যস্থিত একটা তণ্ডুলকণার মতো নহে? অসংখ্য সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ অশ্বগাত্রের একটি কেশাগ্রের মতোই নগণ্য।

আত্মনিষ্ঠ জ্ঞান হইতেই বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞানের উৎপত্তি; আত্মা হইতেই অনাত্ম বস্তুর অনুভূতি; অথচ, সবই আত্মনিষ্ঠ, আবার, সবই বিষয়নিষ্ঠ! ইহাকেই বলে বিকল্পের উপপত্তি।

আত্মনিষ্ঠ জ্ঞান ও বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞান একত্র অবস্থান করিয়াও যদি পরস্পর নিরপেক্ষ থাকে, তবে সেই জ্ঞানকে 'তও'য়ের মেরুদণ্ড বলা যায়; তাহা যখন

সমস্ত সনাতন সত্তার কেন্দ্রস্থলের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হয়, তখন অস্তি ও নাস্তি সংমিলিত হইয়া অদ্বিতীয় একে পরিণত হয়।

'তত্ত'য়ের হিসাবে তৃণে ও স্ফটিকস্তম্ভে প্রভেদ নাই; সুন্দরে কুৎসিতে, ক্ষুদ্রে মহতে, উত্তমে অধমে, বিকৃতে অদ্ভুতে, কোথাও অসামঞ্জস্য নাই। সৃষ্টিই ধ্বংস, ধ্বংসই সৃষ্টি; ভাঙাও নাই, গড়াও নাই; সমস্তই একের মধ্যে সমাহিত।

বাঁচিবার স্পৃহা যে আমাদের মনের ভুল নয়, তাহা কেমন করিয়া জানিব? দরিদ্রের মেয়ে রাজা স্বামীর ঘরে যাইতেও কাঁদে; পরে যখন রাজভোগের আস্বাদ বুঝিতে পারে, তখন কান্নার কথা মনে পড়িলে, নিজেই মনে মনে লজ্জিত হয়। মৃতেরাও হয়তো জীবনের প্রতি মমতার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জিত হয়; কে জানে!

মানুষের জ্ঞান সীমাবিশিষ্ট; মানুষ না-জানার উপর নির্ভর করিয়াই সকল জ্ঞানের আধার 'তত্ত'কে জানিতে পারে।

মহৎ সত্তা, মহা শূন্য, মহা নাম, মহান্ ঐক্য, মহৎ সত্য, মহৎ বিধান, ইহাদের জ্ঞানই জ্ঞানের চরম।

মনে কর খেয়ার নৌকার সঙ্গে একখানা খালি নৌকার ধাক্কা লাগিবার উপক্রম হইয়াছে; মাঝি, স্বভাবত বদ্‌মেজাজী হইলেও, এ ক্ষেত্রে চটিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু খালি নৌকাখানা যদি খালি না হইয়া উহাতে একজনও মানুষ থাকিত, তবে, খেয়ার মাঝি ঐ লোকটিকে সাবধান হইতে বলিত; লোকটা শুনিতে পায় নাই এরূপ মনে হইলে আরো দুই-তিনবার হুঁশিয়ার হইতে বলিত; তাহার পরেই গালিবর্ষণ আরম্ভ হইত। প্রথম ক্ষেত্রে মাঝি চটে নাই, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চটিয়াছে। মানুষের পক্ষেও ঠিক ঐরূপ; যে মানুষ শূন্য নৌকার মতো সারাজীবন ভাসিয়া চলিতে পারে, ধাক্কা লাগিবার সম্ভাবনা থাকিলেও, তাহার কোনো অনিষ্ট হয় না, লোকে তাহাকে বাঁচাইয়া চলে।

জলে নৌকা ভালো, ডাঙায় গাড়িই ভালো। বর্তমান ও অতীত—ডাঙা ও জল; সত্যযুগের নিয়ম কলিযুগে খাটাইতে যাওয়া ডাঙায় নৌকা চালানোর মতোন; শ্রম যথেষ্ট, ফল শূন্য; লাভের মধ্যে টিট্‌কারী।

মানুষ যখন মরে তখন বুঝিতে হইবে তাহার সময় পূর্ণ হইয়াছে; একথা যিনি বুঝিয়াছেন তাঁহার অন্তরে শোকের স্থান নাই। ইন্ধন ফুরায় কিন্তু

আগুন অন্যত্র নীত হইতে পারে ; আগুনের পরমায়ু যে ইন্ধনের সঙ্গে সঙ্গেই ফুরাইয়া যায় এমন কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না।

মানবজীবন লাভ করা,—সেই তো এক আনন্দের বিষয় ; তাহার উপর, একমাত্র অনন্তের অভিমুখে দৃষ্টি রাখিয়া, রূপ হইতে রূপান্তরে, ক্রমাগত নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া যাওয়া,—সে সুখের তুলনা নাই।

'তও' জন্মের সময়ে আমাকে এই শরীর দিয়াছেন, যৌবনে কর্মপ্রবৃত্তি দিয়াছেন, বার্ধক্যে নিবৃত্তি দিয়াছেন এবং মৃত্যুতে বিশ্রামের অধিকারী করিয়াছেন। জীবনে যাঁহার দয়ার বিধান প্রত্যক্ষ করিয়াছি জীবনান্তেও তিনিই আমার নির্ভর।

তপ্ত লৌহের একটা বুদ্বুদ যদি হঠাৎ উদ্ভূত হইয়া লৌহকারকে বলে, "ওগো আমাকে শাণিত তরবারিতে পরিণত কর", তবে আমার মনে হয় ঐ প্রগল্ভ বুদ্বুদটাকে লৌহমল বিবেচনা করিয়া, লৌহকার কটাহ হইতে তুলিয়া, দূরে নিক্ষেপ করিবে। আমার মতো অধম যদি ক্রমাগত ভগবানকে বলে, "ওগো আমাকে মানুষ কর", আমার মনে হয়, তিনিও আমাকে বাচাল বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন। এই সংসার তপ্ত কটাহ ; ভগবান লৌহশিল্পী ; তিনি আমাকে যেমন করিয়া গড়িবেন তাহাতেই আমি খুশী হইব ; তিনি আমাকে যেখানে রাখিবেন আমি সেইখানেই থাকিব ;—এবং অতীতের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া, জন্মে-জন্মে, স্বপ্ন-বিবর্জিত নিদ্রার অবসানে নব আনন্দে জাগিয়া উঠিব।

জ্ঞানীর নিবৃত্তি বিষয়ীর কর্ম-বিরতি নহে। ইহা জড়তা নহে ; ইহা তাঁহার মানসিক ভাবেরই অভিব্যক্তি। বিশ্বকোলাহল তাঁহার অন্তঃসামঞ্জস্যকে টলাইতে পারে না, এইজন্যই তিনি প্রশান্ত, আত্মস্থ। জল যখন স্থির থাকে, তখন সে ঠিক দর্পণের মতো, ভ্রূর লোমগুলি পর্যন্ত গণিতে পারা যায় ; সেই জন্য, এইরূপ নিস্তরঙ্গ জলাশয় সমতলের আদর্শ, তলসাম্যের নিরিখ্। চাঞ্চল্য-বর্জিত মন স্থির সরোবরের মতো স্বচ্ছ ; তীরস্থ ক্ষুদ্র তৃণটি হইতে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বের প্রতিবিম্ব ইহারই মধ্যে ধরা পড়িয়া থাকে। ইহা জ্ঞানীজনের আদর্শ।

স্রোতের জলে কেহ চেহারা দেখিতে যায় না, যাহা নিজে চঞ্চল তাহা অন্যকে ধারণ করিবে কেমন করিয়া?

কংফুশিয়ো কি যথার্থ জ্ঞানী? তাঁহার এত শিষ্য হইল কিরূপে? তর্কনিপুণতা ও বাক্‌পটুতাই তো তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। প্রকৃত জ্ঞানীরা তর্কবিদ্যায় প্রসিদ্ধিলাভ করাকে চোরের বেড়ীর মতোন মনে করিয়া থাকেন।

দেবকোটি মানুষ মানুষের কাছে দেবতার মতো, কিন্তু, ভগবানের কাছে নিতান্ত সাধারণ; এই জন্যই বলে, "স্বর্গে যে অধম পৃথিবীতে সেই উত্তম, পৃথিবীতে যে উচ্চ স্বর্গে সে তুচ্ছ।"

মানুষের হৃদয় স্বভাবত ভালো; কিন্তু, তাই বলিয়া, ঘাঁটাইও না। তাহাকে খোঁচাইয়া তোলাও খারাপ; দাবাইয়া রাখাও খারাপ; দুইয়েরি পরিণাম ভয়ংকর।

যে নিজেকে মূর্খ বলিয়া জানে সে কখনো মূর্খের সর্দার হইতে পারে না।

যুদ্ধ নিম্ন শ্রেণীর বিচারক; দণ্ড পুরস্কার নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক; আইন-কানুন নিম্ন শ্রেণীর শাসনকর্তা; রেশ্‌মী পোশাকে নিম্ন শ্রেণীর আনন্দ; রোদন ও হাহাকার নিম্ন শ্রেণীর শোক্।

প্রাচীনেরা দুইটি ধর্মশালা স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন;—একটির নাম 'দানপুণ্য,' আর একটির নাম 'কর্তব্যনিষ্ঠা'; ও সব আশ্রয়ে একরাত্রি আনন্দে কাটাইতে পার; কিন্তু, তাহার বেশী থাকিতে গেলেই মুশকিল।

মানুষের জীবন রন্ধ্রপথে সূর্যরশ্মির মতোন; এই আছে, পরমূহূর্তেই অন্তর্ধান।

জন্মই আরম্ভ নয়, মৃত্যুই অবসান নয়।

জ্ঞান অজ্ঞেয়ের সীমায় পৌছিয়া স্তব্ধ হইয়া যাক্; ইহাই জ্ঞানের পূর্ণতা; ইহাই যথার্থ পরিণতি।

খণ্ড জ্ঞানের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ কর, মহাজ্ঞান তোমার চিত্তকে উদ্ভাসিত করিবে। সৎ হইবার জন্য আড়ম্বর করিও না, আপনা আপনি ভাল হইবে। শিশুরা বেশ কথা কহিতে শেখে, সে জন্য তাহাদিগকে ভাষাতত্ত্ব-বিদের দ্বারস্থ হইতে হয় না।

অনুদ্যোতক

চুয়াংস্থ মাছ ধরিতেছিলেন ; এমন সময়ে, রাজার তরফের দুইজন কর্মচারী আসিয়া তাঁহাকে জানাইল যে, স্বয়ং রাজা তাঁহাকে রাজ্যের ব্যবস্থাপক হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

চুয়াংস্থ ছিপের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিয়াই বলিলেন, "শুনেছি এ রাজ্যে তিন হাজার বছরের মরা একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপের খোলা আছে, আর সেই খোলাটাকে দেব-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে রাজা স্বয়ং তার পূজা করে থাকেন। আচ্ছা, জীয়ন্ত থেকে কাদায় ল্যাজ নেড়ে বেড়ানো, আর, মরে গিয়ে মন্দিরে পূজা পাওয়া,—এই দু'টো অবস্থার মধ্যে যদি কচ্ছপটাকে একটা অবস্থা বেছে পছন্দ করে নিতে বলা হ'ত, তবে, সে নিজে কোন্ অবস্থাটা পছন্দ করত ?"

রাজকর্মচারীরা দুই জনেই বলিয়া উঠিল, "বেঁচে থেকে কাদায় ল্যাজ নাড়াই পছন্দ করত।"

চুয়াংস্থ বলিলেন, "তবে পালাও, আমিও এই কাদায় পড়েই ল্যাজ নাড়ব।"

একবার গুজব উঠিল, চুয়াংস্থ রাজমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। লোকে মন্ত্রীকে বলিল ",চুয়াংস্থ তোমার বদলে মন্ত্রী হতে আসছেন।" মন্ত্রী ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন এবং তিন দিন তিন রাত্রি ধরিয়া চুয়াংস্থকে দেশময় খুঁজিয়া বেড়াইলেন। অবশেষে, চুয়াংস্থ নিজেই আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন এবং মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দক্ষিণে একটা পাখী আছে, সে গরুড় জাতীয় ; সে দক্ষিণ সাগর থেকে যাত্রা করেছে, যাবে উত্তর সাগরে,— ক্রমাগতই উড়্ছে ; অক্ষয় বট ভিন্ন অন্য কোনো গাছের শাখায় সে বিশ্রাম করে না ; বাঁশের তণ্ডুল ভিন্ন আর কিছুই খায় না। একটা পেঁচা একটা মরা ইঁদুর আগ্‌লে বসেছিল, সে গরুড়কে উড়ে আসতে দেখে 'খিচ্' 'খিচ্' করে উঠল। তুমি এ গল্প শোনোনি ? আশ্চর্য ! কিন্তু সে কথা থাক্। তুমি তোমার মন্ত্রিত্ব নিয়ে সুখে থাক, তোমার পদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও লোভ নেই।"

আদর্শের দ্রষ্টা

[কংফুশিয়ো অর্থাৎ আচার্য কংয়ের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে, চীনসাম্রাজ্য ভয়ানক বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। ক্ষমতাপন্ন রাজন্তেরা তখন স্ব স্ব প্রাধান। চারিদিকে যুদ্ধ, চারিদিকে বিপ্লব ; দস্যুর উৎপাত, ফৌজের উপদ্রব। তাহার উপর দুর্ভিক্ষ। জনসাধারণ সন্ত্রস্ত, "চাচা আপন বাঁচা" নীতির অনুসরণ করিতেছে। ঠিক এই সময়ে মহাত্মা মাংস্থর জন্ম। ইহার যখন বয়স তিন বৎসর সেই সময়ে ইহার পিতার মৃত্যু হয়। মাংস্থর জননী বিদুষী ছিলেন, এই অসহায়া বিধবার অক্লান্ত চেষ্টায় মাংস্থ ক্রমশঃ নানা শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত হইয়া ওঠেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া মাংস্থ একটি টোল স্থাপন করেন। ইহার পর হইতে তাঁহার টোল বিভিন্ন দেশীয় প্রতিভাবান শিষ্যের সমাগমে ক্রমশঃ সাম্রাজ্যব্যাপী খ্যাতি লাভ করে। মাংস্থ নিজে কংফুশিয়োর মানসপুত্র ; কংফুশিয়োর রচনা পড়িয়া ইনি উঁহাকে গুরু বলিয়া বরণ করেন।

চল্লিশ বৎসর বয়সে মাংস্থ শিষ্য-সেবক সঙ্গে করিয়া দেশ পর্যটনে বাহির হন। দেশের দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ এবং দুর্দশার প্রতিকারই তাঁহার চীন-পরিক্রমার উদ্দেশ্য। তিনি বহুতর সামন্ত রাজার দরবারে উপস্থিত হইয়া অকুতোভয়ে নিজের মত প্রচার করিয়াছিলেন। অনেক স্বার্থান্বেষী রাজমন্ত্রী এবং ক্ষুদ্রচেতা পণ্ডিতম্মন্য রাজপুরুষকে তর্কে পরাজিত করিয়া মাংস্থ চীনজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হন। শেষে নিজের জীবদ্দশায় স্বজাতির নৈতিক উন্নতি সম্পূর্ণভাবে সংসাধিত হওয়া অসম্ভব দেখিয়া আপনার সমস্ত মতামত লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। খ্রীস্ট পূর্ব ২৮৯ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

কংফুশিয়ো-প্রবর্তিত পিতৃপূজার প্রাচীন মার্গ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের মর্যাদার ক্রম রক্ষা করিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে পারিবারিক আদর্শ পুনঃ সংস্থাপন করাই মহাত্মা মাংস্থর জীবনের এবং গ্রন্থ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। ইনি একদিকে সাম্যবাদের সকল সূত্র নির্বিচারে গ্রহণ করিবার বিরোধী ছিলেন অন্যদিকে রাজবংশের দেবত্বে ইহার আস্থা ছিল না।

মহামানবের অন্তর্নিহিত যে অনির্বচনীয় শক্তি ধর্মস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে এবং দেশে দেশে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে, মহাত্মা মাংস্থও সেই মহাশক্তির

প্রেরণায় কর্ম করিয়া গিয়াছেন ; সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মাংস্থ আদর্শের দ্রষ্টা—মহাপুরুষ।]

মাংস্থুর উক্তি

পৃথিবী-রূপ বিপুলায়তন বাস্তভিটায়, সমগ্র মানবজাতি-রূপ প্রকাণ্ড পরিবারের মধ্যে, নির্বিবাদে যে ঠিক নিজের উপযুক্ত আসন বাছিয়া লইতে পারে সেই মহাপুরুষ।

ন্যায়ানুমোদিত পন্থাই যথার্থ মহাযান, এই পথ মহাজনদিগের।

যিনি প্রকৃত মহাত্মা তিনি দেশের মধ্যে উচ্চ পদ লাভ করিলে নিজের হৃদগত নৈতিক ও সামাজিক আদর্শকে বাস্তবের জগতে আকার দিতে চেষ্টা করেন ; অকৃতকার্য হইলে অন্ততঃ নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই উহাকে কথঞ্চিৎ সার্থকতা দিয়া থাকেন ; আদর্শকে কখনো ত্যাগ করেন না।

যিনি পদস্থ হইয়াও আপনার প্রভাব, পদমর্যাদা ও ধন-সমৃদ্ধির অপব্যবহার না করেন তিনিই মানুষ। যিনি দরিদ্র হইয়াও ন্যায়সংগত কর্তব্যের পথ হইতে বিচ্যুত না হন এবং প্রবলের পীড়নেও নিজের নিজত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন তিনিই যথার্থ মানুষ নামের যোগ্য।

দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং প্রধান শক্তি—সাধারণ প্রজা ; মঠ-মন্দির তাহার নীচে ; মঠ-মন্দিরের নীচে রাজা। গুরুত্বে জনসাধারণ জ্যেষ্ঠ ; রাজা সর্ব কনিষ্ঠ।

জলের ধারা পূর্বদিকেও বহিতে পারে, পশ্চিম দিকেও বহিতে পারে ; তাই বলিয়া নির্বিচারে নীচের দিকে গড়ায় বলিয়া, ঊর্ধ্বদিকে কখনো গড়াইয়া যাইতে পারে না। জলের যেমন স্বাভাবিক গতি নিম্নাভিমুখী, মানুষের তেমনি স্বাভাবিক গতি সততার অভিমুখে। জলে ঢিল মারিলে উহা উদ্ধত হইয়া উষ্ণীষে আসিয়াও লাগিতে পারে, বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে জল পাহাড়েও চড়ে। কিন্তু এই সব উন্মার্গগামিতা উহার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। ইহা বলপ্রয়োগের ফল, কৌশলের কর্ম। মানুষও যখন সততার বিরোধী কোনো আচরণে প্রবৃত্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে সে প্রকৃতিস্থ নয় ; বুঝিতে হইবে যে বাহ্যিক বলপ্রয়োগের ফলেই এই বিকৃতি। বাহিরের কৌশলে মোচড় খাইয়া সে নিজের স্বাভাবিক পথটি পরিত্যাগ করিয়াছে।

বুদ্ধি, বিবেচনা শক্তি, ন্যায়ানুবর্তিতা, এবং হিতৈষণা এ সমস্তই মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি; ইহা বাহির হইতে পাইবার নয়। ইহা চিত্ত-পুরুষের শীর্ষ, হৃদয়, বাহু এবং জঙ্ঘা।

জিহ্বা স্বাদু অন্নের অন্বেষণ করে, চক্ষু সৌন্দর্যের পক্ষপাতী, কর্ণ সুস্বরের প্রয়াসী, হস্ত পদ মাঝে মাঝে আরাম চায়; কিন্তু, সকল অবস্থায় সকল মানুষের পক্ষে এ সমস্ত সুখ-সম্ভোগ সহজ হইতে পারে না। সুতরাং "অমুক অমুক জিনিস না হইলে আমার চলিবেই না", এমন কথা বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের কথ্য হওয়া উচিত নয়।

মানুষ যতই মন্দ হউক, সে যদি চিত্তসংযম অভ্যাস করিতে পারে, তবে ভগবৎ-পূজার অধিকারী হয়।

হৃদয়টি যাহার শিশুর মতোন সেই মহাত্মা।

নিজের নির্লজ্জতায় যে লজ্জিত হয় ভবিষ্যতে সে আর লজ্জা পায় না।

তরবারির সাহায্যে যে জয় করে, সে হৃদয় জয় করিতে পারে না; যে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়া বশীভূত করিতে পারে, সেই জগতের মন পায়।

সম্রাট যদি ন্যায়-অন্যায় ভুলিয়া, কেবল, নিজ সাম্রাজ্যের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি রাখেন, তবে রাজপুরুষেরা নিজ নিজ পরিবারের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির দিকেই নজর রাখিবে; জনসাধারণ ব্যক্তিগত স্বার্থকেই পরমার্থ করিয়া তুলিবে। ছোট বড় সকলের মধ্যেই কাড়াকাড়ির একটা কোলাহল পড়িয়া যাইবে, সাম্রাজ্যের পক্ষে ইহা অমঙ্গলের কথা।

রাজ্যের সমস্ত গৃহে ও সকল পাঠশালায়, দৃষ্টান্ত ও উপদেশের দ্বারা যদি যথার্থভাবে পিতৃভক্তি ও জ্যেষ্ঠানুবর্তিতার শিক্ষা প্রচলিত করা যায়, তবে পলিত কেশ জরা-জর্জরিত বৃদ্ধ মুটিয়ার মোটবহনরূপ বিসদৃশ দৃশ্য জগৎ হইতে একেবারে লুপ্ত হওয়াও একদিন সম্ভব হইতে পারে।

হে সামন্তরাজ! তোমার কুকুরে ও শূকরে তোমার প্রজার অন্ন ধ্বংস করিতেছে; তুমি সঞ্চয়ের মাহাত্ম্য জান না। দুর্ভিক্ষে মানুষ পথে পড়িয়া মারা যাইতেছে অথচ শস্য-ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিতে তুমি কুণ্ঠিত! অনশনে মানুষ মরিতেছে, আর তুমি বলিতেছ, "দুর্বৎসর—আমি কি করিব?" যে লাঠি মারিয়া মানুষ খুন করে, সেও তো বলিতে পারে, "লাঠিটাই দুষ্ট, আমি

কি করিতে পারি? আমি নির্দোষ।" দুর্বৎসরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইও না;—অবিলম্বে রাজ্যের লোক তোমার আজ্ঞানুবর্তী হইবে।

আস্তাবলে তোমার ঘোড়াগুলির চেহারা বেশ পুষ্ট। গোয়ালে তোমার গরুগুলিও নধর; কিন্তু তোমার প্রজাদের মূর্তি দেখিলে উহাদিগকে সকল কালেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বলিয়া মনে হয়; শস্যক্ষেত্রে নরকঙ্কাল যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাকেই বলে বনের পশু দিয়া মানুষ খাওয়ানো।

পশুরা পরস্পরের হিংসা করে, স্বজাতির মাংস খায়; মানুষ সেইজন্য পশুকে ঘৃণা করে। আর মানব সমাজের তুমি রাজা, প্রজার তুমি পিতৃস্থানীয়; পশুর পুষ্টির জন্য সন্তানের প্রাণনাশ করা কি পিতার কাজ?

যে রাজা যথার্থ প্রজাদিগকে ভালবাসেন এবং দুর্দিনে তাহাদিগকে রক্ষা করেন রাজচক্রবর্তীত্ব তাঁহার অবশ্যম্ভাবী, কেহ উহা রদ করিতে পারে না।

মাছ খুঁজিতে যে গাছে ওঠে, সে যে ব্যর্থকাম হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

প্রতিকূল অবস্থাতেও যে মহত্ত্বের উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হয় তাহাকেই যথার্থ শিক্ষিত বলা যায়।

উদরান্নের অসংস্থান ঘটিলেও যে নীতিধর্মের কঠিন শাসন মানিয়া চলে সেই শিক্ষিত।

বাঁধা আয় না থাকিলেও যে বুক বাঁধিতে পারে সেই মানুষ। অবস্থার বিপর্যয়ে অধিকাংশ লোক নিজের নিজত্ব হারায়, এমন অবস্থায় নীতিধর্মের মুখ্য সূত্রগুলি জীবনের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখা সুকঠিন; কিন্তু যে রাখে সেই মানুষ; সেই প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়াছে।

রাজার বিধিব্যবস্থা ভাল হইলে প্রজা কখনো কুপথে যাইতে পারে না। ভক্তিভাজন পিতা-মাতা এবং স্নেহভাজন পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ যাহাতে প্রত্যেকের পক্ষেই সহজসাধ্য হইয়া ওঠে, রাজ্যে এমনি সকল বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হয়।

সুবৎসরে যাহাতে প্রত্যেক প্রজা উদ্বৃত্ত শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, রাজার সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। তাহা হইলে দুর্বৎসরে আর অনশনে লোকক্ষয়ের ভয় থাকে না।

সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিলে এবং আইনের দ্বারা ও শিক্ষার প্রভাবে অপচয় এবং অপব্যয় নিবারিত হইলে প্রজামাত্রেই খুশী থাকে ; সে অবস্থায় তাহারা রাজার প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে সহায় হইতে পারে। রাজার সংগত আজ্ঞা তখন তাহারা স্বেচ্ছায় এবং সানন্দেই পালন করে।

শৈশবে, মানুষ বাপ-মাকে ভালবাসে, যৌবনে স্ত্রী-পুত্রকে ভালবাসে। রাজার চাকরি পাইলে রাজাকে ভালবাসে ; আবার কর্তব্য করিয়াও রাজার মন না পাইলে ভিতরে ভিতরে জ্বলিতে থাকে।

প্রজার চক্ষু দেবতার চক্ষু, প্রজার কান দেবতার কান। প্রজা দেখিলে দেবতা দেখিতে পান, প্রজা শুনিলে দেবতা শোনেন।

যে ঘটনা বিশেষ কেহ ঘটাইল বলিয়া বোধ হইল না অথচ ঘটিয়া গেল, তাহা দৈব-ঘটনা ; যে কাজ বিশেষ কোনো ব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল বলিয়া মনে লয় না, অথচ সম্ভব হইল, তাহা দেবতার কর্ম।

বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে শৃঙ্খলার সূত্র আবিষ্কার করিতে পারে সে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অল্পবুদ্ধি-জনকে সেই নূতন তত্ত্বটি শিখাইয়া দেওয়া তাহার কর্তব্য। দেবতারা যাহাকে আগে খবর দেন সে যে তাহা নিজের মনের মধ্যে চাবি দিয়া রাখিবে দেবতাদের ইহা কখনই অভিপ্রেত নয়।

আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা সকলকে বুঝাইব; যাহা জানিয়াছি তাহা ঘোষণা করিব, যাহা পাইয়াছি তাহা বিলাইব।

নিজে কুঁজা হইয়া কে কবে অন্যকে সোজা করিয়াছে? নিজেকে কলঙ্কিত করিয়া দেশকে গৌরবান্বিত করিবে কোন্ কৌটিল্য?

কোনো মহাপুরুষ সাম্রাজ্যের ভার নিজের স্কন্ধে লইয়া দেশ ও জাতিকে উন্নত করিয়াছেন ; কেহ বা সাম্রাজ্যের কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া দিন কাটাইয়াছেন ; উভয়েরি কিন্তু এক আদর্শ—জীবনের পবিত্রতা ; এক উদ্দেশ্য—পবিত্রতার সম্যক সংরক্ষণ।

বিবিধ

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত এবং বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত,
বিবিধ রচনাবলী, চিঠিপত্র ও গ্রন্থপরিচয়

কল-কল্লোলে ভারতের কোলে
খেলে শত নদী নদ,
ঈর্ষায় দহে স্বর্গও যার
হেরি রূপ-সম্পদ!

সাগর পরায়ে যত দিই পাড়ি
যত দূরে দূরে যাই
টানে মন প্রাণ হিন্দুস্থান,
হিন্দুস্থান, ভাই!

গঙ্গা! তোমায় সুধাই আজিকে
ওই তব কিনারায়,—
কত যুগ ধরি বাস মোরা করি
মনে কি আছে গো তায়?
পুরাণ-পন্থী, কোরাণ-পন্থী
হিন্দে মোদের ঘর,
ধরমের বাণী না শেখায়, জানি,
কলহ পরস্পর।
দুশমনি মোরা হারাম জেনেছি,
চিনেছি ভ্রাতৃ-প্রেম,
হিন্দের মোরা চির বাসিন্দা
হিন্দু ও মোস্‌লেম।
সময়-সাগরে বুদ্বুদ হেন
কত জাতি কত দেশ
দর্পে ফুলিয়া কাঁপিয়া ফাটিয়া
হইল স্বপ্ন-শেষ!
মিশর বাবিল মৃতের সামিল

গ্রীস আর নাই গ্রীস,
হারায়ে আপন সাধনার ধারা
ধুঁকিছে অহর্নিশ।
মানী রোম আর হিস্পানীয়া,
দেহ আছে প্রাণ নাই,
চির-প্রাণবান প্রাচীন মহান্
হিন্দুস্থান! ভাই!

ভারতী (ফাল্গুন, ১৩২৭)

'কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম্'

কাব্য-কোকিল ডাকলে পরেই শাস্ত্র শিকেয় উঠবে,
তালি-দেওয়া কাঁথার কদর ফাগুন এলেই টুট্‌বে;
কবি হয়ে জন্মেছে যে হৃদয়-রীতির ভক্ত,
শাস্ত্র মানা কানার মত একটুকু তার শক্ত।
সত্যিকারের কবি কবে শাস্ত্র মেনে চল্‌ছে?
'কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম্' শাস্তরই এ বল্‌ছে।
আসল কবির নাই কোনোদিন শাস্ত্র-জুজুর শঙ্কা,
শাস্ত্র চেয়ে প্রশস্ত যা' বাজায় তারি ডঙ্কা।
নকল কবি শাস্ত্র বুলির চিবিয়ে ম'ল চোক্‌লা
পুরুত সে নয়, প্রসাদ লোভে বয় পুরুতের পোঁট্‌লা।

পশু হতে মানুষ হবার হয় না বাঁধা রাস্তা,
শাস্ত্র চেয়ে মানুষেতেই কবির বেশী আস্থা;
মরা শাস্ত্র বাঁচিয়ে চলা ভূত-নাচানো কর্ম,
তাল-বেতালের যোগ্য ও যে নয় তো কবির ধর্ম

শাস্ত্র বাঁচুক কিংবা বাঁচুক ভাবনা কিছুই নাইকো,
মানুষ বাঁচুক—বাঁচুক হৃদয়, আমরা ইহাই চাই গো।
কাব্য-কথা কইলে, জানি, শাস্ত্র জ'লে মর্‌বেই,
ফাগুন এলে শুক্‌নো পাতা ঝরবে ও যে ঝরবেই।

বিচিত্রা (শ্রাবণ, ১৩৩৭)

গুঞ্জামালা

নগর-জনারণ্যে আমার মন নিরালা
গুঞ্জনেরি গেঁথেছে এই গুঞ্জমালা ;
আমি শুধু এনেছি তায় হিয়ায় বেঁধে,
দুঃখে-সুখে অনেক হেসে অনেক কেঁদে।

গুঞ্জাফলে মিটবে না গো কারোই ক্ষুধা,
গুঞ্জনে মোর নাই স্বরগের নাই গো সুধা।
নাই ভ্রমরের ছন্দে গভীর তত্ত্বকথা,
গুঞ্জনে রয় কিছু যদি—সে মত্ততা।

গুঞ্জাকে ফল বলিস্ নে কেউ—মিথ্যে কথা ;
বরং ওরে বল্ রে তোরা নিষ্ফলতা।
গুঞ্জালতা রাখব আমার কুঞ্জে তবু,
গুঞ্জনেরও রবে না মোর বিরাম কভু।

গানের নেশা পায় যারে তার শাস্তি ভারী ;
ভুল্‌ব ভেবে ভুল করি, হায়, ভুলতে নারি।
সকাল বেলার প্রতিজ্ঞা সে সাঁঝ না হতে
যায় ভেসে কোন্ গুঞ্জনেরি নূতন স্রোতে !

গুঞ্জাফলের খানিক রাঙা খানিক কালো,—
গুঞ্জনে মোর মিশিয়ে আছে মন্দ-ভালো ;
একলা লোকারণ্যে আমার মানস-বালা
গুঞ্জনেরি হার গেঁথেছে—গুঞ্জমালা।

বিচিত্রা (ভাদ্র, ১৩৩৭)

কে তুমি ?

কে তুমি ? কি তুমি চাও ? চাহ কীর্তি—অনন্ত জীবন ?
তুমি কবি ? স্বেচ্ছায় করেছ তুমি আত্মসমর্পণ
তীক্ষ্ণ তীব্র লোক-লোচনের এই চির-আলোচনা
অগ্নি-পরীক্ষার মাঝে ? হায় ভাগ্য ! হায় বিড়ম্বনা !
তবে এ চাপল্য কেন ? কেন তবে কেন হেন মতি ?—
অধমের পন্থা ধরি' কেন কর মানীর দুর্গতি ?
কেন এ মক্ষিকা-বৃত্তি ? কোথা হায় অবসান এর ?
ময়ূরের পুচ্ছ ছিঁড়ি' শোভা কি বাড়িছে বায়সের !
অমর করিতে নাম কলঙ্করে করিছ অমর,—
সে কথা ভেবেছ কভু ? কিংবা জানিয়াছ অতঃপর
খ্যাতির নাহিক আশা ; নৈরাশ্যের দুঃসাহসে তাই
ফিরিছ দস্যুর মত,—উৎপীড়িত করিয়া সদাই
স্বর্ণ সম পূজ্য জনে। আর নাহি চাহ খ্যাতি-মধু,
নামের ক্ষণিক নেশা,—তুমি চাহ—উপখ্যাতি শুধু।[১]

মানসী (পৌষ, ১৩১৬)

---

১. এই কবিতাটি সম্ভবতঃ কোনো রবীন্দ্র-বিদ্বেষীকে উদ্দেশ্য করে রচিত।

দশপদীর স্বরূপ

মাথার উপর টাক যেমন টাকের উপর
সিঁথে,—
জুতার উপর পাঁক যেমন অভদ্র
বৃষ্টিতে,

নাকের মধ্যে ফাঁক যেমন ফাঁকের মধ্যে
মাছি,—
মাছির সঙ্গে সুড়সুড়ি ও কাশির সঙ্গে
হাঁচি,—

শুকনো ডালে কাক যেমন কাকের মুখে
রা,—
গোলাপ ফুলের বাগিচাতে শুঁয়োপোকার
ছা,—

বিজয়াতে বৃষ্টি যেমন দোলের দিনে
হি হি,—
বন-বিড়ালের সিংহনাদ ও গাড়ির গরুর
চিঁহি,—

চর্বি-প্রধান ঘৃত যেমন জল-মিশানো
খাঁটি,—
গ্রীষ্ম রাতে ছারপোকা ও ছেঁড়া শীতল-
পাটি,—

বোবার যেমন সংগীতেচ্ছা খোঁড়ার যেমন
নৃত্য,—
প্রভুর পোশাক উল্টা যেমন পরে গ্রাম্য
ভৃত্য,—

তেমনিতর দশপদী তেমনি পরি-
পাটি,—
চৌদ্দপদীর চার পা যেন কে নিয়েছে
কাটি !
হায় রে সনেট ! কাঁকড়া ক'রে কে দিল রে
তোরে ?
চারখানা পদ লুকিয়ে সে জন রাখলে কিসের
তরে !—
চোখ আছে যার দেখ ওগো দেখ নয়ন
মেলি'—
পেত্রার্কের পিণ্ড এবং চৌদ্দপদীর
জেলি !
একাধারে ভাষা এবং ভাবের অপ-
চার !-
উপকবির সৃষ্টি-বাতিক বেজায় অত্যা-
চার !
নূতন কাণ্ড দশপদী পিপীলিকার
পাখা !
নকল দাঁতের দেঁতো হাসি আগাগোড়াই
ফাঁকা !
অবাধ-গতি চল্‌ছে !—যেমন কাঁসা সীসার
টাকা !
কিংবা কাঁচা পথের কাদায় গরুর গাড়ির
চাকা !
বোক্‌ড়া চালের 'ওগ্‌রা' এ যে তলায় এঁকে
যাওয়া।
বন্ধ্যা-নারীর পুত্র !—আহা, তাও সে পেঁচোয়
পাওয়া !

সোনার গাছে মানিকের ফুল তুলতে এসে
হায়,
রাক্ষসে এই লোহার মটর চিবাতে প্রাণ
যায় ;
হচ্ছে পাঠক-পাঠিকাদের পরীক্ষা অদ্-
ভুত !
লাভের মধ্যে—'ভগ্ন-দন্ত-চিকিৎসকের'
যুৎ !

মানসী (মাঘ, ১৩১৬)

দশপদী

(কিন্তু কবিতা নহে)

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানব, হস্তী সম মস্ত মোটেই নহে,
তারি ইচ্ছামত তবু হস্তী তারে বহে মাথায় করে ;
ইচ্ছা এবং বুদ্ধিতে তার সূর্য তারি শত্রু-তরী দহে,[১]
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ উড়ায় ক্ষুদ্র মানব বজ্র-শিখা ধরে।
সৃষ্টিতরুর শ্রেষ্ঠ-কুসুম নরে হতভাগ্য বলে কে সে ?
ভিতরে তার নৃসিংহদেব, তারে আঘাত করে কাহার সাধ্য ?
বিবর্তনে নির্বাচিত, ক্ষুদ্র মানব আসেনিকো ভেসে ;
মুক্ত, অভিব্যক্ত তারে কর্তে স্বয়ং বিধাতা যে বাধ্য,
বিশ্ববীজের বিকাশ তরে, দিতে তারে বিধিমতে সুখ,
বৃদ্ধ হলেও, আশঙ্কা হয়, আছে বিধির বুদ্ধি ততটুক্।[২]

---

১. একজন গ্রীক দেশীয় বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিতে এইরূপ ঘটনা ঘটেছিল।

২. 'দেবালয়' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭) পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথের এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়, উক্ত পত্রিকারই বৈশাখ সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'দশপদী কবিতা'র উত্তর হিসাবে। এ সম্পর্কে 'মানসী' (আষাঢ়, ১৩১৭) পত্রিকার 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনায়' প্রকাশিত হয়—"দশপদী

(কিন্তু কবিতা নহে) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত। বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'দশপদী'র উত্তরস্বরূপ লেখা হইয়াছে। কবিতা হিসাবে ভাল না হইলেও, ইহাতে মানুষ সম্বন্ধে নীচু ধারণাটুকু নাই। এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। দুটি কবিতা পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।"

এস্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এই কবিতাটি তাঁহার কোন গ্রন্থে এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'দশপদী কবিতা'টি এইরূপ—

ওরে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র! দাঁড়িয়ে আছো এমনি দর্পভরে;—
ইচ্ছা—একটি পাদক্ষেপে অতিক্রমণ কর এই ধরায়,
ইচ্ছা যে ভ্রূক্ষেপে তোমার—গিরি-শৃঙ্গরাজি খ'সে পড়ে,
ইচ্ছা যে ইঙ্গিতে তোমার সূর্য এসে পদতলে গড়ায়!
হারে হতভাগ্য! উড্ডীন রে পতঙ্গ সৃষ্টির মহা ঝড়ে!
উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত সদা শুষ্ক তার পাদঘাত যোগ্য!
যতক্ষণ না নীচে পড়—জড় জীব মিশে যাও জড়ে।
তোমার এ আস্পর্ধা ভাবো সৃষ্টি শুধু তব উপভোগ্য?
ভাবো যে বিধাতা বাধ্য তোমায় শুদ্ধ দিতে হেথা সুখ!
—তোমার সুখ কি তোমার দুঃখ এ ব্রহ্মাণ্ডে বাধে কতটুক!!!

দেবরাত

'তত্ত্ব' ভুলেছিনু আমি 'উপাধি'র লোভে
ভুলেছিনু সারদে তোমায়;
সহসা শোকের ঝড়ে—মনের সংক্ষোভে
ক্ষুব্ধ আমি, ডাকি তোরে, আয় মাগো আয়!

আজ গাহিব না গান আনন্দ-লহরী,
গাঁথিব না বন্দন-মালিকা;
আজ শুধু তুলসীর মঞ্জুল মঞ্জরী
দিব জলে, নিবাইব শোক-বহ্নি-শিখা।

একা, হায় ! আজ আমি নিতান্ত একাকী—
দেবরাত ! তুমি আজ নাই !
আজ আমি সঙ্গীহীন, মিথ্যা হবে নাকি
এ সংবাদ ?—কুসংবাদ, সত্য সে সদাই।

শূন্য আজি গুরু-গৃহ, শূন্য তপোবন,
বক্ষে গুরু মৌনতার ভার ;
মনের জগতে মোর মারী হয়ে যেন
একদিনে হয়ে গেছে সব ছারখার।

আজ হতে একা আমি ভ্রমিব এ বনে,
তুমি আর আসিবে না ভাই ;
অশ্বিদ্বয় সম মোরা ছিনু দুইজনে,
আজ আর দুই নাই—ভাবি শুধু তাই।

আমাদের মনে ছিল সংকল্প অনেক ;
দুটি মন দৃপ্ত তেজীয়ান ;
বৃথা হ'ল আশা তরু-মূলে জলসেক,
অঙ্কুরে শুকায়ে গেল—সব অবসান।

দেশের গৌরব কোথা, গৌরব ভাষার,
কোথা হায় উদ্দেশ্য মহান্—
পুণ্য ভাব-উদ্বোধন ? হায় রে আশার
দাস !—বৃথা, সব বৃথা, আশা অভিমান !

শুক্রের শিষ্যত্ব আমি লয়েছিনু ব'লে
ক্ষুণ্ণ তুমি হয়েছিলে ভাই ;
কালের শাসনে আজ তুমি গেছ চ'লে,
ক্ষুণ্ণ আমি, মর্মাহত, শূন্য-পানে চাই !

শূন্যে উঠিয়াছে আজ পূর্ণিমার চাঁদ,
কবি তুমি দেখিবে না তায় !
কোথা তুমি ? কেন হায়—মৌন মনোসাধ ;
অশ্রু আজ আঁধার করিছে পূর্ণিমায় !

বসন্ত আসিবে ফিরে দুই চারি দিনে,
তুমি একা রহিবে নীরব ;
পল্লবিত মুকুলিত রমিত বিপিনে
তুমি শুধু জানিবে না বসন্ত-উৎসব ।

মুকুলে আশ্চর্য গন্ধ—সুপক্ক ফলের,
জানিতাম মোরা সে বিশেষ ;
আজ মনে পড়ে কথা সুদীর্ঘ কালের—
দুঃখ শুধু সে মুকুল হ'ল স্বপ্ন-শেষ ;

হ্রদ-তীরে পল্লবের লম্বশাটপটে
সাজে পুনঃ 'বৃক্ষ-সভাসদ',
কাহারে বলিব ? তুমি নাহি যে নিকটে—
দূর হতে দূরে গেছ চ'লে । সেই হ্রদ—

শোভিত পলাশ ঘাসে তেমনি দু'কূল,
নেচে ফিরে খঞ্জন শালিক ;
জলে দোলে বারুণীর তরঙ্গিত চুল,
তুমি নাই, কে দেখিবে ? স্তব্ধ চারিদিক ।

শফরী লীলায় কাঁপে ছায়ার ভুবন,
মায়ার ভুবন কাঁপে তায় ;
কেন এ মায়ার মোহ, ছায়ার সৃজন,
কে বুঝিবে, কে বুঝাবে, জানে কেবা হায় ?

বর্ষাদিনে গুরু-গৃহে আমা দোঁহাকার
    শুরু হ'ত মেঘের গর্জন ;
তাছাড়া কিছুই কানে পশিত না আর,
ভেসে যেত উপদেশ—গম্ভীর বচন।

তারি সনে ভেসে যেত দূর ভবিষ্যতে
    কি কুহকে দোঁহাকার মন ;
দেখিতাম সাম্য-রাজ্য বিস্তৃত ভারতে
সমুন্নত শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ।

জগৎ ভাসিয়া যেত ভাবের বন্যায়,
    বেঁচে থাকা হ'ত সে মধুর ;
মুছে যেত অত্যাচার ঘুচিত অন্যায়,
কোথা সে স্বপন আজি ? দূর—চিরদূর !

কালাগ্নি-জর্জর-তনু, শ্মশানে বর্জিত
    বন্ধুহীন হে বন্ধু আমার,
সর্বভুক বিশ্বগ্রাসী কাল-কবলিত ;
এ অশ্রু-তর্পণে জ্বালা জুড়াক তোমার।

উচ্চারিয়া মন্ত্র-বাণী যমে করি' জয়
    প্রাণ তুমি লভ' দেবরাত !
অমর বাণীর বরে হয়ে মৃত্যুঞ্জয়
ফিরে এস ; পুনঃ মোরা দোঁহে এক সাথ—

গাঁথিব অশোক-ফুলে বিজয়-মালিকা,
    নবগান গাব এ ধরায়,
পরাবে যশের টীকা কল্পনা-বালিকা,
প্রভেদ না রবে আর ধরা অমরায়।

এস মন্ত্রবলে হেরি মানবের মন,
তত্ত্ব তার শিখি সংগোপনে ;
এস মায়াবলে মোরা হেরি ত্রিভুবন,
এঁকে লই ছবি তার সজনে বিজনে।

'অনেক বলিতে আছে বাকী আমাদের'—
মুখে তব ছিল সদা ওই,
বলিলে দু'জনে মিলে বলা হ'ত ঢের,
দেবরাত ! একা আমি পারি তাহা কই ?

দেবরাত ! দেবরাত ! বাণীর সেবক !
দেবরাত ![1] নির্মল-জীবন !
দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মচারী উজ্জ্বল পাবক
কী নিদ্রায় মগ্ন হায়,—কি দেখ স্বপন ![2]

মাঘ, ১৩১১

---

১. "ঋষি দেবরাত"-এর পূর্বনাম শুনঃশেপ। শুনঃশেপ তাঁহার "জন্মহেতু আঙ্গিরস অজীগর্তের পুত্র" ছিলেন এবং "কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ" হইয়াছিলেন। ক্ষুধাপীড়িত অজীগর্ত একশত গাভীর বিনিময়ে তাঁহার পুত্রকে যজ্ঞের পশুস্বরূপ বিক্রয় করেন, এবং আরও দুইশত গাভীর পরিবর্তে যজ্ঞানুষ্ঠানে "নিয়োজন" (যূপে বন্ধন) করেন ও "শাস" (অসি) হস্তে "বিশসন" (বধ) করিতে প্রবৃত্ত হন। শুনঃশেপ ঋক্‌মন্ত্রের উচ্চারণে "দেবতার আশ্রয়" লইয়া পাশমুক্ত হন। অনন্তর তিনি উক্ত যজ্ঞের "হোতা" বিশ্বামিত্র ঋষির অঙ্কে দেবগণ কর্তৃক অর্পিত হইয়াছিলেন। "তদবধি শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের পুত্র দেবরাত (দেবদত্ত) নামে প্রথিত হইলেন।"

"ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" গ্রন্থের 'সপ্তম পঞ্চিকা'র 'ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে' প্রথম হইতে 'ষষ্ঠ খণ্ড' পর্যন্ত "শুনঃশেপের উপাখ্যান" বর্ণিত হইয়াছে।

দেবপ্রসাদে সতীশচন্দ্রও আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে পুত্রস্থানীয় হইয়াছিলেন।

—বিশ্বভারতী পত্রিকা (মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৪)

২. ত্রয়ী-বন্ধুরূপে খ্যাত রবীন্দ্রনাথের স্নেহবদ্ধ অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র রায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অলৌকিক প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা কেহই দীর্ঘজীবী ছিলেন না। বন্ধু-ত্রয়ের মধ্যে সতীশচন্দ্রের (জন্ম : মাঘ, ১২৮৮—মৃত্যু : মাঘীপূর্ণিমা, ১৩১০) মাত্র বাইশ

বৎসর বয়সে অকালমৃত্যুতে বান্ধব সত্যেন্দ্রনাথ যে বন্ধুকৃত্য করেন, তাহা তাঁহার এই 'দেবরাত' নামক কাব্যে ব্যক্ত হয়েছে। এটি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র ষষ্ঠ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৪) এবং তৎপূর্বে 'বিচিত্রা' (কার্তিক, ১৩৩৭) পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়।

ইঁদুরের মকদ্দমা

নেংটি বেচারা মারা গেছে কাল রাতে,
কালো বিড়ালের অসহ্য উৎপাতে।
যমের দুয়ারে আত্মাপুরুষ তার,
হাজির হইল করিবারে দরবার!
জোড় করি হাত আর্‌জি ধরিয়া দাঁতে,
নেংটির ভূত কহিছে নরক-নাথে;—
"অবধান প্রভু! নেংটি আমার নাম,
মর্ত্যে,—পিকিঙে,—ইঁদুর-গর্তে ধাম।
অনেক দুঃখে এসেছি প্রভুর কাছে,
কালো বিড়ালের নামেতে নালিশ আছে।
দেবতার দয়া, দশের আশীর্বাদে,
খেয়ে থাকি মোরা ফসল নির্বিবাদে;—
পঞ্চশস্য,—মটর, কলাই, ধান,
যব আর গম;—বিধাতার এ বিধান।
বিধির কৃপায় বাড়-বাড়ন্ত খুব।
জ্ঞাতি-কুটুম্বে ভরেছে পছিম-পুব।
আমাদের জ্ঞাতি, প্রথম,—কাঠবিড়ালী,
আর টিক্‌টিকি উঁচুতে যে ফেরে খালি;
বাদুড়কে মোরা মাতুল-গোত্র ধরি,
ছুঁচোদের ঘরে কেবল—বিবাহ করি।
নেউল, ভোঁদড় কুটুম মোদের সব,
মূষা-বংশের না জানে কে গৌরব?

এমন বংশে জন্ম মোদের, তবু,
রাত্রে কি দিনে স্বস্তি না পাই কভু !
কালো বিড়ালের জ্বালায় নাহিক সুখ,
সদা আতঙ্ক,—কেঁপে কেঁপে ওঠে বুক ;
দয়া সে জানে না, ঘটায় প্রাণের হানি,
নিরাপদে খেতে দেয় না অন্ন-পানি ;
ছিলেপিলে নিয়ে সংসার করা দায়,
শঙ্কা,—কখন, কোন্‌টাকে নিয়ে যায় ।
দিনে তার ভয়ে কোটরে লুকায়ে থাকি,
রাতে উঁকি দিয়ে দেখি বিড়ালের আঁখি !
খাদ্য খুঁজিতে বাহিরেতে ভয় বাসি,
সপরিবারেই থেকে যাই উপবাসী ;
ধরিতে পেলেই টুঁটি টিপে যাবে নিয়ে,—
আঙিনা ছাড়ায়ে—মরায়ের পাশ দিয়ে,—
জোর ঝাঁকানির চোটে নির্জীব করে,
নিরিবিলি ঠাঁয়ে নিয়ে যাবে ঘাড় ধরে,
নিশি-রাতে হায় নীরব অন্ধকারে,
ছায়ের গাদায় ফেলিবে পুখুর-ধারে ;
ছেড়ে দিয়ে তেড়ে কামড়ি' ধরিবে ফিরে,
লোনা রক্তটা চেখে চেখে খাবে ধীরে ;
কড়মড় করি' চিবায়ে গিলিবে শেষ,
ল্যাজা মুড়া সব,—ছাড়িবে না নখ কেশ !
এমনি করিয়া ইঁদুর অকালে মরে,
এদিকে তাহার পরিবার কাঁদে ঘরে ;
অভিভাবকের অভাবে ইঁদুর-ছানা,
বিদ্যা শেখে না, জঞ্জাল জোটে নানা ;
ইঁদুরের মেয়ে থুবড়ী থাকিয়া যায়,
পয়সা অভাবে ঘর-বর নাহি পায় ।

যে সংসারেতে কর্তা নাহিক মোটে,
সেখানে সবাই ধিঙ্গি হইয়া ওঠে।
না জানি আজিকে কি ঘটিছে মোর ঘরে,
ভাবিতে আমার পরান কেমন করে ;
অকাল-মরণে—মরেও স্বস্তি নাই,
হুজুরের কাছে হাজির হয়েছি তাই ;
ধর্মাবতার ! এ দুখ সহে না আর,
দোহাই তোমার, কর এর প্রতিকার ;
গরিবের প্রতি মুখ তুলে তুমি চাও,
ইঁদুর জাতিরে দাও গো অভয় দাও।"
আর্‌জি শুনিয়া যম কহে, "ইন্দুর !
নালিশ তোমার করিলাম মঞ্জুর।"
দাঁতের চিহ্ন যত ছিল গায়ে তার,
সব লিখে নিল যমের রিপোর্টার।
চিত্রগুপ্ত,—বাগায়ে, কলমটিকে,
কালো বিড়ালেরে ধরিবারে দিকে দিকে
পেয়াদা পাঠায়ে নিজে দিল যমরাজ,
পাজী বিড়ালের নিস্তার নাই আজ।
যমের পেয়াদা অর্থাৎ যমদূত,
ছুটিয়া চলিল বাঁকা পায়ে অদ্ভুত।
পাহাড়ে পাহাড়ে কালো বিড়ালেরে খোঁজে,
বনে-জঙ্গলে, আনাচে-কানাচে, খোঁজে।
এমনি করিয়া দিনরাত যায় কেটে,
ঘুম নাই চোখে, অন্ন নাহিক পেটে !
বিড়াল তো তারা দেখিল অনেকগুলি,
কোনোটা জর্‌দা, কোনোটা বা কটা-চুলি।
ধব্‌ধবে কেউ, কেউ বা চাঁদ-কপালি,
কালো বিড়ালেরি সন্ধান নেই খালি !

হয়রান হয়ে বসিল তাহারা ভুঁয়ে,
বটের তলায় মাথার পাগ্‌ড়ি থুয়ে।
সমুখেতে ক্ষেত, ঝোপে পাখী গান গায়,
ফড়িং ঝিমায়, কড়ি-পোকা উড়ে যায়।
কাঠ্‌-পিঁপড়েরা গড়িছে পাতায় বাসা,
শুঁয়োপোকা করে সূতা দিয়ে যাওয়া-আসা।
মাথার উপরে মাকড়শা জাল বোনে,
হঠাৎ! ও কি ও?—কিসের শব্দ শোনে?—
ওই যে বিড়াল! বটের কোটরে ঢুকে,
শালিকের ছানা চিবায় পরম সুখে!
লাফায়ে উঠিল যমের পেয়াদা যত,
কালো বিড়ালেরে ধরিল বাঘের মত।
"খুনী আসামীরে ভাল করে নাও বেঁধে,"
কহে যমদূত। বিড়াল তখন কেঁদে
কহিছে, "দোহাই, ছাড়, খেয়ে আসি দু'টি,
দেহ যেন শোলা, আড়ষ্ট ল্যাজ—খুঁটি,
লট্‌পট ঠ্যাঙ্‌; কপাল এমনি ফাটা!
কাল থেকে খেয়ে রয়েছি মাছের কাঁটা!
দু'টি খেয়ে আসি একবার দাও ছেড়ে,
খেয়ে নিলে পরে চলিতে পারিব বেড়ে!"
"কোনো ফল নেই আমাদের কাছে কেঁদে,"
বলিয়া পেয়াদা ফেলিল তাহারে বেঁধে;
হিড়হিড় টানে দড়ি দিয়ে তার গলে,
বাসি-মুখে মেনি যমের বাড়িতে চলে।
আসামীর প্রতি করি কটাক্ষপাত,
রেগে যম বলে, "ওরে বেটা বজ্জাত,
নেংটিরে খুন ক'রে, তুই বেটা পাজী,
যমের সঙ্গে করিস্‌ মামদোবাজী?—

পালিয়ে বেড়াস্ ?—যমদূতে দিস্ ফাঁকি ?
তবে মজা ছাখ্।" বিড়াল সজল-আঁখি
জোড়হাতে বলে, "প্রভু, আমি নির্দোষ,
আমার উপরে মিছে করিছেন রোষ ;
লউন অগ্রে গোলামের এজাহার,
নহিলে গরিব পাবে নাকো স্নবিচার।
ধর্মাবতার ! বিড়াল প্রাচীন জাতি,
প্রাচীন মিশরে বিড়াল চড়িত হাতী ;
পূজা হ'ত তার মন্দিরে মন্দিরে,
দেবতার মতো,—বলি-উপহারে, ক্ষীরে ;
পাজী ইঁদুরেরা 'পেলেগ' আনিল যবে,
পেলেগ দমন করেছিন্থ মোরা সবে,
বাঁচায়েছি দেশ নীলকণ্ঠের মতো,
ইঁদুরের সাথে পেলেগ করিয়া হত।
প্রাচীন ভারতে ষষ্ঠীদেবীর সাথে
পূজা পেয়ে থাকি ষেটেরা পূজায়, ভাতে ;
বামুনের মতো মোরা অবধ্য, আর
বিড়াল যে মারে বংশ থাকে না তার।
অতি-পুরাকালে স্বর্গ হইতে এসে
বসতি করিল বিড়াল ব্রহ্মদেশে ;
তখন সেখানে ইঁদুরের উৎপাতে,
রাজা-প্রজা কেউ ঘুমাতে নারিত রাতে।
'পাঁউ' নামে ছিল পূর্বপুরুষ মোর
রাজারে তুষিতে ধরিল অনেক চোর ;—
চোর ইঁদুরের বংশ করিল ক্ষয়,
বন্ধ হইল ফসলের অপচয়।
খুশী হয়ে রাজা করিল আইন জারি
যার বলে মোরা এখনো ইঁদুর মারি।

তাছাড়া মোদের জন্ম উচ্চকুলে।
বনেদী বিড়াল বেড়ায় পুচ্ছ তুলে।
সিংহের দিদি, বিড়াল বাঘের মাসী,
সবাই শিকার শেখে মোর ঘরে আসি ;
নেকড়িয়া, চিতা সবাই কুটুম মোর,
বানরটা বাদ,—কারণ, বানর চোর।
ওই কারণেই ইঁদুরকে ঘৃণা করি
ছিঁচকে চোরের ব্যাভারে সরমে মরি।
দল বেঁধে তারা দিনেও ডাকাতি করে,
মাচার উপরে বেড়ায় ভাঁড়ার ঘরে।
করে বাঁশবাজি! চ'ড়ে বসে কড়িকাঠে,
যা' পায় সমুখে 'কুটুর' 'কুটুর' কাটে।
উভ-পায়ে তারা বসিতেও বেশ পটু,
পুঁথি লয়ে যেন পড়ে ব্রাহ্মণ-বটু!
মন্দিরে রাতে ঠাকুরের নাক কাটে!
নিরিবিলি বসি' রংটুকু সব চাটে!
সরা উল্‌টায়ে হাঁড়ির ভিতরে ঢুকে,
ভাত চুরি করে পালায় গো এঁটোমুখে!
কেটেকুটে রাখে ভালো ভালো যত বই!
দলিল চিবায়, চেটে মেরে দেয় সই!
বর্ণিব কত? ঘাটি নাই কোনো গুণে,
নূতন গদিরে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে তুলা ধুনে!
নূতন বধূর ইয়ারিং চুরি ক'রে,
বিনা প্রয়োজনে নিয়ে যায় নিজ ঘরে!
চুরি করে তার চিরুনি চুলের দড়ি,
বধূ ঘরে ঢুকে দেখে সব ছড়াছড়ি!
পায় না নোলক, চাকরানী হয় দূষী,
বাবুদের হাতে চাকরেরা খায় ঘুষি!

ধিঙ্গি ইঁদুর ঢোকে যার-তার ঘরে,
সিঁধ কাটে, আর বে-আইনী কাজ করে ;
রাত্রে খোকার দুধের বাটিতে নায়,
ঝিঙুক বাজায় কিচিমিচি গান গায় !
পানের বাটায় রাখে সব ঘেঁটেঘুঁটে ।
চুনের ভাঁড়েতে পড়িলে তখনি উঠে
ভিজে ন্যাজ দিয়ে আল্‌পনা দেয় ঘরে !
মানুষের সাড়া পাইলে অমনি সরে !
মশারির চালে নিশীথে বসায় হাট,
পালঙের তলে ঘোড়দৌড়ের মাঠ !
কখনো লাফায়,—পিলসুজ উলটায়,
বিছানা বালিশে আগুন লাগিয়া যায় !
না-পোহাতে রাত গর্তে লুকায় গিয়ে,
গৃহস্থ ভাবে ভূতের কাণ্ড কি এ ?
গিন্নি বলেন, মিথ্যা বিড়াল পোষা,
ইঁদুরে ভাঁড়ার করেছে বাদুড়-চোষা !
কর্তাটি রেগে লাঠি নিয়ে করে তাড়া,
অভাগা বিড়াল মার খেয়ে হয় সারা !
ইঁদুর জাতির ধর্মাধর্ম নাই,
দোষ করে তারা, আমরা প্রহার খাই !
দোহাই ধর্ম ! মিথ্যা বলিনি আমি,
যা' বলি তা' ঠিক্ বিশ্বাস কর, স্বামী !
বিচার করিয়া দেখ আপনার মনে,—
বিড়াল জাতিরে দূষিছে কেমন জনে !
দেখ গো কেমন ফরিয়াদী মামলার,
আকার-প্রকার সকলি চমৎকার ,
চিম্‌সে চেহারা, চোরের মতোন চোখ,
মুখটা ছুঁচ্‌লো,—স্পষ্টই ছোটলোক ।

মোরা তপস্বী প্রাচীন বিড়াল জাতি,
প্রাচীন মিশরে আমরা চড়েছি হাতী ;
আমাদের নামে নালিশ করিছে কেটা ?
নর্দমা-বাসী নেংটি-ইঁদুর বেটা !
প্রভু শুনেছেন আরজি দু'পক্ষের,
এখন বুঝিয়া বিচার করুন এর ।"
কহে যমরাজ বিড়ালের কথা শুনি,
"বিড়াল খালাস ! ছেড়ে দাও এখ্খুনি ।
যাও পুষি ! তুমি মর্ত্যে বিরাজ কর,
ক্ষেত্রে-খামারে অবাধে ইঁদুর ধর ।
নেংটি বেটারে রাখ্ তো তুড়ুং ঠুকে,
মিথ্যা নালিশ ! ধর্মের সম্মুখে !"
এত বলি' সভা ভঙ্গ করিল যম,
ইঁদুরের পিঠে লাঠি পড়ে দমাদম্ ;
বিড়াল আবার মর্ত্যে আসিল ফিরে,
গর্তে লুকাতে হ'ল ফের নেংটিরে ;
সে অবধি লোক বিড়ালে যতন করে,
ইঁদুর বেচারা আঁধারে হাঁপায়ে মরে ।[১]

---

১. স্বর্গত লেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের জাপানী গল্পের ভাব নিয়ে লেখা সচিত্র 'ঝুমঝুমি' গল্পগ্রন্থের শেষ গল্পটি "ইঁদুরের মকদ্দমা" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পদ্যে রূপান্তরিত করেন। 'ঝুমঝুমি'র ভূমিকায় লিখিত আছে : "ইঁদুরের মোকর্দমা" নামক গল্পটি আমার প্রিয়সুহৃৎ সুকবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই গ্রন্থের জন্য পদ্যে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। কলিকাতা ১লা আশ্বিন, ১৩১৭।" এই গ্রন্থে গদ্যে লেখা আরও যে চারিটি গল্প আছে, সেগুলির নাম যথাক্রমে : শেয়ালের গল্প, পাখীর গল্প, অজগরের গল্প, কুকুরের গল্প।

'ঝুমঝুমি'র প্রকাশকাল : ১লা আশ্বিন, ১৩১৭। প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য : ছয় আনা।

নট-কবি গিরিশচন্দ্র

স্মৃতি-শেষ অতীতের ইতিহাস-আখ্যান-পুরাণ,
যাহার ইঙ্গিতে পুনঃ লভিয়াছে নূতন পরান,
কুড়ায়ে কঙ্কাল-মালা গড়েছে যে নব অবয়ব—
বিচিত্র-কর্মা সে কবি,—সৃষ্টি তার বঙ্গের গৌরব।

যাহার হৃদয়-লোকে জানিয়া লীলার যোগ্য ঠাঁই
জনমিল বারে বারে বুদ্ধ, কৃষ্ণ, শঙ্কর, নিমাই ;
বিশ্বামিত্র দেখাইল মানুষের তপস্যার বল,
ধন্য সে, হৃদয় তার নটেশ শিবের লীলাস্থল।

রাজপুতানার ভীষ্ম চণ্ডেরে যে দিল নব-কায়,
মুকুলের চিত্তকোষ মুঞ্জরিল যার প্রতিভায়,
অশ্রুর সায়রে হায় স্থাপিল যে প্রফুল্ল কমল,
বঙ্গের প্রিয় সে কবি,—খুলে দেয় হৃদয়ের দল।

নটের আদর্শ সেই, নাট্যের সে প্রথম আলোক,
বঙ্গ-রঙ্গ-ভুবনের গিরিশ, গিরিশ-লোকালোক,—
শীর্ষ তার ঘিরি' নিত্য আলো আর আধারের খেলা,
জীবনের মহারঙ্গ—হাসি ও অশ্রুর মহামেলা।

বিচিত্রা (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭)

যশ-অপযশ

গিরিধর

(হিন্দী কবিতার অনুবাদ। ছন্দের নাম কুণ্ডলী। ইহা হিন্দী সনেট)

রইল না কৈকেয়ী, অযশ রইল গো ভুবনে—
অভিষেকের দিনে সে যে রামকে দিল বনে ;

রামকে দিল বনে, স্বামীর আন্‌ল মরণ ডেকে,
যার তরে পাপ কর্‌ল এত, সেও জলে মুখ দেখে।
কয় কবিরায় এই দুনিয়ায় অমর শুধু এই-ই
যশ-অযশ এই রইল বেঁচে, রইল না কৈকেয়ী।

প্রবাসী (আশ্বিন, ১৩২৩)

কুসঙ্গে

আব্‌দুর রহিম

কুসঙ্গে কলঙ্ক রটে—যে দেখে সেই টোকে ;
শুঁড়ির হাতে দুধ-ভরা ভাঁড়,—মদ ভাবে তাও লোকে।

প্রবাসী (আশ্বিন, ১৩২৩)

পরবাসী

বৃন্দ কবি

পরের ছায়ায় বসে যেই সে যে নানামতে কানা হয়
রবি মণ্ডলে পশিলে চন্দ্র নিতুই কলা-ক্ষয়।

প্রবাসী (আশ্বিন, ১৩২৩)

কানু ও হনু

বৃন্দ কবি

ওঁছা যদি কিছু উঁচিয়ে বা করে কভু,—
তবু সে ওঁছাই, উঁচা সে হয় না তবু।
গন্ধমাদন হনু তো ধরেছে শিরে,—
গিরিধারী তবু তারে কেউ বলে কি রে ?

প্রবাসী (কার্তিক, ১৩২৩)

চুম্বন

(টুর্গেনিভ হইতে)

সে এক বসন্ত মধ্যাহ্নে, বনের মধ্যে একটা আঁকাবাঁকা পথ দিয়া আমি চলিয়াছিলাম।

সে বনের প্রায় সকল তরুগুলিই তরুণ, সকলগুলিই সুশ্রী। কোথাও খদিরের জীর্ণবল্কল শাখা আমলকী ও হরিতকীর সঙ্গে কিশলয় মিলাইয়াছে; কোথাও ভূর্জপত্রের ভুজঙ্গসদৃশ অঙ্গে তাম্বূলবল্লী তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে; কোথাও সপ্তপর্ণ, কোথাও ঘনশ্যাম তমাল, কোথাও বট, কোথাও দেবদারু; কৃষ্ণহরিৎ ও পাণ্ডুহরিতের বিচিত্রতার অন্ত নাই।

দিনটি দিব্য পরিষ্কার এবং বেশ একটু গরম। পল্লবের স্তর এতই নিবিড় যে সূর্য দেখা যায় না; কেবল নিম্নে পাখীর পালকের মতো লীলায়িত ঘন ঘাসের উপর আলো ও ছায়ার অবিশ্রাম লুকোচুরি খেলা চলিতেছিল। সেই চঞ্চল খেলা দেখিতে দেখিতে সহসা কোথা হইতে মানুষের একটি সঞ্চারিণী সান্দ্র ছায়া তৃণভূমির উপর লুটাইতে লুটাইতে একেবারে আমার সম্মুখের জায়গাটি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

চমকিয়া আমি পিছনের দিকে চাহিলাম; তবে এ বনের মধ্যে আমি একাকী নহি।

আমার দুই পা তফাতে একটি নারীমূর্তি পুষ্পিত তৃণবীথির উপর দিয়া লঘুচরণে ললিত গতিতে অগ্রসর হইতেছিল।

আমি মুগ্ধের মতো দাঁড়াইয়া রহিলাম। নারীমূর্তিটিও ঘনাইয়া একেবারে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমি একটিমাত্র চকিত-দৃষ্টিতে তাহার সূক্ষ্ম পরিচ্ছেদের ক্ষীণ রচনার ভিতর দিয়া তাহার দেবীর মতো মুখশ্রী এবং সুদুর্লভ অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া লইলাম। সে সুন্দরী এবং তরুণী, কিন্তু ইহার বেশী তাহার পরিচয় বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিলাম না।

হঠাৎ সে আমার আরো নিকটে আসিল এবং একটু ঝুঁকিয়া আমার ললাট চুম্বন করিল।

আমি কাঁপিয়া উঠিলাম। একটা অনির্বচনীয় আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া আমাকে যেন বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিল। আমি দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলাম। যে আনন্দস্পন্দন আমার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহার রম্য-আবেশ আমার ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইল। মুখ তুলিলাম···কিন্তু, হায়, তখন আর তাহাকে নিকটে পাইলাম না।

সে তখন পূর্বের মতো ললিত লঘুগতিতে লীলাভরে চলিয়াছে, প্রায় পূর্বের মতোই তাহার চরণ মৃত্তিকাস্পর্শ করিতেছে না। পিছনে তাহার দুইখানি পাখা,—মৌমাছির পাখার মতোই স্বচ্ছ, এবং এমন বেশী বড়ও নয়; ইহারই বলে সে অমন অবলীলায় চলিয়া যায়।

উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে আমি তাহার পিছনে পিছনে ছুটিলাম। সে আমার অধরে অধর সংযুক্ত করিয়া চুম্বন দান করিবে ইহাই আমার মনের অভিলাষ।

হায়, বৃথা অনুসরণ, বৃথা আহ্বান। সে ক্রমশঃ দূরেই সরিয়া যাইতে লাগিল।

সেই নারীমূর্তি অনুসরণ করিতে করিতে সহসা বনের মধ্যে একজন অল্পবয়স্ক পুরুষকে দেখিতে পাইলাম। সে নিতান্ত তরুণ, বালক বলিলেও চলে। তাহার গতির কোনো স্থিরতা নাই; সে কোথায় যে পা ফেলিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। তাহার সুন্দর অলকবেষ্টিত মুখখানি সর্বদাই ঈষৎ উন্নত। তাহার উজ্জ্বল এবং উৎসুক দৃষ্টি আনন্দের প্রাচুর্যে তাহার আগে আগেই ছুটিতেছিল; এবং তাহার মৃদু লোমাঙ্কিত আপুষ্ট অরুণ অধর স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত।

সহসা দেখিলাম, সেই নারীমূর্তি তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল; বালক সবিস্ময়ে চাহিল, তৎক্ষণাৎ তাহার বিতথ কেশগুচ্ছ যেন আপনা হইতেই কপোলের উপর হইতে সরিয়া একেবারে পিছনের দিকে গিয়া পড়িল। রমণীমূর্তি বালকের বিস্ময়-বিযুক্ত রক্তিম অধরে চুম্বনদান করিল···আমি স্বচক্ষে দেখিলাম।···

অকস্মাৎ রমণীর পরিচয় আমার কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল। বালকের পরিচয়ও গোপন রহিল না।

হ্যাঁ, সেই বটে,—ইনি সেই কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—ইনিই দিব্যদৃষ্টিদাত্রী,—ইনিই কবি-হৃদয় স্বর্গীয় তেজে উদ্বোধিত করেন।

আমি তাঁহার চুম্বনলাভ করিয়াছিলাম—ললাটে ; সে চুম্বন প্রাণহীন, অসম্পূর্ণ।

এরূপ চুম্বনে,—এরূপ লঘু উপহারে তিনি আমার[১] মতো গদ্য-কবিদিগকেই পুরস্কৃত করেন। যথার্থ চুম্বন কেবল সদানন্দ, ছন্দের গায়ক প্রকৃত কবিদিগেরই উপভোগ্য।

---

১. Turgnenieff রসাত্মক গদ্য রচনার জন্যই বিখ্যাত।

প্রবাসী (শ্রাবণ, ১৩১৭)

কালা ও গোরা

(১৭ই জুন, [১৯০৯-এর] 'নিউ এজ' হইতে)

সে আজ দুই মাসের কথা। ঘটনাটি নিউ অর্লিয়েন্স নগরের। সে দিনকার সেই আতপ-তপ্ত, বাষ্প-বিহ্বল, ধূলিসংকুল প্রভাতের আলো ধূসর কুয়াশার মতো নগর মধ্যস্থ কয়েদখানাটিকে যেন বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল।

ঘড়িতে তখন এগারোটা। ঐ সুবৃহৎ অনুতাপ-মন্দিরের সমস্ত সংকীর্ণ প্রবেশ-পথেই আজ অসম্ভব রকম জনতা। আধা-শহরে সাধাসিধা পোশাক-পরা কতকগুলা লোক শান-বাঁধানো পথের উপর স্থানে স্থানে ছোট ছোট দল পাকাইয়াছে, কেহ কেহ বড় বড় পাথরের সিঁড়ি বাহিয়া দ্রুতপদে গহ্বরের মতো বিশাল কারাবারের মধ্যে অন্তর্হিত হইতেছে।

চারিদিকেই ব্যস্ততা···চারিদিকেই ত্রস্ত আলাপের মৃদু গুঞ্জন···কি যেন একটা ঘটিবে। বাড়িগুলির সমতল ছাদে এবং কাঠের বারান্দাতেও লোক জমিয়াছে, ইহারা প্রায় সকলেই কাফ্রি···সকলেই একটু বিষণ্ণ। ইহারা চুপি চুপি কানাকানি করিয়া কথা কহিতেছে এবং যখন গোরার দল উচ্চহাস্য করিতেছে (গোরারা আজ বড় প্রফুল্ল), কালার দল শিহরিয়া উঠিতেছে।

কারা প্রাচীরের মধ্যে, রোয়াকে, দালানে, উঠানে, খোলা সিঁড়ির উপর··· সর্বত্রই লোক। এবং পুলিশের উচ্চতম মাতব্বর হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম ভৃত্য পর্যন্ত সকলেই আজ স্ফূর্তিযুক্ত।

কিসের প্রত্যাশায় এই হর্ষ-চাঞ্চল্য? এ প্রশ্নের উত্তর সহজেই দেওয়া যাইতে পারে। আজ বেলা বারটার সময় দুইজন কালা কাফ্রির ফাঁসি হইবে। তাহার উপর চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে এখানে একটি লোকেরও প্রাণদণ্ড হয় নাই।

যিনি আমাকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, "ইহাই কি স্ফূর্তি করিবার যথেষ্ট কারণ নহে?" এবং তাহার পর কথার ভাবে এমন আভাসও তিনি দিলেন যে, তাঁহার পরামর্শে যদি এতদিন কাজ হইত তাহা হইলে সারা মার্কিন দেশে একটা কাফ্রিও আজ জীবিত থাকিত না। লোকটি অনভিজ্ঞও নহেন এবং নিতান্ত সাধারণ লোকও নহেন।...তাঁহার কথাগুলি পরিপাক করিতে যথেষ্ট সময় লাগিল।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট ত্রিতলের একটা ঘর হইতে আমি নিম্নের নীলবর্ণের রঞ্জিত ফাঁসিকাঠ এবং শ্বেতাঙ্গদের জনতা দেখিতেছিলাম। ঐ জনতার মধ্যে একজনও কাফ্রি দেখিলাম না। লোকগুলা দুপুর বেলায় রৌদ্র অগ্রাহ্য করিয়া নিতান্ত ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে শূন্য ফাঁসিকাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল,...এবং হাসিতে হাসিতে, শিষ্টালাপ করিতে করিতে, নিজের নিজের টুপির বাতাস খাইতে খাইতে ঐ স্বল্প-পরিসর ভীষণ মঞ্চটার দিকে ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছিল।

বেলা বাড়িতে লাগিল। রৌদ্রের তাপ দুঃসহ হইয়া উঠিল। সূর্যদেব মেঘের কেল্লার কিনারা হইতে অগ্নিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।...যে ঘরে আমরা বসিয়াছিলাম তাহা ক্রমশঃ রিপোর্টারে ভরিয়া উঠিল। এমন সময় দূর হইতে যন্ত্রে এবং করুণ-কণ্ঠে স্বর উঠিল...

"আরো কাছে, হে প্রভু! তোমার আরো কাছে!" "আমি ঐ গানটার উপর হাড়ে চটিয়াছি!" নিজের বিরক্তিটা ভাল করিয়া জানাইবার জন্য, ঘরের মেঝের উপর ঘৃণার সঙ্গে থুথু ফেলিয়া, একজন লোক—সম্ভবতঃ একজন গবর্নমেন্টের কর্মচারী—বলিয়া উঠিল, "আমি ঐ সুরটার উপর বিরক্ত হয়ে গেছি, ফাঁসির হুকুম হওয়া পর্যন্ত হতভাগারা ঐ সুরটা কানের কাছে ক্রমাগত ঘ্যানোর ঘ্যানোর কচ্ছে।"

আমি ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "উহাদের কি জন্য ফাঁসি

হইতেছে?" এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইলাম যে, আমি এখানে নূতন আসিয়াছি। যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি প্রথমে গুঁড়া তামাকে নিজের পাইপটি ভরিয়া অবসর মতো আমাকে বলিলেন, "ঐ কাফ্রি দু'টা··· (জ্যাক্ পিয়ার ও এডুয়ার্ড অনরে) Council of God নামক একটা ধর্মসম্প্রদায়ের সভ্য। তাহাদের বিশ্বাস এই পৃথিবী কৃষ্ণাঙ্গের পক্ষে নরক, তবে মৃত্যুর পর উহারা শ্বেতচর্ম লইয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে এবং ঈশ্বরের নির্বাচিত সন্তানদের মধ্যে স্থানলাভ করে। জ্যাক পিয়ারের বাড়িতে উহারা সভা করিয়া এইরূপ প্রায়ই গণ্ডগোল করিত। প্রতিবেশীরা উহাদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত পেশ করিল। আবেদনের ফলে ১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে একদিন সন্ধ্যার সময় পুলিশ কর্মচারী গ্যাব্রিয়াস তদন্ত করিতে গিয়া সহসা তাহাদের সভা ভাঙিয়া দিতে হুকুম দিলেন। ইহাতেই ঐ নিগ্রো দুইটা··· অথবা উহাদের দলের আর কেহ···(সে বিষয়ে এখনো একটু খটকা রহিয়া গিয়াছে।) গ্যাব্রিয়াসের গলা কাটিয়া সাধারণ রাস্তার ধারে লাশ ফেলিয়া দেয়···আজ সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত।"

সহসা গানের শব্দ থামিয়া গেল।···"ঐ যে ফাঁসির হুকুম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে," আমাদের পাণ্ডাটি বলিতে লাগিলে, "পনরো জন সাক্ষীর দস্তখতটা হইয়া গেলেই আসল তামাশা আরম্ভ হইবে।" এই লোকটার এ বিষয়ে অদ্ভুত রকমের উৎসাহ দেখিলাম। কাছাকাছি যত লোক ছিল তাহাদের প্রত্যেককে (এবং সময়ে সময়ে সমবেত ভাবে) এই বিষয়ের নানা তথ্য আগ্রহের সঙ্গে জানাইতে ছিল। এবং ইহারি মধ্যে কাহারও ঐ বীভৎস ব্যাপার দেখিবার একটু অসুবিধা হইতেছে বুঝিলে যথেষ্ট শিষ্টতাসহকারে তাহাকে সম্মুখের দিকে জায়গা করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল।

সে কহিল, "আমি আঠারটা ফাঁসি দেখিয়াছি। কিন্তু এবার যেমন মজা অনুভব করিতেছি এমন কখনও করি নাই।" সন্তুষ্টচিত্তে পাইপ টানিতে টানিতে লোকটা ক্রমশঃ জানালা হইতে হাড়গিলার মতো অর্ধেকটা শরীর বাড়াইয়া দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। উহার কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া বিতৃষ্ণায় আমাকে যেন বুড়া করিয়া ফেলিল।

এই সময়ে একটা গুণ্ডা গোছের লোক ফাঁসিমঞ্চের উপর উঠিয়া রশারশি

নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল ;...এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সর্বজ্ঞ সঙ্গীটি বলিয়া উঠিলেন, "ঐ যে ঘাতক জনসন, আজ পঞ্চাশ-ষাট দিন ধরিয়া বেচারা প্রত্যহই ফাঁসির রশি লইয়া ফাঁদ ফাঁদিতেছে।" সকলে উদগ্রীব হইল। নিম্নে জনতার মধ্যে নূতন উত্তেজনার আবার একটা হল্‌হলা পড়িয়া গেল। বেলা নয়টা হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া লোকগুলা অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

মুহূর্তকালের জন্য সমস্ত নিস্পন্দ বলিয়া মনে হইল। জনসন রশারশির অবস্থা পরীক্ষা করিয়া নিঃসংশয় চিত্তে নামিয়া পড়িল। কাছাকাছি বাড়ি-গুলার বড় বড় ছাদ ছেলে-বুড়ার কালো কালো মাথায় ভরিয়া উঠিল ;... ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার ফটোগ্রাফের ক্যামেরা-আয়ুধে সসজ্জ।

"বাজি রাখ, আমি বলিতেছি জনসন অন্ততঃ আধ বোতল ব্রাণ্ডি টানিয়াছে ; ওরূপ একটা কিছু উদরে না পড়িলে ও লোকটা একেবারেই এ কাজে অসমর্থ হইয়া পড়ে।" কথাগুলি বলিলেন আমাদের পাণ্ডা।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "এ জন্য জনসন কি পাইবে?"

"যারে বলে পাওনা, দুইটাকে ঝুলাইয়া তিন শত ডলার।"

এই সময়ে কয়েদখানার পেটা ঘড়িতে দুঃখ-দুর্ভর গুরুগম্ভীর শব্দে ধীরে ধীরে বারটা বাজিয়া গেল। চারিদিকের বাতাস যেন মথিত সাগরের মতো ফেনিল হইয়া উঠিল। লোকে উৎকণ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এপাশ-ওপাশ করিল, কানাকানি করিল, কেউ থুতু ফেলিল।

একেবারে অনেকগুলা কীলকবদ্ধ লৌহকবাট উদ্ঘাটনের নিরানন্দ ঘর্ঘর শব্দ সহসা কর্ণে আসিয়া পৌছিল। "আসছে হে আসছে," পাণ্ডা রুমাল ঘুরাইয়া উচ্ছ্বসিত উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আসছে হে আসছে।" ঘন জনতার চাপা গলার হর্ষধ্বনি হিংস্র পশুর গর্জনের মতো শুনাইল। এই ঔৎসুক্য বীভৎস হইলেও সংক্রামক। এই "মহাযাত্রা" দেখিবার জন্য উদগ্রীব হয় নাই এমন একটি প্রাণীও ছিল না।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এ দৃশ্য যে দেখিয়াছে সে আর ইহজন্মে ভুলিতে পারিবে না। সর্বাগ্রে দৃঢ়পদে, উন্নত মস্তকে, চুরুট টানিতে টানিতে ঐ কাফ্রি দুইজন, তাহাদের সঙ্গে কয়েকজন রাজকর্মচারী, ইহাদের মধ্যে কেহই মাথার টুপিটা

খোলাও আজ আবশ্যক মনে করে নাই। মৃত্যুদেবতার সম্মানও কেহ রাখিল না। চিরপ্রচলিত প্রথার প্রতি সম্ভ্রমও কেহ দেখাইল না।

এই সম্বন্ধে একটা ক্ষুদ্র প্রতিবাদ উঠিতেই আমাদের অসহিষ্ণু জীবন্ত গেজেট বলিয়া উঠিলেন, "উহাদের জন্য টুপি কেন খুলিবে! উহারা কাফ্রি বই তো নয়! তুমি ইংরেজ, তুমি মার্কিন মুলুকের বর্ণভেদের মর্ম বুঝিবে না।"

এই ছোট দলটি শীঘ্রই বধ-মঞ্চের নিকটে পৌঁছিল। একটু দাঁড়াইতেও হইল; কারণ খর্বকায় এডুয়ার্ড অনরে মঞ্চে উঠিতে পারিল না, সাহায্যের প্রয়োজন হইল। তাহার পা টলিল, সে মুখ ফিরাইল। কিন্তু জ্যাক পিয়ারের প্রশান্ত গাম্ভীর্য একটুও টলিল না।

তাহারা, মঞ্চের উপর, দুইজনে যখন পাশাপাশি দাঁড়াইল; তখন তাহাদের গলার শুভ্র কলার তাহাদের পোশাকের এবং মুখের রঙের তুলনায় এত অদ্ভুত শাদা দেখাইতেছিল যে, তাহাতেও যেন তাহাদের অপরাধের একটা নূতন প্রমাণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। বোধহয় এইরূপ একটা কিছু মনে করিয়া জনসমূহ আনন্দ-গর্জন করিয়া উঠিল।

"বাপ! খুব দেখা হয়েছে," এই বলিয়া আবার পশ্চাতের একজন ভদ্র-লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাহির হইয়া গেলেন। হাজার হাজার লোকের মধ্যে ঐ একজন মাত্র।

নিস্তব্ধতায় হৃৎস্পন্দনের মধ্যে কাফ্রি দুইজনের হাত বাঁধা হইয়া গেল। উহারা প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া যেন কৌতূহল-দৃষ্টিতে নিম্নের উন্মুখ মুখগুলার দিকে চাহিয়াছিল—এই নিষ্ঠুর লোকারণ্যের মধ্যে উহারাই শুধু ভদ্রলোক।

তারপর জনসন যেমন প্রকাণ্ড কালো রঙের টুপিতে তাহাদের মুখ ঢাকিয়া দিতে গেল, অমনি জ্যাক পিয়ার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি নির্দোষ।" সমবেত লোকগুলা বিদ্রূপের স্বরে চেঁচাইতে লাগিল এবং ফাঁসি-মঞ্চের দিকে আরো ঘেঁষিয়া চলিল। সর্বসম্মতিক্রমে নিহত পুলিশ কর্মচারীর বৃদ্ধ পিতা একেবারে সম্মুখের স্থান অধিকার করিলেন। জনসন ফাঁস পরাইয়া বাম কর্ণের পাশে দড়িতে মোচড় দিয়া ভাল করিয়া গিরা আঁটিয়া দিল।

সমস্ত ঠিকঠাক। মুহূর্তকাল সকলে ভয়-সংকুচিত চিত্তে একবার ঐ

অবগুণ্ঠিত লোক দুইটির দিকে আর একবার ঘাতকের দিকে চাহিল। চক্ষের নিমেষে জনসন পিছনে হাটিয়া দাঁড়াইল। সকলে রুদ্ধশ্বাস। অকস্মাৎ দড়ি কাটিবার ছুরিখানা ঝকঝক করিয়া উঠিতেই সশব্দে কাফ্রি দুইজনের পায়ের নীচের যন্ত্র-চালিত গুপ্ত-কবাট সরিয়া গেল এবং দুইজন জীবন্ত মানুষ পুতুলের মতো ঝুলিয়া পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার মৌন পীড়ন কতকটা শিথিল হইয়া পড়িল। দর্শকেরা আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিল। ঘাতক কপালের ঘর্ম মুছিল! রাজপুরুষেরা নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ঠিক এই সময়ে একটা বীভৎস দৃশ্য দেখা গেল। দোদুল্যমান দুইটি দেহের মধ্যে একটির ঘাড় ভাঙিয়া পড়িয়াছিল এবং সমস্ত যন্ত্রণার শেষ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু জ্যাক পিয়ার তাহার ভারী দেহটা লইয়া তখনো ভয়ানক ঝটপট করিতেছিল। দড়িটা সজোরে এধার-ওধার করিয়া দুলিতেছে। লোকটার চোখ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মুখের চেহারা ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছে এবং হাঁটু দুইটা প্রায় চিবুকে গিয়া ঠেকিয়াছে। হাত পা বাঁধা থাকা সত্ত্বেও গায়ের কোটটা ছিঁড়িয়া একবারে দুই টুকরা হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কাহারো মুখে শব্দটি নাই। এই নির্মম পশুপ্রকৃতির লোকগুলার অন্তঃকরণও যেন ভাবী আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল। লোকটা এখনো বাঁচিয়া।...এখনো সে হাত খোলসা করিবার জন্য প্রাণপণ যুঝিতেছে। উপর হইতে ঘাতক জনসন তাহার দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

এই সময়ে, নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আমাদের পাণ্ডা বলিয়া উঠিলেন, "দেখ দেখি, আবার বেচারা জনসনকে ভোগাইবে, আবার ঝুলাইতে হইবে।" এইবার ঘাতকের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁহার কণ্ঠ গদগদ হইয়া উঠিয়াছে।

দশ মিনিট কাটিয়া গেল। এখনো কাফ্রিটা বাঁচিয়া আছে;....এখনো যুঝিতেছে!...বিশ্রী ব্যাপার...বিশ্রী।

আবার কাছের লোকগুলি মুখ পাংশু হইয়া উঠিয়াছে। ছুঁচ পড়িলে শব্দ শোনা যায়...চারিদিক এমনি নিস্তব্ধ। একজন ঘড়ি বাহির করিল।

"সর্বনাশ! তের মিনিট! হে ভগবান!" আরো, দুই, তিন, চার মিনিট

কাটিল···অভাগার এই নিষ্ফল তীব্র চেষ্টার কি অবসান হইবে না?···প্রায় পাঁচ মিনিট! রুক্ষ-ভগ্নস্বরে ভিড়ের ভিতর হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল, "দাও···
···দড়ি কেটে দাও।" এই সময়ে জ্যাক পিয়ারের প্রকাণ্ড শরীরের প্রচণ্ড আক্ষেপ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল এবং দড়িটা যেন একটা বিচিত্র তালে ধীরে ধীরে দুলিতে আরম্ভ করিল। শরীর স্থির—স্থিরতর হইতে লাগিল। সর্বাঙ্গে চূর্ণ তুষারের মতো ফেনপুঞ্জ দেখা দিল। তারপর দড়িটা একেবারে নিস্পন্দ হইয়া গেল। জ্যাক পিয়ারের যন্ত্রণা ফুরাইল।

অতঃপর আমাদের সর্বজ্ঞ পাণ্ডা মহাশয় জানালা হইতে উঠিয়া পায়জামার ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিতে লাগিলেন, "জনসন ঠিক ওজন বুঝিতে পারে নাই, অত ভারী শরীরের পক্ষে ঝুলটা নেহাৎ অল্প হইয়াছিল।"

উঠানে 'রক্তপাগল' লোকগুলা সমস্ত নিষেধ ঠেলিয়া শব দুইটা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ উহাদের রুমাল চাহিতেছে,···কেহ এক টুকরা ফাঁসির দড়ি···ইহাতে নাকি উহাদের অদৃষ্ট ফিরিবে।

প্রবল উত্তেজনার ঘূর্ণি লাগিয়া গেল। এই অবসরে আমি নীচে নামিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথে এখানে-ওখানে কাফ্রিরা জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং মধ্যে মধ্যে অব্যক্ত ঘৃণার বক্রদৃষ্টিতে আমাদের (অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের) দিকে তাকাইতেছে।

গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে শুনিলাম একজন লোক বলিতেছে, "ভালর মধ্যে এই যে, লোকটা কালা কাফ্রি।" আর একজন বলিল, "হ্যাঁ, তা বটে, উহাদের কষ্ট অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই।" প্রথম লোকটি মৃদু হাসিয়া বলিল, "বোধ তো হয় না। যে চেহারা।"

তাহারা চলিয়া গেল। তামাশা ফুরাইল।

চারিদিকেই ভিন্ন বর্ণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধের পূর্বভাব ঘনাইয়া উঠিতেছে। কে জানে ফলে কি দাঁড়াইবে?

প্রবাসী (অগ্রহায়ণ, ১৩১৬)

দিবাস্বপ্ন

(অলিভ শ্রীনার হইতে)

বাহিরে ছেলেরা খেলিতেছে ; ঘরে খোলা জানালায় উহাদের মা বসিয়া আছেন। জানালা দিয়া অপরাহ্নের তপ্ত হাওয়ার হল্কার সঙ্গে ছেলেদের কলরব আসিতেছে। কয়েকটা ভোমরা ফুলের পরাগে একেবারে হলুদ বর্ণ হইয়া ক্রমাগত ঘরের ভিতর দিয়া শিরীষ বনে আনাগোনা করিতেছে। তাহাদের গুঞ্জনের আর বিশ্রাম নাই।

স্ত্রীলোকটি একখানি নীচু চৌকির উপর বসিয়া সেলাই করিতেছেন ; সম্মুখে সেলাইয়ের বাক্স। হাঁটুর উপরে একখানি বই,—খানিকটা সেলাইকরা কাপড়ে প্রায় ঢাকা পড়িবার মতো হইয়াছে।

ছুঁচ-সূতার ডুব-সাঁতার দেখিতে দেখিতে স্ত্রীলোকটির চোখ ঢুলিয়া আসিতে লাগিল ; হাত আর চলে না। শেষে ভোমরার গুঞ্জনে এবং ছেলেদের কলরবে এমনি গোল পাকাইয়া গেল যে, তাঁহাকে চোখ দুটা বুজিতেই হইল। তিনি সেলাই রাখিয়া দিয়া হাতের উপর মাথা রাখিলেন। কয়েকটা ভোমরা আসিয়া তাঁহার কানের কাছে ঘুরিয়া-ফিরিয়া গুনগুন করিতে আরম্ভ করিল। ছেলেদের আওয়াজ কখনো দূরে কখনো কাছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল ; ঠিক যেন স্বপ্নের মতো ! তারপর সেই গুঞ্জন-কলরব হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল ; আর ঠিক সেই সময়ে, স্ত্রীলোকটি তাঁহার গর্ভশায়ী অষ্টম সন্তানটিকে যেন বুকের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলেন। তন্দ্রার ঘোরে, এমনি করিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে এক অদ্ভুত নাট্যলীলা জমিয়া উঠিতেছিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন ভোমরাগুলা ক্রমশঃ লম্বা হইতে হইতে শেষে মানুষের মতো মস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল ! উহাদের মধ্যে একটা আবার তাঁহার কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিল, "তোমার বুকের যে জায়গাটিতে তোমার শিশু ঘুমাইতেছে সেইখানটিতে আমায় হাত রাখিতে অনুমতি কর ; আমি উহাকে ছুঁইলে ও ঠিক আমারি মতো হইবে।"

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে বাছা ?" সে বলিল, "আমি স্বাস্থ্য ; আমি যাহাকে স্পর্শ করি তাহার শিরা-উপশিরায় রক্তের অরুণধারা নৃত্য

করিয়া ফিরে ; সে ক্লান্তি জানিতে পায় না, বেদনা বুঝিতে পারে না ; জীবন-যাপন তাহার পক্ষে আনন্দ-হাস্যের মতো সহজ হইয়া উঠে।"

আরেক জন বলিল, "উঁহু, অমন কাজও করিয়ো না। বরং, আমাকে ছুঁইতে দাও ; আমি হইতেছি ঐশ্বর্য ! আমি যাহাকে স্পর্শ করি, ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল বস্ত্রে বন্ধনের ভাবনা তাহাকে আর ভাবিতে হয় না। ইচ্ছা থাকিলে, সে অনেক দরিদ্রের অস্থি-মজ্জা পেষণ করিয়া অনায়াসে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইয়া লইতে পারে। দুই চক্ষু যাহা চায়, দুর্লভ হইলেও, আমার অনুগ্রহে দুই হস্ত তাহা পাইবেই। অভাবের কষ্ট সে জানিতেও পারে না।"

গর্ভস্থ শিশু পাথরের মতো নিথর হইয়া রহিল।

আর একজন বলিল, "দাও দাও, আমায় ছুঁইতে দাও, আমার নাম কীর্তি। আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহাকে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় বসাই—যাহাতে সকলে তাহাকে দেখিতে পায়। মৃত্যু তাহার পক্ষে বিস্মৃতির বৈতরণী নয়। যুগে যুগে তাহার নাম মুখে মুখে ফিরিতে থাকে। একবার ভাবিয়া দেখ—চিরস্মরণীয় !"

নিদ্রিতা নারীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস একভাবেই পড়িতে লাগিল ; স্বপ্ন কিন্তু ক্রমশঃই ঘনাইতে লাগিল।

এই সময় একজন বলিয়া উঠিল, "দাও দাও ! ওগো আমায় ছুঁইতে দাও, একটি বার আমায় ছুঁইতে দাও, আমার নাম ভালবাসা। আমি যাহাকে ছুঁই জীবনে সে কখনো অসহায় থাকে না ; অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়াইলে সে অন্ততঃ আর একখানি হাতের স্পর্শ পায়। জগৎ যদি বাঁকিয়া দাঁড়ায়, তবুও, এমন একজন তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেই, যে, জোর করিয়া বলিতে পারে, তুমি আছ আমি আছি !"

গর্ভশায়ী পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সকলকে ঠেলিয়া, এমন সময়ে একজন খুব ঘেঁষিয়া আসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "আমি ছুঁইব, আমার নাম নৈপুণ্য। যে সমস্ত কাজ পূর্বে কেহ করিয়াছে সে সমস্তই আমি অনায়াসে করিতে পারি। আমি যে যোদ্ধাকে ছুঁই সে 'মেডেল' পায় ; যে বিদ্যার্থীকে ছুঁই সে 'ডিগ্রি' পায় ; যে পণ্ডিতকে ছুঁই সে বড়মানুষ হয়, পাকা বাড়ি করে, গাড়ি চড়ে। সিদ্ধিলাভ তাহার

অবশ্যম্ভাবী। আর যে লেখককে আমি অনুগ্রহ করি সে বর্তমান ভাব ও রুচির উপরে উঠিতে পারে না বটে, নীচেও কিন্তু নামে না। আমি ছুঁইলে নিষ্ফলতার জন্য কাঁদিতে হয় না।"

ভোমরাগুলা উড়িয়া উড়িয়া নিদ্রিতা জননীর অলক-স্পর্শ করিতেছিল। স্বপ্নের ঘোর এখনো ভাঙে নাই। তাঁহার মনে হইতেছিল, ঘরের অন্ধকার কোণের দিক হইতে আরও একজন যেন তাঁহার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। উহার চেহারা শীর্ণ, চক্ষু উজ্জ্বল, মুখ হাস্যস্পন্দিত অথচ পাণ্ডুর। সে হাত বাড়াইল। স্ত্রীলোকটি সংকুচিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে তুমি?" সে উত্তর দিল না। তখন তিনি তাহার চোখের দিকে দৃঢ়ভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার ছেলেকে কী দিবে?—স্বাস্থ্য।" সে বলিল, "আমি যাহাকে স্পর্শ করি তাহার রক্ত জ্বরের জ্বালার মতো দুঃসহ তাপে জ্বলিতে থাকে। আমি যে জ্বালা দিয়া যাই তাহা চিতার জ্বলনের সঙ্গে একেবারেই নির্বাপিত হয়।"

"তুমি ঐশ্বর্য?" সে মাথা নাড়িল, বলিল, "না, আমি যাহাকে ছুঁই সে নীচে দেখে সোনা, উপরে দেখে জ্যোতি! জ্যোতির জন্য সে উর্ধ্বে চায়; হাতের সোনা খসিয়া পড়ে, পথের লোকে কুড়াইয়া লয়।"

"কীর্তি?" সে বলিল, "খুব সম্ভব তাহার উল্টা। আমি যাহাকে ছুঁই সে অনুর্বর মরু প্রান্তরের মধ্যেও, অদৃশ্য অঙ্গুলির নির্দেশে, সুপথের চিহ্ন দেখিতে পায়, সে পথ অন্যের অগোচর। তাহার গতি কিন্তু ঐ পথেই। সে পথ পাহাড়ের উপরেও তোলে, আবার, খদের তলেও ফেলিয়া দেয়।"

"ভালবাসা?" "ভালবাসা—সে চাহিবে, দুর্ভিক্ষের লোক যেমন করিয়া ভিক্ষামুষ্টি চায় ঠিক তেমনি আগ্রহেই চাহিবে; কিন্তু, পাইবে কিনা সন্দেহ। সে প্রাণপণে ভালবাসিবে, ঈপ্সিতের দিকে অন্তরের বাহু প্রসারিত করিয়া দিবে; কিন্তু নাগাল পাইতে না পাইতে দিগন্তের কোলে বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইবে! মুগ্ধ সে বিদ্যুতের দিকেই ছুটিবে। এবার তাহাকে একাই যাইতে হইবে; কারণ, যাহাকে সে ভালবাসে সে পাগলের সঙ্গে দুর্গম পথে চলিতে রাজী হইবে না। যখনি সে 'আমার' বলিয়া নিজের তপ্ত বক্ষে কাহাকেও নিবিড় করিয়া ধরিবে, তখনি সে শুনিবে, কে যেন বলিতেছে বর্জন কর,

বর্জন কর ; ও তো তোমার বাঞ্ছিত নয় ! ভুল করিও না ; তোমার গ্রহণীয় উহা নয় !"

"তবে ?—সার্থকতা ?" "না,—বরং ব্যর্থতা ! আমি যাহাকে ছুঁই, তাহার কামনার ধন অন্যে লাভ করিবে, কারণ, অশরীরী-বাণী তাহাকে আহ্বান করিবে। দিকে দিকে তাহাকে ছুটিতে হইবে। অলখ্, আলোক তাহাকে ইঙ্গিত করিবে, সে সংসার পাতিয়া এক জায়গায় বসিতে পারিবে না। তাহাকে ঐ বাণী শুনিতে হইবে, ঐ ইঙ্গিতের মর্ম গ্রহণ করিতে হইবে, সে পথের মাঝখানে দল-ছাড়া হইয়া পড়িবে ! সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, সাধারণ লোকে, যে তপ্ত বালুকা-বিস্তারকে মরুভূমি বলিয়া জানে, সে তাহারি মাঝখানে, একখানি নীলার মতো, স্নিগ্ধ নীল সাগরের দর্শন পাইবে। সাগরের মধ্যে দ্বীপ, দ্বীপের উপর পাহাড়, সেই পাহাড়ের চূড়া সে সোনায় মণ্ডিত দেখিবে।"

জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সোনার পাহাড়ে পৌছিতে পারিবে ?" পাংশু মূর্তির মুখ অপূর্ব কৌতুক-হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ? প্রসূতি আবার বলিলেন, "সে কি যথার্থ সোনা ?" সে কহিল, "যথার্থ আবার কী ?" প্রসূতি তাহার অর্ধ-নিমিলিত চক্ষের দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "ছুঁইয়া যাও !"

সে নত হইয়া নিদ্রিতাকে স্পর্শ করিল, এবং মৃদুস্বরে বলিল, "এই তোমার পুরস্কার, ধ্যানের বস্তুই তোমার কাছে সকলের চেয়ে বাস্তব হইয়া উঠিবে !"

গর্ভশায়ী শিশু আবাব পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিল। জননীর সুষুপ্তি গভীরতর হইয়া আসিল, স্বপ্ন তলাইয়া গেল। কিন্তু, তাঁহার গর্ভে যে অজাত শিশুটি শায়িত ছিল, সেও এক স্বপ্ন দেখিতেছিল। যে চক্ষে তখনো আলোকের সাড়া জাগে নাই, যে মস্তিষ্ক আজিও পূর্ণতা লাত করে নাই, তাহার মধ্যে আলোকের অনুভূতি বিদ্যুতের মতো খেলিয়া গেল। যাহা এ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও অনুভব করে নাই—সেই আলোক ! হয়তো সে যাহা কখনও দেখিবে না সেই আলোক ! যাহা অন্যত্র বাস্তব—সেই আলোক !

ইহার মধ্যেই সে ধন্য হইয়া গেল, অজানা ধ্যানের বস্তু তাহার কাছে বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে।

প্রবাসী (কার্তিক, ১৩১৮)

নব্য কবিতা

মানুষের তীব্রতম দুঃখ এবং জগতের প্রধানতম অভিযোগ এই যে, "কেহ কারো মন বোঝে না কাছে এসে ফিরে যায়।" মন বুঝিতে না পারিলে সহানুভূতি জন্মিতে পায় না, সহানুভূতির অভাব সহযোগিতাকে বিনষ্ট করে, ঐক্যকে স্থায়ী হইতে দেয় না। পৃথিবীর পনের আনা অসিযুদ্ধ ও পৌনে ষোল আনা মসীযুদ্ধের মূল মন বুঝিবার অক্ষমতা; সংসারে যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে এ কথা নূতন নয়।

মন বুঝিবার মন্ত্র যাঁহারা জানেন, মানবসমাজ তাঁহাদিগকে মহাপুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। মহাপুরুষদের মানসিক ক্ষমতা এবং মস্তিষ্কের শক্তি সাধারণের তুলনায় অনেক বেশী; কিন্তু মন বুঝিবার মন্ত্রটা ক্ষুদ্র মহৎ সকলের জীবনেই একান্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, কাঁটাগুল্মে গুলাব ফুটাইতে হইলে, সাধারণ মস্তিষ্ককে একটু বিশেষত্ব দান করিতে হইলে culture বা সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাই একমাত্র ব্যবস্থা; একটু ভাবের চাষ, একটু বুদ্ধির চাষ, একটু সহৃদয়তার চাষ। প্রকৃতি যাহার প্রতি কৃপণ, বিজ্ঞান তাহাকেও কৃপা করিতে প্রস্তুত।

Culture বা সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার দ্বারা চিত্তকে বিকশিত করিয়া তুলিতে না পারিলে, জগতের কোন বড় ব্যাপারের মর্ম বুঝিতে পারা যায় না, কোন সমস্যার দুই দিক দেখিতে না পাইলে তাহার সম্বন্ধে কোন ন্যায্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না; মানবজাতির বিচিত্র চিন্তা ও বিচিত্র ভাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইতে না পারিলে সম্পূর্ণরূপে মানুষ হওয়া যায় না।

"বহ্‌তা পানী নির্মলা বন্ধা গন্ধীলা হোয়।"

জগতের পরিবর্তনশীল চিন্তাস্রোতের সঙ্গে যে নিজের সংযোগ রক্ষা করিতে পারে তাহার চিত্তই নির্মল, সংকীর্ণ মন বাঁধা জলের মতো অল্পেই দুর্গন্ধ হইয়া উঠে।

বিচিত্রতার মধ্যে ঐক্য এবং ঐক্যের মধ্যে বিচিত্রতা জগৎ-সংসারের একটি সর্ববাদীসম্মত লক্ষণ। মানুষের অন্তঃকরণ নামক জিনিসটি অনেক সময় সৃষ্টিছাড়া বলিয়া মনে হইলেও ঐ লক্ষণোপেত; এবং অন্তঃকরণের সৃষ্ট সামগ্রী কাব্য-সাহিত্যেও ঐ লক্ষণ সংক্রামিত হইয়াছে। প্রাচীন কাব্য ও নব্য কবিতা

তুলনা করিলে এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায়। 'প্রাচীন' শব্দ আমরা এখানে 'আদিম' অর্থে ব্যবহার করিতেছি। কারণ, জগতের ইতিহাসে, যেখানেই সভ্যতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছে, যখনই ভাব ও চিন্তা জমিয়া উঠিয়াছে, তখনই নব্য কবিতার লক্ষণাক্রান্ত রচনা জন্মিয়াছে। চীন দেশীয় প্রাচীন কবিতা ইহার দৃষ্টান্ত। পিণ্ডার ও স্যাফোর রচনার তুলনা করিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে ; একটি আদিম, আরেকটি পরিণত ; একটি Classic আরেকটি Romantic, একটি উত্তম আরেকটি উচ্ছ্বাস। জার্মানীর কবি হায়েন বলিয়াছেন—

"Classic art had to portray only the finite and its form could be identical with the artist's idea. Romantic art had to represent or rather to typify the infinite and the spiritual."

প্রাচীনতন্ত্রের শিল্পীরা যাহা আঁকিয়াছেন তাহা সীমাবিশিষ্ট, আকারযুক্ত : শিল্পীর ধারণা সহজেই তাহার নাগাল পাইয়াছে। নব্যতন্ত্রের শিল্পীরা অন্তরের আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আধ্যাত্মিক ভাবকে ছাঁচে তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

নব্য কবিতা আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির লীলাভূমি, বিশ্বপ্রকৃতির মতো সে ইঙ্গিতে অনেকখানি বলে, ফুটিয়া কিছুই বলিতে চায় না। ওড়নার সূক্ষ্ম অন্তরালে সুন্দর চোখের মৌন দৃষ্টির মতো, কিছু না বলিয়াও সে অনেক বলে ; হেমন্তের হিমায়মান আকাশপটে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের নক্ষত্রপুঞ্জের নীরব সংক্রমণের মতো আলোক হয়তো সে যথেষ্ট দেয় না, কিন্তু আনন্দ দেয় প্রচুর। একজন সমঝদার সমালোচক বলিয়াছেন—

"About the best poetry there floats an atmosphere of infinite suggestion".

"Suggestion is the indirect evocation of an idea in the mind as the starting point of a process of thought and feeling."

শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণই এই যে, উহার চারিদিকে ভাবসূচনায় একটা অপরিমেয় আবহাওয়া উহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবেই।

যে কথা বা যে ভাব উল্লেখমাত্রেই গৌণভাবে মনের মধ্যে ভাব ও চিন্তার প্রবাহ মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাকে ভাবসূচনা বলা হয়।

ফরাসী-ভূমির ভাবুক কবি পল্ ভার্লেন বলেন—

"Que ton vers soit la chose envole'e
Qu'on sent qui fuit d'une a'me en alle'e
Vers d'autres cieux, a' d'autres amours."

কবিতা হইবে পক্ষযুক্ত পাখীর মতো, অপ্সরার মতো সে উড়িয়া চলিবে ; প্রয়াণ-চঞ্চল চেতনার পরিচয় তাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে ; অভিনব স্বর্গের অভিমুখে তাহার গতি ; নূতন প্রেমের মাদকতা তাহার চক্ষে।

হায়! অন্তরের এই অন্তঃপুরিকা, এই রহস্যময়ী, গোপনচারিণী 'চিত্তনন্দনের সুন্দরী কবিতা'-বধূটিকে তর্কের হাটে, যুক্তির হাসপাতালে হাজির করিয়া নেস্ত-ও-নাবুদ করিতে যাঁহারা কুণ্ঠিত হন না, তাঁহাদিগকে বিদগ্ধ বলিতে আমি কুণ্ঠা বোধ করিতেছি। সকল জিনিস হাত দিয়া ঘাঁটিয়া নষ্ট করা অপোগণ্ড শিশুদিগকেই শোভা পায় ; বয়স্ক লোকের পক্ষে চোখের দেখাই দেখা হওয়া উচিত। ক্ষুদ খুঁটিতে খুঁটিতে রত্নও পাওয়া যায়। কিন্তু, সে বস্তু যদি ঠোঁটের বলে না টুটে তাহা হইলেই কি উহাকে অপদার্থ মনে করিতে হইবে? মনে রাখা উচিত, জগতে ঠোঁটের বলই গুণ পরীক্ষার একমাত্র নিরিখ নহে।

সভ্যতার স্থায়িত্বের সঙ্গে মস্তিষ্ক-কোষের পরিণতির সঙ্গে মানুষের সাহিত্য-বোধের যে তারতম্য ঘটিয়াছে, তাহা অতীত যুগের অলংকার শাস্ত্রের মাপকাঠিতে আর ঠিক মতো মাপা যাইবে না। যুদ্ধের উত্তেজনা এবং হত্যা-কাণ্ডের নৃশংস বর্ণনা এক সময়ে এই মানবজাতিকে আনন্দদান করিত, সেদিন কিন্তু অতীত। এখন সূক্ষ্মতর তারে মৃদুতর স্পর্শে গভীরতর সংগীত উঠিয়াছে। এখন জাতীয় সংগীত, অনেকের প্রিয় হইলেও, কবিতা হিসাবে উচ্চ আসন পায় না। বামনেও যাহার নাগাল পায় সে যে আকাশের চাঁদ নহে সে কথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না।

গান ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতার মধ্যে ভিতরে ভিতরে বেশ একটু সাদৃশ্য আছে। যাঁহারা রাগ-রাগিণীর ভাব জাগাইবার ক্ষমতা স্বীকার করেন নব্য কবিতার মর্ম বুঝিতে তাঁহাদের কষ্ট হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সুর যেমন সূক্ষ্ম-সুকুমার আবেগ-বিভ্রমের পেলব ভাষা, নব্য কবিতাও তেমনি "subtle and delicate intrument of emotional expression." উহার ভাব ও ছন্দ জলের তরলতার মতো, সূর্যের উজ্জ্বলতার মতো একেবারেই অভিন্ন। সুরবাহার বাজাইতে হইলে যেমন কয়েকটা মাত্র তার স্পর্শ করিতে হয়, বাকী-গুলা ঝংকারের স্পন্দনেই ঝংকৃত হইতে থাকে, নব্য কবিতায় তেমনি আমাদের অস্থিমজ্জাগত কতকগুলি চিরন্তন ভাবের সূচনা দ্বারা আমাদের মস্তিষ্কের

বিশুদ্ধ কোমলসুর এবং অন্তরের বিভিন্ন সূক্ষ্ম পর্দাসমূহকে আন্দোলিত করিয়া তোলে। যখন যাহা কিছু হইতে মনের মধ্যে এইরূপে সাড়া জাগিয়া উঠে, তখনই আমরা প্রকৃতরূপে কাব্যামৃতরসাস্বাদ করিতে পারি এবং তাহা যে অমৃত তাহা শুধু এই অবস্থাতেই বুঝিতে পারি। আমাদের অন্তরের উদ্বুদ্ধিত পুরুষকে যে কবিতা 'বসন্তের বাতাসটুকুর মতো' ছুঁইয়া যায়, ছুঁইয়া যায়, এবং যেখানে একদিন কেবল পাতাই গজাইতেছিল, সেখানে একেবারে শত শত ফুল ফুটাইয়া যায়, তাহাই যথার্থ কবিতা, তাহাই শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং তাহাই সত্য কবিতা। উঁচুদরের সমঝদার না হইলে ইহার মানে বুঝিতে পারে না, ধরা যায় না। "Only the finer nerve and keener touch can follow"[১] এইরূপ কাব্যামৃত বিতরণ করিয়াছেন বলিয়াই Shelley ও রবীন্দ্রনাথ Poet of Poets নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সাধারণে যাঁহাদের কবি বলিয়া মানে, সেই সমস্ত কবিরাই একমাত্র ইহাদের কাব্যামৃতের যথার্থ অধিকারী।

দুঃখের বিষয় এরূপ কবিতা বেশী জন্মিতে পারে না, না জন্মিবার কারণও অবশ্য আছে। মনস্বী ওকাকুরা বলেন—

"The beauty of flower or a cloud lies in its unconscious unfolding of itself."

আপনার অজ্ঞাতসারে পাঁপড়ির পর পাঁপড়ি খুলিয়া যাওয়ার মধ্যেই ফুলের সৌন্দর্য, মেঘের চমৎকারিত্ব।

হৃদয়-শতদলের দলগুলি এমন করিয়া কবিতার মধ্যে খুলিয়া দিতে পারেন এরূপ কবি দুর্লভ, সেইজন্য এরূপ কবিতাও দুর্লভ।

অধ্যাপক ব্র্যাড্‌লে তাঁহার 'Oxford Lectures of Poetry' নামক নবপ্রকাশিত গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন—

"Pure Poetry is not the decoration of pre-conceived and clearly defined matter. It springs from the creative impulse of a vague imaginative mass pressing for development and definition. If the poet already knew exactly what he meant to say why should he write the poem? The poem would in fact already be written. For only its completion can reveal, even to him, exactly what he wanted. When he began and while he was at work, he did

১. Walter Pater

"মনোরাজ্য নামটি মধুতে ভরা,
ফুটে যেথা পারিজাত বিচরে গন্ধর্ব অপ্‌সরা !
দলি স্বর্ণরেণু চরে কামধেনু,
কল্পতরু ছায়াতলে রত্নে হাসে ধরা।"২

এখানে কবি কৌতূহলের চকমকি ঠুকিয়া অনাবিষ্কৃতকে আবিষ্কার করিতে করিতে মানব-মনের গুহা হইতে গুহান্তরে ক্রমাগতই চলিয়াছেন। আলোকের এক-একটা ঝলকে তিনি অনেকখানি দেখিয়া ফেলেন ;—কত অতীত বৈভবের ভগ্নাবশেষ, কত বিগত যুগের কেয়ূর কঙ্কণ, মুকুট কুণ্ডল, প্রসাধন সামগ্রী, ভিক্ষাপাত্র ; কত বন্দীর শৃঙ্খল, প্রহরীর লৌহযষ্টি, কত মগ্ন জাহাজের ভগ্ন নঙ্গর ; কত জীর্ণ কঙ্কাল, কীটদষ্ট কপর্দক, সিংহাসনের পুত্তলিকা ; কত অস্ফুট ভাব, কত অশ্রুত কাহিনী, কত অপূর্ব কাকলি ! তাঁহার চক্ষে নব নব দৃশ্য, তাঁহার অন্তরে নব নব উন্মেষ। এই অবস্থায় তিনি কি যে গাহেন, কি যে বলেন তাহা তিনি নিজেই জানেন না ; সে কথার অর্থ আছে কিনা তাহা তিনি একটুও ভাবেন না, ভাবা প্রয়োজন মনে করেন না। তখন তাঁহার কল্পনা 'ভরা পালে চলে যায়, কোন দিকে নাহি চায়' এবং বিচিত্র ভাবের 'ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু-ধারে।' কবিদিগের মনের এই অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া অধ্যাপক ব্র্যাড্‌লে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে লিখিয়াছেন—

"The glowing metal rushes into the mould so vehemently that it overleaps the bounds and fails to find its way into all the little crevices. But no poetry is more manifestly inspired, and even when it is plainly imperfect it is sometimes so inspired that it is impossible to wish it changed. It has the rapture of the mystic, and that is too rare to lose."

তখন তাপদীপ্ত তরলায়মান ধাতুধারা ছাঁচের সীমা ছাড়াইয়া উপচিয়া পড়িতে থাকে, নক্সার সমস্ত রন্ধ্রে হয়তো প্রবেশই করে না। কিন্তু যে জিনিসটি তৈয়ার হইয়া বাহির হইল, তেমন জিনিস জগতে অল্পই জন্মে। 'মৃত্তিকা উপরে জলের বসতি তাহার উপরে ঢেউ', এই সদ্যোজাত অপ্সরাটির আসন সেই চলমান ঢেউটির ঠিক উপরে।

"The light that never was on sea or land
The consecration, and the poet's dream."

ইহা সেই জ্যোতি যাহার স্পর্শ জলে স্থলে কোথাও পড়ে না, পড়ে শুধু কবির হৃদয়ে, স্বপ্নরাজ্যে।

২. স্বপ্নপ্রয়াণ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এইরূপ রচনার মধ্যে যেগুলি সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাহার মধ্যেও কতকগুলি এমনি দৈব-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত বলিয়া মনে হয়, যে তাহার একটি পঙ্ক্তিও পরিবর্তিত দেখিতে, ইচ্ছা হওয়া পর্যন্ত অসম্ভব। ইহা মন্ত্রদ্রষ্টার হর্ষোন্মাদে ওতঃপ্রোত, প্রত্যাদেশের মন্ত্রধ্বনিতে পূর্ণমান, এ জিনিস নিত্য পাওয়া যায় না; এমন দুর্লভ জিনিস ভাবুক লোকে, cultured লোকে হেলায় ঠেলিতে পারে না।

শেলি বলিয়াছেন যাঁহারা প্রকৃত কবি—

"They redeem from decay the visitations of divinity in man."

তাঁহারা মানুষের অন্তরে মাঝে মাঝে দেবতার যে আবির্ভাব হইয়া থাকে তাহা বিস্মৃতির কবল হইতে উদ্ধার করেন।

ইহাই তো চাই, কবির কাছে জগৎ ইহাই তো প্রত্যাশা করে।

মনস্তত্ত্ব-বিশারদ মনস্বী আলেকজাণ্ডার বেন্ বলেন—

"The aesthetic like the religious emotions send their roots far down into the opaque structure of the sub-conscious intelligence and hence the two are natural associates. Nature is not their standard, nor is objective truth their chief end."

সৌন্দর্যবোধের আনন্দ, ধর্ম বিষয়ে উচ্ছ্বাসের মতো, আমাদের চিত্তের যেখানটিতে শিকড় চালাইয়াছে সে জায়গাটি একপ্রকার অস্বচ্ছ, মগ্ন-চেতনার রাজ্য। সেখানকার কাজ জ্ঞানপূর্বক চেষ্টার সাহায্যে সংসাধিত হয় না।

এই দুইটি ব্যাপারের উৎপত্তি এক জায়গায় বলিয়া বিকাশও প্রায় পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। বহিঃপ্রকৃতি ইহাদের নিরিখ্ নয়, প্রকৃতির মাপকাঠিতে ইহাদের মাপা যায় না এবং বাস্তব-জগতের সত্যও ইহাদের উদ্দিষ্ট নহে।

আমাদের মনের এই মগ্ন-চেতনার রাজ্যে যে কত ঐশ্বর্য লুকায়িত আছে কে বলিতে পারে?

"Who dare measure the height and depth of subconscious intelligence? It draws its knowledge from sources which elude scientific research, from the strange powers which we perceive in insects and other lower animals, almost, but not wholly obliterated in the human line of organic descent; and from others now merely nascent or embryonic, new senses, destined in some far off aeon to endow our posterity with faculties as wondrous to us as would be sight to the sightless."[৩]

---

৩. D. G. Brinton.

একদিকে ইহার মধ্যে আমাদের পতঙ্গ জন্মের ও পশু জন্মের লুপ্তপ্রায়, নিগূঢ় রহস্যময়, বিজ্ঞানের অগম্য সহজ বুদ্ধির গুপ্ত নিদর্শনসমূহ বর্তমান; অন্যদিকে, ইহারই মধ্যে নব নব ইন্দ্রিয়ের বিকাশোন্মুখ মুকুলপুঞ্জ, বিধাতার বিধানে আমাদের ভবিষ্যবংশীয়দের জন্য, সুদূর অনাগত যুগের দিকে তাকাইয়া, যথাসময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

হৃদয়ের এই গভীর অতলে যে কবিতা প্রবেশাধিকার পায় মনীষিগণের মতে তাহাই শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং তাহাই নব্য কবিতা। ইহাই আমাদের অনাদি অনন্ত সত্তাকে (যে সত্তা বিশ্বসৃষ্টির সহোদর) আনন্দে উৎপূর্ণ করিয়া তোলে। ইহা স্মৃতির বাসি ফুলে জলের ছিটা দেয়, বর্তমানের টাট্‌কা ফুলে নূতন রকমের মালা গাঁথে, যে আশার কুঁড়ি ফুটে নাই তাহাকে প্রসন্নদৃষ্টিতে অভিনন্দিত করে। এইরূপ অপূর্ব সংগীত যে কবির মুখে মানুষ শুনিতে পায়, তাহাকে সে আনন্দে অধীর হইয়া বলে—

"Sing again with thy sweet voice revealing
A tone
Of some world far from ours
Where music and moonlight and feeling
Are one."৪

প্রকৃত কবিতার অর্থ, অভিধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহা উপলব্ধির বস্তু।

"Its meaning seems to beckon away beyond itself, or expands into something boundless which is only focussed in it; something which will satisfy not only our imagination, but our whole being."

সে ইশারায় আমাদের যতদূর অগ্রসর হইতে বলে, উহার নিগূঢ় তাৎপর্য আমাদের যেখানে পৌঁছাইয়া দেয়, ততদূরে সে নিজেও নাই। দেখিতে দেখিতে, আতসী কাচের কেন্দ্রপরাঙ্মুখ রশ্মিরাশির মতো সে অনন্তের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দেয়। সে যে শুধু কল্পনাকেই পরিতৃপ্ত করে তাহা নহে, সমস্ত অন্তরাত্মাকে আনন্দে আপ্লুত করিয়া দেয়।

কাব্যের যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে নিজের সংকীর্ণ ধারণা, ব্যক্তিগত রুচি বা সম্প্রদায়গত বিশ্বাসের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করিলে একেবারেই চলে না।

"দর ময়কদা জুজ্ নময়্ ওজ্, নতোয়ান্ কর্দ্।"৫

---

৪. Shelley
৫. ওমর খৈয়াম

মদের দোকানে আচমন করিতে হইলে মদের সাহায্যে সারিতে হয়। পূজার ঘরে প্রবেশ করিবার সময় কেহ লাঙল ঘাড়ে করিয়া কিংবা দাঁড়িপাল্লা সঙ্গে লইয়া যায় না। কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সেই রাজ্যের আইনকানুন মানিয়াই চলা উচিত; নহিলে পদে পদে হাস্যাস্পদ হইতে হয়; পদে পদেই বিপদ।

বিশ্বমানবের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে হইলে, জগতের বিচিত্রভাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইতে গেলে, যথার্থ মানুষ হইবার ইচ্ছা থাকিলে, অনেক দুঃখ সহিতে হয়; কষ্ট করিয়া নিজের মানসিক ক্ষেত্র হইতে অনেক আগাছা উপ্‌ড়াইতে হয়; তাহাকে কোদ্‌লাইতে হয়, নিড়াইতে হয়, উর্বর করিয়া রাখিতে হয়; নহিলে পরিণত মনের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়; কুণো হইয়া, সংকীর্ণ হইয়া থাকিতে হয়; মস্তিষ্কের সহস্রদল পদ্মটা রসের অভাবে, আলোকের অভাবে ভাল করিয়া ফুটিবার আগেই শুকাইয়া উঠিতে থাকে। 'সংসার-বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎ ফলে।' কাব্যামৃত রসাস্বাদ তাহার অন্যতম। সেই অমৃত ফল লক্ষ্মণের ফল ধরার মতো কেবল হাতে ধরিয়া বসিয়া থাকা ব্যর্থতারই নামান্তর। তাহাকে উপভোগ করিতে হইবে, যথার্থভাবে তাহাকে পাইতে হইবে। কবিতা বাগ্মিতা নয়, বাচালতা নয়, এমন কি রসিকতাও নহে। উহা শুধুই আন্তরিকতা; উহা একান্তরূপে অন্তরের সামগ্রী। এক অন্তরের অন্তঃপুর হইতে এই লজ্জাশীলা অন্তঃপুরিকা আরেক অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার জন্য যখন অভিসার করে, তখন তাহার অবগুণ্ঠন ধরিয়া টানিলে সে দ্বিগুণ লজ্জায় মুখ এমনি করিয়া ঢাকে যে, তাহা কোনোমতেই আর খুলিতে পারা যায় না। ভাষার শিবিকায় সে রাজপথেও যাতায়াত করে, কিন্তু দুয়ার বন্ধ করিয়া।

আধুনিক মনস্তত্ত্বের একটা গোড়াকার সিদ্ধান্ত এই যে, "We do not think, but thinking simply goes on within us."

মানুষ চেষ্টা করিয়া ভাবে না; ভাবনার ফল মানুষের ভিতর আপনা হইতেই চলিয়া থাকে। এই সহজ কথাটা যিনি বুঝিয়াছেন, নব্য কবিতা তাঁহার কাছে দুর্ভেদ্য-কঠিন তো নহেই,—বরং নিতান্ত সুগম,—ঠিক বজ্রসমুৎকীর্ণ মণির মতো।

প্রবাসী (মাঘ, ১৩১৭)

প্রজাতন্ত্রের রাজকবি

সকল দেশের রাজারা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকে সম্মানিত করিবার জন্ত তাঁকে রাজকবি বা সভাকবি বলিয়া বরণ করেন। কালিদাস ছিলেন বিক্রমাদিত্যের সভাকবি। ইংরেজ রাজারা বহু প্রসিদ্ধ কবিকে পর পর নিজেদের সভাকবি নির্বাচন করিয়া আসিয়াছেন—ইংলণ্ডের বর্তমান রাজকবি ডাক্তার ব্রিজেস। ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এশিয়ার রাজকবি—Poet-Laureate of Asia—বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি রাষ্ট্রের নাম নেব্রাস্কা; সে দেশে তো রাজা নাই, দেশ গণতন্ত্রের অধীন; তাই নেব্রাস্কার রাষ্ট্র পরিষদ নূতন আইন পাস করিয়া তাঁদের দেশের শ্রেষ্ঠ কবি জন জী নাইহার্টকে (John G. Neihard) রাজকবি (Poet-Laureate) নির্বাচিত করিয়াছেন। একজন রাজার খামখেয়ালী খুসীর বদলে দেশের সর্বসাধারণের বহু প্রতিনিধির নির্বাচনের মূল্য ঢের বেশী! নাইহার্টের দু'খানি কবিতা পুস্তক আছে—*The Song of Hugh Glass* এবং *The Song of Three Friends*; ১৯১৯ সালে আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা পুস্তক বলিয়া শেষোক্ত বইখানি Poetry Society Prize পায়। আমেরিকায় এখন নাইহার্ট খুব লোকপ্রিয় কবি—যেখানে-সেখানে নাইহার্ট-ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। নাইহার্টের একটি প্রসিদ্ধ কবিতার অনুবাদ আমরা এখানে দিতেছি।

কামনা

রক্ত গরম রয় যতদিন সেই ক'টা দিন বাঁচতে আমি চাই,
স্বপ্নচারীর সোমরসেরি নেশাতে চাই মরতে মাতাল হ'য়ে;
এই যে মোদের প্রাণ-নিকেতন কাদার গড়ন এই যে দেহ, ভাই,
দেখতে এরে চাইনে জীর্ণ,—পরিণত শূন্য দেবালয়ে।
তুরন্ত চাই চুকিয়ে যেতে, নিবে যেতে তেল ফুরোবার আগে,
ম'রে ম'রে চাইনে বাঁচা, মরতে আমি চাইনি র'য়ে র'য়ে;
ভরা দিনের আলোর পরেই পরান আমার গভীর নিশা মাগে,
চাইনে আমি থাকতে টিকে দীর্ঘ সাঁঝের দীর্ঘ ছায়া ল'য়ে।

এই রীতে চাই যেতে আমি ; এমনি করেই চাই যে বিদায় নিতে,
শেষের দিনের ভয়ংকরের ডাকে—দেব ডুবিয়ে গানের রবে,
অনুভবি' মহাগীতের পরম স্পন্দ তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে
সহসা তার কাটবে বীণার—পরম ক্ষণে—সকল স্তব্ধ হবে।

প্রবাসী (শ্রাবণ, ১৩১৮)

নাথু সর্দার

(একখানি জাপানী নাটিকা অবলম্বনে)

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ

লালা রামলায়েক সিং	...	জমিদার
দেওয়ানী সিং	...	ঐ পুত্র
নাথু সর্দার	...	ঐ তাঁবেদার
ছাহর	...	নাথুর পুত্র
বিষণদেও	...	মঠাধ্যক্ষ

(সাধারণী বাক্—কোরাস)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মঠের সম্মুখস্থ পথ। নাথু সর্দার

নাথু। আমি ভজনপুরের নাথু সর্দার,—লালা বংশের তিন পুরুষের তাঁবেদার। মনিবের আমার একটিমাত্র ছেলে—তাকে তিনি গুরুকুলের মঠে পাঠিয়েছেন,—সঙ্গে আছে আমার ছেলে—ছাহর। মনিবের ছেলেটি কিন্তু লেখাপড়ায় মোটেই মন দেন না ;—কেবল হুড়াহুড়ি আর ঘুষোঘুষি এই নিয়েই আছেন। তাই বোধহয় ত্যাজ্যপুত্র করবার জন্যে, লালা সাহেব একে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন। বার বার লোক পাঠানও

সেই জন্যেই। ছেলেও তেমনি একরোখা এক গুঁয়ে,—কেউ তাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারলে না। তাই আবার আমাকে আসতে হ'ল! দেখি! (মঠের সম্মুখে গিয়া) কে আছেন গো ভিতরে? অ্যাঁ, ভিতরে কে আছেন?

ছাঁহুর॥ কে ভিতরে আসতে চায়?

নাথু॥ কে? ছাঁহুর? কুমার সাহেবকে বল, আমি তাঁকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি।

ছাঁহুর॥ যে আজ্ঞে। (নেপথ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া) কেমন ক'রে বলা যায়?…আজ্ঞে…আজ্ঞে…সর্দার আপনাকে নিতে এসেছেন।

(দেওয়ালীর প্রবেশ)

দেওয়ালী॥ এই দিকে ডাক।

ছাঁহুর॥ যে আজ্ঞে। (নাথুর দিকে অগ্রসর হইয়া) পা' তুলে এই দিকে আসুন।

নাথু॥ তাই তো! সব নূতন ঠেক্‌ছে, অনেক দিন আসিনি কিনা!

দেওয়ালী॥ এই যে সর্দার! হঠাৎ এখানে? কি মনে করে?

নাথু॥ আজ্ঞে, লালা সাহেবের হুকুম; আপনাকে আমার সঙ্গে দেশে ফিরতে হবে; নিতে এসেছি।

দেওয়ালী॥ আঃ! জ্বালাতন করলে দেখছি,…আচ্ছা চল, কিন্তু যাবার আগে উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে হবে; রও…আসছি।

নাথু॥ আজ্ঞে, কসুর মাফ্ করতে হবে, লালা সাহেবের সে রকম হুকুম নেই।

দেওয়ালী॥ তাই নাকি?…আচ্ছা, চল।

নাথু॥ ছাঁহুর! দাঁড়িয়ে রইলি যে? তুইও আয়।

ছাঁহুর॥ দাঁড়িয়ে কি? আমি তো পা বাড়িয়ে রইছি।

নাথু॥ বে-আদব!…চল্।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

(লালা সাহেবের বসিবার ঘর। লালা রামলায়েক আসীন। নাথু সর্দার ও দেওয়ালীর প্রবেশ)

নাথু ॥ তাই তো!…মাথা গুঁজে ব'সে আছেন…একবারও চাইছেন না…কি ক'রে নজর ফেরানো যায়?…(গলা খাঁকার দিয়া) আজ্ঞে, কুমার সাহেব এসেছেন।

লালা ॥ দেওয়ালী! আমি তোমায় মঠে পাঠিয়েছিলাম লেখাপড়া শিক্ষার জন্য;…কেমন?…আচ্ছা, এখন এই সংস্কৃত-সূত্র-গ্রন্থ থেকে খানিকটা পড় দেখি।

দেওয়ালী ॥ (স্বগত) হায় আমি সূত্র পাঠ করিব কেমনে?
হরফ কেমনে লেখে তাই নাহি জানি;
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ মম, অশ্রু দু'নয়নে,
পিতার আদেশে মনে বড় ভয় মানি।

লালা ॥ হুঁ…বোঝা গেছে; হাজার হোক আমার পুত্র কিনা…শুদ্ধ শান্ত হয়ে, সংযত হয়ে, কেবল উপাসনার কালেই সূত্রপাঠ কর্তব্য,…এটা বোঝে…তাই কুণ্ঠিত হচ্ছে। আচ্ছা দেওয়ালী! একটা শ্লোক রচনা কর দেখি।

দেওয়ালী ॥ রচনা?…রচনা আমার হয় না।

লালা ॥ হয় না!…আচ্ছা, কিছু আবৃত্তি কর।

(দেওয়ালী নিরুত্তর হইয়া রহিল)

লালা ॥ এ কি? নিরুত্তর? জিব খ'সে গেছে নাকি?
কী করিলে এতদিন মঠে তবে থাকি'?
পিতার আদেশ—সে কি হাওয়ার সমান?—
মন হতে মুহূর্তেই হ'ল অন্তর্ধান!
ক্রোধে কাঁপে সর্ব দেহ—পুত্র বলি' তোরে
পরিচয় দিতে লোকে—হতভাগ্য!—ওরে—

সাধারণী বাক্ ॥ আচম্বিত ঝলসি' যে ওঠে তলোয়ার!
লালা বুঝি কেটে ফেলে পুত্র আপনার!

নাথু পড়ি মাঝখানে চোখের পলকে,—
আসন্ন মরণ হ'তে বাঁচায় বালকে!
সবলে সে সসম্ভ্রমে ধরে দুই হাতে—
প্রভুর উদ্যত বাহু,—বালকে বাঁচাতে।

নাথু। রাজা সাহেব! এবারটা—একটাবার ছেলেমানুষকে মাফ করুন।

রাজা। কেন তুমি হাত ধরলে···অবাধ্য নির্বোধ ছেলের বেঁচে থাকা হবে না—ওকে জীয়ন্ত থাকতে দেব না;···এই নাও তলোয়ার, কেটে ফেল,··· আমি ওর রক্ত দেখতে চাই।

[প্রস্থান

নাথু। এ কি কাণ্ড! রাগ চণ্ডাল!···ওঁর রাগ তো সহজে পড়বে না, ···এ রাগ তো ক্ষণস্থায়ী ব'লে বোধ হয় না। এখন উপায়?···কি করি? কী করি? (চিন্তিতভাবে মুহুর্মুহুঃ পায়চারি করিতে লাগিল) হুঁ···হয়েছে, ···হয়েছে···সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে কুমার সাহেবকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে···এ করতেই হবে।—ছাঁহর!···ছাঁহর!···ওখানে আছিস?

ছাঁহর। আজ্ঞে করুন।

নাথু। কুমার সাহেব কোথায়?

ছাঁহর। আমি এত বোঝালুম···এত বললুম···ফল হ'ল না; উনি কিছুতেই লুকিয়ে এখান থেকে চলে যেতে রাজী হলেন না।

নাথু। সে কি?···কেন যাবে না? আচ্ছা! ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষ! তার যে গর্দানা নেবার হুকুম হয়েছে।

(ধীরে ধীরে দেওয়ানীর প্রবেশ)

দেওয়ানী। আমি যে এখনও বেঁচে আছি সে কেবল তোমার স্নেহে। আমি সব শুনেছি। কিন্তু পালাব না,—

আমার বাঁচা ও মরা দুই এক কথা,
প্রভু পাশে তুমি দোষী হলে পাব ব্যথা।
পড়িলে তাঁহার কোপে রক্ষা কারো নাই,
মোরে বধি' পিতারে দেখাও শির, ভাই।

নাথু। কুমার সাহেব ! দেওয়ালী ! স্থির হও। আমি থাকতে এ কাজ হতে পারবে না। আমি তোমায় বুক দিয়ে রক্ষা করব ! (আকাশে) অ্যাঁ। কি বললে ? লালা সাহেব আবার একজন লোক পাঠিয়েছেন ?···আমার সমস্ত মৎলব গোলমাল হয়ে গেল যে !···আবার লোক ?···খবর জানতে এসেছে ?··· দেওয়ালীর রক্ত দর্শন করতে এসেছে ?

হায় ! এই দুঃখ সুখ—এ সব কেবল
জন্মান্তরে কৃত পুণ্য-পাতকের ফল।

ছাজ্জর। জন্মান্তরে পাপ ছিল—

দেওয়ালী। হায় ! আজ তার—

সাধারণী বাক্। গুরুদণ্ড। ভাবিয়ো না মনে তবে আর—
তুমি ভুঞ্জিতেছ দণ্ড পরের লাগিয়া ;
নিজেরি এ কর্মফল ; কি হবে রাগিয়া ?
কাঁদিয়া দেওয়ালী কহে, "কাট মোর শির"
বালকের কথা শুনে ঝরে অশ্রুনীর।

নাথু। আহা, কুমার ! যদি বয়েস আমার তোমার সমান হ'ত।—তাহলে ছাজ্জরের হাতে নিজের শির পাঠিয়ে,—রাজা সাহেবকে ভুলিয়ে, তোমার শির বাঁচিয়ে দিতাম।

ছাজ্জর। বাবা,···একটা কথা,···আপনাকে বলব ?

নাথু। কি এমন কথা বাপু ?

ছাজ্জর। আপনি আমায় জ্ঞান দিলেন ;···আপনার কথায় আমি আমার নিজের কর্তব্য বুঝে নিয়েছি।···রাজা সাহেবের রক্ষার ভার আপনার, কুমার সাহেবের ভার কিন্তু আমার। এ···'না' বললে হবে না।···আর, এই বোধহয় ঠিক সময়, আমাদের বয়সেও ঠিক এক।···তাহলে—তাহলে···আর দেরি নয়···আমায় কেটে ফেলে ছিন্ন মুণ্ডটা কুমার সাহেবের ব'লে রাজা সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

নাথু। ঠিক ! (তরবারি উত্তোলন)

দেওয়ালী। (হাত ধরিয়া) এ বিষম কাজ আমি দিব না করিতে,
এ ভীষণ কাণ্ড আমি না পারি হেরিতে।

কথা রাখ, এ কর্ম করো না সমাধান,
মরিলে ছাঁহুর,—আমি রাখিব না প্রাণ।

ছাঁহুর ॥ কিন্তু এ যে জানা কথা,—সর্ব লোকে বলে,—
"ভৃত্য দিবে তুচ্ছ প্রাণ—প্রভুর মঙ্গলে ?"

দেওয়ালী ॥ ক্ষুদ্র হোক, তুচ্ছ হোক মানুষ সবাই ;
অন্যে বলি দিয়ে আমি বাঁচিতে না চাই।

নাথু ॥ হায় ! হায় ! কি আশ্চর্য তর্ক দু'জনার !
দু'জনেরি চেষ্টা আগে নিজ মরিবার !

ছাঁহুর ॥ আমার মিনতি রাখ—

দেওয়ালী ॥ রাখিয়াছি দূরে।

নাথু ॥ হায়, হায়, পুত্র মোর—

ছাঁহুর ॥ ভুলিছ প্রভুরে !

সাধারণী বাক্ ॥ দু'জনের মাঝখানে নাথু দাঁড়াইয়া—
কি কহিবে, কি কহিবে পায় না ভাবিয়া।
প্রভুর লাগিয়া পারে দিতে নিজ প্রাণ ;
আজি সে সাহস হায় যেন মুহ্যমান ?

দেওয়ালী ॥ যারে অপদার্থ জেনে ত্যজে পিতামাতা,—
জীবনের 'পরে তার কিসের মমতা ?
মিথ্যা মমতায় হায় আর কেন মোরে
ডুবাবে নরকে তুমি ?

ছাঁহুর ॥ হায়, স্নেহভরে
হেন কাজ করিতেছি ভাবিয়ো না মনে ;
কলঙ্ক স্পর্শিবে কুলে, কলঙ্ক জীবনে,—
"নিজ রক্ত দিলে প্রাণে বাঁচিতেন প্রভু"—
কহিবে সকলে—"নীচে বেঁচে আছে তবু!"

সাধারণী বাক্ ॥ দু'জনেই বালক হায় ! দু'জনই বালক—

নাথু ॥ দু'জনেরই প্রাণে কিবা কর্তব্য-আলোক !

সাধারণী বাক্ ॥ প্রিয় তব প্রভু—

নাথু ॥ প্রিয় সন্তান আমার।

সাধারণী বাক্ ॥ প্রভুভক্ত জানে—প্রাণ কখনো তাহার—
চাহিবে না প্রভু-পুত্রে দিতে বলিদান,
যেথা বলি দিলে চলে আপন সন্তান।
না তুলিয়া নত আঁখি অন্ধ অশ্রুজলে,
"ছাঁহুর বাঁ-দিকে বুঝি!" মনে মনে বলে।
পলকে ঝলসে খড়্গ,—কণ্টকিত কেশ,
আপন সন্তান আহা! হ'ল স্বপ্নশেষ!

নাথু ॥ হাঃ! কী দুরদৃষ্ট!···শেষে নিজের হাতে নিজের নির্দোষী ছেলেটার গর্দান নিতে হ'ল?···হাঃ!···যাই প্রভুকে রক্ত দেখাই—

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

(লালা সাহেবের বাড়ির আর একটি ঘর। লালা ও নাথু)

নাথু ॥ কেমন করে হুজুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়?···(গলা খাঁকার দিয়া) আজ্ঞে···হুকুম মত···কুমার সাহেবের গর্দান·নেওয়া হয়েছে।

লালা ॥ অ্যাঁ?···কাজটা শেষ হয়ে গেছে?···হুঁ···মৃত্যুকালে বোধ হয় সে কাপুরুষের মতোই আচরণ করেছিল?···কেমন···না?

নাথু ॥ না, হুজুর,···আমিই বরং তলোয়ার হাতে নিয়ে ইতস্ততঃ করছিলাম,···কুমারই আমাকে সাহস দিয়ে দৃঢ়স্বরে ব'লে উঠলেন, "নাথু সর্দার! আর বিলম্ব কেন?···আমি এ প্রাণ রাখব না!" এই তাঁর শেষ কথা।

লালা ॥ নাথু, তুমি জান, কুমার দেওয়ালী সিং আমার একমাত্র সন্তান ছিল!···ছাঁহুরকে ডাক, আমি তাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করব। আহা! দেওয়ালী আমার ছাঁহুরকে ছেড়ে একদণ্ড থাকৃত না,···বড় স্নেহ করত··· বড্ড ভাব ছিল দু'টিতে···কই ছাঁহুরকে ডাকলে?

নাথু ॥ ছাঁহুর···সে তার কুমার সাহেবকে হারিয়ে···কোথায় যে চ'লে গেছে···তা' কেউ বলতে পারে না।

আমিও এসেছি নিতে তব অনুমতি,
দেশ ছেড়ে বনে গিয়ে করিব বসতি।

লালা ॥ কঠোর সে আজ্ঞা মোর,—পালনে কঠিন ;
বুঝিতেছি কুমারের শোকে তুমি ক্ষীণ।
আমার সে দুষ্ট ছেলে আপনার করি'
ভালমন্দ দু'টিরেই হারাইলে, মরি !
কী করিবে ? জগতে এ প্রথা চিরদিন,—
প্রভুর পালিবে আজ্ঞা—যে জন অধীন।

[উভয়ের প্রস্থান

সাধারণী বাক্ ॥ নানা উপদেশে লালা নাথুরে বুঝায়
তবু সে বিষণ্ণ, হায়, অবসন্ন-প্রায় ;
বাহিরে লোকের কাছে পারে না সে আর
লুকাতে প্রাণের ব্যথা, নয়নের ধার।
দেখ শোকাবহ দৃশ্য—করি' হাহাকার
নিজ সন্তানের নিজে করিছে সৎকার !

[পটক্ষেপণ

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(লালা সাহেবের বাড়ির সম্মুখে)

বিষণদেও ॥ আমি বিষণদেও—গুরুকুলের উপাধ্যায় ; লালা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছি ; একটু কর্ম আছে। ওহে !···আমি প্রবেশ করতে ইচ্ছা করি।

নাথু ॥ কে প্রবেশ করতে চায় ?···ও, আচার্য বিষণদেও !···প্রণাম।

বিষণ ॥ আহা ! ছাঁহুর ছেলেটি বড় ভাল ছিল।

নাথু ॥ হুঁ···কিন্তু দেখুন, দোহাই আপনার, হুজুরকে যেন ওসব কথা শোনাবেন না।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

(লালা সাহেবের ঘর। লালা সাহেব উপবিষ্ট। নাথুর প্রবেশ)

নাথু॥ প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।…বলছিলাম কি…গুরুকুলের মঠ থেকে আচার্য বিষণদেও এসেছেন।

লালা॥ তাঁকে এইখানে নিয়ে এস।

নাথু॥ যে আজ্ঞা (অগ্রসর হইয়া) এই পথে আসুন…এই যে…এই দিকে।

(বিষণের প্রবেশ)

লালা॥ (অভিবাদন করিয়া) আজ আমার পরম সৌভাগ্য…এখন আপনার পদার্পণের কারণ জানতে পারলে অনুগৃহীত হতে পারি।

বিষণ॥ কারণ বিশেষ কিছুই নয়…আমি কুমার দেওয়ালী সিংহের সম্বন্ধে দু'একটি কথা আপনাকে বলতে ইচ্ছা করি।

লালা॥ দেওয়ালীর সম্বন্ধে ?…সে সম্বন্ধে আর কী বলবেন ? তার সম্বন্ধে শেষ ব্যবস্থা হয়ে গেছে ;…আমি নাথু সর্দারকে হুকুম দিয়েছি…সে তামিল করেছে।

বিষণ॥ অধীর হয়ে পড়বেন না, আমি তার বিষয়েই কিছু বল্‌ব।…নাথু সর্দারকে আপনি হুকুম দিয়েছিলেন বটে…কিন্তু সে কাজে নাথুর কোনো মতেই প্রবৃত্তি হ'ল না ; প্রভুপুত্রের রক্তপাত প্রভুর রক্তপাতের সমান মনে ক'রে। পাতকের ভয়ে, লোকান্তরের দণ্ডের ভয়ে, জন্মান্তরের আত্মার অবনতির ভয়ে, কলঙ্কের ভয়ে, কুমার সাহেবের মমতায় সে নিজপুত্র ছাঁহুরের মুণ্ড এনে আপনাকে দেখিয়েছে। আজ আমি দেওয়ালীর হ'য়ে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছি, আপনি তাকে ক্ষমা করুন।…যার জন্যে লোকে নিজের সন্তান বিসর্জন দিতে পারে, তাকে তুচ্ছ মনে করবেন না,…তার জীবন একেবারে মূল্যহীন হতে পারে না,…সে ক্ষমার্হ—

লালা॥ অ্যাঁ…তবে সেটা কাপুরুষের কাজই করেছে, যা ভেবেছিলাম তাই! ছাঁহুরকে তার জন্য বলি দেওয়া হ'ল…আর সে এমনি অপদার্থ…যে নিজের বুকে ছুঁরি বসিয়ে দিতে সাহস করলে না ?

বিষণ॥ আপনি ও সকল চিন্তা ত্যাগ করুন। ছাঁহুর স্বর্গে গেছে, তার

স্বাস্থ্য যাতে চঞ্চল হয়, এমন আলোচনা মনে স্থান দেবেন না। পুত্রকে আর ভর্ৎসনা করবেন না।

শাশ্বতী বাক্‌। বলিতে বলিতে, আহা, হিতৈষী ব্রাহ্মণ
বার বার মুছে আঁখি, ফিরায় বদন।
লালার কঠিন মন গলিল এবার,
পুত্রে ক্ষমা করি' প্রাণ লঘু হ'ল তাঁর।
সাধু আজ তাঁহাদের বাড়ায়ে আনন্দ
পার করি' মধু আনে কুসুমে সুগন্ধ।
আনাগোনা ঘন ঘন, তবু কেন মন
উদাস হইয়া যায়, ভাবে সে এখন—
একদিন লালার নাতির নাতি হবে,
তাদের করিতে সেবা সাধুর কে রবে?

বিষ্ণুদেও। সাধু সর্দার! জগত্‌! এই শুভদিনে তুমি আমাদের একটা গান শোনাও।

সাধু। যে আজ্ঞা (গান)

সিন্ধু শকুন! সিন্ধু শকুন!
সিন্ধুকূলের পাখী!
আজকে কেন একলাটি তুই?
অরুণ কেন আঁখি?
কোথায় রে তোর তরুণ সাথী?
আজকে সে কোথায়?
(আজ) আনাগোনা ঢেউ গণা তোর
ফুরাতে না চায়।
(শুধু) ঝাঁপিয়ে পড়া পাখা ঝাড়া
ঢেউয়ের ফেনা মাখি'।

সকলে। সিন্ধু শকুন! সিন্ধু শকুন!
সঙ্গীহারা পাখী!

নাথু। হায় যদি বাছা মোর থাকিত গো আজ,
হ'ত উহাদের সঙ্গে সেওয়ানীর নাচ ;
আসিত বিদায় যোগ উহাদের সনে,
আনন্দে ভরিত আঁখি শোকের বদলে।

সাধারণী বাক্। দেখ আহা, চোখ দিয়া পড়িতেছে জল,
বাহিরে আমোদ করে অন্তর বিকল।

নাথু। পড়িছে চোখের জল, কিন্তু দেখে লোকে
নৃত্যাবেগে চুলগুলো পড়ে মুখে চোখে।

সাধারণী বাক্। রাখিতে ঠাকুর মান নাথু নৃত্য করে!

নাথু। নয়নে ভাসিছে বাষ্প হিমকণা করে'!

সাধারণী বাক্। হায় হিমকণা সম ঝরে আঁখি জল,
শোকাশ্রু-সাগরে ঘেরা পৃথিবী-মণ্ডল।
চুপ! শোনো! কি বলিছে আচার্য বিষণ,
"যাত্রাকাল উপস্থিত!" সেওয়ানী এখন—
পিতার নিকটে ওই লইছে বিদায় ;
গুরু সহ উঠিল সে বংশ-শিবিকায়।
নাথু তার সঙ্গে সঙ্গে যায় কতদূর ;
বিদায় মাগিছে কহি' বচন মধুর!
কি বলিছে ?···"শান্ত হয়ো, পাঠে দিও মন!
এবার কহিলে প্রভু, কি হবে তখন ?"
এত বলি' মাথা ছুঁয়ে
ভূমি ছুঁয়ে লইল বিদায় ;
দূর হতে দূরান্তরে
সেওয়ানীর শিবিকা মিলায়!
বাষ্পাকুল নেত্রে নাথু
চিত্রাপিত দাঁড়ায়ে এখনো—
চাহিয়া সে পথ পানে,—
দুই হাতে অশ্রু মুছে ঘন!

কাঁদে আর ভাবে মনে
"টোল হ'তে এই পথে আর
ফিরিবে না পুত্র মোর,—
ফিরিবে না ছাঁহর আমার।"

যবনিকা

বিচিত্রা (আশ্বিন, ১৩৩৭)

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

॥ ১ ॥

৪৬ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট
২০শে ভাদ্র, ১৩১৯

পূজ্যবরেষু—

চারু[১] ও মণিলালের[২] চিঠিতে আপনার স্নেহাশীর্বাদ পাইয়াছি। আনন্দে মনে মনে প্রণাম করিয়াছি; কিন্তু চিঠি লিখি নাই। কারণ, বিলাতের অতিব্যস্ত জীবনের মধ্যে, correspondence-এর বোঝা বাড়াইয়া, আপনাকে আর অধিক ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় নাই।

আজ আমার নূতন প্রকাশিত "কুহু ও কেকা" এবং "জন্মদুঃখী" পাঠাইলাম, এবং সেই ছুতায় আপনাকে চিঠি লিখিয়া ধন্য হইলাম।

বাংলার কবির বিলাতে সংবর্ধনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কাগজে পড়িয়াছি, কিন্তু উহা এতই সংক্ষিপ্ত যে উহাতে তৃপ্তি হয় নাই। সে যাহা হোক, কবির দিগ্বিজয় জগতের ইতিহাসে, বোধ হয়, একেবারে নূতন জিনিস। কিন্তু প্রতিভার এই প্রাপ্য পূজায় বিস্মিত হইবার বড় বেশী কিছু নাই। আমি জানিতাম, যে, আপনার কবিতার অমৃত আস্বাদ যে পাইবে, সেই আপনার বিশ্বজনীনতার অপূর্ব স্বরে মুগ্ধ হইবে। তা সে ইংলণ্ডের লোকই হোক আর ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডেরই হোক্।

---

১. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

"জগৎ-কবি সভায় মোরা তোমারি করি গর্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব ;
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি' লইবে মানি'
হে গুণী ! তব প্রতিভাগুণে জগৎ-কবি সর্ব।"

আপনার সম্মানে দেশের সকলেই সম্মানিত অনুভব করিতেছে। কেহ বলিতেছে, এই ব্যাপারে বাংলা দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, বাঙালী নূতন গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছে। কেহ বলিতেছে, আমাদের কবি-সংবর্ধনার তরঙ্গ বিলাত পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে ; আবার কেহ বলিতেছে, মহম্মদ মক্কার চেয়ে মদিনায় গিয়া বেশী সম্মানিত হইয়াছেন। এ সব বাহিরের কথা। এ ছাড়া, আমাদের পাঁচ সাত জনের ব্যক্তিগত একটি পরম লাভ হইয়াছে। আমরাও যে প্রকৃত সাহিত্যরসের আস্বাদ জানি এবং কবি ও অকবির প্রভেদ বুঝিতে পারি, তাহা ইংলণ্ডের সাহিত্যরসিকেরা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে।

Yeats,···Rothenstein প্রভৃতির আপনার কবিতার উপর ভক্তির কথা পড়িয়া অবধি আমার একটি কথা মনে হয়। মনে হয়, যে, গোত্রগত প্রাধান্য এবং কুলদেবতার সংকীর্ণ প্রজাবিধি উল্টাইয়া দিয়া, সাম্রাজ্য-সম্ভব সমন্বয় এবং বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ বা জনক যাজ্ঞবল্ক্যের বিশ্বজনীন পূজাবিধি, যেমন, পূর্ব পূর্ব যুগে মানুষে মানুষে মিলনের সেতু রচনা করিয়াছিল, তেমনি Culture-এর আধার বড় বড় Idealist বা কবিরাই বর্তমান যুগের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে, যুগ ধর্মের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে মহামিলনের রাখীসূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া নিতেছেন। ইহাতে যে বিশ্বজনীনতার সূত্রপাত হইতেছে তাহার তুলনায় বুদ্ধ খ্রীষ্ট বা মহম্মদের এক এক মহাদেশ-ব্যাপী মিলন-সঙ্ঘ ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মাত্র। হয়তো, আমার এ সিদ্ধান্ত ভুল ; তবুও ইহা আপনাকে নিবেদন করিলাম। সুবিধামত এ সম্বন্ধে একটু লিখিলে আনন্দিত হইব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—

স্নেহার্থী
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

॥ ২ ॥

৪৬ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২০শে কার্তিক, ১৩১৯

শ্রীচরণেষু—

আপনার চিঠি দু'খানি যথাসময়ে পৌঁছেচে। 'কুহু ও কেকা' সম্বন্ধে আপনি যা লিখেচেন তাতে আমি আপনার স্নেহেরই পরিচয় পেয়েছি। আশীর্বাদের করুণ হস্তের স্পর্শ ই লাভ করেছি। আর আপনার কাছে এও আমাকে স্বীকার কর্তে হবে, যে, মনে মনে একটু গর্বও অনুভব করেছি। ভাল লিখতে পারি বলে নয়,—বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির স্নেহ লাভ কর্তে পেরেছি বলে।

যখন 'তীর্থ সলিল' এবং 'তীর্থরেণু'র জন্যে নানা দেশের কবির কবিতা সংগ্রহ ও অনুবাদ করছিলুম তখন ভেবেছিলুম, যে, আপনার রচিত যদি কোন ইংরেজী কিংবা সংস্কৃত কবিতা পাই তা'হলে সেটিকে অনুবাদ ক'রে আমার বিশ্ব-কবিসভা উজ্জ্বল করে তুলি। কিন্তু তার কোনো সন্ধান না পাওয়ায় আমার সেই মানসী কবিসভায় একটি উচ্চতম আসনই শূন্য ফেলে রাখতে হ'ল। সেই অবধি মনটা ক্ষুণ্ণ, বইটার খুঁৎ থেকে গেছে। এবারে আপনি ইংরেজীতে অনেক বই লিখেছেন এবং লিখছেন ; এই সময়ে যদি মৌলিক কোনো কবিতা; —অন্ততঃ Whitman-এর ধরনের গদ্য-কবিতা,—বাংলায় না লিখে একেবারে ইংরেজীতে লেখা হ'য়ে পড়ে, তবে সে লেখাটি যেন একবার দেখতে পাই। তা'হলে আমার অনেক দিনের সাধ পূর্ণ কর্তে পারব।

কলেজ ছেড়ে পর্যন্ত ইংরেজীতে কাউকে চিঠি পর্যন্ত লিখিনি, নইলে আর এক রকমেও ঐ সাধটা মিটতে পারত। অন্ততঃ আপনার অমূল্য সময় এবং অনুবাদের শ্রম অনেক পরিমাণে বাঁচিয়ে দিতে পারতুম ;—অবশ্য আমার নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সাধ্যের অনুপাতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, artistic expression আয়ত্ত করা দূরে থাক, ইংরেজী রচনার Idiom পর্যন্ত একরকম ভুলেই গেছি। সুতরাং ইংরেজীতে কাব্যানুবাদের চেষ্টা, এখন আমার পক্ষে বিড়ম্বনা।

সর্বশেষে আমার একটি নিবেদন আছে। য়ুরোপীয়েরা আমাদের আনন্দের

অংশী হয়,—আমাদের কবির কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়, এতে আমাদের একটুও হিংসে হবে না, বরং আনন্দই ববে। আর সেই অমৃতের আস্বাদ যত বেশী পায় ততই ভাল। কিন্তু আপনার অসুস্থ শরীরের কথাটাও একেবারে ভুললে চলবে না। ইতি—

প্রণত

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

॥ ৩ ॥

৪৬, মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯১২

শ্রীচরণেষু—

'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজীটি পেয়ে অনুগৃহীত হলুম। Nation, Times ও Atheneum-এর সমালোচনাও দেখেছি।

'জলে না নাব্‌লে সাঁতার শেখা যায় না' আমাদের স্বদেশী নেতারা যখনই বিশেষ কোনো রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্যে সোরগোল শুরু করে থাকেন তখনই ঐ কথাটার উপরে বেশী করে জোর দেওয়া হয়ে থাকে। কথাটা, একসময়ে, আমারও খুব ভাল লাগত এবং ঠিক বলেই মনে হ'ত। কিন্তু, এখন দেখছি, জলে নাবাটাও যেমন দরকারী, যে লোকটা সাঁতার শিখতে চাইছে তার ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্যের ওজন বোঝাটাও তেম্‌নি দরকারী।

আমাদের দেশে খবরের কাগজের অভাব নেই, কিন্তু সমঝদার সমালোচক কই? অবশ্য, সবাই যে Matthew Arnold হবে কি Walter Patler হবে তা আশা করা যায় না; Creative Criticism করবার মতো প্রতিভা চিরকালই দুর্লভ আছে এবং থাকবে। কিন্তু যেটুকু উচ্চশিক্ষিত লোকদের কাছে স্বভাবতঃ আশা করা যেতে পারে তাই বা কই।

Nation বা Times-এ যাঁরা গীতাঞ্জলির সমালোচনা লিখেছেন তাঁরা কেউ Matthew Arnold নন্, এ কথা স্বীকার্য, কিন্তু তাঁদের মতো লেখকই বা আমাদের দেশে কই? তাঁরা যে কথাটি বল্‌তে চেয়েছেন, তা' বেশ অনায়াসেই

পরিষ্কার করে বল্‌তে পেরেছেন, যা বুঝেছেন তা অপরকেও বোঝাতে সমর্থ হয়েছেন; আমাদের সামর্থ্য কই?

আমাদের চেয়ে যে ওঁরা বেশী রসগ্রহণ করেছেন্ এ কথা আমি সহজে স্বীকার করতে পারি নে; কিন্তু যেটুকু পেয়েছেন সেইটুকুতেই মশ্‌গুল হ'য়ে উঠেছেন; সেটুকু একলা ভোগ করেন নি, সকলকে বেঁটে দিয়েছেন; এইটেই তাঁদের বিশেষত্ব, এইটেই গৌরব। ওখানকার তুলনায় আমাদের দেশে culture-এর হাওয়া বইছে না বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে ভাবের ব্যাপারীরা···নিজের নিজের পুঁজিটুকু নিয়ে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করেছে; লেনাদেনা একরকম বন্ধ; কোনো কিছুই ফলাও হ'তে পাচ্ছে না; আড়ৎদার চিরকাল আড়ৎদারই থেকে যাচ্ছে; হৌস্‌ওয়ালা সওদাগর হ'তে পাচ্ছে না। ভারি Depressing.

আপনার শরীর এখন কেমন? ওদিকেও একটু নজর রাখতে হবে; এটি আমাদের সকলের অনুরোধ।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।[১]

স্নেহার্থী
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পুনশ্চ—

এবার মাঘোৎসবে আমরা আপনাকে লাভ করতে পেলুম না। ভারি ফাঁকা বোধ হ'ল।

॥ ৪ ॥

৭ই পৌষ, ১৩২৮

শ্রীচরণেষু—

যেদিন জ্যোতির দীক্ষা
পেলেন পরম পুণ্যবান্
অন্তরের পদ্মদলে
আনন্দের পেলেন সন্ধান

সে অমৃত-সিক্ত দিনে
হে কবি ! হে বিশ্বের আহ্লাদ !
পুণ্যহীন যাচে তব
পদধূলি আর আশীর্বাদ।[২]

প্রণত
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

---

১. এই পত্রগুলি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকায় পত্রগুলির পরিচয় সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশিত হয়, তা হ'ল এই যে, "প্রথম তিনখানি পত্র ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের বিলাত প্রবাসকালে লিখিত। এই সময় বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যে-সমাদর হইয়াছিল চিঠিগুলিতে সেই প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। ২-সংখ্যক পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ যে অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ 'বিগত ইউরোপ-প্রবাসের সময় ইংরেজীতে একটি মাত্র মৌলিক গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহারই অনুবাদ "মণি-মঞ্জুষা"য় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।' —দ্রষ্টব্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, "মণি-মঞ্জুষা" (১৯১৫), পৃ ৯৮, 'একটি গান'।"

২. "চতুর্থ পত্র বা কবিতা লিখিত হয় ৭ই পৌষে মহর্ষির দীক্ষাদিনের স্মরণে।—মূল পত্রগুলি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র সদনে রক্ষিত।"—বিশ্বভারতী পত্রিকা (বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৭)।

প্রমথ চৌধুরীকে কবিতায় লিখিত

পদচারণের কবি
মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়
সমীপে—

রসের যে শিধা পেহু ঢোলে চাঁটি পড়ার শব্দে,—
পাঠাই রসিদ তার, ঢাকে কাঠি থামিবার পরে ;
জানেন তো কুঁড়ে গরু চিরদিন ভিন্ন গোঠে চরে,
কুঁড়েমি কায়েমি যার, ত্রুটি তার ঘটে পদে পদে।

মরম বোঝে না কেউ, মনে ভাবে মেতে আছে মদে,
কেউ কয় 'চালিয়ান্ !' 'কি অসভ্য !' কেউ মনে করে ;

আমি শুধু তুলি হাই,…চিঠির কাগজ নাই ঘরে,…
দোয়াতে মসীর পঙ্ক,…এক ফোঁটা জল নাই গঁদে !
লেফাফা দুরস্ত অতি, পোস্টাপিসে বিকিকিনি তার,
লেফাফা-দুরস্ত হওয়া তাই আর হ'ল না আমার।

হুহু করে বে-পরোয়া চলে যেতে চায় দিনগুলো,
হাঁ হাঁ করে পদে পদে ওদের কি রাখা যায় ধরে ?
বিশেষে গরম দেশে,…হাঁফ্ ধরে, নাকে ঢোকে ধুলো ;
ঢাকে ঢোলে চিঠি তাই লিখি আমি দু'বার বছরে।

গোড়ায় জানিয়ে হাল, ক্ষমা চাই বিনয়-বচনে,
ওগো ছন্দ-চঞ্চরীক ! পদচারণের কবিবর !
পায়চারি করে চিত্ত তব গুঞ্জ-গীতি কুঞ্জবনে,
তারিফে ফুটিয়ে তারা, পদে পদে, নিত্য নিরন্তর ![1]

ইতি— ভবদীয়

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

---

১. সত্যেন্দ্রনাথকে 'সবুজ পত্র'র সম্পাদক প্রমথনাথ চৌধুরী তাঁর 'পদচারণ' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন।* এই গ্রন্থখানি পেয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে কবিতায় এই পত্রটি লেখেন। এটি প্রথম 'সবুজ পত্র' ৭ম বর্ষের ৪র্থ (শ্রাবণ, ১৩২৭) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়বার সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ৯ম বর্ষের ৯ম (বৈশাখ, ১৩৩৩) সংখ্যায় পুনরায় প্রকাশলাভ করে। প্রমথনাথ চৌধুরী এই পত্রের প্রকাশ সম্বন্ধে সবুজ পত্রে লেখেন যে, "আজ দিন চার-পাঁচ হ'ল, আমার পুরোন কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পদ্যে লেখা একখানি পত্রের সাক্ষাৎ পেলুম। আমার 'পদচারণ' উপহার পেয়ে তিনি আধ-মজা করে এই পত্রখানি আমায় লেখেন। সত্যেন্দ্রনাথের হাত থেকে যখন যা বেরিয়েছে, তারই আমার বিশ্বাস ছাপার অক্ষরে ওঠবার অধিকার আছে। এই বিশ্বাসবশতই সে পত্রখানি আমি সবুজ পত্রে প্রকাশ করছি। আশা করি কেউ মনে করবেন না যে, ওখানি আমি আমার সার্টিফিকেট হিসাবে পাঠকের দরবারে পেশ করছি।—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।"

* 'পদচারণ' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রটি এইরূপ:

"শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

করকমলেষু

গদ্যের কলমে-লেখা এই পদ্যগুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ, আমার বিশ্বাস এগুলির ভিতর আর-কিছু না থাক্‌, আছে rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ reason।

এর প্রথমটি যে পদ্যের এবং দ্বিতীয়টি গদ্যের বিশেষ গুণ, এ সত্য আপনার কাছে অবিদিত নেই; সুতরাং আশা করি আমার এ রচনা আপনার কাছে অনাদৃত হবে না।"

শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত প্রমথ চৌধুরী'র 'সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা' (৭ই আশ্বিন, ১৮৮৩ শকাব্দ) গ্রন্থে 'পদচারণ' (১৯১৯) কাব্যগ্রন্থটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় এবং সেই সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের এই কবিতা-পত্রটিও মুদ্রিত হয় গ্রন্থপরিচয়ের মধ্যে।

সহধর্মিণী কনকলতা দত্তকে লিখিত

॥ ১ ॥

বৈশাখ, ১৩১৫

হে আমাদের একজন!

নব বৎসর আমাদিগকে নূতন শক্তি প্রদান করুক। আমরা যেন সর্ব-প্রকার দুর্বলতা পরিহার করিতে পারি। নূতন বৎসর আমাদিগকে নূতন পথে লইয়া যাক্ আমরা যেন বেদনা বিস্মৃত হইতে পারি। ভারতবর্ষে দুইটি আদর্শ প্রধান। বৈদিক আদর্শ ও বৌদ্ধ আদর্শ। গার্হস্থ্য আদর্শ ও সন্ন্যাসের আদর্শ। আমরা দু'য়ের সামঞ্জস্য করিতে চাই। আমাদের অন্য পন্থা নাই। সুতরাং ব্রহ্মচর্য আমাদের একান্ত পালনীয়। ব্রহ্মচর্য-ভ্রষ্ট হইলে কি হয়? সমাজ স্বতঃ পরতঃ নানা উপায়ে তাহার দণ্ডবিধান করে। তাছাড়া ব্যভিচারীর বার্ধক্য একান্ত অবজ্ঞার জিনিস। পূজার ফুল শুকাইলেও নির্মাল্যে পরিণত হয়। বিলাসীর উপভোগের ফুল রাত্রিশেষে পথের পঙ্কে পচিয়া থাকে। আমরা যেন শারীরিক সুখকেই চরম সুখ মনে না করি। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকারের দ্বারা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঙ্গলকার্যের দ্বারা যেন আমাদের এই সামান্য জীবনকে ধন্য করিয়া তুলিতে পারি। আমরা যেন মনকে শুদ্ধ শান্ত করিতে পারি।

যেন বিচলিত বিক্ষুব্ধ না হই।· যেন অভিমান না করি। যেন দুর্বলতাকে সবলে পরিহার করিতে সমর্থ হই। মনুষ্যত্বের মহৎ আদর্শ যেন উজ্জ্বল রাখিতে পারি। স্নেহ, প্রেম, মমতা ইহা পরমুখাপেক্ষী নহে—ইহা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, সন্তুষ্ট; একথা যেন মুহূর্তের জন্যও ভুলিয়া না যাই। বিলাসী বা বিলাসিনীদের হেয় আদর্শ যেন ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিতে পারি; তাহাদের প্ররোচনায় যেন আত্মবিস্মৃত না হই। আমাদের শরীর অপটু হইলেও যেন আমরা মনের শক্তি দ্বারা সকল বিঘ্ন-বিপত্তি দূর করিতে সমর্থ হই। হে নূতন বৎসর, তুমি আমাদিগকে নূতন জীবন প্রদান কর।[১] ইতি—

আমাদের আর একজন

॥ ২ ॥

লুইস জুবলী স্যানিটোরিয়াম
দার্জিলিং[২]

সুচরিতাসু!

আমি দার্জিলিং এসে অবধি অনেকটা ভাল আছি। এখানে ভাল না থাকিয়া উপায় নাই। কারণ পৃথিবীর মধ্যে যাহা উচ্চ তাহাই চোখের সম্মুখে। প্রভাতে উঠিয়া পারদমসৃণ তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘার অরুণসজ্জা দেখিয়া পবিত্র আনন্দরসে হৃদয় অভিষিক্ত হইতে থাকে। মনে হয় যদি দেবতা থাকেন

---

১. এই চিঠিগুলির প্রথম তিনখানি 'প্রবাসী'তে (শ্রাবণ, ১৩৫৬) 'লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। সংগ্রহকারী প্রকাশক সুরেশচন্দ্র রায় এই চিঠিগুলি সম্পর্কে তাঁর একটি বিস্তৃত বক্তব্যের মধ্যে লেখেন যে, "এই চিঠি তিনখানি কবি তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্তকে ১৩১৫ সালে লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিগুলির লেখার পর বহু বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু চিঠিগুলির অন্তর্নিহিত সংযম, শালীনতা ও সৌন্দর্যবোধ তেমনি অটুট রহিয়াছে। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কবির বয়স তখন ২৭ বৎসর ছিল এবং কবিপত্নী ছিলেন সপ্তদশবর্ষীয়া। কিন্তু এই চিঠিগুলিতে কোন যৌবন-সুলভ উচ্ছ্বাস নাই, সৌন্দর্য আছে।"

২. দ্বিতীয় চিঠিখানি সম্পর্কে তিনি লেখেন, "এ চিঠিতে তারিখ না থাকিলেও সত্যেন্দ্র-বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে দার্জিলিং হইতে অনবদ্য কবিতায় যে চিঠি কবি লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানিতে পারি, কবি ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দার্জিলিঙে ছিলেন।—স-চ-র"

আর যদি তাঁহারা মর্ত্যলোকে কখনও পদার্পণ করেন তবে ওই মৌন, শান্ত, শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক উচ্চ হইতেও উচ্চ কাঞ্চনজঙ্ঘাই তাঁহাদের উপযুক্ত পাদপীঠ। কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছে দার্জিলিং যেন সমুদ্রগামী সুবৃহৎ জাহাজের কাছে পানসী। ত্রিতল হর্ম্যের কাছে পর্ণকুটীর। শ্বেতহস্তীর কাছে মেষের দল। অথচ এই দার্জিলিং সাত হাজার ফুট, অর্থাৎ সাতশো তলার বাড়ির মতো উচ্চ।[৩]

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এমন চমৎকার স্থানের অধিবাসীরা কুৎসিত হইতেও কুৎসিত। কে যেন সযত্নে প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া কক্ষে কক্ষে কতকগুলো কুৎসিত ব্যাঙ ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহারা অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং অত্যন্ত চুরুটপ্রিয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই চুরোট খায়। ইহারা 'মুড়ো ঝাঁটা'র মতো এক প্রকার জিনিস দিয়া চুল আচড়ায়। কলসীর পরিবর্তে মোটা-মোটা বাঁশের চোঙায় দুধ লইয়া বিক্রয় করিতে আসে। ইতি—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

॥ ৩ ॥

বিজয়া দশমী

সুচরিতাসু!

বিজয়ার সম্ভাষণ গ্রহণ কর। দুঃখকে বিজয় কর। আনন্দ লাভ কর। পবিত্রতাকে জীবনের সঙ্গী কর। আপনাকে জান। ইতি—

শ্রীসত্যেন্দ্র

॥ ৪ ॥

রবিবার

কনক,

তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি এবং তোমরা নির্বিঘ্নে পৌঁচেছ জেনে আনন্দিত হয়েছি। তোমাদের শিলং যাওয়ার কি হ'ল? চিঠিতে ঠিকানা তো দেখছি গৌহাটির।

---

৩. "স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে কবি যে চিঠি কবিতায় লিখিয়াছিলেন (২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫) তাহা ১৩৪৯ সালে মাঘ সংখ্যায় [প্রবাসীতে] মৎকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। সেই কবিতায় চিঠির

এখানকার খবর একরকম ভালো। তোমাদের খবর কি? হেমন্তবাবুরা কেমন আছেন?

আমার চোখের অবস্থা একই রকম। পড়াশুনো বন্ধ রেখেছি। কল্‌কাতার বর্ষা এখনো ছাড়েনি। তোমাদের ওখানে কি রকম? ঠাণ্ডা না গরম? লিখো।[৪] ইতি—

শ্রীসত্যেন্দ্র

॥ ৫ ॥

দার্জিলিং
৩।১১।১৯

কনক,

তোমার চিঠি পাইলাম ; তোমার পেটের অসুখ এখনও সারে নাই শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। যদি দরকার মনে কর, ডাক্তার দেখাইবে। ব্যায়রামের শেষ রাখা ভাল নয়।

আমি ভাল আছি। এখানে বেশ শীত পড়িয়াছে। তবে অসহ্য নয়। এখনও প্রত্যহ স্নান করা চলে। তাহাতে বিশেষ কষ্ট হয় না। তুমি আমার প্রীতি গ্রহণ করো। মা, মাসীমা প্রভৃতি গুরুজনদের আমার প্রণাম দিয়ো। আমি বোধহয় আর দিন দশেক এখানে থাকিব।[৫] ইতি—

শ্রীসত্যেন্দ্র

প্রায় দুই ছত্র 'আমি এখন বসে আছি সাত'শ তলার ঘরে, বাতাস হেথা মলিন বেশে পশিতে ভয় করে।' কবিপত্নীকে লিখিত কবির এই চিঠির এই অংশ স্মরণ করাইয়া দেয়।—স-চ-র"

৪. চার ও পাঁচ সংখ্যক চিঠি দু'খানি সম্পাদকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ হইতে মুদ্রিত। চার সংখ্যক চিঠিখানি কলিকাতা হইতে ৩-১০-১৬ (খামের উপর ডাকঘরের ছাপ দৃষ্টে অনুমান) তারিখে গৌহাটিতে লিখিত। শ্রীহেমন্তকুমার রাহা'র কেয়ারে এই চিঠি লেখা হয়।

৫. এই চিঠিখানিতে আশ্চর্যরকম ভাবে সত্যেন্দ্রনাথ সাল তারিখ উল্লেখ করেছেন, যা তাঁর অধিকাংশ চিঠিতেই অনুপস্থিত। এটি দার্জিলিং থেকে কলকাতায় কনকলতা দত্তকে লেখা।

গ্রন্থপরিচয়

বেণু ও বীণা (কাব্য)। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল : আশ্বিন, ১৩১৩ (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫) পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫০। পরবর্তীকালে গ্রন্থটির ৫টি সংস্করণ হয়। ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩২৯, ৩য় ১৩৩৩, ৪র্থ ১৩৫৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, এবং দীর্ঘদিন পরে এর আর একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৬৮ সালে। (প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা)।

'বেণু ও বীণা'র দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ সত্যেন্দ্রনাথের জীবিতকালেই আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু সেই সময় অকস্মাৎ তাঁর পরলোকগমনের ফলে, এই সংস্করণ মৃত্যুর প্রায় তিন মাস পরে (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২২) প্রকাশিত হয়।

এই সংস্করণে সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্য-পুস্তিকা 'সন্ধিক্ষণ' (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫) বহু সংস্কারের পর 'বেণু ও বীণা'র অন্তর্ভুক্ত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় 'সন্ধিক্ষণ'-এর আত্মপ্রকাশ। ইহার নামপত্রে লিখিত আছে—

> "যাঁহারা আদর্শ আজি বঙ্গে একতার
> তাঁহাদেরি তরে এই ক্ষুদ্র উপহার।"

'সন্ধিক্ষণ' ছোট আকারের কাব্য-পুস্তিকা এবং ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩। কলিকাতা, ৩।৪ নং গৌরমোহন মুখার্জির ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ্‌ প্রেসে মুদ্রিত।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য-পুস্তিকা 'সবিতা'র পর 'সন্ধিক্ষণ' প্রকাশিত হয় এবং 'সন্ধিক্ষণ' 'বেণু ও বীণা'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আর পুনর্মুদ্রিত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও তৎকালীন বহু পত্র-পত্রিকা 'বেণু ও বীণা' সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন; "তুমি যে কাব্য-সাহিত্যে আপনার পথ কাটিয়া লইতে পারিবে, তোমার এই প্রথম গ্রন্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।"

১০ই আষাঢ়, ১৩২৯ (২৫শে জুন, ১৯২২) সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যে মর্মস্পর্শী দীর্ঘ কবিতাটি রচনা করেন তা 'বেণু ও বীণা'র পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থারম্ভের পূর্বেই মুদ্রিত হয় এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থের শেষাংশে একটি 'কবি-পরিচয়' (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত) সংশ্লিষ্ট হয়।

'বেণু ও বীণা'র প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র ও মুদ্রাকর পরিচয় অংশটি এইরূপ ছিল :

বেণু ও বীণা ।/ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-বিরচিত ।/ কলিকাতা :/ সমাজপতি ও বসু কর্তৃক / ৪৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত । / ১৩১৩ । / এক টাকা ।/ কলিকাতা / ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, / মেটকাফ্ প্রেসে মুদ্রিত ।/

হোমশিখা (কাব্য)। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল : আশ্বিন, ১৩১৪ (১৬ই অক্টোবর, ১৯০৭)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৭। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' (১৩ই জুন, ১৯০০) বহু পরিবর্তিত আকারে 'হোমশিখা'র প্রথম কবিতা হিসাবে উক্ত গ্রন্থের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হয়, এবং পরে আর এটি মুদ্রিত হয়নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ৬৩তম গ্রন্থ 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত'তে এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, "ছাত্রাবস্থায় ১৯০০ সনে তাঁহার প্রথম পুস্তক 'সবিতা' গোপনে মুদ্রিত হয়।"

'সবিতা' গ্রন্থের আখ্যাপত্রে লিখিত ছিল : সবিতা (কাব্য)। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত। এবং তার নীচে ইংরেজ কবি টেনিসনের এই পঙ্ক্তি ক'টি—

"For I doubt not through the ages one increasing
And the thoughts of man are widened by the process of the suns."

Tennyson.

প্রকাশক : কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯০০। মূল্য দুই আনা। মুদ্রক সম্বন্ধে ইংরেজীতে লিখিত আছে : Calcutta. Printed by Srimanta Roy Chowdhury, Newton Press. 79/3/2/3, Cornwallies Street. 1900.

'সবিতা'র প্রকাশক তাঁর 'নিবেদন'-এ জানিয়েছিলেন : "সবিতা প্রকাশিত

হইল। ইহা একখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের কাব্য। কবি নবীন—'সবিতা' তাঁহার প্রথম উদ্যম। তবে এই প্রথম উদ্যমের ফল কেমন হইয়াছে, তাহার বিচারভার আমাদের নহে, সুধীগণের ও সাধারণের।"

এই কাব্যগ্রন্থের 'সূচনা'য় সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

"প্রাচ্যের বৈদিক ঋষি এবং প্রতিচ্যের বৈজ্ঞানিক উভয়ের চক্ষেই সবিতা জ্ঞানের আধার—প্রাণের আধার। এত উৎসাহ—এত তেজ আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। মানবের এমন গুরু আর নেই। তাই আমাদের প্রাণহীন জাতিকে অতীত ও বর্তমান স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত আজি ঐ প্রাণময় অমিততেজা বিশ্বজ্ঞানরূপী সবিতার মূর্তি অঙ্কিত করিবার প্রয়াস। জীবনে উৎসাহ চাই, মনে তেজ চাই, কর্মে আনন্দ চাই, হৃদয়ে স্ফূর্তি চাই। দর্শনের অবসাদ ঔদাস্য যথেষ্ট হইয়াছে—আর নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতায় শত শত লোক বর্ষে বর্ষে অনশনে প্রাণ হারাইতেছে, এমন করিয়া কতদিন চলিবে? দুই শত—চারি শত, দুই সহস্র—চারি সহস্র বৎসর, তারপর? জগৎ হইতে ভারতবাসীর নাম মুছিয়া যাইবে। জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমেরই সমাদর—প্রকৃতির নিয়ম। তাই যদি স্বজাতীয়ের বিলোপ বাঞ্ছিত না হয় তবে এখনও দার্শনিক নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানোন্নত শিল্পশিক্ষা কর্তব্য। সত্য বটে দর্শনই বিজ্ঞানের ভিত্তি, তাহা হইলেও অভিব্যক্তি হিসাবে বিজ্ঞান দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তাই উৎসাহ চাই—বল চাই—জ্ঞান ও সত্যের সমাদর চাই। তৃষ্ণার সময় কঠোর সংযম প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাই আমাদের দুর্দশা। এখন কিসে সকল সময় শীতল সলিল সুলভ হয়—অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, তাহাই দেখিতে হইবে। পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ হইব না—প্রতিযোগিতায় জগতের সমকক্ষ হইব—ইহাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া চাই। সবিতার মতো অদম্য উৎসাহ, অনন্ত তেজ, অশ্রান্ত গতি চাই। তবেই দেশের কল্যাণ—জাতির কল্যাণ—প্রতি অধিবাসীর কল্যাণ। এখনও সময় আছে। পূর্ব প্রতিভার অঙ্গারে এখনও অনল আছে। কে বলিল উৎসুক ফুৎকারে জ্বলিয়া উঠিবে না? ভারত দর্শনে শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞানে না হইবে কেন?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।"

'হোমশিখা'র আখ্যাপত্র ও মুদ্রাকর পরিচায়ক অংশটি নিম্নরূপ :

হোমশিখা। / শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত / বিরচিত। / কলিকাতা / সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী কর্ত্তৃক / ৩০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত / ১৩১৪ / এক টাকা। /

মেটকাফ্ প্রেসে মুদ্রিত / ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, / কলিকাতা /

তীর্থ-সলিল (কাব্য)। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল : ৭ই আশ্বিন, ১৩১৫ (২০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৫+।৵০।

সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্ব-সাহিত্যের কবিতার অনুবাদে যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, 'তীর্থ-সলিল' তারই প্রাথমিক নিদর্শন হিসাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অনূদিত কবিতাগুলির মূল রচয়িতাদের পরিচয় হিসাবে 'রহস্যের চাবি' নামে যে অংশটি 'তীর্থ-সলিল' গ্রন্থের শেষাংশে মুদ্রিত ছিল, সেটিও এস্থলে সামান্য পরিবর্তিত ও সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হ'ল।

'তীর্থ-সলিল' গ্রন্থ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "অনুবাদ পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। কবিতাগুলি এমন সহজ ও সরল হইয়াছে যে,···অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। মূলের রস কোনোমতেই অনুবাদে ঠিকমতো সঞ্চার করা যায় না, কিন্তু তোমার এই লেখাগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রসসৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরবই তাই—তাহা একই কালে অনুবাদ ও নূতন কাব্য।"

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "তুমি যে পৃথিবীর নানা খনি হইতে নানা রত্ন আহরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে উজ্জ্বল করিয়াছ ইহা আমাদের পরম আহ্লাদ ও গৌরবের বিষয়। ইহা তোমার খ্যাতনামা দাদা মহাশয়ের (অক্ষয়কুমার দত্ত) নাম রক্ষা করিতেছে ;—তিনি যেমন সেকালে গদ্যক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, আশীর্বাদ করি তুমিও কবিকুলের উচ্চ আসনে স্থান লাভ করিবে।···শেলির Sky Lark যে বাংলা কবিতায়ও এমন সুন্দর ও সুপাঠ্য হইতে পারে, তাহা তোমার রচনাতে প্রকাশ পাইতেছে।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন, "এই গ্রন্থে পাশ্চাত্য কবিতার পাশাপাশি প্রাচ্য কবিতাগুলি খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। 'মাঙ্গলিক' কবিতাটি আমার

খুব ভাল লাগিল ; [এই কবিতাটি এই খণ্ডের ২০৬ পৃ দ্রষ্টব্য] প্রত্যেক বাঙালীর গৃহে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। উপনিষদের কবিতাগুলির গাম্ভীর্য অনুবাদে নষ্ট হয় নাই। 'পরমেষ্ঠী'র [৩২৮ পৃ দ্রষ্টব্য] মতো এরূপ উদাত্ত ভাবের কবিতা আর কোন ভাষায় কোনো সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ।"

এতদ্‌ব্যতীত তৎকালীন বিখ্যাত 'বঙ্গবাসী', 'ভারতী', 'বসুমতী', 'উদ্বোধন' ও 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় 'তীর্থ-সলিল' সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ সমালোচনায় 'প্রবাসী'তে (অগ্রহায়ণ, ১৩১৫) প্রকাশিত হয়। সমালোচক লেখেন যে, "এই গ্রন্থখানি বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ হইয়াছে। বাঙালী পাঠক এই পুস্তকের ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের হৃৎস্পন্দন অনুভব করিয়া প্রীত ও পুলকিত হইবেন।...পরিশিষ্টে সকল কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়াতে পাঠকের বিশেষ সাহায্য হইবে।...জাপান চীন হইতে আমেরিকা অবধি, বৈদিককাল হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত ভগবদ্ভক্তি, নরপ্রেম ও দেশপ্রীতি বিষয়ে যত ভাবের কবিতা বিশ্বমানবের অন্তর হইতে ক্ষরিত হইয়াছে, তাহাই সংগৃহীত হইয়া বঙ্গবাসীর মন্দিরে আনীত হইয়াছে। তীর্থ-সলিল নামটি যেমন অন্বর্থ তেমনি কবিত্বময়।"...

'তীর্থ-সলিল' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র ও মুদ্রাকর পরিচয়টি এইরূপ :

তীর্থ-সলিল। / শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত। / কলিকাতা, / সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী কর্তৃক /৩০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। /১৩১৫। /একটাকা

মুদ্রক : মেসার্স মুখার্জি এণ্ড চ্যাটার্জি / ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, / মেটকাফ্ প্রেস, / কলিকাতা।/

'রহস্যের চাবি'

('তীর্থ-সলিল' গ্রন্থের কবিতা বা কবি-পরিচয়)

অথর্ব বেদ—যজ্ঞের সময়ে যিনি অন্যান্য ঋত্বিকের কার্য পরিদর্শন করিতেন তাঁহাকে ব্রহ্মা বলিত। এই ব্রহ্মাদিগের রচিত বেদই অথর্ব বেদ নামে পরিচিত।

অবস্তা—ইহাকে সাধারণতঃ জেন্দাবেস্তা বলে। প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্মশাস্ত্র। ইহা প্রায় বেদ-সংহিতার সমকালবর্তী।

অবৈয়ার—ইনি দাক্ষিণাত্যের

একজন স্ত্রী-কবি। বিদ্যাবতী বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে।

আনাক্রেয়ন—বুদ্ধদেবের সম-সাময়িক। ইনি আজীবন সুরা ও নারীর বন্দনা গাহিয়াছেন। জন্মভূমি গ্রীস।

আবু মহম্মদ—হারুণ-অল্-রসীদের পৌত্র কালিফ্ বাৎহক্ ইহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া ইহাকে রাজ-পরিচ্ছেদে ভূষিত করেন। ইনি সুগায়কও ছিলেন।

আব্দল্ সালম বিন রাগোয়োন্—ইনি হিজিরার দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার চরিত্র কতকটা বায়রনের মতো।

আলতাফ্ হুসেন আন্সারি—ইনি 'হালি' অর্থাৎ নব্য-কবি নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। আলি-গড়ের স্যার সৈয়দ আহম্মদ ইহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

আহ্লাও—(খ্রীঃ ১৭৮৭-১৮৬২) বাহুল্যবর্জিত মনোজ্ঞ ভাষায় করুণ রসের কবিতা ও গাথা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জন্মভূমি জর্মনি।

ইবসেন—(খ্রীঃ ১৮৩০-১৯০৬) বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার নানা জটিল সমস্যা-ইনি নাট্যবস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। জন্মভূমি নরওয়ে।

ইমাম সাফাই মহম্মদ বিন্ ইদৃস্—ইনি মহম্মদ প্রবর্তিত ধর্মমতের একটি নূতন শাখা সৃষ্টি করেন। ভয়ানক তার্কিক ও ঘোর অদৃষ্টবাদী ছিলেন।

ইশী—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনায় ইহার নিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে। জন্মভূমি জাপান।

এজিদ্ (কালিফ্)—মহম্মদের মদিনা প্রবেশের সত্তর বৎসর পরে ইনি কালিফ্ হন। কবিত্ব ভিন্ন ইহার অন্য কোনো সদ্গুণ ছিল না। ইহার মাতা মৈসুনা বেগমও সুকবি ছিলেন।

এরিস্টোফেনিস—(খ্রীঃ পূঃ ৪৪৪-৩৮৮) ইহার বুদ্ধিবৃত্তি, ভাবপ্রবাহ এবং কল্পনাশক্তি সমান প্রবল। ইনি ব্যঙ্গনাট্য রচনায় অদ্বিতীয়। জন্মভূমি গ্রীস।

ওমর খৈয়াম—(খ্রীঃ ১০৫০-৩১২২) জন্ম খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরে। ইনি গণিত-শাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ—(খ্রীঃ ১৭৭০-১৮৫০) ইনি ঋষি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। জন্মভূমি ইংলণ্ড।

কবীর—ইনি সুলতান সেকন্দর লোডির সমকালবর্তী ছিলেন। জন্ম বারাণসীর নিকটে। ইনি রামানন্দের শিষ্য, জাতিতে জোলা।

কালিদাস—নবরত্নের শ্রেষ্ঠতম রত্ন। ইঁহার দেশ ও কাল সম্বন্ধে মতের ভয়ানক পার্থক্য আছে। ইঁহার অধিকাংশ কাব্য উজ্জয়িনীতে রচিত বলিয়া বোধ হয়।

কীটস্—(খ্রীঃ ১৭৯৫-১৮২১) 'সুন্দরই সত্য এবং সত্যই সুন্দর'—ইহাই তাঁহার কাব্যের প্রধান কথা।

কেরি—(খ্রীঃ ১৬৭০-১৭৪৩) ইনি মার্কুইস অফ্ হ্যালিফাক্সের ঔরস-পুত্র। ইনি কবি ও সংগীত বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন।

কোরান—কাহারও মতে ইহা মহম্মদ শ্রুত ঈশ্বরের বচন। কাহারও মতে ইহা মহম্মদের নিজের রচনা। শেষ মতটিই সমীচীন।

খুশ্‌হাল (খাঁ খতক)—ইনি একজন আফগান সর্দার। কবি এবং ভারত সম্রাট শাজাহানের বন্ধু ছিলেন। পিতৃদ্রোহী আরঙ্গজেব ইঁহাকেও নানা মতে ক্লেশ দিয়াছিল। সে কাহিনী ইঁহার লেখাতেই পাওয়া যায়।

গতিয়ে—(খ্রীঃ ১৮১১-৭২) ফরাসী সমালোচকরা বলেন, ইনি চিত্র লিখিতেন ; শব্দ-শিল্পে তাঁহার ক্ষমতা অসীম।

গেটে—(খ্রীঃ ১৭৪৯-১৮৩২) ইঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী ; ইনি জর্মনির শ্রেষ্ঠ কবি, আবার বিজ্ঞানেরও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

গোর্কি (ম্যাক্সিম) খ্রীঃ ১৮৬৮-১৯৩৬—জন্মভূমি রুশিয়া। সামান্য ঝাড়ুদার হইতে ইনি একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ঔপন্যাসিক হইয়াছিলেন।

চাণক্য—চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী। কূট-বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত।

চিত্রলিপি (মিশরের)—অক্ষর সৃষ্টির পূর্বে মিশর দেশে চিত্রের সাহায্যে মনোভাব জ্ঞাপন করিবার প্রথা ছিল।

জনষ্টার্ন জোর্নসন্—নরওয়ের জাতীয় কবি।

জাতক গ্রন্থ (বৌদ্ধ)—প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ইহা একত্র গ্রথিত হয়। জন্মান্তরবাদ ইহার প্রধান প্রতি-পাদ্য। বুদ্ধ-কথিত কাহিনী নিশ্চয়ই ইহার ভিত্তি।

জেবুন্নিসা (খ্রীঃ ১৬৬৯-১৭০৯)—সম্রাট আরঙ্গজেবের বিদুষী ও রূপসী কন্যা। ইনি কবি ছিলেন।

টলস্টয় (কাউন্ট) খ্রীঃ ১৮২৮-১৯১০—ইনি লোকহিতের জন্য সর্বস্ব এমন কি স্বরচিত গ্রন্থসমূহের স্বত্ব পর্যন্ত দান করিয়া কুটীরবাসী হইয়াছিলেন। ইনি পূর্বে রুশিয়ার একজন প্রধান ভূস্বামী ছিলেন। এখনও সভ্য-জগতের মনের উপর রাজ্য করিতেছেন।

টেনিসন (আলফ্রেড, লর্ড) খ্রী: ১৮০৯-১৮৯২—ইনি মহারানী ভিক্টোরিয়ার সভাকবি ছিলেন।

ৎসিসাতু—ইনি উদ্ভট শ্লোকের মতো অনেক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন।

তলবকারোপনিষৎ—এ ক শ ত পঞ্চাশখানি উপনিষদের অন্যতম। উপনিষদের অনেকাংশ ক্ষত্রিয়দিগের রচিত। সুতরাং যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানকে ক্ষাত্রজ্ঞান বলিলেও ভুল হয় না।

থিয়গ্নিস—ইনি আমাদের বুদ্ধদেবের সমসাময়িক; জন্ম গ্রীস দেশে। ইনি একজন আভিজাত এবং তজ্জন্য গর্বিত ছিলেন।

দান্তে—(খ্রী: ১২৬৫-১৩২১) খ্রীষ্টান ইতালির প্রধান কবি। ইনি রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারেও মিশিতেন।

দায়ুদ (রাজা)—ইনি খ্রীষ্টের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথম বয়সে নিজ পিতার মেষ সমূহের পরিচর্যা করিতেন। ক্রমশঃ নিজ চরিত্রের বলে ইহুদীদিগকে স্বাধীন করেন। ইহার রচিত গানগুলি ইহার ঈশ্বর নির্ভরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নাইডু (সরোজিনী) খ্রী: ১৮৭৯-১৯৪৯—ইনি ইংরেজীতে চমৎকার কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। নাইডু ইহার স্বামীর উপাধি। ইনি হায়দরাবাদের প্রসিদ্ধ ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা।

নানক (খ্রী: ১৪৬০-১৫৩১)—শিখ-ধর্মের প্রবর্তক ও প্রথম গুরু। ইহার রচিত গানগুলি অতীব মধুর।

নিকোলাস (দ্বিতীয়)—রুশ সম্রাট। ইনি কবিতাও লিখিতেন।

পৃথ্বী কবি—ইনি রাণা প্রতাপসিংহের সমসাময়িক। জন্ম বিকানীরের রাজবংশে।

পেটোফি—হঙ্গেরির জাতীয় কবি। ইহার 'Talpra Magyar' শীর্ষক সংগীত বিনা রক্তপাতে হঙ্গেরির ভাগ্য পরিবর্তন করিয়াছিল।

পেত্রার্ক—ইনি 'সনেট' নামক ছন্দোবন্ধের আবিষ্কর্তা। জন্মস্থান ইতালি।

পো (এডগার অ্যালেন) খ্রী: ১৮০৯-১৮৪৯—জন্ম আমেরিকার বোষ্টন নগরে। ইহার রচনা ইন্দ্রজালের মতো মোহকর।

প্রজাপতি—ইনি ঋগ্বেদীয় কয়েকটি সূক্তের রচয়িতা; ইহার রচনা নব ভাবালোকে সমুজ্জ্বল।

প্রোক্টার (অ্যাডেলেড অ্যান্)—ইনি একজন স্ত্রী-কবি। উপদেশমূলক

কবিতাকে সরস করিতে ইনি বিশেষ পটু ছিলেন।

ফন্তেন (লা) খ্রীঃ ১৬২১-৯৫— ইহাকে ফরাসাদেশের বিষ্ণুশর্মা বলা যাইতে পারে।

ফিলিকাজা—(খ্রীঃ ১৬৪২-১৭০৭) ইহার অনেক কবিতা পেত্রার্কের কবিতার সহিত তুলনীয়। জন্মভূমি ইতালি।

ফিলিপস্ (ষ্টিফেন) খ্রীঃ ১৮৪৯-১৯১৫—ইংলণ্ডের বর্তমান যুগের এক-জন শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। 'মানুষ' শীর্ষক কবিতাটি বুয়ার যুদ্ধের সময়ে রচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র (খ্রীঃ ১৮৩৮-৯৪)— নব্যবঙ্গের গুরুস্থানীয়। বর্তমান যুগে ইনিই প্রথম বাংলাদেশে খাঁটি সাহিত্য-রসের মর্যাদা বুঝাইয়া দেন।

বায়রন—(খ্রীঃ ১৭৮৮-১৮২৪) ইংলণ্ডের প্রতিভা-প্রতিমা। জগদ্বিখ্যাত কবি।

বার্নস্ (রবার্ট)—(খ্রীঃ ১৭৫৯-৯৬) জন্ম স্কটলণ্ডে। ইনি কৃষক হইলেও প্রথম শ্রেণীর কবি। ইহার আবেগময়ী ভাষা অতুলনীয়।

বাল্মীকি—ভারতবর্ষের কবিগুরু। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের রচয়িতা প্রথম জীবনে নাকি দস্যু ছিলেন।

বিবেকানন্দ—(খ্রীঃ ১৮৬৩-১৯০২) ইনি য়ুরোপ ও আমেরিকায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। ইনি গদ্য-পদ্য অনেক লিখিয়াছেন। সমন্বয়াচার্য শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস ইহার গুরু ছিলেন।

বিশ্বামিত্র—(খ্রীঃপূঃ ১৭০০-১৬০০) ইনি অনেকগুলি ঋগ্বেদীয় সূক্তের রচয়িতা। ইনি অত্যন্ত অধ্যবসায় বলে ঋষিত্ব লাভ করেন।

বেদব্যাস—(খ্রীঃ পূঃ ১৬০০-১৫০০) ইনি দাসরাজ-কন্যা মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও বেদ পড়িতে পাইয়াছিলেন, এমন কি অনেকটা তাঁহারি কৃপায় বেদ বর্তমান কলেবর প্রাপ্ত হইয়া সুবিন্যস্তভাবে রক্ষিত হইয়াছে। এই ধীবর-দৌহিত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে আসন পাইয়াছেন।

বের‍ঁজ্যার—(খ্রীঃ ১৭৮০-১৮৫৭) ইহার বিদ্রূপাত্মক সংগীতসমূহ বিখ্যাত। জন্মভূমি ফ্রান্স।

বোয়ার্দো—ইনি ইতালির কবি।

ব্রাউনিং (রবার্ট)—(খ্রীঃ ১৮১২-৮৯) ইনি মানব জীবনের সমস্ত রস নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া স্বীয় কাব্যে তাহা নানা আকারে বিবৃত করিয়াছেন।

ব্লেক (উইলিয়াম) খ্রীঃ ১৭৫৭-১৮২৭—ইনি কাঠ ও ইস্পাতের উপর ছবি খোদাই করিতেন। ইংরেজ কবি হিসাবেও এঁর নাম মন্দ ছিল না।

ভবভূতি—প্রায় বার শত বৎসর পূর্বে ইনি দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। মনের অতি প্রবল ভাবাবেগ নির্ঝর-কাকলি-তুল্য ভাষায় প্রকাশ করিতে ইনি সংস্কৃত-সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ভর্তৃহরি—ইনি বিক্রমাদিত্যের সহোদর বলিয়া প্রবাদ আছে। স্ত্রী-চরিত্রে অশ্রদ্ধাবশতঃ বৈরাগ্য অবলম্বন করেন।

ভার্জিল—(খ্রীঃ পূঃ ৭০-১৯) প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের মহাকবি।

ভল্টেয়ার—(খ্রীঃ ১৬৯৪-১৭৭৮) ইনি স্বীয় গ্রন্থে কাহাকেও বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেন না। এজন্য অনেকবার ইঁহাকে নির্বাসিত হইতে হইয়াছিল। ইনি ফরাসী-বিপ্লবের দীক্ষা-গুরু।

মজ্‌নাইকেন—বেলজিয়মের কবি।

'ম-ন্যো-শু' গ্রন্থ—প্রাচীন জাপানী কবিতার সংগ্রহ। 'ম-ন্যো-শু' অর্থাৎ সহস্রদল।

মহিন অল্‌হরামি—হিজিরার দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাচীন আরব কবিতার একটি সংগ্রহ-পুস্তক প্রচারিত হয়। ঐ পুস্তকের নাম 'হামাসা'। উহাতে এই কবির অনেকগুলি কবিতা আছে।

মাইকেল মধুসূদন—(খ্রীঃ ১৮২৪-৭৩) বঙ্গভাষার প্রথম মহাকবি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক।

মিলারেপা (লামা)—পিতৃব্য কর্তৃক পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়া ইনি মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে তাহার উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হন; পরে মারণ-উচাটনাদির অভ্যাসে মানসিক অবনতি হইতেছে বুঝিয়া বুদ্ধপদে চিত্ত সমাহিত করেন। ইনি তিব্বতবাসীদের প্রিয় কবি।

মূর—(খ্রীঃ ১৭৮০-১৮৫২) জন্ম আয়র্লণ্ডে। ইনি লঘু চটুল কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত।

য়ুরিপিডিস—ইনি সক্রেটিসের বন্ধু ছিলেন। প্রায় সত্তরখানি নাটক রচনা করেন। জন্মভূমি গ্রীস।

রঁসার্—(খ্রীঃ ১৫২৪-৮৫) ইনি ইঁহার কয়েকটি কবিবন্ধু 'সাতভাই চম্পা' বা কৃত্তিকা-মণ্ডলী নামে অভিহিত হইতেন। জন্মভূমি ফ্রান্স।

রুজে দেলিল্‌—ইনি মেয়র ডাত্রিকের অনুরোধে ফরাসীদের জাতীয় সংগীত 'লা মার্শেয়েস' রচনা করেন। এই সংগীতের প্রথম বঙ্গানুবাদ ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'নব্য ভারতে'

প্রকাশিত হয়। (বৃটেন—তৎকালীন বড়ালীয়াকের সেনাপতি ছিলেন।)

'লাল মানুষ'—আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে আমি 'লাল মানুষ' নামে অভিহিত করিয়াছি।

লোপ দি বেগা—(খ্রী: ১৫৬২-১৬৩৫) জন্মভূমি স্পেন। ইনি অসংখ্য নাটক ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

শিলার—(খ্রী: ১৭৫৯-১৮০৫) ইঁহাকে অনেক দেশবাসীরা জার্মানির শেক্সপীয়ার বলে। প্রথম জীবনে চিকিৎসক ছিলেন।

'শী-কিং' (গ্রন্থ)—ইহার অর্থ কবিতা পুস্তক। চীন দেশের প্রাচীন কবিতা সমূহ প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে একবার একত্র সংগৃহীত হয়, সংগ্রহ গ্রন্থের নাম 'শী-কিং'।

শূদ্রক—রাজা ও কবি। কেহ কেহ বলেন ইনি নিজে কবি ছিলেন না। ধাবক নামে কোনো কবির রচনা ক্রয় করিয়া নিজের নাম দিয়া প্রচার করিলেন।

শেক্সপীয়ার—(খ্রী: ১৫৬৪-১৬১৬) জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। মানব-চরিত্রের দূত।

শেলি—(খ্রী: ১৭৯২-১৮২২) ইঁহার রচনা বিদ্যুতের মতো তীব্র ও উজ্জ্বল। ইনি কবি-সমাজের কবি নামে খ্যাত।

শ্রীহর্ষ—রাজা ও কবি। সংস্কৃত সাহিত্যের অতি বিখ্যাত। কেহ কেহ বলেন ধাবকের রচনা ইঁহার নামে প্রচারিত হইয়াছে।

সাদি—খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'গুলিস্তাঁ'।

সিমনিডিস—ইনি গ্রীসদেশের এক-জন বিখ্যাত লেখক।

সিডনি—(খ্রী: ১৫৫৪-১৫৮৬) জন্মভূমি ইংলণ্ড।

সিরাজ আল্ ওয়ারক—ইনি আরব দেশের কবি।

সুইনবার্ন—(খ্রী: ১৮৩৭-১৯০৯) ইংরেজ কবি। ইঁহাকে বায়রনের মানসপুত্র বলা যাইতে পারে। ভাষা ও ছন্দের উপর ইঁহার অসাধারণ দক্ষতা।

সুদাস (রাজর্ষি)—ইনি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সমসাময়িক বিখ্যাত রাজা ও ঋগ্বেদীয় সূক্তের রচয়িতা।

সুরদাস—ইঁহার রচিত ভজনগুলি প্রত্যেক হিন্দুস্থানীর আদরের বস্তু। ইনি অন্ধ ছিলেন।

স্যাফো—(খ্রী: পূ: ৬১০-৫৭০) 'কৃষ্ণকুন্তলা, মধুরহাসিনী, নিষ্কলঙ্ক স্যাফো'। জন্মভূমি গ্রীস।

হাফেজ—হিজিরার অষ্টম শতাব্দীতে পারস্যের সিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার রচনার সহিত আমাদের বৈষ্ণব কবিদের রচনার ভাবগত সাদৃশ্য আছে।

হায়েন্—(খ্রীঃ ১৭৯৯-১৮৫৬) ইঁহার রচনার সহজ সৌন্দর্য অনুকরণীয়। জন্মভূমি জর্মনি। জাতিতে ইহুদী।

হিরণ্যগর্ভ (ঋষি)—ইনি ঋগ্বেদীয় স্থক্তের রচয়িতা। কবি ও দার্শনিক।

হুইট্‌ম্যান (ওয়াল্‌ট্) খ্রীঃ ১৮১৯-৯২ —আমেরিকার প্রসিদ্ধ কবি ; বিশ্বপ্রেম ইঁহার কাব্যে ওতঃপ্রোত।

হুগো (ভিক্তর) খ্রীঃ ১৮০২-৮৫— কবি, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক স্বদেশ প্রেমিক, আধ্যাত্মবিদ্যায় পরমপণ্ডিত। 'হাসি-অশ্রুর সম্রাট'। জন্মভূমি ফ্রান্স।

হেঙ্‌জু—ইনি জাপান দেশের একজন প্রাচীন কবি।

হোমর—ইনি আমাদের বেদব্যাস অপেক্ষা ছয় শত বৎসরের ছোট। য়ুরোপখণ্ডের প্রথম ও প্রধান মহাকাব্য রচয়িতা। জন্মভূমি গ্রীস অথবা এশিয়া মাইনর।

হোমস্—(অলিভার ওয়েণ্ডেল)— ইঁহার গদ্য ও পদ্য হাস্যস্নিগ্ধ সরস মাধুর্যের জন্য প্রসিদ্ধ। জন্মস্থান আমেরিকার বোস্টন নগরী।

হোরেস—(খ্রীঃ পূঃ ৬৫-৮) জন্মভূমি ইতালি। ইঁহার ভাষা ও ছন্দের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ইনি নানা ছন্দের নানা বিষয়ের কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

জন্মদুঃখী (উপন্যাস)। প্রথম প্রকাশকাল : দক্ষিণায়ন-সংক্রান্তি, ১৩১৯ (২০শে জুলাই, ১৯১২)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬১।

ইহা ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী' (জ্যৈষ্ঠ-চৈত্র, ১৩১৮) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 'জন্মদুঃখী' নরওয়ের Jonas Lie রচিত 'Livsslaven' নামক উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে বাংলায় অনূদিত।

Jonas Lauritz Edemil Lie (জন্ম : ৬ই নভেম্বর, ১৮৩৩—মৃত্যু : ৫ই জুলাই, ১৯০৮) নরওয়ের একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও কবি। জোনাস লাই সাধারণভাবে কল্পনানির্ভর ফ্যাণ্টাসি-জাতীয় কাহিনী রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে লিখিত আছে, "As a novelist he stands with those minute and unobtrusive painters of

contemporary manners who defy arrangement in this or that school."
—Encyclopaedia Britannica (1963) Vol. 14

'Livsslaven' (১৮৩৮) উপন্যাসটি তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ব্যতিক্রম হিসাবেই গণ্য। এই উপন্যাসটিতে সমাজ-সমালোচনা ও বাস্তব-চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। অনুবাদের জন্য এই উপন্যাসটি বেছে নেওয়ার মধ্যেও সত্যেন্দ্রনাথের বহুমুখী কৌতূহলের প্রকাশ ব্যক্ত হয়।

'ভারতী' (আশ্বিন, ১৩১৯) পত্রিকায় শ্রীসত্যব্রত শর্মা ও 'প্রবাসী' (আশ্বিন, ১৩১৯) পত্রিকার ছদ্মনামী সমালোচক 'মুদ্রারাক্ষস' [চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] 'জন্মদুঃখী'র দুটি দীর্ঘ সমালোচনা করেন। 'মুদ্রারাক্ষস' তাঁর সমালোচনার একস্থানে লেখেন, "এইরূপ একখানি দরিদ্র জীবনের করুণ কাহিনী ভাষান্তরিত করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ কবিহৃদয়েরই পরিচয় দিয়েছেন—আমাদের নিজস্ব যাহা অভাব ছিল, তাহা পরের ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়া সাহায্য করিয়াছেন,—এজন্য বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।"

স্বর্গত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কিছু বক্তব্য প্রাসঙ্গিকভাবে এস্থলে উল্লেখ করা যায়। তিনি তাঁর 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' (১৩৬৪) গ্রন্থে লিখেছেন, "১৯০৮-১০ সালে সত্যেন্দ্রনাথ-সৌরীন্দ্রমোহন-চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণ লেখকরা রবীন্দ্রনাথের কাছে সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, তখন রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁদের বলেন, 'সেরা বিদেশী উপন্যাস বাংলায় অনুবাদ করতে। লাইন ধরে অনুবাদ নয়—বিদেশী উপন্যাস পড়ে মূল কাহিনীটিকে নিজের ভাষায় বেশ সাবলীল ভঙ্গিতে লিখতে হবে। বিদেশী উপন্যাসের মধ্যে যে সব ঘটনা বা চরিত্রাদি আমাদের দেশের পাঠকসমাজ ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না, তা বাদ দিলেও দোষ হবে না। এ-অনুবাদে শিক্ষা হবে—উপন্যাসের theme কি করে নানা ঘটনা এবং নানা চরিত্র-সমাবেশে সুস্পষ্টভাবে ব্যঞ্জিত করা যায়।'...তাঁর উপদেশে আমি করে-ছিলুম পর-পর তিনখানি বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ—তাঁরি নির্দিষ্ট প্রণালী মেনে 'বন্দী' (ভিক্টর হুগো), 'মাতৃঋণ' এবং 'নবাব' (আলফঁশ দোদে)। মণিলাল করেছিলেন একখানি ডাচ উপন্যাসের অনুবাদ—'ভাগ্যচক্র'; এবং সত্যেন্দ্রনাথ করেছিলেন জোয়ানা লাইয়ের Soul of a Slave ['Livssla-

ven'-এর ইংরেজী নাম] উপন্যাসের অনুবাদ—'জন্মদুঃখী'।" [রবীন্দ্র-স্মৃতি, পৃ ১২৭-২৮] বলা বাহুল্য, এই ইংরেজী অনুবাদ থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গানুবাদ করেছেন।

'জন্মদুঃখী' প্রথম প্রকাশের প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরে ১৯৬৬ সালে এর আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। (প্রকাশক : এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কো., ৩১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সংস্করণে 'জন্মদুঃখী' নামটির পরিবর্তন-সাধন করা হয় এবং নূতন নামকরণ হয় 'জীবন-তরঙ্গ'। প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মভূষণ এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা রচনা করেন।

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র, প্রকাশক ও মুদ্রাকর পরিচয় ছিল নিম্নরূপ :

জন্মদুঃখী / শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত / মূল্য বার আনা / প্রকাশক / শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় / ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস / ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট / কলিকাতা / কান্তিক প্রেস / ২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, / কলিকাতা / শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।/

রঙ্গমল্লী (নাট্য)। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় : ? (৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০১। 'আহুমতী', 'সবুজ সমাধি', 'দৃষ্টিহারা' ও 'সিরিয়াসন' নামক চারটি বিভিন্ন দেশের নাট্যানুবাদ একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় 'রঙ্গমল্লী'র মধ্যে।

'আহুমতী' নাটিকাটি ইংরেজ কবি Stephen Phillips-এর (১৮৬৪-১৯১৫) রচনার বঙ্গানুবাদ। 'প্রবাসী' (কার্তিক, ১৩১৯) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

'সবুজ সমাধি' একটি চীনা নাটিকা। প্রথম প্রকাশ : 'ভারতী' (আষাঢ়, ১৩১৮)।

'দৃষ্টিহারা' নাটিকাটি বেলজিয়ান কবি ও নাট্যকার Maurice Materlinck-এর (১৮৬২-১৯৪৯) Les Lenogles বা ইংরেজীতে Sightless-এর বঙ্গানুবাদ। ইহাকে 'জিজ্ঞাসুর স্বপ্ন'ও বলা হয়ে থাকে। প্রথম প্রকাশিত হয় : 'প্রবাসী' (চৈত্র, ১৩১৬)।

'মিথ্যাসন' জাপানী নাটিকা 'Za Zen'-এর ভাবানুবাদ। সত্যেন্দ্রনাথ এই জাপানী নাটিকাটির ইংরেজী 'Abstraction' নামের অনুবাদ খানি পেয়েছিলেন B. H. Chamberlain সম্পাদিত 'The Classical Poetry of the Japanese' গ্রন্থ থেকে।

'মিথ্যাসন' প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকার ১৩১৯ সালের কার্তিক সংখ্যায়।

ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের 'অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ' (১৩৬৮) গ্রন্থে ইংরেজী অনুবাদটি পুনর্মুদ্রিত হয়। এই 'মিথ্যাসন' নাটিকাটি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে একস্থানে গ্রন্থকার বলেছেন, "বাংলা একাঙ্কিকার ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথের 'মিথ্যাসন' নাটিকাটির চিরন্তন আসন রয়েছে।" অন্যত্র তিনি আরও বলেছেন, "সত্যেন্দ্রনাথের মিথ্যাসন উল্লিখিত ইংরাজী নাটিকাটির কেবল অনুবাদ নয়···একটি নির্মিতি, অর্থাৎ অসাধারণ-চমৎকার-কারিণী রচনা। ইংরাজী নাটিকাটি অনেক আড়ষ্ট···বাংলাটি অনেক প্রাণবন্ত।"

আলোচ্য 'রঙ্গমল্লী' গ্রন্থটি 'ভারতী' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০) পত্রিকায় সমালোচনা করেন গোলকবিহারী মুখোপাধ্যায়। এতদ্ব্যতীত 'প্রবাসী'র (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০) 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগেও গ্রন্থটির একটি দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

কবির জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর 'রঙ্গমল্লী'র আর কোনো নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র, প্রকাশক ও মুদ্রাকর পরিচয় এইরূপ :

রঙ্গমল্লী / শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত / মূল্য বারো আনা / প্রকাশক / শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় / ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস / ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা / কান্তিক প্রেস / ২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা/শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত /

চীনের ধূপ (প্রবন্ধ)। প্রথম প্রকাশকাল : ? (৫ই অক্টোবর, ১৯১৩)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪।

'চীনের উপনিষৎ', 'চীনের নীতি-সাহিত্য', 'কাঁটা বনের প্রজাপতি' ও 'আদর্শের স্রষ্টা' নামক চারটি স্বতন্ত্র নিবন্ধ নিয়ে 'চীনের ধূপ' রচিত। এর মধ্যে 'চীনের উপনিষৎ', 'প্রবাসী' (আষাঢ়, ১৩১৭) এবং 'কাঁটা বনের প্রজাপতি',

'প্রবাসী' (ভাদ্র, ১৩১৭) পত্রিকার 'সংকলন ও সমালোচনা' বিভাগে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'কাঁটা বনের প্রজাপতি' নিবন্ধটির সঙ্গে দুই শত বৎসরের প্রাচীন চীনা চিত্র হইতে সংগৃহীত 'তাও-পন্থী ম্যাও য়িং ঋষির স্বর্গারোহণ' নামক একটি সুন্দর চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

এই গ্রন্থের কোনো ভূমিকা ছিল না। কিন্তু 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' (১৩৬৪) গ্রন্থের লেখিকা সন্‌জীদা খাতুন অনবধানবশতঃ একটি বন্ধনীর মধ্যে 'চীনের ধূপ'-এর পরিচয় সম্পর্কে 'চীনদেশের ঋষি ও মনীষীদিগের ভাব-সম্পুট' (ভূমিকা, 'চীনের ধূপ') এরূপ উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' পুস্তিকায় 'চীনের ধূপ'-এর পরিচয় সম্পর্কে ঐ পঙ্‌ক্তিটি উল্লেখ করেছিলেন বলে, শ্রীমতী খাতুন এটিকে ভূমিকার অংশ হিসাবে গণ্য করেন।

'চীনের ধূপ' তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় বহু প্রশংশিত হয়। তন্মধ্যে 'ভারতী' (কার্তিক, ১৩১৯) পত্রিকার সমালোচক তাঁর দীর্ঘ সমালোচনার একস্থানে লেখেন, "এই গ্রন্থে এমন অনেক মহাবাণী আছে, যাহা পাঠ করিলে অনেক বিষয়ে আমাদের চোখ খুলিবে, জীবনযাত্রার অনেক জটিল প্রশ্ন-সমাধানের সহায়তা ঘটিবে। কঠিন ভাবগুলিকে সহজ সরল ও সুমধুর ভাষায় প্রকাশ করিবার কৃতিত্ব সত্যেন্দ্রবাবুর অসামান্য।…চীনের ধূপের সৌরভে গ্রন্থকার আমাদের হৃদয় উল্লসিত করিয়া তুলিয়াছেন।"

এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের পর আর কোন নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। এর নামপত্র, প্রকাশক ও মুদ্রাকর পরিচয় অংশটি নিম্নরূপ :

চীনের ধূপ / শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত / চারি আনা। / প্রকাশক / শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত/ ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস,/ ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা / কান্তিক প্রেস / ২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা / শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত। /